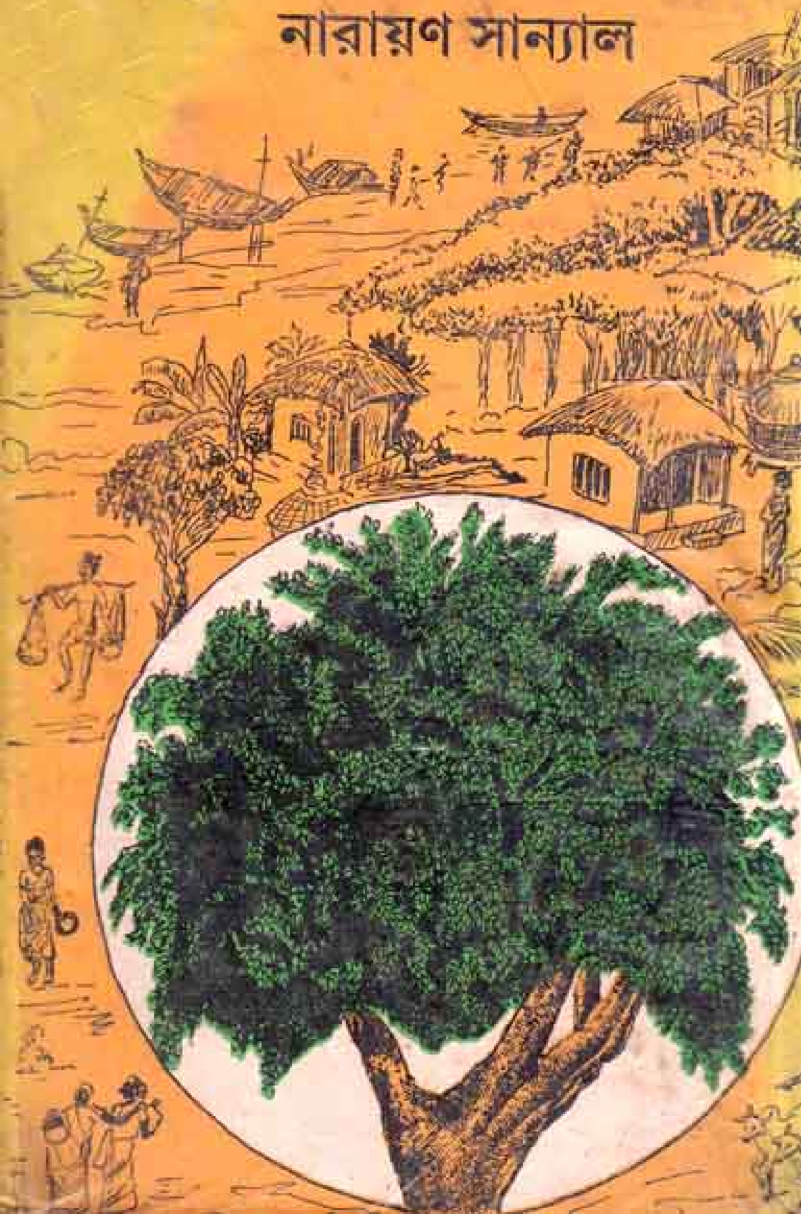
অরণ্যদণ্ডক

নারায়ণ সান্যাল





বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যসন্ধানী নারায়ণ সান্যালের সাহিত্যসৃষ্টির একটি পর্যায় : উদ্‌বাস্তু-জীবন। 'ট্রিলজি'র এইটি শেষ গ্রন্থ। ষাটের দশকে প্রথম প্রকাশকালেই তা সাড়া জাগিয়েছিল : "লেখক অত্যন্ত সচেতনায় এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে এই বৃহৎ উপন্যাসে হাত দিয়েছেন এবং স্বীকার করতে বাধা নেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এত চরিত্রের আনাগোনা, এত ঘটনার অনুপ্রবেশ, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও পাঠকের বিরক্তি জাগবে না।"

—আনন্দবাজার — 15.7.62

"সমকালীন বাঙালীজীবনে উদ্‌বাস্তু-সমস্যার মতো এতবড় একটা জাতীয় সমস্যা সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে আঘাত দিলেও তা নিয়ে যথার্থ রসোত্তীর্ণ সাহিত্য তেমনভাবে রচিত হয়নি।... এত কথা বলবার প্রয়োজন এ জন্য যে, বিকর্ণ রচিত নৈমিষারণ্য বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হবে বলেই বিশ্বাস রাখি।"

—যুগান্তর — 22.7.62

"তাঁর অভিজ্ঞতা, সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং গভীর অভিনিবেশের জন্য এবং কাহিনী গঠন, চরিত্রসন্নিবেশ ও রচনাভঙ্গির বিশেষ আকর্ষণে সুবৃহৎ উপন্যাসটি পড়তে কোথাও বিপর্যস্ত বোধ হয় না।"

—দৈনিক বসুমতী — 6.8.62

"এ-গ্রন্থের ভাষার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই। উদ্‌বাস্তুদের মুখে পূর্ববঙ্গের ভাষার নমুনা কোন কোন পাঠকের কানে মধুবৃষ্টি করতে থাকে।"

—চতুরঙ্গ — পূজা সংখ্যা — 1962

"The author deserves compliments for building a close-knit story utilising the big social up-heaval of Bengal of the post-independence period"

—Amrita Bazar — 10.10.62

"এ-গ্রন্থ উদ্‌বাস্তু-জীবন নিয়ে এক পরম অনুসন্ধিৎসু ও আন্তরিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসার একটি সার্থক সাহিত্যকর্মরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

—দেশ — 12.1.63

কৈফিয়ৎ

[ষাটের দশকে 'নৈমিষারণ্য'-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে]

বাঙলা ব্যবচ্ছেদের পর এবং অরণ্যযাত্রার পূর্বে উদ্‌বাস্তুদের জীবনে এসেছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পি. এল. ক্যাম্পের সেই পরনির্ভরশীল জীবন এবং আর্বান-রুরাল-জবরদখল কলোনিতে ওদের সেই জীবন-সংগ্রামের কথা না জানলে বাস্তুচ্যুত সেই মানুষগুলির অরণ্যবাসের চিত্র সম্পূর্ণ দেখা হয় না। অথচ ওদের সে জীবনের চিত্র আঁকতে গেলে এ বৃহদায়তন উপন্যাসের কলেবর যেত আরও বেড়ে। এইজন্য উদ্‌বাস্তু-জীবনের ঐ দুটি পটভূমিকার উপর রচিত ইতিপূর্বে প্রকাশিত দুটি বাঙলা উপন্যাসের [এখন স্বীকার করায় আপত্তি কী? এখানে 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প' ও 'বল্মীক' গ্রন্থদ্বয়ের কথা বলা হয়েছিল।] কয়েকটি চরিত্র লেখকের অনুমতি অনুসারে এ বইতে ব্যবহার করেছি। যাঁরা সেই দুটি উপন্যাস পড়েননি তাঁদের রসগ্রহণে কোন অসুবিধা হবে বলে আশঙ্কা করি না—যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা উদ্‌বাস্তু-জীবনসংগ্রামের একটা সামগ্রিক চিত্র পাবেন এমন আশা করা অসঙ্গত নয়।

সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় যখন ধারাবাহিকভাবে 'নৈমিষারণ্যের ডাক' নামে একটি রম্যরচনা প্রকাশিত হচ্ছিল তখন নৈমিষারণ্যের ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে অনেকে সম্পাদক-মারফৎ আমাকে পত্রাঘাত করেছিলেন। রামের জন্মস্থান হিসাবে অযোধ্যার চেয়ে আদিকবির মনোভূমির দাবিই নাকি অগ্রগণ্য—একথা বলে এ প্রসঙ্গের ছেদ টানা চল্‌ত—যদি নৈমিষারণ্যে'-র বদলে অন্য কোন কাল্পনিক নাম আমি গ্রহণ করতাম। কিন্তু নৈমিষারণ্যের ভৌগোলিক ও পৌরাণিক অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। গোমতী নদীর তীরে এ অরণ্যের অস্তিত্ব আজও নির্দেশিত হয়। আমার কল্পনালোকের নৈমিষারণ্য সে নৈমিষারণ্য নয়। এ উপন্যাস-বর্ণিত সমস্ত চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশ কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও আমি কেন ঐ পৌরাণিক নামটি ব্যবহার করলাম এমন একটা প্রশ্ন ওঠা অসঙ্গত নয়। নৈমিষারণ্যে মহামুনি গৌরমুখ মন্ত্রবলে 'নিমেষ' মধ্যে অসুরকুলকে নির্মূল করেছিলেন। কলিযুগের মানুষের সে মন্ত্রশক্তি নেই। বোধকরি এই কাহিনীর কল্পনা-অরণ্যে যে সুরাসুরের দ্বন্দ্ব চিত্রিত করা হয়েছে, সেখানে আসুরিক প্রভাবকে নিমেষমধ্যে নির্মূল করার ক্ষমতা নেই বলেই লেখক এই নামকরণের মাধ্যমে খুঁজেছেন ইচ্ছাপূরণের এক তির্যক-তৃপ্তি—ভাইকেরিয়াস্ এঞ্জয়মেন্ট।

বিকর্ণ

নব্বই-দশকের কৈফিয়ৎ

বিগত চৌত্রিশ বছরে গঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত ধীরগতি জলধারাই শুধু নয়, দণ্ডকারণ্যের চিত্রকূট জলপ্রপাত থেকে ইতিমধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আছড়ে পড়েছে লক্ষ-কোটি গ্যালন জল। তাই 'নৈমিষারণ্য' বিবর্তিত হয়েছে 'দণ্ডকারণ্যে'। বিকর্ণের ছদ্মনামও আজ অনাবশ্যক। প্রসঙ্গত বলি, এত সাবধানতা সত্ত্বেও আমার আত্মগোপনের প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি—দণ্ডকারণ্যে ডেপুটেশনে কর্মরত এঞ্জিনিয়ারকে 'নৈমিষারণ্য' গ্রন্থপ্রকাশের অনতিবিলম্বে একটি নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছিলেন দণ্ডকারণ্য-প্রকল্পের সর্বময় কর্ণধার সুকুমার সেন, আই. সি. এস.। লেখককে অভিনন্দিত করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্তবিভাগ থেকে ডেপুটেশন নিয়ে দণ্ডকারণ্যে চাকরি করতে গিয়েছিলাম 16.4.1960 তারিখে। প্রথমে একাই গিয়েছিলাম, সপরিবারে নয়। তবে আমার যাত্রা-সঙ্গিনী ছিল এক জগদ্দল মার্বেল-ফলক। কথা ছিল পরের সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে সফরে যাবেন এবং ভাস্কল-ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর গেড়ে আসবেন। ঐ প্রস্তরখণ্ডটি নিয়ে আমার বিড়ম্বনার কথা এবং হাওড়া স্টেশনের লালমুখো সর্বাধিনায়কের সঙ্গে আমার তকরারের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি **'পঞ্চাশোর্ধ্বে'** গ্রন্থে। সপরিবারে দণ্ডকারণ্যে বাস করেছি দুই বছর। ফিরে এসে কলকাতায় চাকরিতে যোগ দিই 4.3.1962 তারিখে।

অরণ্যবাসকালে দুটি গ্রন্থ রচনা করি। একটি আদিবাসীদের নিয়ে : **দণ্ডকশবরী**। সেটি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য মনোজ বসুকে, বেঙ্গল পাব্‌লিশার্সে। মনোজদা আমাকে না জানিয়েই রচনাটি শ্রীসাগরময় ঘোষকে পড়তে দেন। পরে সেটি ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটির সে-কালীন নাম ছিল **'নৈমিষারণ্য'**, অর্থাৎ বর্তমান উপন্যাসটি। তার কিছু বিক্ষিপ্ত রচনাও প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' সাপ্তাহিকে — **নৈমিষারণ্যের ডাক** নামে।

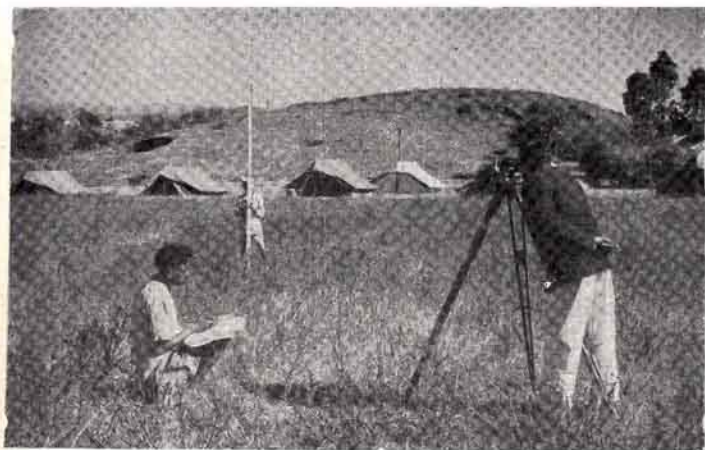
অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে আমি পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারে ডেপুটেশনে যাই — এন. বি. ও-র পূর্বভারতীয় লায়াজন অফিসার হিসাবে। সে সময় — আশীর দশকে — কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে এক সপ্তাহের জন্য দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম — আদিবাসীদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের রূপায়ণে। সে অভিজ্ঞতার খণ্ডচিত্র প্রকাশিত হয়েছে **ষাট-একষট্টি** গ্রন্থে।

বিশ বছর পরে গিয়ে দেখেছিলাম ভাস্কল ড্যাম সুসম্পন্ন হয়েছে। খালের জলে মধ্যপ্রদেশের অনুর্বর জমি সোনা ফলাচ্ছে। কিন্তু সে ফসল কেটে কেটে ঘরে

তুলছে মধ্যপ্রদেশের কৃষক — কোনও বাঙালী উদ্‌বাস্তু পরিবার নয় (আমরা কিন্তু ভাস্কল ড্যাম ও সেচের খাল খনন করেছিলাম উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন খাতে)।

প্রসঙ্গত, যে গ্রামটির চিত্র ষাটের দশকে এঁকেছিলাম — যার বর্ণনা পাবেন এ গ্রন্থশেষে — সেই বাস্তব গ্রামটিতেও আমি গিয়েছিলাম আশীর দশকে। যে বাস্তব মানুষের ছায়া দিয়ে গড়েছিলাম কিছু কাল্পনিক চরিত্র — তাদের চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি। তারাপ্রসন্ন বা রত্নাকর ঘোষকে জীবিত দেখব না, এ আশঙ্কা ছিলই ; কিন্তু বাদবাকি জোয়ান মানুষগুলো? ঐ যগন্দ, রাখহরি, ছিদেম, নবীন যুগীর জামাই-বেটা রসময় আর আনন্দ? বিশে, পাঁচু, ছিনাথ, সুধাময়, অর্জুন, মাধো? দেবু পণ্ডিত আর উমা? — নেই, নেই, কেউ নেই সে-গ্রামে। গ্রামটা আছে — বাস করে মধ্যপ্রদেশের মানুষ। কেউ আমাকে জানাতে পারল না এ গাঁয়ের সেই ছিন্নমূল মানুষগুলো শেষপর্যন্ত কোথায় গেল — সুন্দরবন, মরিচঝাঁপি.........নাকি দুনিয়ার বাইরে!

নারায়ণ সান্যাল
15.8.94



উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসনের কাছে দণ্ডকারণ্যে প্রথম জরিপ হচ্ছে



উদ্‌বাস্তু-গ্রামের পত্তন। বাঁয়ে সারি সারি হোলদারী তাঁবু, ডাইনে নয়া বাস্তুর খুঁটি গাড়া হচ্ছে। পেছনে অরণ্যের অবশেষ



প্রথম যৌথ চাষের ফসল

প্রাইমারি স্কুলে উদ্‌বাস্তু শিশুরা



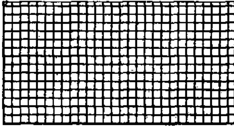
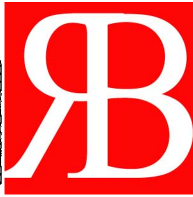
উদ্‌বাস্তুদের মাছ ধরা

প্রথম বর্ষণের পর দণ্ডকারণ্যের কুমারী ভূখণ্ডে প্রথম কর্ষণ



প্রথম বর্ষ চাষের পর পাকা ধানের ক্ষেতে রত্নাকর ঘোষ



অরণ্যকাণ্ড

—অরণ্যদণ্ড!

কথাটা বলেছিল মাকরেল ক্যাম্পের ছিনাথ। শ্রীনাথ মালাকার। উদ্ধত ভঙ্গিতে নয়—সবিনয়ে হাত দুটি জোড় করে নিবেদন করেছিল তার বক্তব্য : আজ্ঞে বাবুমশয়, পেরথমে তো ক'ন নাই, যে বিচারে আমাগো অরণ্যদণ্ড হইছে।

—অরণ্যদণ্ড! সেটা আবার কী?

—হেই কথাডা তো আমরাও জিগাই। কারাদণ্ডরে চিনি, মিত্যুদণ্ডও না চিনি তা লয়, কিন্তুক্ এমন অরণ্যদণ্ড দিবার ববস্থা হইছে, তা তো ক'ন নাই।

বসুজা চুপ করে থাকে। নতুন এসেছে সে ডেপুটেশান নিয়ে। মাত্র গতকাল রাত্রে। আজ সকালে জয়েনিং রিপোর্ট দিয়েছে কি দেয়নি; মৈত্র বললে, যাবে নাকি রিতুদা কাজ দেখতে?

—কাজ? আমার আবার কাজ কোথায় এখানে? আমার পোস্টিং তো সেই কোন্ডাগাঁও—এখান থেকে চল্লিশ মাইল।

—না না আপনার জুরিস্‌ডিকশন্ নয়। মাকরেল ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে ধর্মঘট হয়েছে। সি. ই. আমাকে তদন্ত করে একটা রিপোর্ট দিতে বলেছেন। যাবেন দেখতে?

অগত্যা রাজি হয়ে চলে এসেছে বসুজা। এখন মনে হচ্ছে এসে ভালই করেছে। দিব্যি একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেল মৌফৎসে।

উনিশ শ' ষাট সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার যাঁরা মহামহারথী তাঁরা আগামী সপ্তাহে সরেজমিনে একটা তদন্ত করতে আসছেন। সারা পরিকল্পনায় তাই সাড়া পড়ে গেছে। মাকরেল ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পেও ওঁদের পদধূলি পড়ার কথা। এই মওকায় ওরা ধর্মঘট ঘোষণা করে বসল। অভাব-অভিযোগের একটা লম্বা ফিরিস্তি তৈরি করেছে রত্নাকর ঘোষ—ওদের পাণ্ডা। আমরণ অনশন ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে। কপি ফরোয়ার্ডেড টু—তা-বড় তা-বড় আশমান তক্। ইউ. এন. ও-র সেক্রেটারি জেনারেলকে কেন কপি দেওয়া হল না সেটা বোঝা যায়নি অবশ্য। ফলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে হয়েছে বীরেন মৈত্রকে।

বীরেন মৈত্র ঋতব্রতের চেয়ে কলেজে একবছরের জুনিয়ার। যদিও চাকরি জীবনে দুজনে সহকর্মী বন্ধু এবং দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় বীরেন ঋতব্রতের অগ্রজ, তবু বি ই-কলেজের চিরাচরিত প্রথায় ঋতব্রতকে সে ঋতুদা বলেই ডাকে। সারা পরিকল্পনায় উদ্‌বাস্তুদের খোঁজ-খবর সুখ-দুঃখের হদিস-হিসাব রাখতে হয় মৈত্রকে। পরিকল্পনায় তার পদটা বিচিত্র—অফিসার-অন-স্পেশাল ডিউটি, অথবা সংক্ষেপে ও. এস. ডি.।

তাকিয়ে তাকিয়ে ঋতব্রত মাকরেল ক্যাম্পের পরিবেশটা দেখে নিচ্ছিল। দুই সারি তাঁবুর মাঝখান দিয়ে লাল সুরকির পথ। না ভুল হল—সুরকি নয়—রাঙামাটির

রাস্তা—মুরাম-রোড। বিরাট এক আমের বাগান—তারই ছায়ায় সারি সারি ছোলদারি তাঁবু। যেন পলাশীর আম-বাগানের প্রান্তে রণক্লান্ত নবাবি শিবির। যেন মীরজাফর আলি খাঁর বেইমানিটা এখনও ওরা ঠিক হজম করে উঠতে পারেনি। যুদ্ধে হার হয়েছে—মাতৃভূমি বিকিয়ে গেছে—তবু পলাশীপ্রান্তরের এই আমবাগানের শিবিরে বসে ওরা ভাবছে বোধহয় সবটাই স্বপ্ন! দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বের ভার যাদের হাতে তুলে দিয়ে ওরা নিশ্চিন্তে যুদ্ধযাত্রা করেছিল, সেই মীরজাফরের দল যে এভাবে মাতৃভূমিকে গদির লোভে বিকিয়ে দেবে—তা যেন আজও ওদের বিশ্বাস হচ্ছে না। মসনদ কি মাতৃভূমির চেয়েও বড়?

একজন অর্ধ-উলঙ্গ রিফুজি বাচ্চা পাথর ছুড়ে ছুড়ে কচি আম পাড়তে ব্যস্ত। টিউব-ওয়েলটার কাছে চাপ ভিড়। দুটো কলের একটা টিকে আছে, দ্বিতীয়টায় জল ওঠে না—সেটা শোভাবর্ধন করতে আছে। তাই জলপ্রার্থীর সংখ্যাধিক্য। তাঁবুগুলো ছিঁড়ে এসেছে। এক পশলা বৃষ্টি হলেই তাঁবু ছেড়ে গাছতলায় এসে আশ্রয় নিতে হবে।

—রত্নাকর ঘোষ কার নাম?—প্রশ্ন করে বীরেন।

হাড়-পাঁজরা-সর্বস্ব একটি জীব ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে—কী ক'ন?

—আপনি না কি আমরণ অনশন করবেন স্থির করেছেন?

—স্থির করনের আর আছে ডা কী? অনশনেই তো আছি। রোজগার করি মাসে বাইশ টাকা, আপনে কাটি নেন ছাব্বিশ টাকা—শ্যাষে বলেন ছাবছিডি দিবেন। মাসান্তে তাও আসে না।

—র'ণ, র'ণ,—আমারে কইবার দ্যান......বাবুমশায়, আমাগো এমন দগ্‌দি দগ্‌দি না মার্‍্যা এ্যাক্কেরে মেশিনগান চালায়ে দ্যান! আমাগোও স্বস্তি, আপনাগোও শান্তি!

আরও পাঁচসাতজন একসঙ্গে কথা বলে ওঠে। পানীয় জলের অভাব, বোরহোল পায়খানা ভর্তি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ, ছেঁড়া তাঁবুর বর্ণনা। অভিযোগের আদিই নেই তার অন্ত। বাধা দিয়ে বীরেন বলে—টিউবওয়েল আর তাঁবু মেরামত করতে লোক এসেছিল—আপনারাই নাকি তাড়িয়ে দিয়েছেন?

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অধোমুখে রাঙামাটিতে আঁচড় কাটে।

—কী হল? জবাব দিচ্ছেন না কেন? মিস্ত্রিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

—হ দিছি। ক্যান দিমুনা? এ্যাদ্দিন যুদি কষ্ট করতি পারি, তয় আরও এক হপ্তা পারুম। ডাক্তার রায় আসুক—আমাগো অবস্থাডা দেখ্যা যাক্—শ্যাষে সারাই করবান্নানে।

আলোচনা এগিয়ে চলে। বীরেন বোঝাতে থাকে। নানা বিষয়ে। কখনও সাবসিডির হিসাব, কেন ওদের দিয়ে মাটি কাটানো হচ্ছে তার কারণ। কোথাও নরম সুরে বোঝাবার চেষ্টা করে, কোথাও গরম সুরে হুমকি দেয়। ওদের স্বরগ্রামে কিন্তু কড়ি-কোমল নেই। সানাইয়ের পোঁর মতো একটানা বেজেই চলেছে—আগে ডাক্তার রায়ের পরিদর্শন হয়ে যাক—তারপর অন্য কথা। ইতিমধ্যে ওরা কাজও করবে না—কাজ করতে দেবেও না কাউকে।

বীরেন শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে—এটা কিন্তু আপনারা ভাল করলেন না। আপনাদের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আমি বলব...

বাধা দিয়ে একজন বলে বসে, আমাগো মঙ্গল তো ব্যাবাকই দ্যাখলেন ছার, অখন হপ্তা-খানেক নিজ মঙ্গল দেখেন। চাকরিডা বাচান। বিধান রায় আইত্যাসেন,—তাই আপনাগো টনক নড়ছে—জিপে কর্যা ছুটে আইসেন আমাগো পায়ে ধরতি।

আশ্চর্য ধৈর্য বীরেনের। নির্লিপ্তের মতো বললে, রাগের মাথায় যদি একথা বলে থাকেন, তাহলে আমার আরও কিছু বলার ছিল—আর সত্যি যদি মন থেকে একথা বলে থাকেন, তাহলে না হয় এক হপ্তা পরেই আসব।

—তাই আসব্যান। মাটি আমরায় আর কাটুম না। ঘর-জমি যদি দ্যান তো দিন—নইলে শিয়ালদ' ইস্টিশনেই চইলে যাই গা।

বীরেন ইংরেজিতে বললে, চলুন ঋতুদা, এখন আর কিছু হবে না। ভিতরে রাজনীতির খেল চলেছে। দে হ্যাভ বিন্ পয়েজন্‌ড্।

আবার ধুলো উড়িয়ে জিপ ছুটে চলে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে জগদলপুরের দিকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মাকরেল ক্যাম্পে হঠাৎ শাঁখে ফুঁ পড়ল। চমকে পিছন ফিরে তাকায়। হাড়-পাঁজরা-সর্বস্ব মাথায়-ঘোমটা একটি উদ্বাস্তু বধূ জঙ্গলের দিকে মুখ করে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে। রাস্তার দুধারে মাঝে মাঝে গ্যাঙ-কুলিরা কাজ করছে। মুরাম মাটি বিছিয়ে দিচ্ছে খানা-খন্দ দেখে দেখে। অশীতিপর মহামান্য অতিথি স্বচক্ষে দেখতে আসবেন পরিকল্পনা। গাড়িতে যেন ঝাঁকি না লাগে। পথের বাঁকে হারিয়ে গেল মাকরেল ক্যাম্প। শুধু শঙ্খ-ধ্বনির ক্ষীণ আওয়াজ তখনও লেগে আছে কানে।

অরণ্যের বিরুদ্ধে মানব-সন্তানের শঙ্খ-নির্ঘোষ!

তিনটি প্রদেশজুড়ে বিরাট এই পরিকল্পনা। অন্ধ্র, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ। আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের আড়াই থেকে তিন গুণ। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মকেন্দ্র জগদলপুর। সি ই-র অফিস সেখানেই। আর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেব থাকেন কোরাপুট—পাহাড়ের উপরে ছবির মতো ছোট্ট শহর। দুই রাজধানীর মধ্যে পথের দূরত্বটা মেপে দেখা গেছে—তা মাপবার একটা মানদণ্ড আছে—সেটা উনসত্তর মাইল। মতের দূরত্ব মাপবার কোন মানদণ্ড নেই—তাই মেপে সেটা দেখা যায়নি। দুই কেন্দ্র—দুই বিভিন্ন প্রদেশে। জগদলপুর বাস্তার জেলায়, মধ্যপ্রদেশে। কোরাপুট উড়িষ্যায়। সবচেয়ে মজার কথা যে অঞ্চলে উদ্‌বাস্তুদের জন্য জমি পাওয়া গেছে সেটা এই দুই রাজধানীর কোনটারই কাছে-পিঠে নয়!

এত বড় দণ্ডকারণ্যে রেলের লাইন নেই। আদিম ভারতবর্ষ পাষাণী অহল্যার মতো এখানে ঘুমিয়ে আছে। শুধু বনজ আর খনিজ সম্পদই নয়—কেবলমাত্র উর্বর কুমারী ভূমিই নয়—প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক গাথা এর অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো। ছেলেবেলায় বড়দিমা সুর করে রামায়ণ পড়তেন। ঠাকুরমাকেই ঋতব্রত দাদা-দিদিদের দেখাদেখি বড়দিমা বলত—কেন বলত তা জানে না। তাঁর মুখেই শুনছিল এই আরণ্যক ভূমির এখানে ওখানে ছড়ানো ছিল মুনি-ঋষিদের আশ্রম। শ্রীরামচন্দ্র লোকটির প্রতি ঋতব্রতের আদৌ কোন শ্রদ্ধা ছিল না—স্ত্রৈণ বাপের কথায় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, বউ যায় চুরি, ফিরে পেয়েও রকবাজ চ্যাংড়াদের কথায় আবার ত্যাগ করে এত-কষ্ট-করে পাওয়া বউকে। দণ্ডকারণ্যে এসে কিন্তু মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে টুপি খুলেছে

সে—এত ভাল 'হনিমুন-স্পট' ভূ-ভারতে আতি অল্পই আছে। কিন্তু স্থান-নির্বাচনে ভুল না হলেও কোথাও না কোথাও গলদ ছিল তাঁর পরিকল্পনায়। এ অরণ্যে শান্তিময় নতুন জীবন যাপন করতে পারেননি। সব শুভ ইচ্ছাই বিসর্জন দিতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। স্বর্ণমৃগের সন্ধানে বিপথে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি! অরণ্যবাসের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল ফলে! চরম মুহূর্তে জনম-দুখিনী সীতার আর্ত-ক্রন্দন তাঁর কানে যায়নি। রাজকন্যা সীতা ছিলেন ধরিত্রীর সন্তান—সুজলা-সুফলা মাটিকেই তিনি চিনতেন আপন করে। এ আরণ্যক জীবনের ভয়াবহতা সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। রাজপ্রাসাদের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা থেকে ভাগ্যতাড়িতা উদ্বাস্তু সীতাদেবীকে বাধ্য করা হয়েছিল এই আরণ্য জীবন-যাপনে। তাই ভুলে গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি—লক্ষ্মণের গণ্ডিসীমা তাঁর খেয়াল ছিল না। একবার পদস্খলন হলে আর রক্ষে আছে? আর ফিরে আসতে পারেননি গণ্ডি-দেওয়া গার্হস্থ্য-জীবনের স্বাভাবিকতায়। মহাকাব্য কি আজও রচিত হচ্ছে অলক্ষ্যে? ইতিহাস কি নিজেরই পুনরাবৃত্তি? র‍্যাডক্লিফের টানা-গণ্ডির বাইরে পা দিয়ে ঐ যে মেয়েটি শাঁখে ফুঁ দিচ্ছিল মাকরেল ক্যাম্পে ও কি কলির রঙ্গমঞ্চে ত্রেতার সেই নাটকটাই অভিনয় করতে এসেছে?

পথের ধারে ধারে ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প। ওদের বলা হয়েছিল বাঙলাদেশে আর চাষের জমি নেই—তোমরা দণ্ডকারণ্যে চল, সেখানে তোমাদের জন্য পাকাবাড়ি, হাঁসিল-জমি, ভালো-জাতের বলদ, গরু, লাঙল, বীজ দেওয়া হবে। সেই আশায় ছুটে এসেছে মানুষগুলো, এই উপলবন্ধুর রাঙামাটির দেশে। পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়েল খাঁ বিধৌত নদীমাতৃকা ভূখণ্ডের মানুষ ওরা। এসেছে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে, নিভু-নিভু আশার প্রদীপখানি সাবধানে বাঁচিয়ে। অনেক ঘাটের জল খেয়েছে ইতিমধ্যে। প্রথমে এসে উঠেছিল ভারতসীমান্তের রিসেপ্শন সেন্টারে—বার্নপুরে, বনগাঁয়, আরও অসংখ্য ছোট ছোট প্রাথমিক কেন্দ্রে। সে আজ একযুগ আগের কথা—দশ-বারো বছর অতীতের কাহিনী। হলদে-রঙের এক চিলতে ছাপা কাগজে লিখতে হয়েছে নাম, পেশা, আদি নিবাস, পরিবারভুক্ত লোকের নাম ও বয়স। কর্তারা তার মাথায় বসিয়েছেন একটা ক্রমিক-সংখ্যা। রেজিস্ট্রেশন-কার্ডের নম্বর। সরকারি সিলমোহর-লাঞ্ছিত সেই কাগজখানির মূল্য অনেক। ওইটেই ওদের উদ্‌বাস্তু পরিচয়। ডোল বল, লোন বল—ওটা চাই! সেই কাগজখানি রক্ষাকবচ করে তারপর ঘুরেছে এখানে ওখানে। এ-ঘাটে ও-ঘাটে। রিসেপ্শন সেন্টার থেকে ট্রানসিট সেন্টার। সেখান থেকে পি. এল. ক্যাম্প। ধুবুলিয়া, কুপার্স, রূপশ্রীপল্লী, দুধকুণ্ডি, পিয়ারডোবা, বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প। কেউ কেউ পি. এল. ক্যাম্প থেকে অবশেষে পুনর্বাসন পেল কলোনিতে। সরকারি-আধাসরকারি-বেসরকারি জবরদখল কলোনি। গয়েশপুর-তাহেরপুর-খাশ্‌বাশমহল্লা-হাবড়াবৈগাছী। দেশনেতাদের নামে নতুন নতুন কলোনি স্থাপন করল মহা উৎসাহে। প্রফুল্লনগর, নেতাজীনগর, রবীন্দ্রনগর, জওহর-কলোনি! কেউ নাম দিল নবজীবন কলোনী—কেউ নাম দিল উদয়নগর উদ্‌বাস্তু কলোনি। ক্যাম্প ছেড়ে যারা কলোনিতে গেল তারা ভাবলে হাতে স্বর্গ পাওয়া গেল বুঝিবা। মাথার উপর নিজস্ব একখানা টিনের চালা—যার নিচে সপরিবারে আশ্রয় নিতে পারবে, পায়ের তলায় নিজস্ব একচিলতে জমি—

যাতে ফলবে লাউ-কুমড়ো-শশা-বেগুন-লঙ্কা। নিজস্ব বাড়ি হওয়ায় বাপ বেটার দিকে চেয়ে হেসেছিল, স্ত্রী স্বামীর দিকে চেয়ে। কিন্তু দুদিনেই বোঝা গেল গলদটা। অনুর্বর বন্ধ্যা মাটির উপর সারি সারি বাড়ি তুলে দিলেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় না। খাবে কী? জমি কোথায় চাষের? কেউ কেউ স্মল-ট্রেড-লোন পেল—দোকান দিল, সাইকেল রিক্‌শা কিনল, হকারি শুরু করল—কিন্তু গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা হল না। কোথাও কোথাও কলোনিতে সরকারি কনট্রাক্ট ডিভিশন এল কাজ করতে। তারা রাস্তাঘাট বানাল, পুকুর কাটল, নলকূপ তৈরি করল ওদের দিয়ে। ওরা গতরে খেটে পয়সা কামালো। ছ-মাস-নমাস চলল সংসার। তারপর? কলোনির কাজ শেষ হল একদিন। আবার বেকার। তিল-তিল করে গড়ে তোলা বাড়ি তিল-তিল করেই খুলে ফেলল আবার। বিক্রি হয়ে গেল করোগেট-টিন, জানলা-দরজা। পেট বড় অবুঝ—তার দাবিটাই সবার আগে। আবার উদ্‌বাস্তু। কিন্তু আর রিসেপশান-সেন্টার নেই। এবার 'লোন পাওয়া' উদ্‌বাস্তু ওরা। তাই ঠাঁই হল শেয়ালদহ স্টেশন, স্ট্র্যান্ডরোডের ধারে ধারে। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ঘুরে এল বিহার-উড়িষ্যা-আসাম। ফিরে এল শেয়ালদ' আর হাওড়া স্টেশনে। হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোথা, অন্য কোনখানে। অবশেষে এল আহ্বান—চল দণ্ডকারণ্য! সেখানে জমি পাবে, বাড়ি পাবে, লাঙল, গরু, বীজধান পাবে। নতুন করে জীবন শুরু করবে তোমরা।

সেই নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ওরা এসেছে দণ্ডকারণ্যে।

মৈত্র পরদিন কোণ্ডাগাঁওয়ে ওসেছিল একটা এন্‌কোয়ারিতে। লংজোলা ক্যাম্পের একটি উদ্‌বাস্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আবেদন করেছে—সে ঠিক মতো মজুরি পায়নি। স্পেশাল অফিসার বীরেন মৈত্রকে পাঠানো হয়েছে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে। ল্যাংজোলা ক্যাম্প ঋতব্রতের এলাকায়। তাই বললে—অভিযোগটা তাহলে আমার বিরুদ্ধে?

—আরে না না....

—না, না, কী রকম? আমার প্রেডিসেসরের সমস্ত কাজের জন্য এখন আমিই তো দায়ী—

—কী আশ্চর্য। আপনি শুনতেই চাইছেন না। আবেদন লিখছে রাখহরি দাশ। সে বলছে গ্রুপ-লিডার তাকে ন্যায্য মজুরি দেয়নি। ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই।

—গ্রুপ-লিডারটা কী বস্তু?

—বলছি যেতে যেতে। উঠে বসুন জিপে।

দুজনকে নিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে চলল জিপ। মৈত্র বুঝিয়ে বলতে থাকে—ক্যাম্পের উদ্‌বাস্তুরা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ করে। এক একটি গ্রুপের কাজ দেখে একজন গ্রুপ-লিডার। ওরাও উদ্‌বাস্তু—মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। এটাও আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের একটি আবিষ্কার। তাঁর আসার আগে বিভিন্ন কাজের জন্য ঠিকাদার লাগান হত। উনিই এই গ্রুপ-লিডার প্রথার প্রবর্তন করেন। ঠিকাদারদের লভ্যাংশটাও যাতে উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে থাকে তাই এ প্রচেষ্টা। গ্রুপ-লিডার টেন্ডার দিয়ে

কাজ ধরে না। শিডিউল-রেটে ওদের কাজ বণ্টন করা হয়। ওদের আর্নেস্ট মানিও দিতে হয় না।

—কে ওদের কাজ দেয়? কেই বা গ্রুপ-লিডার নির্বাচন করে?

—কাজ দেয় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। আপনাকেই দিতে হবে এর পর থেকে। আর চূড়ান্ত নির্বাচন করেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার আমার সুপারিশে।

—এ তো মহা ঝকমারির কাজ।

—ঝকমারি তো বটেই। দুদিনেই বুঝবেন এদের কাণ্ডকারখানা। এখানে নিত্যি যা ঘটে তা নিয়ে রোজ একখানা করে ছোট গল্প লেখা যায় অথচ আশ্চর্য এই উদ্‌বাস্তুদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কেউ কিছু লিখল না। পঞ্চাশ লক্ষ লোক ঘর-বাড়ি-সমাজ-সংসার ছেড়ে চলে এল। দশ পনের বছর ধরে স্রোতের জলে ভেসে ভেসে বেড়ালো—শিকড় গাড়ল না কোথাও। নতুন জমিতে, নতুন করে ওরা বাঁচতে চায়—কী তীব্র ওদের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। দরমা-ঘেরা খড়ো ঘরের অন্ধকারে জীবনকে ওরা খুঁজছে। অথচ ওদের সে জীবন-সংগ্রামের কথা দুনিয়া জানল না। আজকের সাহিত্যিকের দৃষ্টি পড়ল না ওদের দিকে। বাংলাদেশের সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের খোঁজ করছেন ইতিহাসের পাতায়—পুরানো কলকাতার নথিপত্রে—সিপাহি বিদ্রোহের ইতিবৃত্তে; লেখবার বিষয়বস্তুর সন্ধানে তাঁরা দেশছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাগা হিল্‌সে, সিন্ধুপারে। জীবনের রহস্যের সন্ধানে আড়ি পেতেছেন শ্মশানের বামাচারে।

ঋতব্রত হঠাৎ হেসে ওঠে: ধান ভানতে হঠাৎ এ গাজনের গান কেন ভাই?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে মৈত্র। সামলে নিয়ে বলে : আপনিও তো এককালে লিখতেন কিছু কিছু। লিখুন না এই উদ্‌বাস্তু জীবন নিয়ে। যে কোন ক্যাম্পে বসে শুনতে পাবেন ওরা কোথা থেকে এল, কেমন করে এল—কেন এল। ওদের এ বারো বছরের জীবন নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত না হক—ওয়ার অ্যান্ড পিস রচনা করা চলে একখানা।

তা হয়তো চলে—কিন্তু তা লিখবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। রুচিও নেই। তুমি যাদের নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছ আমি ওদের নিয়ে অতটা মাতামাতির কোন কারণ দেখি না। ওদের খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল—'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পে'। ওরা ফুরিয়ে গেছে—ওরা মানুষ নয়, ভুতপূর্ব মানুষ।

দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে মৈত্র : ওদের খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ আমারও হয়েছিল। আমি দেখছি ওরা মোটেই মৃত নয়—ওরা বেঁচে আছে, ওরা বাঁচবে। উদয়নগর উদ্‌বাস্তু কলোনিতে আমি দেখেছি তার সূচনা। উইপোকার মতো বারে বারে ভেঙে যাওয়া 'বল্মীক' তারা আবার গড়ে তুলেছে। আমরা ওদের বাঁচার সুযোগ দিইনি—সে দোষ ওদের নয়। আমরা যদি সুযোগ দিতাম, ওদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতাম—তা হলে দেখতেন ওরাও মরেনি মোটেই—আবার বেঁচে উঠত ওরা।

ঋতব্রত বলে : আমিও জীবনকেই দেখতে এসেছি এখানে। লিখবারও ইচ্ছে আছে আমার, তবে উদ্‌বাস্তু জীবন নয়, আদিবাসী জীবন—ঐ মারিয়া, মুরিয়া, হালবা আর গোণ্ডদের জীবন। কিন্তু যাক সে কথা। গ্রুপ-লিডার নির্বাচনের কথা কী বলছিলে যেন? যা নিয়ে নিত্য একটা ছোট গল্প লেখা যায়?

—কিন্তু সে কথা তো আপনাকে বলে লাভ নেই। ভূতপূর্ব মানুষদের কথা আলোচনা করে কী লাভ?

ঋতব্রত বুঝতে পারে মৈত্র আহত হয়েছে। তার পূর্ববঙ্গে বাড়ি বলেই কি? নাকি ও সত্যই বিশ্বাস করে এদের মনুষ্যত্বে? সে যাই হোক, হেসে বলে, বেশ আমি উইথড্র করছি আমার কথা। বল কী বলছিলে।

মৈত্রও বোধহয় পরিবেশটা হাল্কা করতেই উন্মুখ। সে গল্প শুরু করে, মাস-খানেক আগেকার কথা বলছি। অফিসে বসে কাজ করছি। মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। এফ.এ.-র অফিস থেকে অবজেকশন এসেছে রিফুজি গ্রুপ-লিডারদের অগ্রিম টাকা দেওয়ায়। কাজ শুরু করার আগে বিনা জামানতে অগ্রিম দিলে অডিট অবজেকশন হবেই। অথচ প্রথমেই কিছু টাকা হাতে না থাকলে এইসব উদ্‌বাস্তু জি. এল.-রা কাজ শুরুই বা করে কেমন করে? চিফ ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, যাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, যাদের পোষ্য-সংখ্যা বেশি, যারা শিক্ষিত বেকার—তাদের মধ্যে থেকেই গ্রুপ-লিডার বেছে নিতে হবে। তাই করছিলাম এতদিন। কিন্তু কাজে নেমে অসুবিধাটা বোঝা গেল। কাজে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপ-লিডারকে কিছু খরচ করতে হবে। ভারার বাঁশ কিনতে হবে, ইঁট ভেজাবার তাগাড় বানাতে হবে—প্রথম সপ্তাহের মজুরি মেটাতে হবে ঘরের থেকে—কারণ পেমেন্ট সে পাবে কিছুটা কাজ করার পর। ভেবে দেখলাম, একেবারে অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ গ্রুপ-লিডার দিয়ে আমার কাজ চলবে না। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উপযুক্ত লোক বেছে নিতে হবে—অন্তত শ' দুই টাকা মূলধন যার নেই, অন-প্রিন্সিপল তাকে গ্রুপ-লিডার করব না।

সেদিন অফিস থেকে কাজ সেরে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল। প্রায় সাতটা বাজে। হ্যাঙার থেকে কোটটা নামিয়ে গায়ে দিচ্ছি, আর্দালী টেবিল থেকে একখণ্ড কাগজ তুলে দেখাল। ভিজিটিং স্লিপ। বললাম, এখন আর হবে না বলে দে। পিয়নটা মাথা চুলকে বল্‌লে—লোকটা সেই দুপুর থেকে বসে আছে স্যার। ধমক দিয়ে উঠি, তাহলে এতক্ষণ কী করছিলে? ঘুমোচ্ছিলে বসে বসে? পিয়নটা চুপচাপ ঘাড় চুলকায়—একবারও বলে না টিফিন আওয়ার্সেই তাকে বলে রেখেছিলাম, বিকালে আমি জরুরী একটা রিপোর্ট লিখব, ফালতু লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে না। কথাটা মনে পড়ায় বলি—আচ্ছা ডেকে দে।

ঘরে এসে ঢোকে একটা কঙ্কালসার লোক। বয়স ত্রিশ না পঞ্চাশ বুঝতে হলে ভাল করে সাবান দিয়ে স্নান করাতে হয় তাকে। রুক্ষচুলে দিতে হয় তেল চিরুনি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে চালাতে হয় ব্লেড। যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিয়েই বিযুক্ত হল না। বুকের কাছে নেমে এসে থেমে গেল। এই অতি-বিনয় আমি সহ্য করতে পারি না। বলি, বসুন।

—আপনি আমাকে তুমিই বলবেন স্যার—বললে লোকটা। বসল না কিন্তু। দাঁড়িয়ে রইল ঠায়।

—বলুন, কী বলতে এসেছেন?

—শুনলাম আপনি নতুন কয়েকজন গ্রুপ-লিডার নেবেন।

—তা নেব। আপনি গ্রুপ-লিডারি করতে চান? কী নাম? কোথায় থাকেন? ক্যাম্পে ডি.পি. ? রিফিউজি রেজিস্ট্রেশন্ কার্ড আছে?

একে একে আমার সবকয়টি প্রশ্নেরই জবাব দেয়। হ্যাঁ, দিবাকর গোস্বামী রেজিস্টার্ড রিফিউজি—আদি নিবাস পাকিস্তানের কোন এক কমলপুর। এখন আছে মাকরেল ক্যাম্পে। নতুন এসেছে। আই. এ. পাশ। সংসারের নিরতিশয় দৈন্য-দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে ওর গলা কেঁপে গেল। দু-এক ফোঁটা জলও বুঝি ঝরে পড়ল আমার রেক্সিনটপ টেবিলে। আমি কিন্তু বিচলিত হইনি একচুল। দীর্ঘ দিন ওদের দুর্দশার কাহিনী শুনে শুনে পুনরুক্তি দোষে আমার আর ভাবান্তর হয় না। মনের উপর কড়া পড়ে গেছে ক্রমে। সব শুনে বললাম, টি. বি.-র কথাটা তো কই বললেন না?

লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, আপনি কী করে জানলেন স্যর?

সর্বজ্ঞের মতো হেসে আমি একটা সিগারেট ধরাই, বলি, আমার সময় অল্প। কতদিন ধরে রক্ত উঠছে আপনার?

ও সামলে নিয়ে বলে—আজ্ঞে না, রাজরোগটা হয়েছে আমার স্ত্রীর।

—ভালো। বিয়েও করেছেন তাহলে। বয়স কত? ছেলেপিলে আছে?

—কার বয়স? আমার স্ত্রীর? উনত্রিশ—

—না, আপনার।

—পঁয়ত্রিশ।

বাজে কথা না বাড়িয়ে বলি : গ্রুপ-লিডারি কাজ আপনার দ্বারা হওয়া শক্ত...আচ্ছা দাঁড়ান—ভেবে দেখি।

লোকটার চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকে। জজ-সাহেব যখন জুরিদের দিকে ফিরে বলেন—'বাট দেয়ার্স ওয়ান পয়েন্ট ইন ফেভার অব দ্য অ্যাকিয়ুস্‌ড' তখন ফাঁসীর আসামীর চোখে ফুটে ওঠে যে দৃষ্টি—সেই দৃষ্টি তখন ওর চোখে। আমি কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলি—আপনার হাতে তো একটি পয়সা নেই, কেমন?

একেবারে ম্লান হয়ে যায় লোকটা। তবু আমতা আমতা করে বলে—কতটাকা লাগবে স্যর?

—অন্তত শ' দুয়েক টাকা জোগাড় করতে পারবেন ?

—আমতা আমতা করে লোকটা বললে, আপনি কাজ দিন স্যার, যেমন করে পারি জোগাড় করব টাকা।

আমি বলি—ও কথা সবাই বলে, অথচ কাজ পাওয়ার পর দেখা যায় কিছুতেই আর টাকাটা জোগাড় হচ্ছে না। আপনি নগদ দু'শো টাকা এনে যদি দেখাতে পারেন কাজ পাওয়ার আগে, তবেই কাজের অ্যালটমেন্ট দিতে পারি আপনাকে।

লোকটা হাসল, বললে—তাই হবে স্যার। সোমবার টাকা নিয়ে আসব।

হাসিটা দেখে কেমন খটকা লাগল। এ হাসিটা কেমন যেন চেনা। ঠিক এই হাসিই কাকে যেন হাসতে দেখেছি আমি। অতীত জীবনের অন্ধকারে মিটিখানেক হাতড়ে হতাশ হয়ে বললাম, আপনাকে এর আগে কোথাও দেখেছি?

দিবাকর এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিল—তারপর অত্যন্ত গোপনসুরে নিচু গলায় বললে, উনিশ শ তেতাল্লিশ সালে আমি বহরমপুর জেলে আটক ছিলাম।

আমার স্মৃতির কুয়াশা ততক্ষণে কেটে গেছে। বললাম—আরে, তুমি দেবু পণ্ডিত নয়?

—হ্যাঁ স্যার !

আমি হেসে বলি—আমাকে আবার স্যার কি হে দেবু?

বাবা ছিলেন বহরমপুরের জেলার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কর্মচারী হলেও মনে মনে তিনি শ্রদ্ধা করতেন স্বদেশী আন্দোলনের বন্দীদের। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বছর সতের-আঠারোর একটি কিশোর এল রাজবন্দী হিসাবে বাবার জেলে। আমারই সমবয়সী। সবচেয়ে মজার কথা ঐ একফোঁটা ছেলের নাম দেবু-পণ্ডিত ! জেলারের ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল তার।

বেলটা বাজাই। পিয়নকে দু পেয়ালা চা আনতে দেব। পিয়ন ঢুকতেই তিন পা পিছিয়ে গেল দিবাকর। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললে, আজ চলি স্যার। গরিবের কথাটা মনে রাখবেন।

বুঝলাম একদিনে ওর জড়তা কাটবে না। তাছাড়া ওকে যখন কাজ দেব তখন খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়াও উচিত নয়। একটু দূরত্ব রেখে না চললে সেই সুযোগে কাজে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাই চায়ের অর্ডারটা আর দিলাম না। সামলে নিয়ে বলি, বেশ সোমবার আমার সঙ্গে দেখা কর। ঐ দিনই কাজটা বিলি করব। দিন-তিনেক সময় পেলে, এর ভিতর টাকাটা জোগাড় করে ফেল।

আমার ব্যবহারে অসংলগ্ন কিছু ছিল কি? দিবাকর যেন একেবারে শিউরে উঠল। একবার আমার দিকে একবার আমার পিয়নের দিকে চোরের মতো তাকিয়ে সুট করে সরে পড়ল।

বাধা পড়ল গল্পে। একটা কাঠের কালভার্ট মেরামত হচ্ছে। ডাইভারশন দিয়ে নেমে যেতে হল জিপকে। উদ্‌বাস্তু ছুতার কাজ করছে, আদিবাসী পুরুষ রমণী খাটছে সাথে। হাত তুলে নমস্কার করল ওরা। ডাইভারশন দিয়ে ঘুরে জিপ এসে আবার উঠল সড়কে। আবার গল্প শুরু করল বীরেন—পরের সোমবারে এল দিবাকর। অফিস থেকেই অ্যালট্‌মেন্ট লেটারটা নিয়ে দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। লক্ষ্য করে দেখলাম দিবাকর দাড়িটা কামিয়েছে। চুলে তেল-চিরুনি তখনও পড়েনি—বোধকরি আজ অ্যালটমেন্টটা হাতে পেয়ে কাল তেল মেখে স্নান করবে। বললাম, কী হে দিবাকর? টাকাটার জোগাড় হল?

দিবাকর হেসে বললে, হ্যাঁ, হল।

—কতটাকা? কী করে হল?

—কী করে হল, তা আর নাই শুনলে। তবে হয়েছে, পুরো দু শ'ই হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখলাম আজ দিবাকর অনেকটা সহজ হয়েছে—স্যার স্যার ছেড়ে 'তুমি'তে নেমেছে। হেসে বলি—ভেরি গুড্, কিন্তু কথা ছিল আগে টাকাটা দেখিয়ে তবে তুমি চিঠিখানা নেবে।

দিবাকরও হেসে বলে—সেই জন্যেই আজ দেখা করতে এসেছি তোমার সঙ্গে। মির‍্যাকুলাস কোয়েন্সিডেন্স বলতে পার—আজ আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে ঠিক এই তারিখে আমি নতুন জীবন শুরু করেছিলাম। আজও তোমার অনুগ্রহে এই দিনেই নতুন করে জীবন শুরু করলাম। ধৃষ্টতা মাপ কর ভাই—আজ তাই তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। অফিস থেকে ফেরার পথে একবার আমাদের ক্যাম্পে যেতে হবে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম ওর স্পর্ধায়। মাত্র তিন দিন আগে যে লোক চোখ তুলে বলতে পারেনি যে, সে আমার বন্ধু ছিল এক-কালে—আজ সে আমাকে অনায়াসে নিমন্ত্রণ করবার স্পর্ধা পায় কী করে?

একটু রূঢ় সুরে বলি, আমার তো আজ সময় হবে না দিবাকর। আর তাছাড়া তোমার সঙ্গে যখন কাজের সম্পর্ক হল, তখন যতদিন সে সম্পর্ক বজায় থাকছে ততদিন এতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া ভালোও নয়। শুধু আমার নয়, তোমারও।

দিবাকর যেন একেবারে নিভে যায়। তবু থেমে থেমে বলে—কিছু মনে কর না ভাই, এ রকম অনুরোধ আর কখনও করব না আমি। কিন্তু এখনও তো আমি কাজে নামিনি। অন্তত আজকের একটি সন্ধ্যা যদি তুমি আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা ভুলে আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে, তবে সুখী হতাম। জানি না, তুমি ওর টি.বি.-র কথাটা কেমন করে আন্দাজ করেছিলে—তবে আমি নিশ্চিত জানি, এই আমাদের জীবনের শেষ বিবাহ-বার্ষিকী উদ্‌যাপন। গত তিন বছরও এই দিনটি এসেছে আমাদের জীবনে—বন্ধু-বান্ধবও না ছিল তা নয়—কিন্তু হাতে একটা পয়সা ছিল না, যে কাউকে নিমন্ত্রণ করি। এই আমাদের শেষ বিবাহ-বার্ষিকী। আমার বউ নিজে রান্না করতে পারে না! রাঁধি আমিই। কিন্তু বাড়ির রান্নাও খেতে বলছি না তোমাকে। শহরের দোকান থেকে ভালো সন্দেশ আনিয়েছি। প্লেটে দেব না—প্যাকেট থেকেই তুলে নিয়ে দুটো সন্দেশ মুখে দিও তুমি।

আমি বাধা দিয়ে বলি—ছি ছি দিবাকর। আমাকে আর লজ্জা দিও না; কিন্তু আজই বা তুমি বন্ধুকে সন্দেশ খাওয়াবার পয়সা পেলে কোথায়?

দিবাকর বললে—আমার শ্বশুর ধনীলোক ছিলেন। তিনি আমার শাশুড়ীকে একটা আংটি দিয়েছিলেন—সেটাই আমার শাশুড়ী যৌতুক দিয়েছিলেন আমাদের বিয়েতে। কাল বাধ্য হয়ে সেটা বিক্রি করেছি দু শ' টাকায়। তা থেকেই সামান্য খরচ করেছি ভাই।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, অন্যায় করেছ দিবাকর।

দিবাকর ম্লান হয়ে যায়।

যাই হোক অফিস ছুটির পর গেলাম ওদের ক্যাম্পে। মাকরেল ক্যাম্পের একেবারে শেষ প্রান্তে ওদের ঘর। দিবাকর প্রায় একঘরে হয়ে আছে—ওর স্ত্রীর অসুখের জন্য। একটা কুমড়ো-লতা লতিয়ে উঠেছে টিনের চালে। আমার মতো সম্মানিত অতিথির জন্য যতদূর সম্ভব ঘরদোর সাফা করা হয়েছে। অর্থাৎ যাবতীয় তোরঙ্গ-প্যাঁটরা চালান দেওয়া হয়েছে রান্নাঘরে। একটি মাত্র ঘর। সুতরাং ওর রুগ্না স্ত্রীরও অন্তরালে যাবার উপায় নেই। কঙ্কালসার মেয়েটি বোধকরি সুন্দরী ছিল

এককালে। আজ আর তা বোঝা যায় না। রক্তহীন হাতে একজোড়া শাঁখা শুধু। রুক্ষচুলের সীমন্তে সিন্দুর-চিহ্ন দগ্‌দগ্‌ করছে।

ঘণ্টাখানেক ছিলাম ওদের সেই দমবন্ধ করা কুঠুরিতে। ওরা দুজনে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে থাকে—যেন ওদের ঘরে পদধূলি দিতে আসাটা আমার তরফে একটা দুর্লভ ঔদার্য। যতবার অন্য কথা বলতে যাই, ততবারই ঘুরে ফিরে আসে সেই কথাটাই—আমিই ওদের বাঁচিয়েছি, আমার দয়ার তুলনা নেই, আমি মানুষ নই, দেবতা। বিরক্ত হয়ে উঠি ক্রমশ। দিবাকর বলেছিল ওর শ্বশুর বড়লোক ছিলেন; বুঝলাম চাল মেরেছে একটা। ওর স্ত্রীর, ওর নিজের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সই প্রমাণ করছে আমার মতো মাননীয় অতিথির পরিচর্যা অভ্যাস নেই ওদের।

সত্যই কাগজের প্যাকেটে করে সন্দেশ এনে দেওয়া হল আমাকে। কেমন যেন বাড়াবাড়ি মনে হল সেটা। কিন্তু এ-নিয়ে রুগীর সামনেই কিছু বলা চলে না। ভদ্রতা রক্ষা করে একটি মাত্র সন্দেশ তুলে মুখে দিলাম। এ নিয়ে ওরা সদলবলে অনুযোগ করতে থাকে। আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম ওদের মনের ছবি। ওরা চাইছে যেন আমি যথেষ্ট ভুক্তাবশিষ্ট রেখে যাই। দিবাকরের রুগ্না স্ত্রীই শুধু নয়, জুল-জুল-চোখ প্রতিবেশীর বাচ্চা ছেলেটার দৃষ্টিতেই শুধু নয়—দিবাকরের চোখেও দেখলাম ফুটে উঠেছে লোলুপতা। বেরিয়ে আসার সময় ওর স্ত্রী বললে—আবার আপনার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে কি না জানি না,—তবে আপনার দয়ার কথা ভুলব না।

আমি হেসে বলি, বারে বারে যদি ঐ কথাই বলতে থাকেন তবে সত্যিই আর দেখা করতে আসব না কোন দিন।

বিদায় নিলাম যখন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাকরেল ক্যাম্পের ঘর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কাঠের উনানের ধোঁয়া। শাঁখের আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে জোনাক-জ্বলা সন্ধ্যা বাতাসে। দিবাকর আমাকে জিপে তুলে দিয়ে গেল। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিচ্ছি, হঠাৎ আমার হাত দুটি ধরে ভেঙে পড়ল সে, সত্যিই নতুন করে আবার প্রাণ দিলে তুমি। জানি বাঁচবে না, তবু ওকে বাঁচাবার একটা মন-ভোলানো ব্যর্থ চেষ্টা করতে পারব। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না, একটা চিঠিতে সব লিখেছি—এটা পড়ে দেখ।

বন্ধ খামটা আমার কোলে ফেলে দিয়ে আর সে দাঁড়াল না।

বীরেন মিত্র চুপ করে।

গাড়ি লাংজোলা ক্যাম্পে প্রবেশ করেছে।

ঋতব্রত বললে, মন্দ নয় শর্ট স্টোরিটা, ট্র্যাজিক পরিবেশটা ঠিকমতো ফুটিয়ে লিখতে পারলে—

বাধা দিয়ে বীরেন মৈত্র বলে—গল্পটা আমার শেষ হয়নি ঋতুদা। আসল ট্র্যাজেডির কথাটা বলা হয়নি। সে ট্র্যাজেডির নায়ক দিবাকর গোস্বামী নয়, আমি নিজে। বাড়ি এসে চিঠিখানা খুলে পড়লাম। দিবাকর লিখেছে—"তোমার অমায়িক ব্যবহারের কথা জীবনে ভুলিব না। ইতিপূর্বেও বহু বন্ধু-বান্ধবের নিকট চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছি—কিন্তু-সহজ-সরল কথাটা কেহই বলে নাই। পরিচয়ের জন্যই, বন্ধুত্বের জন্যই তাহারা সঙ্কোচ করিয়াছে। একমাত্র তুমিই সোজা কথাটা সরলভাবে বলিয়াছ। ভাবিয়াছিলাম

আমাকে চিনিতে পারার পরে হয়তো তুমি পিছাইয়া যাইবে; কিন্তু তুমি মহৎ—বন্ধু বলিয়া অহেতুক চক্ষুলজ্জার জালে জড়াইয়া আমাকে প্রত্যাখ্যান কর নাই। ...আংটিটা বিক্রয় করিয়া ঠিক দুইশত টাকাই পাইয়াছিলাম। তাহা হইতে আজকের উৎসবের জন্য দশটা টাকা খরচ করিয়াছি। এ জন্য ইতিপূর্বেই তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছ; সত্যই প্রতিশ্রুত অঙ্কের ভিতর হইতে এ দশটা টাকা খরচ করা আমার অন্যায় হইয়াছে। মনে করিও বন্ধুর বিবাহে দশটাকার একটা উপহার কিনিয়া দিয়াছ। বিশ্বাস কর এ দশটাকা পূরণ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। ভগবান দিন দিন তোমার শ্রীবৃদ্ধি করুন।"

বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন ঋতুদা, খামের ভিতর চিঠি ছাড়াও ছিল উনিশখানা দশটাকার নোট!

* * *

জিপ এসে খ্যাঁচ করে ব্রেক কষল লাংজোলা ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে।

উদ্বাস্তুরা গোল হয়ে বসেছে একটা গাছের তলায়। বীরেন মৈত্রের একটা টুল জুটেছে. সামনে-দাঁড়ানো একজন লোককে সে প্রশ্ন করে : তুমি স্বীকার করছ যে রাখহরি তোমার গ্রুপে কাজ করেছে এগার দিন?

—আজ্ঞে হ।

—তাহলে ওর প্রাপ্য টাকা ওকে দাওনি কেন?

—দিছি ছার। কড়ায় গণ্ডায় মিটায়ে দিছি।

—মিটিয়ে দিয়েছ তো অ্যাকুইটেন্স রোলে সই নেই কেন? মানে ওকে দিয়ে তোমার খাতায় লিখিয়ে নাওনি কেন?

—ও টাকা নিছে ছার—কিন্তুক টিপছাপ দে নাই।

ও পাশ থেকে গর্জে ওঠে হাড়-পাঁজরা সর্বস্ব একজন বৃদ্ধ উদ্বাস্তু। কাশির ধমকে আটকে যায় তার অর্ধেক কথা : মিছা কথা ছার! হালায় একপয়সা দে' নাই...যগনরে শুধান...মেধোরে শুধান...সব্বাই সাক্ষী আছে।

এক সঙ্গে পাঁচছয়জন চিৎকার করে কথা বলতে যায়। মৈত্র এক ধমকে থামিয়ে দেয় ওদের। যগন পতিতুণ্ডি বোধহয় ক্যাম্পের একজন মাতব্বর—মৈত্র তাকেই বলে ঘটনার আনুপূর্বিক একটা বিবৃতি দিতে। এক নিঃশ্বাসে কী যেন বলে গেল যগন। পূর্ব-বঙ্গের ভাষা—নোয়াখালি অথবা চট্টগ্রামের। ঋতব্রতের বোধগম্য হল না—সে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে; কিন্তু অনায়াসে বুঝে নিল বীরেন মৈত্র। ধৈর্য ধরে সবটা শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে; ঋতব্রতের দিকে ফিরে বললে, আপনিও যখন এসে পড়েছেন তখন আপনিই মামলার বিচারটা করে দিন। কেসটা খুব জটিল, অবধান করুন : এই শ্রীহরি দাশ হচ্ছে আমার গ্রুপ-লিডার। দিন দশেক আগে ও একটা পেমেন্ট পেয়েছে। দলের একজন কর্মী—কী যেন নাম তোমার?

বৃদ্ধ বলে, রাখহরি দাশ আজ্ঞে।

—হ্যাঁ, দলের একজন কর্মী রাখহরি অভিযোগ করেছে যে, দলপতি শ্রীহরি তাকে

তার ন্যায্য মজুরি মিটিয়ে দেয়নি। বর্তমানে আমি তারই তদন্ত করছি। রাখহরি বলছে সে টাকা পায়নি আর শ্রীহরি বলছে সে টাকা দিয়েছে।

ঋতব্রত বলে, কিন্তু টাকা দিলে প্রাপককে সই দিয়ে টাকা নিতে হয় না?

মৈত্র ইংরেজিতে বলে—হয়; কিন্তু তদন্তে এইমাত্র একটি নতুন সত্যাবিষ্কার করা গেল। বাদী শ্রীমান্ রাখহরি হচ্ছেন প্রতিবাদী শ্রীমান্ শ্রীহরির পরম পূজ্যবাদ পিতৃদেব। শ্রীহরির বক্তব্য—গত বৎসর পিতৃআজ্ঞায় তিনি একটি উদ্বাস্তু কন্যার পাণিপীড়ন করেছেন; এবং তাঁর শ্বশুর মহাশয় যে পাঁচকুড়ি টাকা নগদ দিয়েছিলেন সেটা বাদী সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং বাদীর বর্তমান প্রাপ্য উনিশ টাকা বাদ দিলেও তিনি এখনও একাশি টাকা পাবেন। অপরপক্ষে রাখহরির বক্তব্য বিবাহরাত্রেই তিনকুড়ি টাকা খরচ হয়েছিল এবং বাকি টাকা দিয়ে তিনি বধূমাতাকে একখানি শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন, সুতরাং...

* * *

রাঙা-মাটির আস্তরে ঢাকা অরণ্যময় পাহাড়ে দেশ এই দণ্ডকারণ্য। বিশাল মালভূমি একটা। প্রচুর খনিজ সম্ভার, প্রভূত বনজ সম্পদ আর সুবিস্তীর্ণ উর্বর কুমারী ভূমি কেমন করে এতদিন এখানে লুকিয়ে ছিল ভাবলে অবাক লাগে। উঁচু-নিচু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। শীতে ঝরাপাতার দিনে অদ্ভুত নগ্ন তার রূপ—নেংটি-সার আদিবাসী মুরিয়া যুবকের মতো। বসন্তে কচিপাতার সবুজাভায় আবার যখন সে সাজে—আমের নতুন লালপাতার আগুন লাগে বনে বনে, মনে হয় যেন কাশ্মীরের চেনার-বন; উৎসব রজনীতে বাইসন-হেডেড্ মারিয়া-গোণ্ড রমণীর মতো তখন তার সাজের বাহার! এদেশে ধানের খেত আছে—কিন্তু তার পশচাদ্‌পট খাড়া পাহাড়। এ দেশে আমের গাছ আছে—কিন্তু তার তলায় দূর্বা নয়, রাঙামাটি। এ দেশে বর্ষা হয়, বাংলা দেশের মতো ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় দিগ্‌দিগন্ত—আসে ধুলোর ঝড়—কালবৈশাখী; বর্ষা থাকেও তিন-চার মাস। কিন্তু সে বর্ষা বাংলা দেশের বন্যাবাহী বর্ষা নয়। তিন দিন দিবারাত্র বৃষ্টি হবার পর যখন তা থামে তখন আপনি সোয়েডের জুতা পায়ে পথে বার হতে পারেন। জল সরে গেছে সঙ্গ সঙ্গে। ঋতব্রত চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভাবে এমন একটা দেশ কি পছন্দ হবে, পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়েলখাঁ বিধৌত নদীমাতৃক ভূখণ্ডের এই শ্যামল মানুষগুলোর?

মানুষের যেমন মাথা আছে তেমনি আছে মন। সুতরাং মাথা গোঁজার জন্য এমন ঠাঁই খুঁজতে হবে যেখানে মাথাও গোঁজা যায় মনও বসতে পারে। গাছকে এক জায়গা থেকে তুলে যে-কোন আর একটা জায়গায় লাগিয়ে দিলেই সে বাঁচে না। কোন রকমে বেঁচে থাকলেও সে বাড়ে না, ডালপালা মেলে না। তার জন্য চাই অনুকূল আবহাওয়া আর অভ্যস্ত পরিবেশ। গাছের যদি মেজাজ থাকে, মানুষের থাকতে নেই?

কথাগুলো পড়ছিল একজন চিন্তাশীল কথাশিল্পীর উপন্যাসে। এই পুনর্বাসনের প্রসঙ্গেই কথাগুলি বলেছিলেন তিনি। এ মতের সারবত্তা মেনে নিয়েছিল সে। আজ মাকরেল ক্যাম্প আর জুড়ানী গাঁয়ের মানুষগুলিকে দেখে ওর মনে সন্দেহ জেগেছে। বোধহয় পুনর্বাসন সম্বন্ধে ঐটাই শেষ কথা নয়। না হলে খাল-বিল-নদীর দেশের

শ্যামলিমায় যারা মানুষ তারা এখানে এত উৎসাহভরে নীড় বাঁধছে কেমন করে?

বোধহয় প্রাণের তাগিদটা সবচেয়ে বড় বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষ খোঁজে তার পরিচিত অভ্যস্ত পরিবেশ, অনুকূল বাতাবরণ—কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে চায় বাঁচতে। প্রাণধারণের প্রেরণায় নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া তার কাছে নতুন কথা নয়। মেয়েদের জীবনে তো এই নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আবশ্যিক। যে পরিবেশে, যে জল-হাওয়ায় সে আঠার-বিশ-বাইশ বছর ধরে বেড়ে ওঠে সেখান থেকে তাকে সমূলে উৎপাটিত করে এনে রোপণ করা হয় নতুন জমিতে। রাতারাতি। তৎক্ষণাৎ পুনর্বাসন পায় সে। নতুন করে বাঁচতে শেখে নতুন ,পরিবেশে। ধনীর দুলালী এসে গোবর নিকাতে বসে—মেটে ঘরের মেয়ে গিয়ে বসে ড্রইংরুমের সেট-এ। কোন্নগরের কনে এসে ঘর করে বরিশালের বরের; মৈমনসিং-এর মেয়ে পুনর্বাসন পায় নদীয়ায় নতুন সংসারে। পুরুষের জীবনও তাই। ইংল্যান্ড-স্পেন-পর্তুগালের মানুষ গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে কানাডায়, আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়া আর নিউফাউন্ডল্যান্ডে। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বরবুদরে গিয়ে একদিন বসতি স্থাপন করেছিল এদেশেরই মানুষ। সরকারি আনুকূল্য ছিল না তার পেছনে। বুলডোজার দিয়ে জঙ্গল সাফ করানো হয়নি, ট্রাক্টার দিয়ে চষে দেওয়া হয়নি কুমারী ভূমি—তৈরি করে দেয়নি কেউ বাস্তুবাড়ি—ঘরের দোরে পৌঁছে দেয়নি লাঙল-বলদ, অ্যামোনিয়াম সালফেট আর বীজধান। অজানা দেশে, প্রতিকূল পরিবেশে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছে এদেরই পূর্বপুরুষ—আপন বীর্যে। ইসরাইলের মানুষ, জার্মানির মানুষ করেছে আমাদের চোখের ওপরেই। অত কথা কি, পশ্চিম পাকিস্থানের সর্দারজীদের গিয়ে দেখে আসুন দিল্লীর আশেপাশে, যুক্তপ্রদেশে আর মধ্যপ্রদেশের গ্রামে—তারা শুধু মাথাই গোঁজেনি, নতুন পরিবেশে মনও .বসিয়েছে। তবে পুববাঙলার মানুষগুলিই বা পারবে না কেন? এদের রক্তের মধ্যে তো বীর্যহীনতার বীজ নেই। এদেরই পূর্বপুরুষ বারেবারে বাস্তু বদলেছে। কীর্তিনাশার ভাঙনে—জমিদারের অত্যাচারে গ্রামকে গ্রাম উদ্বাস্তু হয়েছে, জরু-গরু বাল-বাচ্চা নিয়ে সরে গেছে নতুন অঞ্চলে। বাদা-অঞ্চলে জঙ্গল সাফ করে হাঁসিল করেছে নতুন ভূখণ্ড; নতুন জাগা চরের বুকে তুলেছে খড়ে ঘর। ইজারা নিয়েছে বুনো-শুয়োর অধ্যুষিত ঘন-জঙ্গল—পত্তনি নিয়েছে পলিমাটি-পড়া নতুন চরের জমি—গড়ে তুলেছে নতুন গ্রাম, নতুন বসতি, নতুন জনপদ! এদেরই বাপ ঠাকুর্দা। ইতিহাস তার সাক্ষী। তারা তো কই সরকারি সাহায্য নেয়নি কোনদিন। তাদের জন্য তো সাবসিস্টেন্স লেভেলের হিসাব করেনি কেউ? মেইন্টেনেন্স ডোলের বন্দোবস্ত রাখেনি কোন সরকারী সংস্থা?

স্থান-কাল আর পাত্র। স্থান নির্বাচনে ভুল হয়নি, পাত্ররাও নির্বীর্য নয়—ভুল হয়েছে কাল-নির্ণয়ে। দণ্ডকারণ্যে আসতে কালাপানি পার হতে হয় না। এদের প্রতিবেশী গিয়ে সুষ্ঠু পুনর্বাসন নিয়েছে আন্দামানে। তাই আবার বলি, ভুল হয়েছে কালে। এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় যদি হাত দেওয়া যেত আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে তাহলে ইতিমধ্যেই সোনা ফলে যেত এখানে। ত্রুটি হয়েছে বিলম্ব করার। দশ-বারো বছর একটা সুস্থ মানুষকে পাগলা-গারদে আটকে রাখলে সে পাগল হয়ে যায়—দশবারো বছর একজন নির্দোষীকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখলে পাকা ক্রিমিনাল হয়ে বেরিয়ে

আসে সে। তেমনি একদল সুস্থ-সবল প্রাণচঞ্চল মানুষকে যদি একযুগ ধরে ভিক্ষা আর ডোল-নির্ভর করে কোন ক্যাম্পে ফেলে রাখা হয় তখন তারাও ভিক্ষাজীবী হয়ে পড়ে। বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেছিলেন, 'দে আর এ ক্লাস অফ পার্পিচুয়াল প্রফেশানাল লিগালাইজ্‌ড বেগার্স।' ওরা নাকি আইন-সম্মত একদল চির-ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদরান্নের সংস্থানের কথা আর তারা ভাবতে পারে না। দোষ ওদের নয়—দোষ তাদের, যারা ওদের ভাগ্য নিয়ে বারো বছর ধরে জুয়া খেলেছ! দায়ী তার দ্বাদশবর্ষব্যাপী পরনির্ভরশীল ভিক্ষাপুষ্ট জীবনের প্রতিক্রিয়া।

মনে আছে চিফ-ইঞ্জিনিয়ারের পরিদর্শনের কথা। কাজ দেখতে এসেছিলেন উনি বাথ্‌না ক্যাম্পে। উদ্বাস্তু-কর্মীরা রাস্তার নয়ানজুলিতে মাটি কাটছে। সঙ্গে ছিল ও. এস. ডি. মৈত্র আর লেডি ওয়েল-ফেয়ার অফিসার রেখা মিত্তির। হঠাৎ একজন উদাস্তু কোদাল রেখে এগিয়ে এল। বছর পঁচিশেক বয়স—মাঝারি গঠন, বলিষ্ঠ। সর্বাঙ্গে তার ধুলার ছাপ। দু'হাতের তেলো-উল্‌টিয়ে বড়-সাহেবের সামনে মেলে ধরে বলে—'দ্যাহেন ছার অবস্থাডা দ্যাহেন!'

দু'হাতের তালুতে তার ফোস্কা পড়েছে আধুলির মাপে। ঋতব্রতের মনে হয়েছিল একে এখনই ছুটি দেওয়া উচিত্। ফোস্কা গলে গেলে সেপ্‌টিক হতে পারে। বড়-সাহেব ওর হাত দুটি দেখে লেডি ওয়েলফেয়ার অফিসার রেখা মিত্তিরকে বললেন—তোমার কাঁথা শেলাইয়ের কাজ খালি আছে? বড়ি-দেবার? এঁকে ভর্তি করে নাও।

রেখা মিত্র রুমালে মুখটা মোছে—হাসি গোপন করে আর কি।

এ অপমানে ছলছল করে ওঠে উদ্বাস্তু যুবকটির দু চোখ।

তার দিকে ফিরে বড়-সাহেব বলেছিলেন—তোমার বদলে আমি যদি মাটি কোপাতে শুরু করি আজ—তাহলে আমার হাতেও ফোস্কা পড়বে। অনভ্যাসের মাশুল। কিন্তু হাত দুটি লুকিয়ে রাখব আমি—চাষীর ছেলে না হলেও। কাউকে দেখতে দেব না। আর তুমি নিজেকে কৃষক বলে পরিচয় দিয়েও আমাকে হাতের ফোস্কা দেখাচ্ছো একটি মহিলার উপস্থিতিতে?

ঋতব্রতের মনে হয়েছিল এটা বড়-সাহেবের বাড়াবাড়ি। বয়স বাড়ছে যত ততই দুর্মুখ হয়ে উঠছেন ভদ্রলোক। সেটা বুঝতে পেরেছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার—তাই অফিসে ফিরে যেন ওকে উদ্দেশ করেই বললেন—এ পরিকল্পনার হিউম্যান আসপেক্টটা ভুল না বোস। সাত একর জমি, বাড়ি, লাঙল, গরু, আর বীজধানই এর সমাধান নয়। এদের মানুষ করে তুলতে হবে। এই ব্রত আমরা নিয়েছি।

জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার যশোবন্ত সিং ওঁকে খুশি করবার জন্য ইংরেজিতে বললেন—এরা একেবারে অমানুষ স্যার। ভারি অলস।

রুখে উঠেছিলেন চিফ—নো! ভুল বলছ তুমি। এরা অমানুষ নয়, অলস নয়। এদের অমানুষ করে তোলা হয়েছে—অলস হতে বাধ্য করা হয়েছে।—তারপর ঋতব্রতের দিকে ফিরে সাদা বাঙলায় বললেন 'ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত; এ তোমার এ আমার পাপ।'

যশোবন্ত সিং বুঝতে পারে না এ বাংলা উদ্ধৃতির মর্ম। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে বড়সাহেব ইংরেজিতে বলতে থাকেন—বারো বছর

ধরে ওদের আমরা মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে এসেছি। ফিডিং-বট্‌লে ওদের খাবার খাইয়েছি আমরা—বিনিময়ে কুটোটি নাড়তে দিইনি। কোন কাজ করতে বলিনি ওদের—পাঁচবছর অন্তর ব্যালট-পেপারে অনুকূল একটা বাক্সে ভোট দিতে বলা ছাড়া। ওদের কর্মহীন ক্যাম্পের র‍্যাশনগুদামে প্রতি সপ্তাহে যে জোড়া-বলদ পৌঁছে দিয়ে গেছে সাপ্তাহিক র‍্যাশন তার মর্যাদা ওরা দিয়েছে। পাঁচ বছর অন্তর একদিন তাস বন্ধ রেখে গেছে পোলিং-বুথে। আমাদের এ ব্যবস্থা যেন কোন প্রাণচঞ্চল দুরন্ত শিশুকে আফিং খাইয়ে নিশ্চিন্ত থাকা, আর তারপর যখন যৌবনে সে অকর্মণ্য হয়ে ওঠে তখন তাকেই দোষারোপ করা। প্লিজ রিমেম্বার যশোবন্ত সিং—ওদের মানুষ করে তোলার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু সেটা হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডেনের মতো উঁচু মঞ্চ থেকে ঘোষণা কর না—সেটা আমাদের পূর্ব-কৃত পাপের প্রায়চিত্ত শুধু। তুমি-আমি আমাদের নিজেদের স্বার্থে আর অকর্মণ্যতায় ওদের বারোটি বছর ধরে গুদামে পচিয়েছি।

ওঁর পরিকল্পনাটা একদিন উনি বুঝিয়েছিলেন ঋতব্রতকে ধৈর্য ধরে—কোথায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওঁর মতের মূল বিরোধ। কর্তৃপক্ষ চাইছেন, অতি দ্রুত জঙ্গল সাফ করে ফেলতে—বড় বড় ঠিকাদার এনে রাতারাতি গ্রামের পত্তন করতে। বাঙলা দেশ থেকে সরাসরি স্পেশাল ট্রেনে উদ্বাস্তুদের এনে সেই গ্রামে, সেই জমিতে বসিয়ে দিতে। তাদের প্রত্যেক পরিবারকে সাত একর জমি, বাড়ি, লাঙল-বলদ আর বীজধান চুকিয়ে দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলতে—তামাম শুদ্।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন—এতে তামাম শোধ হয় না বোস। স্বাধীনতা ক্রয় করবার উদ্দেশ্যে পুববাংলা থেকে এদের মূলোৎপাটন করে আমরা যে ঋণ করেছিলাম সেই ঋণের শোধ হয় মাত্র।

ঋতব্রত বলেছিল—এটাই তো আমাদের ঋণ, আর কী বাকি রইল?

—বারো বছর এদের বন্দিজীবনের খেসারত? ব্যাস্টিল আর বেলসেনের বর্ণনা শুধু পড়েছি—কিন্তু পি. এল. ক্যাম্প তো চোখে দেখা আছে বোস। এই যে দশ-বারো বছর ওদের বন্দী করে রাখলাম—কর্মক্ষমতা হরণ করলাম, ভিক্ষাজীবী করে তুললাম ওদের, তার খেসারত আছে না?

—তা আপনি কী করতে চান?

—আমি বলতে চাই শুধু জমি-বাড়ি-লাঙল-গরু বিলিয়ে আমরা যদি নিজেদের দায়িত্বমুক্ত মনে করি তাহলে বিরাট ভুল করব। এরা চাষ করতে পারবে না সে জমি! দু-পাঁচ বছর পর আবার একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে হাজির হবে হাওড়া-শেয়ালদ' স্টেশানে, এস্‌প্ল্যানেডে, স্ট্র্যান্ড-রোডের ধারে ধারে। সরকার বিরক্ত হয়ে বলবেন—ওদের তাহলে মরাই উচিত। বলব তুমি-আমিও। বলবে খবরের কাগজের রিপোর্টারেরাও। অথচ আসল গলদ কোথায় তা কেউ ভেবে দেখবে না।

—বুঝলাম, তাই আপনি ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প খুলে আগে ওদের দিয়ে মাটি কোপানো অভ্যাস করাচ্ছেন। হাতে ফোস্কা পড়লে ব্যঙ্গ করছেন। কিন্তু একটা কথা স্যার, সরকারি রাস্তায় মাটি কুপিয়ে যদি ওরা অভ্যস্ত হতে পারে তবে নিজের জমিতেই বা কাজ করতে পারবে না কেন?

—কেন জান? জমি-বাড়ি-লাঙল-বীজ দেবার পর আইন অনুযায়ী তাকে আর ডোল দেওয়া যাবে না বলে। যতদিন না পুনর্বাসন পাচ্ছে, অর্থাৎ ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প ছেড়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠছে ততদিন ওদের আংশিক ডোল দিতে পারি আমরা। বাঙলা দেশের ক্যাম্প থেকে সরাসরি গ্রামে ওদের বসিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে আমি নারাজ—ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্পের বকযন্ত্রে চোলাই করে মানুষ করে নিতে চাই তার আগে। এখানে ওদের হাতে ফোস্কা পড়বে, ক্রমে ঘাঁটা পড়বে। এখানে প্রথমে ওদের গায়ে গতরে ব্যথা হবে, ক্রমে সে ব্যথা সারবে। ধীরে ধীরে ডোলের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। মাস ছ'য়েক পরে ওরা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে শিখবে। তখন জমি পেলে চাষও করতে পারবে—তার আগে নয়। এই ছয়মাসের মাটি কাটার পরিশ্রম ওদের জমি-বাড়ি পাওয়ার মূল্য বলেই ওরা বুঝতে শিখেছে আজ। প্রথম প্রথম ওদের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল রাস্তার কাজ করায়—ওরা নাকি ভাগচাষী, মজুর নয়। কর্তৃপক্ষ গোপনে রাজি হয়েছিলেন নরম হতে—আমি হতে দিইনি। আজ ওরা বুঝেছে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আজ ওরা কাজ করছে—হাতের ফোস্কা নিয়েও।

ঋতব্রত বলেছিল—কিন্তু কথাটা তো সত্যি। ওরা চাষী, মজুর নয়।

—ড্যাম ইট!—ধমক দিয়ে উঠেছিলেন চিফ। কে চাষী? কেউ নয়! সরকারি খাতায় এগ্রিকালচারিস্ট ফ্যামিলি লেখা আছে বলেই ওরা চাষী? ব্যাপারটা কোনদিন তলিয়ে ভেবে দেখেছ? এক যুগ আগে যে লোকটা এসে বলেছিল সে ভাগচাষী, আজ সে পঙ্গু বৃদ্ধ। এক দশকেই সে এতটা বুড়িয়ে যেত না অবশ্য—কিন্তু ডোলের অর্ধাহার, ক্যাম্পের অকর্মণ্য জীবন তাকে অকাল বার্ধক্যে টেনে এনেছে দ্রুতগতিতে। লাঙলের মুঠ ও আর চেপে ধরতেই পারবে না কোনদিন। আর আজ যে কর্মক্ষম যুবক—ঐ যে বাইশ চব্বিশ বছরের ছেলেটি হাতের ফোস্কা দেখাচ্ছিল আমাকে, ও কি চাষী? ও যখন পুব-পাকিস্তান ছেড়ে এ দেশে আসে তখন পাঠশালায় যেত, গাছে গাছে লাফালাফি করত, গরু চরাত অথবা ন্যাংটো হয়ে মাছ ধরত খালে-বিলে! জীবনে কখনও ও লাঙলের মুঠ ধরেছে? কাস্তে ধরেছে? কী অভিজ্ঞতা আছে ওর? চাষী! আমন ধান কোন মাসে রুইতে হয়, আউস ধান কোন মাসে পাকে, চাষের এসব রুডিমেন্টারি কথাই কি ও জানে? গো অ্যান্ড আস্ক হিম! ও শুধু জানে সপ্তাহে মাথা পিছু কতটা ক্যাশডোল পাওয়া যায়—কত সের চাল, কত ছটাক ডাল। আর জানে, অ্যাসেমব্লি অভিযানে ফেস্টুন ঘাড়ে যোগ দিলে দৈনিক ক-আনা প্রাপ্য হয়। চাষী পরিবার! মাই ফুট্‌!

এদিকটা ভেবে দেখেনি ঋতব্রত। জানে না, ভেবে দেখেছেন কি না কর্তৃপক্ষও।

ঋতব্রত ভয়ে ভয়ে বলে, একটা কথা স্যার। আপনি যে ওদের স্পষ্ট কথা অমন কড়া ভাবে শুনিয়ে দেন—আমার ভয় করে। ফস্‌ করে যদি অপমান করে বসে?

বড় সাহেব হাসেন। বলেন, স্পষ্ট কথা বলার জন্য অপমান হয়তো হতে হবে আমাকে, বোস—তবে ক্ষেত্রটা তুমি যা ভাবছ তা নয়। এর চেয়ে অনেক বেশি কড়া কথা আমি বলেছি উদ্বাস্তুদের—ওরা কখনও আমাকে অপমান করেনি। কারণ ওরা জানে আমার প্রকৃত স্বরূপ। একটা পোষা জন্তু যেটুকু বোঝে—মানুষ সেটা বুঝবে না? তবে তোমার আশঙ্কা অমূলক নয়। স্পষ্ট কথা বলার জন্য অপমানিত আমাকে হতে

হবে। অন্য মহল থেকে। সেটা আমি জানি। সক্রেটিস, গ্যালিলিও, ব্রুনো সত্য কথা স্পষ্ট করে বলে কী শাস্তি পেয়েছিলেন তাও জানা আছে আমার। ইতিহাস তুমি একাই পড়নি বোস—আমিও কিছু কিছু পড়েছি!

ঋতব্রত আর কথা বাড়ায়নি।

বড়-সাহেব নিজে থেকেই আবার বলেন—আমি হয়তো চলে যাব, কিন্তু তোমরা থেক। দেখ, যদি কিছু করতে পার। স্কিমটা অপূর্ব! বাঙালির বাঁচবার মতো এই পরিকল্পনাটি পাঁচভূতে নষ্ট করে দিলে বাঙলারই সর্বনাশ! এতবড় সুযোগ আমরা বেশিদিন পাব না। বাঙালি উদ্‌বাস্তু যদি না আসে তবে এখানে আমদানি করা হবে ভিন্ন প্রদেশ থেকে ভূমিহীন কৃষক। সেটা বাঙালির পক্ষে যে কতবড় সর্বনাশ হবে তা শুধু আমিই জানি। যদি প্রাকৃতিক কারণে এ স্কিম নষ্ট হত, যদি দৈব-দুর্যোগে এতবড় সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যেত তবু যা হোক সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু এ তো তা নয়। 'মানব জীবন রইল পতিত' এটাই ক্লাইমেক্স নয় বোস—তার চেয়েও বড় ট্রাজেডি হচ্ছে 'আবাদ করলে ফলতো সোনা!'

আবার কিছুটা চুপচাপ। বড়সাহেব আবার বললেন—তুমি তো এককালে লিখতে, এদের নিয়ে লেখ না একটা কিছু।

—সেই জন্যেই তো এসেছি স্যার। পরিকল্পনাকে সফল করার সামর্থ্য একা আমার নেই—কিন্তু এই মানুষগুলির ইতিকথা লিখে যাবার মতো ক্ষমতা আমার একলারই আছে।

—হ্যাঁ, ওদের দেখ, ভাল করে দেখ, কাছ থেকে দেখ। মাঝে মাঝে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ওদের মধ্যে মিশে যাও; ওদের গাঁয়ে গিয়ে রাত্রিবাস কর, না হলে ওদের মনের কথা জানতে পারবে না। কোন পূর্বধারণা নিয়ে ওদের কথা লিখ না, তুমি রাজনৈতিক কারণে লিখছ না,—মনে রেখ তুমি কথাশিল্পী। দরদ দিয়ে ওদের দুঃখটা বুঝতে চেষ্টা কর। অতিরঞ্জন কর না, অথচ ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ওদের সার্থকতা-ব্যর্থতার ইতিহাসকেও ছোট কর না।

ঋতব্রত বললে, হ্যাঁ যা দেখব তাই লিখব শুধু।

বাধা দিয়ে বড় সাহেব বললেন, না, যা দেখবে শুধু তাই নয়। যা দেখলে না চর্মচক্ষে—কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় মনের চোখ দিয়ে, তাও লিখ। তুমি ফটোগ্রাফার নও, তুমি সাংবাদিকও নয়। আমি ওদের আজকের রূপটা বুঝতে পারি কারণ ওদের দশ-পনের-বিশ বছর আগেকার রূপটি দেখা আছে আমার। তোমার যদি তা দেখা না থাকে তাহলে ক্যাম্পে গিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প কর—দেখবে ওরা তোমায় হাত ধরে নিয়ে যাবে ওদের সেই ফেলে আসা গাঁয়ে। ওদের সেই অতীত জীবনটাকে না দেখে এলে উদ্‌বাস্তুদের আজকের এই স্বরূপটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না তুমি।

ঋতব্রত গ্রহণ করেছিল সেই ব্রত।

মাকরেল ক্যাম্পের ঐ ছিনাথ, ঐ রত্নাকর, ঐ দ্বিজপদ-নবাপাল-যগন্দের আদিম ইতিহাস সে সংগ্রহ করতে যেত কাজের অবকাশে। বুঝে নেবার চেষ্টা করত ওদের আজকের রূপটা, ফেলে আসা অতীতের পশ্চাদপট।

2 আদিকাণ্ড

বাঙলা তেরশ বাহান্ন সালের আশ্বিন মাস।

কমলপুরের মানুষ কিন্তু জানতো না যে, আর দু বছর পরেই, অর্থাৎ তেরশ চুয়ান্ন সালেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে চলেছে।

এই বছরেই অসন্তোষটা একটা প্রকাশ্য রূপ নিল। আপাতদৃষ্ট কারণটা অবশ্য সামান্যই। একটা থিয়েটারের পার্ট। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের ভূমিকা। কমলপুরের জমিদার বংশের বড় কেউ একটা গ্রামে বাস করেন না। অতবড় জমিদারবাড়ি প্রায় খালিই পড়ে থাকে—কিছু আমলা-কর্মচারী থাকে বার মহলে, আর অন্দর-মহলে থাকেন জমিদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ জাহ্নবী দেবী, তাঁর একমাত্র কন্যাটিকে নিয়ে। দীর্ঘদিন পরে কী-জানি-কেন এ বছর হঠাৎ যশোহর থেকে সংবাদ এসেছে জমিদার স্বয়ং মহাপূজায় উপস্থিত থাকবেন। অন্যান্য বছর এ সময়টা তাঁরা সচরাচর মুশৌরী-সিমলা-কাশ্মীরে যান। মহাপূজার ব্যবস্থা করেন নায়েব হরিহর গাঙ্গুলি, জাহ্নবীদেবীর নেপথ্য নির্দেশে। মাসখানেক ধরে চলে আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। মহাপূজার তিনদিন বস্তুত গ্রামের কারও বাড়িতে উনান জ্বলে না। জমিদার বাড়িতেই সকলে অতিথি। যাত্রা, কীর্তন, ঢপ, তর্জা বা কবির লড়াই লেগেই থাকে।

কমলপুরের চৌধুরীরা এ তল্লাটের সমস্ত জমির মালিক। জমিদার থাকেন যশোরে তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে। এ বছর কী খেয়াল হল, তিনি পূজার দিনকুড়ি আগে হঠাৎ এসে হাজির হলেন—নিজে উপস্থিত থেকে মহাপূজা উদ্‌যাপন করবেন। কমলাপতি এসেই ডাকতে পাঠিয়েছিলেন গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরকে। আহ্বান পেয়ে হাজির হলেন ননীমাধব, সরোজ সাঁই, রসিকলাল শিরোমণি প্রভৃতি। অন্যান্য ব্যবস্থা সব করাই ছিল। নায়েব মশায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে পূর্বেই তাঁদের দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গেছে। কোনদিন কজন বেগার-লাগবে, কাকে কবে উপস্থিত হতে হবে তার তালিকা মিলিয়ে রাখা হয়েছে। এদিক থেকে নায়েব হরিহর গাঙ্গুলির ব্যবস্থাটা চিরকালই পাকা। তিনি জানেন, এ সময়ে একটা দিন কেন একটা বেলাও তুচ্ছ নয় চাষী-প্রধান গ্রামবাসীর কাছে। সকলেরই আছে নিড়ানোর কাজ। আউশের খেতই এ অঞ্চলটায় বেশি; মাঠে ধান অধিকাংশেরই কাটার মতো অবস্থায় এসেছে। ওদিকে ধান-মাড়াই-এর জন্য খামার প্রস্তুত করা আছে, আছে আসন্ন শুভদিনের আয়োজন। এ সময়ে সহজে কেউ বেগারি দিতে চায় না। অথচ বেগার না হলে পুজাই বা সম্পন্ন হয় কী করে? গাঙ্গুলি তাই গ্রামের পঞ্চজনার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা পাকা লিস্ট বানিয়ে রাখেন। তারপর যদি কেউ হাজিরার সময় অনুপস্থিত থাকে—তবে পাইক-বরকন্দাজের গামছা তো আছেই। এ লিস্ট কর্তারা কেউই

কোনদিন দেখেন না; দেখতে চান না। কর্তাদের কেউ যদি এসে পড়েন তবে পূজার পূর্বে গ্রামের পঞ্চজনকে ডেকে পাঠান। পরামর্শ করেন। এবার তো বড়কর্তা স্বয়ংই আসছেন সাত বছর পর।

সংবাদ পেয়ে রসিকলাল চাটুজ্জে, সরোজ সাঁই, ননীমাধব, হৃদয় ঘোষ প্রমুখ সাত-আটজন মাতব্বর পাটকরা উড়ুনি কাঁধে পেলে জমিদারের বৈঠকখানায় হাজিরা দিলেন। কর্তা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করছিলেন। এঁদের বিনয়াবনত যুক্তকর প্রণামের বিনিময়ে ঘাড়টা একটু কাত করে হাসলেন—অর্থাৎ প্রতি নমস্কার করলেন আর কি। তারপর আলবোলার নলটা ফরাসের অপরপ্রান্তে নির্দেশ করে বললেন—বসুন।

এঁরা জুতো—চটি খুলে ধীরে ধীরে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বসে পড়েন ফরাসের একপ্রান্তে।

—ওকি শিরোমণি মশাই, আপনিও আসুন।

শিরোমণি কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, আমি এখানেই বেশ আছি, আমার ধুলো পা।—প্রায় চৌকাঠের ওপরেই বসে পড়েন তিনি।

—না, না, তা কি হয়! আসুন, উঠে আসুন ব্রাহ্মণের পদধূলি থেকে বঞ্চিত হবে কেন ফরাসটা।

হাসেন বড়কর্তা। শিরোমণির কিন্তু কান্না পায়। ফেনশুভ্র আস্তরণটি কর্দমলাঞ্ছিত করে তিনি উঠে এসে বসেন। মনে মনে হাসছিলেন ননীমাধব। তিনি বুঝে নিয়েছেন শিরোমণির ইতস্তত করার কারণ। ফরাসের ওপরেই কাঁচকড়ার একটা প্লেটে ভুক্তাবশিষ্ট মাংসের উপস্থিতিটা তাঁর নজর এড়ায়নি। এই অবেলায় ব্রাহ্মণকে আবার স্নান করতে হবে।

—তারপর? পূজার তো আর সতের দিন মাত্র বাকি। ব্যবস্থাটা কি রকম করেছেন এবার?

চৌধুরীকর্তার বাচনভঙ্গীতে মনে হতে পারে যেন অভ্যাগত পাঁচজনেই পূজার ব্যবস্থা করছেন—তিনিই আগন্তুক অতিথিমাত্র।

সরোজচন্দ্র গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলেন—আজ্ঞে হুজুর, প্রতিবারের মতোই হবে ব্যবস্থা। আমাদের পুজোর ব্যবস্থা তো সাবেকি ব্যাপার—ওর কি আর এদিক-ওদিক হবার জো আছে?

কথাটা সকলের মুখপাত্র হিসাবে বেশ বাগিয়ে বলতে পেরে যেন একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন সাঁইমশাই। চারদিকে একবার চেয়ে দেখেন।

নিমীলিত নেত্রে চৌধুরীকর্তা বলেন—কিন্তু সাবেককালের ব্যবস্থাই কি হবে শুধু? এ বছর আমি নিজে উপস্থিত থেকে—মানে...

কথাটা যদিচ শেষ করেন না চৌধুরীকর্তা, তবু বিব্রত বোধ করেন সাঁই। কথাটা তাঁর খেয়াল হওয়া উচিত ছিল। ননীমাধব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শুধরে নিয়ে বলেন—তা তো বটেই

—শ্রীপতির ইচ্ছা মায়ের এবার ডাকের সাজ হবে, আর কৃষ্ণনগর থেকে ব্যান্ড পার্টি আনাতে হবে।

আগন্তুক গ্রামবাসীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিরোমণি মশাই এতক্ষণ কিছু বলতে না পেরে উশ্‌খুশ্‌ করছিলেন। এই সুযোগে বলে বসেন—ব্যবস্থাটা হুজুরের উপযুক্তই হয়েছে!

প্রতিবাদ করেন কমলাপতি—না শিরোমণি মশাই, ও দুটো ব্যবস্থাই আমার করা নয়। শ্রীপতির সাজেস্‌শন। আমারও অবশ্য একটা প্রস্তাব আছে—আপনারা বিবেচনা করে দেখুন।

সপ্রশ্ন চক্ষুগুলি উন্মুখ হয়ে ওঠে।

এ বছর নবমীর রাত্রে আমরা একটা নাটক অভিনয় করব। ডি. এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্ত।

এতক্ষণে শিরোমণি মশাই ভ্রমটা সংশোধন করবার সুযোগ পান—এটা আমাদের হুজুরের মতোই কথা হয়েছে। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে হুজুর। ঐ চন্দ্রগুপ্তের পার্টটা আপনাকে নিতে হবে। এ সব ছেলে-ছোকরারা না জানলেও আমি তো জানি হুজুরকে!

কমলাপতি এবার স্পষ্টই বিরক্ত হলেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। শিরোমণি না জানলেও কমলাপতি জানতেন, নাটকটিতে নামভূমিকার চেয়েও লোভনীয় চরিত্র হচ্ছে চাণক্য! এ প্রসঙ্গে কিন্তু কোনও আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল না তাঁর। তাই সংক্ষেপে বললেন—অভিনেতা নির্বাচন আমরাই করব, সে আপনাদের ভাবতে হবে না। আমি শুধু চাই আপনাদের সহানুভূতি আর সক্রিয় সহযোগিতা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই, আমরা যথাসাধ্য করব।

—নায়েববাবুর সঙ্গে তাহলে পরামর্শ করে নেবেন; বুঝতেই তো পা[illegible] [illegible] করে পুজো করতে গেলে খাটাখাটনি একটু বেশি হবেই। অবশ্য বাড়[illegible] [illegible] আমার; কিন্তু পুজোটা যখন আপনাদের গ্রামের তখন গতরে যেটুকু—

—সে আর বলতে হবে না হুজুর।

—শিরোমণি মশাই, আপনার দিনুরীর হিসাবটা তা হলে...

—আজ্ঞে সে তো বটেই।

নমস্কার করে এঁরা উঠে আসেন। আনন্দ-সংবাদটা এখনি গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে না পারলে তৃপ্তি নেই। ডাকের সাজ আর গড়ের বাদ্যি! তার ওপর ডে-লাইট উদ্ভাসিত মঞ্চের উপর চন্দ্রগুপ্তের অভিনয়! চৌধুরীরা দেখালে বটে!

এইভাবেই বাঙলা তেরশ বাহান্ন সালে মহাপূজার সূচনা হয়েছিল জলাঙ্গী বিধৌত কমলপুর গ্রামে!

আনন্দ সংবাদটা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে গৃহ হতে গৃহান্তরে, এ পাড়া থেকে সে-পাড়ায়, ক্রমে এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে। ডাকের-সাজ বস্তুটার সঙ্গে পরিচয়ই নেই অনেকের। এ অঞ্চলে সোলার সাজই প্রচলিত। গড়ের বাদ্যি তো স্বপ্নকথা। আর থিয়েটার? হ্যাঁ, সেটাও অভূতপূর্ব। যাত্রারই প্রচলন আছে গ্রামে, নাটক হয় না।

ধন্য ধন্য পড়ে গেল জমিদারের। গাঙ্গুলিমশায়ের আশঙ্কা দেখা গেল অমূলক। বেগারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে আপত্তি করল না কেউ। উপরি আমোদের বিনিময়ে বাড়তি খাটতে পিছপাও নয় গাঁয়ের মানুষ। সবাই খুশি হয়ে উঠল।

খুশি হল না শুধু একজন। গ্রাম্য পাঠশালার প্রাক্তন পণ্ডিত দিবাকর গোঁসাই। শ্যামবর্ণ দীর্ঘ একহারা চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো। উজ্জ্বল দুটি চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। বেয়াল্লিশের আন্দোলনে দিবাকর কারারুদ্ধ হয়েছিল। তখন তার বয়স সতের-আঠার মাত্র। সে নাকি 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। দিবাকরের বিঘা-আষ্টেক পৈত্রিক লাখেরাজ আছে। বিধবার একমাত্র সন্তান দিবাকর ভাগে চাষ করাতো জমিটা। বস্তুত চাষ-আবাদের যাবতীয় ব্যবস্থা ভাগচাষীই করত। রত্নাকর ঘোষ। রতন আসলে ভাগচাষী নয়। সম্পন্ন গৃহস্থ চাষী। তবু বিধবার কাছ থেকে জমিটা ভাগে বন্দোবস্ত নিয়েছিল সে। দিবাকরের মাও নিশ্চিন্ত ছিলেন। উৎপন্ন শস্যের প্রাপ্য অংশ রত্নাকর পৌঁছে দিয়ে যেত বিধবার গোলায়। এছাড়া ছোট একটি পাঠশালা খুলেছিল দিবাকর। গ্রামের আট-দশটি বাচ্চা পড়তে আসত। তাদের সিধাও জমা হত দিবাকর-জননীর ভাণ্ডারে। সংসারে অসচ্ছলতা ছিল না। এর মধ্যে হঠাৎ ঊনিশশ' বেয়াল্লিশের আন্দোলনে তরুণ দিবাকর গ্রেপ্তার হল। কমলপুর গ্রামের সে এক বিশেষ ঘটনা। এ গ্রামে ও বালাই ছিল না। পুলিশ অভিযোগ আনে, দিবাকর টেলিগ্রাফের তার কেটেছিল। দিবাকর অবশ্য অস্বীকার করেছিল এ অভিযোগ। তবু বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বছরচারেক পরে জেল থেকে ফিরে এসে দেখে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে তার জীবনে। মায়ের মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যে। পাঠশালার পণ্ডিতির দায়িত্বটা গ্রহণ করেছেন মন্দিরের পুরোহিত রসিকলাল শিরোমণি মশাই। পৈত্রিক জমি থেকে যা পায় তাতেই অবশ্য একজনের সংসার চলে যায়। নবীন যুগীর বারো বছরের মেয়ে রাধা সকালে এসে দুটি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দিয়ে যায়।

দিবাকরের কাছে সুসংবাদটা নিয়ে এসেছিল ঐ রাধাই। একা রাধা নয়, সঙ্গে ছিল দ্বিজপদ কর্মকারের ছেলে সতীশ। ওরা ঠিক সংবাদটা বহন করে আনেনি, এসেছিল একটা তর্কের মীমাংসা করতে। রাধার মত—'ডাকের সাজ' হচ্ছে আসল সোনা চাঁদির গহনা, সতীশের বিশ্বাস ওগুলো গিল্টি করা। ওদের তর্ক শুনে কিন্তু হাসি আসেনি পণ্ডিতের। কৌতূহলভরে সে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল। আশ্চর্য, গ্রামের প্রতিটি লোকের কাছে এ সংবাদ এত পুরানো—অথচ সে কোন খবরই রাখে না। পরমুহূর্তে এর কারণটা মনে পড়ে যায়। গ্রামে ফেরার পর থেকে একরকম একঘরে হয়ে আছে সে। মাসে একদিন যাকে থানায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসতে হয়, তার থেকে কত হাত দূরে থাকা উচিত যদিও চাণক্য পণ্ডিত সে সম্বন্ধে কিছু বলে যাননি; কিন্তু ওদের নিজস্ব বুদ্ধি অনুযায়ীই ওরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছিল। শুধু নন্দ চৌকিদার নয়, ধানকলের ঐ বাবুটি রত্নেশ্বর সম্বন্ধেও সকলে সন্দিগ্ধ। ও লোকটাও নাকি সরকারি গোয়েন্দা। গ্রামে ফিরে এসে তাই দিবাকর গ্রাম্য-জীবনের সঙ্গে নিজেকে ফের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। ইতিমধ্যে সে নিজেও কিছু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে

পড়েছিল। নিজের খেতখামার আর অর্ধসাপ্তাহিক খবরের কাগজটি নিয়ে দিন কাটে। সঙ্গী বলতে তার ঐ দুটি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী—সতীশ আর রাধাই মাঝে মাঝে আসে। দিবাকর নানান দেশের গল্প শোনায় ওদের। অবাক বিস্ময়ে দুটি কিশোর-কিশোরী সে গল্প শোনে।

সতীশের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটা শুনে দিবাকর কিছু চঞ্চল হয়ে পড়ে। ব্যবস্থাটার একটা দিকই সকলের নজরে পড়েছে। অপরদিকটা কেউ তলিয়ে দেখেনি। পণ্ডিত ইদানীং গ্রামের সব বিষয়ে কিছু উদাসীন হয়ে পড়েছে। বুঝেছে, তার সাহায্য অথবা পরামর্শ এরা চায় না। সে গ্রামে অবাঞ্ছিত। তার প্রতিটি কাজের মূলে এরা রাজনৈতিক কারণ আরোপ করছে। তাই তাকে সযত্নে পরিহার করে চলে। ক্রমে কখন যে সে নিজেই গ্রামের অন্তর থেকে নির্বাসন নিয়ে একান্তবাস শুরু করেছে তা জানে না। আজ কিন্তু দিবাকর সব শুনে স্থির হয়ে থাকতে পারল না। চাদরটা কাঁধে পেলে পথে পা বাড়ায়।

পণ্ডিতের বাড়ি বস্তুত গ্রামের দক্ষিণতম প্রান্তে। ওর ভিটার সামনে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা জলাঙ্গীর বাঁধ। ঠিক উত্তর-দক্ষিণ নয়, নদী এখানে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী। বাঁধের পূর্ব-প্রান্তে গ্রাম। পশ্চিমাংশের অধিকাংশই নিম্নভূমি। প্রতি বর্ষায় জলে ডুবে যায়। ও অঞ্চলটার নাম 'মানা'। প্রায় সবটাই বালি-জমি, কাশ আর হোগলার জঙ্গল। ওর মধ্যে খানিকটা অংশ, ঠিক বাঁকের মুখে—বালুহীন উর্বর পলিমাটি-ঢাকা একফালি জমি। এই মানাতেই বাস করে কয়েকটি অন্তজ পরিবার। বায়েন-পল্লী। জাতে ওরা মুচি। বাঁধের সমান্তরাল প্রায় একমাইল বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল; প্রস্থে সিকি-মাইলও হবে না। গ্রামের পশ্চিমাংশে বিস্তীর্ণ আউসের খেত। সেদিকে তাকালে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। সুবিস্তীর্ণ মাঠের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত একটা গাঢ় সবুজাভা। আউসের শিষের ওপর হাওয়ার নাচন একটা দেখবার জিনিস বটে। ধানগাছের গোড়ায় এখনও জল জমে আছে—ঘিয়ে রঙের ঘোলা জল। উঁচু-খেত থেকে নিচু জমিতে জলনিকাশের একটানা কলকল শব্দের সঙ্গে ভেসে আসছে আওয়াজ—হাওয়ার দোলায় ধানের গুছির হিস্‌হিসানি। দিনে চনচনে রোদ হচ্ছে—কখনও কখনও এক-আধ পশ্‌লা বৃষ্টিও যে হচ্ছে না তা নয়।

একদিকে জলাঙ্গীর লম্বালম্বি বাঁধ, অপরদিকে ধানের খেত—এর মাঝখানে যে গ্রামভূমি সেখানে এই বায়েনদের ঠাঁই হয়নি। ওরা ঐ মানায় থাকে। প্রতি বর্ষায় মানাটা ডুবে যায় জলাঙ্গীর বন্যায়। ওদের বাসা তাই মাটির নয়। তালপাতা আর উলু-বেনার আচ্ছাদনে প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস। প্রতি বছরেই বর্ষায় ওরা গৃহ-গৃহস্থালী সমেত সরে আসে বাঁধের এ পারে। আশ্রয় নেয় চাঁপা-ডাঙ্গার বন্ধ্যা ভূখণ্ডে। ওখানেই তেঁতুল আর অশ্বত্থের জড়াজড়ি করা বিস্তীর্ণ ঘনছায়ার তলায় আশ্রয় খোঁজে। তালপাতার চাটাইগুলো বেঁধে দেয় চারদিকে।

বাঁধটা অতিক্রম করে দিবাকর নদীগর্ভের মানায় নেমে পড়ে। বায়েনরা বর্ষা শেষে এখন আবার আশ্রয় নিয়েছে নদীর চড়াতে—মানায়। কাঁটা-গুল্মের মাঝ দিয়ে পায়ে-চলা পথ। দিবাকর এগিয়ে চলে শেয়াকুলের কাঁটা এড়িয়ে। বায়েনপল্লী থেকে একটানা

একটা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। বোধহয় সম্প্রতি এদের আত্মীয়স্বজন কেউ মারা গেছে—দিবাকর জানে না।

বায়েনরা পাঁচ-ছয় ঘর বাসিন্দা। প্রহ্লাদ বায়েনই ওদের মণ্ডল, মাতব্বর স্থানীয় ব্যক্তি। নিজের বাড়ির সামনে একটা চাটাইয়ে দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল। গোঁসাইকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ায়। একটি ফুটফুটে কিশোরী মেয়ে দড়ি দিয়ে বোনা একটা বাঁশের জলচৌকি এনে দেয়। মেয়েটিকে চেনে দিবাকর—পদ্ম, প্রহ্লাদ বায়েনের একমাত্র মেয়ে। বছর চৌদ্দ-পনের বয়স—কিন্তু পরে আছে সামান্য একটি ছেঁড়া ফ্রক। কোনমতে জলচৌকিটা পৌঁছে দিয়েই অন্তরালে সরে যায়। দিবাকর বসে। কান্নাটা মনে হচ্ছে প্রহ্লাদের অন্তঃপুর থেকেই ভেসে আসছে। প্রশ্নটা তাই না করে পারে না দিবাকর, কাঁদছে কে?

দিবাকরকে আসতে দেখে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে এসে জুটেছে। অধিকাংশই স্ত্রীলোক। পুরুষেরা মজুর খাটতে বেরিয়ে গেছে। প্রহ্লাদ কোন জবাব দেয় না। প্রহ্লাদের শালী পরী দাঁড়িয়েছিল পাশেই। ফিক্ করে হেসে বললে, কাঁদে আবার কে, পেল্লাদের মাগ, সরি।

—কেন? কী হয়েছে—প্রশ্নটা স্বাভাবিক।

এবার খুক্‌খুক্ করে হেসে ওঠে পরী।

প্রহ্লাদ বলে, ছাড়ান দ্যান ও হারামজাদির কথা। আপুনি আসছেন কেনে তাই বলেন।

দিবাকর সামলে নেয় নিজেকে। এই অন্ত্যজ পরিবারগুলির বিষয়ে বেশি কৌতূহলী হওয়া উচিত নয়। হয়তো সরির চরিত্রে সন্দিহান হয়ে সাত সকালেই প্রহ্লাদ ঠেঙিয়েছে তাকে। তাই ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে সোজা বলে—এবার পুজোয় নাকি গড়ের বাদ্যি আসবে?

—হঁ! —সংক্ষেপে জবাব দেয় প্রহ্লাদ।

—তাহলে তোরা এবার কোথায় বাজাতে যাবি?

প্রহ্লাদ জবাব দেয় না। দু-হাতের তালু উল্টে দেয়—অর্থাৎ কে জানে। জবাব দেয় পরী—সেই বিত্তান্তেই তো সরিকে ঠেঙালে উ।

পরীর বর্ণনা থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। প্রহ্লাদ তার ঐ মেয়েটিকে ভারি ভালবাসে। স্ত্রী তার চিররুগ্না, মেজাজ খিটখিটে। পরীকে বাড়িতে আশ্রয় দেবার পর থেকে সরি আরও তিরিক্ষে হয়ে উঠেছে। ফলে প্রহ্লাদ ঐ একফোঁটা মেয়ের আঁচলের তলায় আশ্রয় খোঁজে। বাপে-বেটিতে খুব ভাব। পদ্মর সখের জিনিস প্রাণ দিয়েও নিয়ে আসে প্রহ্লাদ। কদিন আগে ঐ কিশোরী মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বায়েন পাড়ার কয়েকটি উঠ্‌তি জোয়ান কী যেন রসিকতা করেছে। পদ্ম এসে বাপকে ধরেছিল একখানা শাড়ি কিনে দিতে হবে তাকে। শাড়ি! শাড়ি কিনবার মতো সামর্থ্য কোথায়? কিন্তু স্ত্রীর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী মেয়েটির লজ্জা নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রহ্লাদ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। মহাপূজায় জমিদার বাড়ি বাজনা তার আবহমানকালের মৌরসী ব্যবস্থা। সেই অর্থাগমের কথা স্মরণে

রেখেই বায়েন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মেয়েকে। লোকমুখে গড়ের বাদ্যির কথা শুনে প্রথমটা চমকে ওঠে। কাল সন্ধ্যায় ব্যাপারটা জানতে গিয়েছিল নায়েব হরিহরের কাছে। হরিহর গাঙ্গুলি জানিয়েছিলেন এবার আর প্রহ্লাদের প্রয়োজন নেই—তাই তার বায়না হবে না। প্রহ্লাদ অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেছিল, ফলে ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন নায়েবমশাই। শেষে প্রহ্লাদ মহানবমীর রাত্রে কবিগানের আসরে ঢোলবাজনার বায়না বাবদ কটা টাকা আগাম চেয়েছিল। ফেরার পথে সে অন্তত একটি আট-হাতি খাটো শাড়ি কিনে নিয়ে যেতে চায়—নাহলে অভিমানী মেয়েটিকে ঠাণ্ডা করা যাবে না। হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন হরিহর। কবিগান হবে না এবছর। তার বদলে থিয়েটার হবে। দুঃসংবাদটা শুনে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে বায়েন, মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ে হরিহরের পায়ে। এ ব্যবস্থা হলে মারাই যাবে সে। হাঁ হাঁ করে সরে গিয়েছিলেন গাঙ্গুলি, কিন্তু তার পূর্বেই নাছোড়বান্দা বায়েন জড়িয়ে ধরেছে তাঁর পা। ছুঁয়ে যখন ফেলেইছে তখন আর দ্বিধা করেননি গাঙ্গুলিমশাই। অন্তরের নিরুদ্ধ কামনাটা চরিতার্থ করেছিলেন। প্রহ্লাদ ফিরে এসেছিল পদাঘাত-চিহ্ন বুকে নিয়ে। শক্তিশালী লোক সে—না হয় বন্যা, যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের বাজারে ক'টা বছর ভরপেট খেতে পায়নি। তাহলেও এখনও হরিহরের মতো লোককে মাথার ওপর তুলে আছাড় মারবার মতো ক্ষমতা আছে তার। সে কিন্তু কিছুই করেনি। ফিরে এসে গুম মেরে বসেছিল বাড়িতে। সংবাদটা শুনে সরি আর স্থির থাকতে পারেনি। বিষমিশ্রিত কর্কশকণ্ঠে গালি দিয়েছিল বায়েনকে। প্রহ্লাদ দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল—জবাব দেয়নি একটি কথারও। তাতে যেন আশ্ মেটেনি সরির, তাই কণ্ঠে আরও বিষ ঢেলে বলেছিল—হয়, বুঝ্ছি—তোমার মতলব কি বুঝি নাই! শুধু শ্যালিরে দিয়া কুলাইছে না—অখন পদ্মরে দলে নিতি চাও!

ফোঁস করে উঠেছিল প্রহ্লাদ : মানে? কী বুল্‌তে চাস তু?

—ইচ্ছা করি তুই পদ্মর লেগে শাড়ি কিনিস নাই। মেয়েরে উদামগা করি রাখতি চাস্! পরীর দলে ভিড়াতি চাস্!

আর স্থির থাকতে পারেনি প্রহ্লাদ। পরুষ হস্তে সে শাসন করেছিল স্ত্রীকে। ফলে প্রহ্লাদের ধর্মপত্নী তারস্বরে আর্তনাদ জুড়েছে এই সাত সকালে—আর তার স্বামী—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো ঊর্ধ্বমুখে ভগবৎ-চিন্তা করছে।

সরির বোন পরীর কিছু বদনাম আছে। জনশ্রুতি সে স্বৈরিণী শ্রেণীর মেয়ে। স্বামীত্যক্তা মেয়েটি প্রহ্লাদের আশ্রয়েই আছে। তাই সরি যখন অভিযোগ আনল প্রহ্লাদ ইচ্ছা করে তার আত্মজার লজ্জানিবারণের ব্যবস্থা করছে না, পদ্মকে পরীর পথে ঠেলে দেবার উদ্দেশ্যে, তখনই শুধু ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল তার।

দিবাকর এটুকু বোঝে যে, এখানে তার কিছুই করণীয় নেই। একবার মনে হল স্বয়ং চৌধুরীবাড়ির মেজকর্তার দরবারে গিয়ে আপত্তিটা জানায়। পুজো চৌধুরীদের হতে পারে কিন্তু গ্রামবাসীরও এটা একটা সর্বজনীন বাৎসরিক আনন্দোৎসব। প্রহ্লাদ বায়েন আর তার দলের সাত-আটটি বাজনদার যদি তাদের বাৎসরিক আনন্দ আর রোজগার থেকে বঞ্চিত হয় তবে গ্রাম্য উৎসবের যে অনেকখানি অঙ্গহানি হবে এই সহজ কথাটা কি বুঝতে পারবেন না কমলাপতি চৌধুরীর মতো শিক্ষিত জমিদার?

কিন্তু না, একা যাবে না দিবাকর। যাওয়া উচিত নয়। গেলে জিনিসটার যথেষ্ট গুরুত্ব হবে না!

গ্রামের প্রায় কেন্দ্রস্থলে আনন্দময়ীর মন্দির। এটাই হাটতলা। চাঁপাডাঙার মাঠের ধারে ভৈরব ধর্মরাজ শিবের মন্দির। ওরা বলে বুড়োরাজা। মন্দিরের সামনে বিরাট এক ছাতিমগাছ। তলাটা বাঁধিয়ে দিয়েছেন জমিদার কমলাপতির স্বর্গগত পিতৃদেব লক্ষ্মীপতি চৌধুরী। মন্দিরটি আবার তাঁর প্রপিতামহ রতিপতির কীর্তি। চৌধুরী বংশের পঞ্চম পুরুষ রতিপতি চৌধুরী ছিলেন কৃতবিদ্য স্বনামধন্য পুরুষ। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক তিনি। তাঁর আমলেই জমিদারির বিস্তৃতি হয় সবচেয়ে বেশি। মায়ের নামে তিনি দিঘি কাটান—চাঁপাডাঙার মাঠের উত্তরে পদ্মদিঘি সে কীর্তি বহন করছে আজও। পদ্মদিঘিতে আজ পদ্ম নেই—তবু অতলস্পর্শ কালো জলে দিঘিটা ভরা আছে। আনন্দময়ীর মন্দিরই শুধু নয়, ভৈরবের মন্দিরও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য মায়ের মূর্তি তিনি তৈরী করাননি—তিনি তৈরি করিয়েছিলেন মন্দিরটি শুধু।। মূর্তি আবহমান কাল নাকি ঐখানেই ছিল—যেমন ছিল চাঁপাডাঙার মাঠের ধারে ধর্মরাজের অনাদিলিঙ্গ মূর্তি।

মনে হয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকরণে রতিপতি দেবীমূর্তির নামকরণ করেছিলেন 'আনন্দময়ী'। মূর্তিটি আসলে চামুণ্ডা-ভৈরবীর। চামুণ্ডা অথবা ধর্মরাজ অনার্য দেবতা। দুলে, বাগ্‌দি, উগ্রক্ষত্রিয় আর সদগোপদের পূজা নিয়েই ধন্য ছিলেন তাঁরা। বর্ণহিন্দু রতিপতি ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে দেবতাকে জাতে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। কিন্তু শিবের অধিকাংশ ভক্ত বা সন্ন্যাসী যেখানে প্রধানত গোপ, বাগ্‌দি, দুলে, ডোম সেখানে রাতারাতি দেবতাকে আত্মসাৎ করা সম্ভব হয়নি বোধহয় ব্রাহ্মণ্য সমাজের তরফে। একটা আপোষ রক্ষা হল। শ্মশান থেকে দেবী এসে আশ্রয় নিলেন ভদ্র পল্লীতে। অনাদিলিঙ্গ দেবতার ঠাঁই নড়াবার উপায় নেই। পূজারী হিসাবে নিয়োজিত করা হল—ডোম—বাগ্‌দি নয়—উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের একটি পরিবারকে। ক্রমে সে অধিকার চলে আসে বর্তমান পূজারী রসিকলাল শিরোমণির পূর্বপুরুষের দখলে। মন্দির সংলগ্ন বিশাল ছাতিমগাছ সমতে চণ্ডীমণ্ডপ আর হাটতলাটাও দেবীর সম্পত্তি! হাটতলায় সারি সারি ছোট ছোট ছাউনি। প্রতি মঙ্গলবার হাট বসে। এরই আয় থেকে নিত্যপূজার ব্যবস্থা; বৎসরে একবার 'মচ্ছোব' হয় জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে। সমস্ত এলাকাটা তখন সরগরম হয়ে ওঠে। দূর গ্রাম থেকে আসে যাত্রীরা। মেলা বসে মন্দির ঘিরে। পাঁঠা বলি হয় অসংখ্য। কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ডোমেরা শুয়োরও বলি দেয়—তবে দেবমন্দিরের সামনে নয়—দেবীর আদিম নিবাস শ্মশানে। জামালপুরের পুড়োরাজার উৎসব, কৃষ্ণনগরের বারোদোলের মেলা সেরে দোকানিরা আসে এগাঁয়ে। পক্ষকালের জন্য গ্রামের চোহারাই পালটে যায়।

তাছাড়া সারাবছরই হাটতলাটা গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। ছোট ছোট অস্থায়ী ছাউনি ছাড়া কিছু পাকা দোকানঘরও আছে। এমনি একখানি পাকা ঘরে এ তল্লাটের একমাত্র চিকিৎসক জগবন্ধু রায়ের ডাক্তারখানা। জগবন্ধু এ গ্রামের আদিম বাসিন্দা নয়। একটি বিবাহের বরযাত্রী হিসাবে এসেছিল ও গাঁয়ে। জায়গাটি তার পছন্দ হয়ে যায়। শুধু কমলপুর নয়, উত্তরে রায়না, মধ্যমগ্রাম,—দক্ষিণে বড়পলাসন, পুবে সাতগাঁ—খ'ড়ের

ওপারে মোল্লাহাটি, এই পঞ্চগ্রামের মধ্যে পাশকরা ডাক্তার ছিল না। জগৎ ডাক্তারও অবশ্য ঠিক পাশকরা ডাক্তার ন'ন—কিন্তু সে খবর বড় একটা কেউ জানে না গ্রামে। ঢাকার মেডিক্যাল স্কুলে তিনি ফাইনাল ইয়ারে উপর্যুপরি তিনবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। সে যাই হোক, ডাক্তারের ক্ষেত্র নির্বাচনে ভুল হয়নি। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে। সাইকেলের কেরিয়ারে ঔষধের বাক্সটা বেঁধে প্রায় সারাদিনই তাঁকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

দিবাকরের অনুমান নির্ভুল। ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে এই সকালেই এসে জুটেছেন গ্রাম্য-প্রধানদের কয়েকজন। ডিস্‌পেনসারি-ঘরের মাঝখানে একটা আমকাঠের টেবিল। সামনে দুখানা বেঞ্চি পাতা। পিছনে একটা পর্দা ঝুলছে। পর্দাটা তুলে ধরলে দেখা যাবে—ওদিকে স্বল্প পরিসর স্থানে একটি কাঠের চৌকি। ডাক্তার ওটাতে রুগীদের পরীক্ষা করে। ডাক্তারখানার সম্মুখে উবু হয়ে বসে আছে খালি-পা, উদাসদৃষ্টি-মেলা রুগীর দল। বেঞ্চিখানি দখল করে জমিয়ে বসেছেন ননীমাধব আর হৃদয় ঘোষ। আর আছেন কমলপুরের সবচেয়ে ধনী নন্দদুলাল রায়। রায়মশায়ের নিজ চাষের জমিই আছে তিনশ বিঘা—জমিদার বাড়ি ছাড়া এ তল্লাটে নন্দদুলালই প্রধানতম ব্যক্তি। ক্ষেতের ফসলের চেয়ে তেজারতি কারবার থেকেই বেশি আয় হয় তাঁর। তাছাড়া জমিদারের কাছ থেকে জলাঙ্গীতে মাছ-ধরার জমা, পারানিঘাটের ডাক-জমা প্রভৃতি সবগুলিই তাঁর অধিকারে। এমনকি অনাদায়ী বছরে সদরে খাজনা পৌঁছে দেবার দায়িত্বও বহন করতে হয়েছে নন্দদুলালকে। কৃপণ বলে আড়ালে রহস্য করলেও প্রবল প্রতাপান্বিত রায়মশায়ের ডাকে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। জমিদারের নায়েব পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলে।

দিবাকরকে ডাক্তারখানায় উঠতে দেখে ঘোষমশাই বলে ওঠেন—কী হে গোঁসাই, তোমার আবার কী বেমারি হল?

—আজ্ঞে না, অসুখ নয়। আমি এসেছিলাম আপনাদের সঙ্গে অন্য একটা ব্যাপার আলোচনা করতে। কদিন থেকেই কথাটা মনে হচ্ছে আমার। আজ রায়জ্যেঠা আর আপনাদের একজায়গায় দেখে কথাটা বলতে এলাম।

—কী ব্যাপার হে? —জিজ্ঞাসা করেন ননীমাধব।

দিবাকর ধীরভাবে তার বক্তব্য পেশ করে। চৌধুরীবাড়ির পূজাটা এ অঞ্চলের একমাত্র পূজা। মোল্লাহাটির কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, বাকি রায়না, মধ্যমগ্রাম, বড়পলাসন আর সাতগাঁর মধ্যে দ্বিতীয় পূজা নেই। আজ নায়েবমশাই হুকুম দিয়েছেন—এ পূজায় প্রহ্লাদ বায়েনদের বাজনার প্রয়োজন নেই। খ'ড়ের মানায় ঐ যে কয়েকঘর বায়েন বাস করে ওদের এই একখানি পূজাই ভরসা। গাঁয়ের ঐ ক'ঘর গরিবের অন্ন মেরে গোরার বাদ্যি কি না আনলেই নয়?

ননীমাধব হেসে বলেন—জেল থেকে ছাড়া পেলে কি হবে, গোঁসাই আমাদের শোধরায়নি। গোরাদের উপর মজ্জাগত রাগটা আর ওর গেল না।

হৃদয় ঘোষ ফোড়ন কাটেন—গোরাদের উপর এতই যদি তোমার রাগ গোঁসাই—তবে গোরাচাঁদ গোরাচাঁদ বলে কেঁদে ভাসাও কেন?

শাক্ত ঘোষ-মশাই আশ মিটিয়ে একটা রসিকতা করতে পেরে হা-হা করে হাসলেন খানিক। হাসিতে যোগ দিলেন রসিকলাল শিরোমণি মশাই। আনন্দময়ীর মন্দির থেকে পূজা সেরে তিনিও ইতিমধ্যে গুটি গুটি এসে জুটেছিলেন। তিনিও শক্তি-উপাসক। হেসে বলেন—ঘোষজা যে আমাদের আলঙ্কারিক হয়ে উঠলে হে। অ্যাঁ? গোরার উপর যমকটা ছেড়েছে জবর।

দিবাকর কিন্তু রাগ করে না। হেসে বলে—গোরার উপর রাগটা যে আমার মজ্জাগত ঘোষকাকা। গোরার বাদ্যির উপরেও আমার রাগ, আবার গোরাচাঁদের উপরেও আমার রাগ। তবে প্রথমটা বাঙলায় আর দ্বিতীয়টা সংস্কৃতে।

ঘোষ মশায়ের অর্থগ্রহণ হয় না, বলেন—তার মানে?

—মানে, অলঙ্কারশাস্ত্র আমরা আলোচনা করছি না কাকা, করলে যমকের জমকে আসল বক্তব্যটা আমরা ভুলে যাব।

—সেই আসল বক্তব্যটা তোমার কী? প্রশ্ন করেন শিরোমণি।

—আসল বক্তব্যটা এই যে, আমাদের কাছে যেটা রসাত্মক বাক্য বলে মনে হচ্ছে—কয়েকটি অন্তজ পরিবারের কাছে তাই জীবনমরণ সমস্যা।

শিরোমণি মশাই বলেন—কী বলতে চাও তুমি সহজ করে বলত?

দিবাকর আবার পেশ করলে তার বক্তব্যটা—পূজায় গড়ের বাদ্যি আনা চলবে না। প্রতিবারের মত এবারও বায়েনরা মায়ের পূজায় বাজনা বাজাবে—এই ব্যবস্থাই আমাদের করা উচিত, এই আমার মত।

শিরোমণি কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু তার আগেই রোগী-পরীক্ষারত জগৎ-ডাক্তার বলে ওঠে—বায়েনদের বাজনা বাজাবার ইচ্ছেটাও সত্যি, তোমার মতামতটাও প্রাঞ্জল, কিন্তু পয়সা খরচ করে পূজাটা যাঁরা করছেন তেনাদের ইচ্ছা আর মতটা একটু ভিন্ন প্রকারের। তুমি আর কী করবে বল? জিব বার কর।

শেষ নির্দেশটা অবশ্য রোগীর প্রতি প্রযোজ্য, কিন্তু এক নিঃশ্বাসে যে ভাবে বক্তব্যটা শেষ করল ডাক্তার তাতে সকলেই হেসে ওঠে। দিবাকর ক্ষুণ্ণ হয়, বলে—তুমি গাঁয়ে নতুন এসেছ ডাক্তার, তুমি ও কথা বলতে পার। আমরা কিন্তু এই পাঁচগাঁয়ের লোক বাপ-পিতামহের আমল থেকে জেনে এসেছি এটা একা জমিদারের পূজা নয়—পঞ্চগ্রামের পূজা!

শিরোমণি তৎক্ষণাৎ সায় দেন—সে কথা একশবার। প্রতিবার আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই ওঁরা মায়ের পূজায় হাত দেন। এবার তো কর্তা স্বয়ং এসেছেন—কিন্তু তিনিও আমাদের ডেকে বসিয়ে আলাপ করলেন, পরামর্শ নিলেন—না কি ঘোষজা?

দিবাকর বললে—তাহলে পরামর্শটা আপনারা ঠিক দেননি শিরোমণি জ্যাঠা।

রায়মশাই এতক্ষণ নির্বাক ছিলেন। এবার গলাঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসেন। ওটা তাঁর বাক্‌প্রয়োগের গৌরচন্দ্রিকা। রায় বললেন—গড়ের বাদ্যি মানে কিন্তু সত্যিকারের সাহেব এসে বাজাবে না। বাজাবে আমাদের দেশী লোকই বিলাতী ব্যান্ড বাজনা। আর বায়েনদের কথা বলছ? একজনের উপকার করতে গেলেই আর একজনের অপকার হয়। এঘরে জমা পড়লেই ওঘরে খরচ লিখতে হয়—না হলে হিসাব মেলে না।

পেল্লাদ যদি বাজায় তাহলে ব্যান্ড বাজিয়েদের রোজগার বন্ধ হবে। নিরবচ্ছিন্ন ভালো বলে তো দুনিয়ায় কিছু নেই। একের লাভ মানেই অপরের লোকসান। এই যে ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে—তুমি তো যুক্তি দেখাতে পার এতে করে ও লক্ষ লক্ষ রোগজীবাণুকে হত্যা করছে। সুতরাং ডাক্তারের এ কাজ করা উচিত নয়। পার না কি?

শিরোমণি নন্দদুলালের ভিতর এতবড় একজন তার্কিককে আবিষ্কার করে যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন। খপ্ করে রায়মশায়ের নস্যাদানী থেকে একটিপ নস্য তুলে নিয়ে নাসারন্ধ্রে চালিয়ে দিলেন।

দিবাকর সবিনয়ে বলে—আপনার যুক্তিটা কিন্তু আমারই তরফে রায়জ্যেঠা। তাই আমি বলব ভুল আমার হয়নি। ডাক্তার জীবাণুকে বধ করে মানুষকে বাঁচিয়ে অন্যায় করছে কি না আপনারাই বলুন।

কেউ কোন জবাব দেয় না। দিবাকর আবার বলে—অন্যায় করছে না। কারণ ডাক্তারের কাছে লক্ষ জীবাণুর চেয়ে একটা পরিচিত মানুষ বেশি আপন। জীবাণুদের সে চেনে না—রোগীকে চেনে। জীবাণুর দুঃখকষ্ট ওকে অনুভব করতে হয় না—রোগীর রোগযন্ত্রণা ওর কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। ঠিক সেই যুক্তিতেই আমি বলছি, অপরিচিত শহরের ব্যান্ড-বাজিয়েদের চেয়ে প্রহ্লাদই আমাদের কাছে বড়। বায়েনদের দুঃখ-দুর্দশা আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

কেউ প্রতিবাদ করে না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে একজন নতুন অভিনেতা; ঠিক প্রবেশ করে বলা উচিত নয়, সেও উপস্থিত ছিল রোগীদের মধ্যে—উঠে দাঁড়ালো এতক্ষণে। সুবল কাওড়া। কমলপুরের কবিয়াল। ঠিক যে ভঙ্গিতে কবিগানের আসরে দাঁড়ায় তেমনি হাতজোড় করেই বলে—মোদের গোঁসাই ঠাকুর যখন ভরসা দ্যালেন, তখন আমিও কিছু নিবেদন করি হুজুর। আপনারা গাঁয়ের পঞ্চজনা হাজির আছেন—যা হয় বিচার করি দ্যান। এই আমি, কিম্বা জনাদ্দন ভায়া, আমরা বছরে একটিবার পূজাতলায় পালা পাই। একখান গামছা, তিনপালি ধান পাই। জিতলি একখান ধুতিও পাই। তাছাড়া বশ্‌কিসের কথাটা না হয় ছাড়ানই দ্যান। এবার পুজোয় আমাদের কথাটা বিবেচনা করেন। তাছাড়া আমাদের গিয়ে ক্যাবলা দোয়ারকি, পেল্লাদ বাজনদার—

তাকে থামিয়ে দেয় ডাক্তার—তা কী করবে বল সুবল? দিনকাল বদলে যাচ্ছে। তোমাদের ঐ একঘেয়ে 'বাবু মহাশয়' আর 'মিথ্যা কথা লয়' যদি আমাদের ভালো না লাগে তো দুষবে কাকে?

সুবল হতাশভাবে ঘাড় নাড়ে। উপায় কী? মানুষের ভালো লাগা না লাগার উপর সত্যিই তো তার হাত নেই। কঠোর সত্যটা হজম করতে গিয়ে বেচারি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

দিবাকর কিন্তু হাল ছাড়ে না, বলে, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না ডাক্তার। তোমার কাছে কবিগান ভালো না লাগতে পারে—আমার কাছে লাগে। দেশের বেশির ভাগ লোকের লাগে। ওটা আমাদের গাঁয়ের জিনিস, আমরা বুঝতে পারি। নাটক জিনিসটাই বরং আমাদের অচেনা।

—বেশ তো, যাদের ভালো লাগবে না তারা জমিদারের কাছে গিয়ে বলুক আমরা কবিগান চাই, ঢোলের ঢ্যাবঢ্যাবি চাই—আবার যারা নাট্যামোদী তারা বলুক আমরা নাটক চাই, ব্যান্ড চাই। যার পূজা সে বুঝে নিক—এ নিয়ে তর্কের কী আছে?—জবাব দেয় জগবন্ধু!

দিবাকর চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বুঝতে পারে, এটা তার একারই মত নয়—মজলিসের মত। আর কথা না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে সে নেমে আসে পথে।

জগবন্ধু ডাক্তারের রাগ করার একটা বিশেষ কারণ ছিল। ডাক্তার একজন নাটুকে লোক। স্কুল-কলেজে তো বটেই, পরবর্তী জীবনেও অভিনেতা হিসাবে তার সুনাম ছিল। অনেক বড় বড় চরিত্রে সে অভিনয় করেছে। বহু আসর-জমানোর ইতিহাস আছে তার। এ পর্যন্ত যতগুলি পদক তার নামে ঘোষিত হয়েছে, তা যদি সত্যি দেওয়া হত তাহলে মেডেলের একটা মালাই গলায় ঝুলত তার। এই পাণ্ডববর্জিত গাঁয়ে এসে ডাক্তারের একটা ভারি খেদ ছিল—এখানে নাটকের কদর নেই। যাত্রা অবশ্য মাঝে মাঝে হয়; কিন্তু চতুর্দিকে অডিটোরিয়াম, উইংসের আড়াল বলে কিছু নেই এটা ভাবতেই যেন কেমন অস্বস্তি লাগে। এবার জমিদার-বাড়ি থিয়েটার হবে এবং তাতে ওঁরা গ্রামবাসীর সহযোগিতা কামনা করেছেন শুনে ডাক্তার উল্লসিত হয়ে উঠেছে। এইবার সে সকলকে একহাত দেখিয়ে দেবে। পাঁচখানা গ্রামে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে—ডাক্তার বলে নয়—অভিনেতা বলে। সাইকেলে চেপে এগ্রাম থেকে ওগ্রামে যখন যাবে—সবাই আঙুল তুলে বলবে—ঐ যায়।

এ ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল। এখানে এসে বসার পর জমিদার বাড়ি থেকে কোনদিন ডাক আসেনি তার। জমিদার অবশ্য গ্রামে থাকেন না, কিন্তু তাঁর আত্মীয়রা তো থাকেন। এই সূত্রে পঞ্চগ্রামের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াও লাভ ছাড়া লোকসান নয়। এরপর যখন ডাক্তার শুনলে যে, কর্তা চন্দ্রগুপ্ত ধরেছেন, তখন সে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। চন্দ্রগুপ্ত তার করা বই—একেবারে চাণক্যের ভূমিকা। ডাক্তার সেদিন থেকেই উসখুস করছে। শেষ পর্যন্ত সে মুরুব্বি পাকড়েছে শিরোমণি ঠাকুরকে। শিরোমণি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও গররাজি নন—বিশেষ সেদিন ডাক্তার নিজে থেকেই ওঁকে ডেকে একটা বাতের মালিশ দিয়েছে—দামের কথা উল্লেখ করেনি। কিন্তু তিনি ইতস্তত করছিলেন অন্য কারণে—তাঁর মন পড়ে আছে দিনুরীটার ব্যাপারে। নায়েব হরিহর গাঙ্গুলিকে এড়িয়ে চলছেন তিনি। টাকাটার যে কী করবেন কোনও কুলকিনারা করতে পারছেন না।

কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শিরোমণি—দিনুরী—গাঙ্গুলির সম্পর্কটা পরিষ্কার বোঝা যাবে না—যদি না আমরা প্রাচীনকাল থেকে এ ব্যবস্থার কথাটা বুঝে নিই।

রসিকলাল শিরোমণির প্রপিতামহকে সেবায়েত করার সময় একটা পাকা ব্যবস্থা করে যান তদানীন্তন চৌধুরী-জমিদার মহীপতি চৌধুরী। চাটুজ্জে পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে সেবায়েত থাকবেন দেবীর। দেবসম্পত্তি রক্ষা করা, আদায়পত্র করার অধিকার থাকলে সেবায়েতের—বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতা রইল না। হাটতলা থেকে হাট-তোলা আদায় করা হয়, দোকান থেকে দিনুরী সংগ্রহ করা হয় একটা বন্ধ

কাঠের বাক্সে। মহালয়ার দিন আর পয়লা চৈত্র—বছরে এই দুদিন চণ্ডীমণ্ডপে সর্বসমক্ষে সে তালা খোলা হয়। বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত সঞ্চিত অর্থের এক আনা অংশ সেবায়েতের প্রাপ্য, দশ-আনা অংশ মন্দিরের নিত্য পূজায় ব্যয়িত হয়, আর বাকি পাঁচ আনা খরচ করা হয় শারদীয় দুর্গোৎসবে। মূর্তি গড়িয়ে পূজা হয়—বারোয়ারী হাটতলায় নয় কিন্তু—জমিদারের পূজামণ্ডপে। তেমনি আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত যা সঞ্চয় তাও ভাগ করা হয় একইভাবে। এবার পাঁচ আনা অংশ খরচ হয় 'মচ্ছোবে'। ব্যবস্থাটা পাকা। মহালয়ার দিন সর্বসমক্ষে তালা ভেঙে মায়ের দিনুরীর টাকা-সিকি-দোয়ানি-পয়সা গুনে গুনে তোলা হয় মায়ের সিন্দুকে। শারদোৎসবের টাকাটা জমিদার সরকারে জমা দিয়ে পাকা রসিদ নেন সেবায়েত।

কিন্তু এই পাকা ব্যবস্থাটাই পালটাতে হল কাল যুদ্ধের আমলে। রেজগি, অর্থাৎ খুচরা পয়সার হঠাৎ আকাল পড়ল। অথচ দৈনিক অর্থ সংগ্রহ না করলে দোকানিরা আপত্তি জানায়। সাতদিনের বকেয়া টাকা তারা একদিনে মেটাতে পারে না। ফলে সংগ্রহের কৌটাটা সিন্দুকে উঠল। জটিল পদ্ধতিতে শিরোমণি সংগ্রহ করতে থাকেন মায়ের দিনুরী। সংগৃহীত অর্থের সবটাই যে প্রাপ্তিমাত্র সিন্দুকে উঠত একথা হলপ করে বলতে পারেন না। দিনের শেষে তিনি দেখেন তাঁর হাতে একখানা পাঁচটাকার নোট—তার তিনটাকা পৌনে তের আনা প্রাপ্য মায়ের, আর বাকি একটাকা ন' পয়সার দাবিদার সাত- আটজন দোকানি। নিরুপায় শিরোমণি নোটখানা কোথায় রাখবেন স্থির করতে পারেন না। ফলে আদায়ী টাকা-সিকি-দোয়ানি কখনও থাকত তাঁর ট্যাঁকে, কখনও ফতুয়ার পকেটে, কখনও তাঁর কর্ণকুহরে। বৎসরান্তে যা হোক করে হিসাবটা মিলিয়ে দেন। ক'বছর এ ভাবেই চলেছে। এ বৎসর শিরোমণি কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। খরচ যে কখন কোন সিন্দুক থেকে করতে হল তার হিসাব তো দূরের কথা হদিসই পাননি। বর্তমানে হিসাব করতে বসে দেখেছেন মায়ের তহবিলে সাতশ' বারোটাকা পাঁচ আনার ঘাটতি। শিরোমণির বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করলে অবশ্য একটা সুরাহা হয়—কিন্তু তাহলে বেচারিকে পথে এসে বাস করতে হয় ব্রাহ্মণীর হাত ধরে। তিনি তাই কোনদিকেই কোন আলোকের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে, স্বয়ং ব্রাহ্মণীকে পর্যন্ত কথাটা বলা যায়নি। এখন উপায়ান্তরবিহীন হয়ে শেষ পর্যন্ত উনি রায়মশায়ের শরণাপন্ন হলেন।

* * *

সন্ধ্যার পূর্বেই শিরোমণি এসেছেন রায়মশায়ের দরবারে। ওঁর বৈঠকখানাটা আবার খালি পাওয়া যায় না সহজে। কেউ না কেউ থাকেই। বিশেষত বছরের এই সময়টা। তার কারণও আছে।

চাষীপ্রধান গ্রাম। কৃষিকার্যে রায়মশায়ের যে অবদান এই সময় তার ফলশ্রুতি ঘটে। মাথায় টোকা, খালি-গায়ে চাষীরা এসে বসে থাকে রকের ধারে। নিম্নমুখে মেঝেতে আঁচড় কাটে। এরা চায় দাদন। প্রথম বর্ষণের পর লাঙল দেবার সময় যে কৃষক প্রাণ খুলে গান গায় মাঠের মাঝখানে দিগন্ত কাঁপিয়ে—**পুষ্কর** মেঘকে আহ্বান করে ঘড়ঘড়ে গলায়—

'কালো বরণ ম্যাঘ রে, পানি নিয়া আয়
আমার পরাণ জুড়ায়ে দে—'

অথবা মহা হুল্লোড় করে ব্যাঙের বিয়া দেয়—'ব্যাঙ লো রানি, দে লো পানি, সোণার ঘুঙুর গইড়ে দেব পায়'—তাদেরই চেহারা শুকিয়ে আসতে থাকে ক্রমশ। দুবেলা আর উনান জ্বলতে চায় না ধান রোয়ার সময়। সারা বছরের সঞ্চিত ধানের পুঁজি ফুরিয়ে আসতে থাকে। তারপর যখন ধীরে ধীরে তিলে তিলে সবুজ ধানের চারাগুলির মাথায় দেখা দেয় ধানের অঙ্কুর—বাতাসের দোলায় ধানের শীষ এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে—তখন থেকেই একবেলা অর্ধাহার শুরু হয় ওদের। নিরন্ন-উদরে ওরা চোখ বুজে স্বপ্ন দেখে প্রতিটি ধানের ভিতর মা লক্ষ্মীর হাতের শাঁখার মতো সাদা আঠালো রস জমাট বেঁধে উঠছে। সবুজ স্বপ্ন সোনালী দৃষ্টি মেলে চায়। দিন যায়, ডাক পড়ে ধান কাটার। পুঁজি ততদিন একেবারে ফুরিয়েছে। তখনই চাষীর প্রয়োজন হয় নগদ টাকার। হাওয়ায় দুলে দুলে মাঠে মা অধীর আগ্রহে ডাকছেন সন্তানকে—কেটে কেটে ভারে ভারে তুলে আনতে হবে এবার। ওরা কান পেতে সে ডাক শুনতে পায়, মায়ের সে আহ্বান,—দুগ্ধপুষ্ট নিটোল স্তনভারের ব্যথায় যেমন আবেশভরে ডাকতে থাকে বিয়ান-গাই তার বাছুরকে—তেমনি করেই ডাকে ধানে-ভরা মাঠ, চাষীভাইদের। নিরুপায় কৃষক এসে মাথা নিচু করে বসে থাকে রায়মশায়ের বৈঠকখানার সামনে। চড়া সুদে দাদন নেয় কাঁচা টাকা। অথবা চড়া দাদনে ধান। ধান দাদনটাই চলে বেশি। পক্ষকালের মধ্যে যার গোলায় ভারে ভারে ধান উঠবে ভরে তাকেই হাত পেতে নিতে হয় নির্মম শর্তে এই আগাম দাদন। পক্ষকাল পরে মণ-প্রতি সোয়ামণ থেকে দেড়মণ প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

শিরোমণি রায়মশায়ের দরবারে এসে দেখলেন তেমনি কয়েকটি হতভাগা বসে আছে তখনও। গোবর্ধন-যগন্দ-রাখহরি-নেতাই-মাধো।

সামনের লোকটাকে লক্ষ্য করে রায়মশাই বলেন—গোবর্ধন, তুই শুনলাম খালেক-সাহেবের কাছে গেছিলি? তা কী হল? দরে বনল না?

গোবর্ধন দুই হাত দুই কানে ছুঁইয়ে বলে—হেই বাপ, আপনি রইলেন ঘরের কাছে তল্লাটের বাপমা হয়ি, আর আমি যাব হেই খ'ড়ে পাড়ের মোল্লাহাটি, খালেক ছাহেবের দরবারে? কোন শত্তুর কয় এ কথা?

রায়মশাই হাসেন। তৃপ্তির হাসি। বলেন—তা ভালো, এখন ওঠ তোরা। রসিকভায়ার সঙ্গে জরুরী কাজ আছে আমার। যা পালা সব।

পিছন থেকে একটা গুঞ্জন ওঠে। আজই কিছু নিয়ে না গেলে অনেকের বাড়িতেই হাঁড়ি চড়বে না। একেবারে নিরুপায় হয়ে না পড়লে কেউ অজগরের বিবরে পা বাড়ায় না। গোবর্ধন সকলের মুখপাত্র হিসাবে বলে ওঠে—তাহলে আমাদের বিত্তান্ত...

—ওর নাম কি, কাল শুনব। ওঠ তোরা এখন।

—এক এক পালি ধান দিবার হুকুম দ্যান কর্তা তাইলে। কাল আসি সব [illegible] দে বাকি ধান নে যাব অনে।—যোগ দেয় যগন্দ।

—আজ আর হবে না। যা—

—কর্তা

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান রায়। ভ্রূকুটি করে বলেন—এর পর থেকে খালেক-ছাহেবের কাছেই যাস তোরা।

—কী অপরাধ করলাম কর্তা?

—হারামজাদা বেটারা! হিঁদুর ছেলে নস্ তোরা? সন্ধ্যা হয়ে গেছে! শাঁখ বাজছে ভর-সন্ধ্যার, এরপর ধান দেয় কোন গেরস্ত? তোরা না হয় লক্ষ্মীছাড়া, আমি তো তা বলে....

সত্য কথা! লক্ষ্মীমন্ত রায়মশাই এতবড় অনাচার সহ্য করেন কী করে? লোকগুলো আর কথা বলে না। মাথা নিচু করে একে একে উঠে যায়। লক্ষ্মীমন্ত রায়মশায়ের দোহাই দিয়ে আর একটা রাত না হয় উপবাসেই কাটবে।

শিরোমণিকে ব্রাহ্মণের কড়ি-বাঁধা হুঁকায় তামাক দিয়ে যায় চাকরে। রায়মশায়ের গড়গড়ার কলকেটাও পালটে দিয়ে যায়। দু একটা সুখটান দিয়ে রায়মশাই অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে শিরোমণির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন—ভায়ার ব্যাপারখানা কী?

শিরোমণি এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন—তোমার সঙ্গে একটা গোপন পরামর্শ ছিল ভাই!

চতুর নন্দদুলালের ওষ্ঠাধরে ফুটে ওঠে এক চিলতে হাসি। গড়গড়ার সটকাটা দিয়ে নির্দেশ করেন ভৃত্যকে। চলে যায় সে। আমতা আমতা করে শিরোমণি পেশ করেন তাঁর বক্তব্য—দেখ ভায়া, কথাটা তোমাকে এতদিন বলিনি; ইয়ে হয়েছে, মানে কালীর বিয়েতে আমার কিছু ধার হয়ে গেছে ভাই। আমার কিছু টাকার প্রয়োজন। তোমাকে কিছু ধার দিতে হবে। সুদ আমি দেব, তবে একটু বিবেচনা কর। ব্রাহ্মণকে এ উপকারটুকু তোমাকে করতেই হবে ভাই।

রায় নির্বিকারভাবে আলবোলায় টান দিতে দিতে বলেন—একজনের ঋণ শোধ করতে আর একজনের কাছে তুমি ঋণ করতে চাইছ? ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝলাম না শিরোমণি—

—মানে....ইয়ে হয়েছে....লোকটা বড় তাগাদা দিচ্ছে ভাই। তোমার কাছে....মানে....আমার তো কোন সঙ্কোচ নেই—

—তা নেই। বুঝলাম, কিন্তু কত টাকা?

—ধর হাজার খানেক। -কিছু হাতে রেখেই বলেন শিরোমণি। নন্দদুলাল যদি কিছু কমিয়ে দেন তাহলেও যেন তাঁর দায় উদ্ধার হয়।

—এক হাজার? তা কী বাঁধা রাখছ?

—বাঁধা? মানে বন্ধকী-তমসুক?....মানে, আমার আর কী আছে বল ভাই, ভদ্রাসন ছাড়া?

—আছে বই কি। জীতু মণ্ডলের দরুন চাঁপাডাঙার মাঠের দক্ষিণ ধারে বিঘে আষ্টেক ব্রহ্মোত্তর আছে তোমার।

শিরোমণির মনে হল একঘটি জল পেলে খেতেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ না হয়ে গিয়ে থাকলে এরপর একটু পানীয় জলই চেয়ে বসতেন হয়তো।

রায়মশাই একইভাবে পুনরায় বলেন—আগে যেখানে কর্জ করেছিলে সেখানে কী হারে সুদ দিতে? কী বাঁধা রেখেছিলে?

বিচলিত হলেন শিরোমণি—অ্যাঁ? না, সেখানে কিছু লাগেনি।

—লেগেছে বই কি! বংশানুক্রমিক সুনাম মর্যাদাটা বন্ধকী পড়েনি সেটাতে? রাত্রের নিদ্রায় সুদ যোগাতে হচ্ছে না?

শিরোমণি রীতিমতো ঘাবড়ে যান। প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলেন—বেশ ঐ জমিই বাঁধা রাখব আমি।

—কিন্তু ভাই বন্ধকী কারবার তো আমি করব না। বিক্রি-কোবালা করে দিতে হবে।

—বিক্রি! তুমি বলছ কি রায়! হাজার টাকায় সোনা ফলানো ঐ আট বিঘে জমি বেচে দেব আমি?

—মহাজনী-আইন তো তোমার অজানা নেই ভায়া। ও হারে টাকা খাটাতে পারব না আমি! সুতরাং একমাত্র উপায় বিক্রি-কোবালা। তামাম মুলুকে এই ব্যবস্থা চলছে। এক বছরের মধ্যে সুদ সমেত টাকা ফেরত দিলে জমি ফেরত পাবে—না দিলে জমি আমার হবে।

শিরোমণির বুঝতে আর বাকি থাকে না কিছু। তাঁর অসহায়ত্বের সুযোগে সোনা-ফলানো জমিটা হস্তগত করতে চান চতুর নন্দদুলাল। একটা ঢোক গিলে তবু শেষ চেষ্টা করেন—তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ভাই; কিন্তু বিষয়সম্পত্তির কথা, সব সম্ভাবনাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এক বছরের মধ্যে ভালোমন্দ যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার ওয়ারিস তোমার ওয়ারিসের কাছে জমিটা ফেরত পাবে কী করে?

—তোমার ওয়ারিসের প্রশ্ন ওঠে না—তবে আমি মারা গেলে আমার ছেলেকে বলে যাব। আমার কথাতেই বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে।

হাঁ হাঁ করে বাধা দেন রসিকলাল—কী যে বলে বস রায়! এই ভর সন্ধ্যাবেলায় ও কথা বলতে আছে? বিশ্বাস তোমাকে করি বইকি!

—না, কর না,—কড়া জবাব রায়মশায়ের,—করলে সত্যিকথাটা স্বীকার করতে তুমি। গোপন করতে না আমার কাছে।

—কী স্বীকার করতাম? কী গোপন করছি আমি?—আমতা আমতা করেন রসিকলাল।

—কিছু না। তাহলে তুমি রাজি?

একটু নীরব থাকেন শিরোমণি। তারপর বলেন—রাজি হলে কবে টাকাটা পাব?

—আজ থেকে একমাস পরে।

—না, তা হবে না, টাকাটা আমার তাড়াতাড়ি দরকার।

—কবের মধ্যে?

—এই ধর....

—পিতৃপক্ষের শেষদিনের আগেই? কেমন?

—অ্যাঁ? শিরোমণি হতচকিত হয়ে যান।

রায়মশায়ের চোখ দুটি ছোট হয়ে আসে। নিম্নস্বরে বলেন—রসিকভায়া, মেয়ের বিয়েতে তুমি গাঁয়ের বুকের উপর বসে হাজার টাকা ধার করলে অথচ কমলপুরের নন্দদুলাল রায় জানতে পারল না। সুদ তোমায় দিতে হয় না—ব্রহ্মোত্তর বাঁধা পড়ল না তোমার—অথচ হাজার টাকা কর্জ করলে তুমি,—কেমন? আর সেই টাকা শোধ করতে তুমি আট বিঘে জমি বিক্রি-কোবালা করছ? টাকা তোমার চাই—এবং মহালয়ার পূর্বেই! ঘাসের বীজই যদি খাব চাটুজ্জে, তবে কমলপুরের নন্দদুলাল হব কীকরে?....ছি ছি ছি! শেষ পর্যন্ত মায়ের তহবিলে হাত দিয়েছ তুমি?

মাথাটা আর তুলতে পারেন না শিরোমণি। অবনত মস্তক বুকের সঙ্গে মিশে যায় যেন। হঠাৎ আবেগপূর্ণ স্বরে বলে ওঠেন—তুমি আমাকে বাঁচাও ভাই!—হাত দুটি চেপে ধরেন রায়ের।

—কত টাকা ঘাটতি পড়েছে?

—সাতশ বারোটাকা পাঁচ আনা!—অম্লানবদনে কবুল করেন এতক্ষণে। রায় চোখ দুটি বুঁজে মনে মনে কি হিসাব করেন। তারপর উঠে তাকের উপর থেকে খতিয়ান বইখানা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টান। বলেন, তোমার দাগ নম্বর তো সতের শ' একাত্তর থেকে পঁচাত্তর?

নীরবে ঘাড় নেড়ে দেন শিরোমণি।

—ঠিক আছে। তুমি শুধু একাত্তর আর বাহাত্তর দাগ দুটো বিক্রি করে দাও। দুটো মিলিয়ে পাঁচ বিঘে স'তিন কাঠা। আমি নগদ আটশ টাকাই দিচ্ছি। সুদের হার একেবারে না হয় কমিয়ে দিচ্ছি। টাকায়-আনা।

শিরোমণি অসহায়ভাবে তাকান রায়ের দিকে—পাঁচ বিঘে বেচলে যে বিঘে প্রতি চারশ টাকা দর পেতাম আমি।

—তা হয়তো পেতে, কিন্তু তাহলেও তোমাকে মহালয়ার আগে খদ্দের ঠিক করে বেচতে হত—আর সবচেয়ে বড় কথা এতবড় খবরটা গাঁয়ে গোপন রাখতে হত। মহালয়ের পূর্বেই এ ভাবে যদি তোমাকে জমি বিক্রি করতে দেখে লোকে তাহলে গ্রামসমাজে রসিকলাল শিরোমণির অবস্থা কী দাঁড়াবে সেটা ভেবে দেখেছ?

—তাহলে তুমিই আমার দুবিঘে জমি কিনে নাও না ভাই। ধার আমি চাই না। পাকা দলিল করে বেচেই দেব আমি। ধর গিয়ে, একাত্তর নম্বর দাগটা গোটা নাও। এক বিঘে সতের কাঠা। চারশ' টাকা দরটা তো তুমিই স্বীকার করেছ?

—তা হয় না রসিক। দু বিঘে ছুট্‌কো জমি থাকলে চাষের মহা হাঙ্গামা। ও আমার পোষাবে না। তার চেয়ে এই ভালো। সুদটা না হয় আমি আরও কমিয়ে দিচ্ছি—তিন পয়সা।

—কিন্তু হাজার টাকার জন্যে পাঁচ বিঘের উপর জমি?

—হাজার নয় আটশ'। তোমাকে তো জানি ভায়া—ঐ রকম হলেই তোমার গরজ থাকবে জমিটা ফেরত নেবার। বল, টাকাটা কি আজ রাত্রেই নেবে?

—না, না,—শিউরে ওঠেন শিরোমণি। আমি বরং ভেবে দেখি।

—তাই দেখ।—সুতো না ছাড়লে মাছ উঠবে না বুঝেছেন রায়। তবু খেলিয়ে

নেন,—তবে শোন, আমি খবর পেয়েছি গাঙ্গুলি তোমায় সন্দেহ করছে। আজ-কালের মধ্যেই তোমার ডাক পড়বে কিন্তু। যা হয় ঠিক করে টাকাটার জোগাড় করে ফেল। তুমি আমার বন্ধুস্থানীয়। পাঁচজনের সামনে তুমি অপদস্থ হলে—আর অপদস্থ মানে কী? না মায়ের তহবিল তছরুপ। এদিকে হাতকড়া, মাজায় দড়ি—থানা, পুলিশ, কাঠগড়া—ওদিকে পঞ্চায়েতের বিচার, ধর্মে পতিত! নিজের অনন্ত নরকবাসের কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম। ছি ছি রসিক, তুমি কাণ্ডটা করেছ কী! আমাকেও কথাটা জানাওনি ঘুণাক্ষরে? যাক, এখন বাড়ি যাও। তাড়াহুড়া করাটা কিছু নয়। আজ রাতটা বেশ ভালো করে ভেবে দেখ। কাল সকালে এসে যা হয় জানিও আমাকে।

কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসেন শিরোমণি মশাই। এ কী করলেন তিনি! গাঙ্গুলির সন্দেহ যদি না-ও হয়ে থাকে—এখন হবে। রায়মশাই সে সন্দেহটার উদ্রেক করবেন। কী দরকার ছিল—সাত তাড়াতাড়ি রায়কে বলার? অস্ফুটে একটা মর্মান্তিক গালাগাল দেন তিনি রায়ের উদ্দেশে। ঠিকই বলে লোকে। রায় : অজগর সাপ। কোনক্রমে একটি প্যাঁচ যদি জড়িয়ে ফেলে তবে হাড়-মাস-মজ্জা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই। শিরোমণি সেই প্রথম প্যাঁচটি স্বহস্তে গলায় পরেছেন ফুলের মালার মতো।

বাড়ি এসে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণী এসে বলেন—ও কী? ভর সন্ধ্যেবেলা অমন করে শুলে যে? পূজা-আহ্নিকও তো হয়নি এখনও!

কাঁপতে কাঁপতে শিরোমণি বলেন—আজ সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি!

—তো, খাবেও তো কিছু?

প্রবল কাঁপুনি এসেছে ততক্ষণে রসিকলালের। চীৎকার করে ওঠেন—মেলা বকাট না দিকিন। লেপটা পেড়ে দাও!

—লেপ? আশ্বিন মাসে লেপ?

সে রাত্রে শিরোমণির প্রবল জ্বর এল! কাল ম্যালেরিয়া!

* * *

দিবাকর বসেছিল তার বাড়ির সামনেটায়। খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছে তার। উঠে এসে বসেছে একটা বেতের মোড়া নিয়ে বাইরের দাওয়ায়। আশ্বিনেই এবার একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একটা চাদর কি সুজনি গায়ে জড়াতে পারলে হত—কিন্তু উঠে গিয়ে নিয়ে আসতে আলস্য হচ্ছে। দুলাল তখনও ঘুমাচ্ছে। হাসি পেল দিবাকরের। বাড়িতে যদি দ্বিতীয় একটা প্রাণী থাকত। কেউ যদি এ সময়ে এসে বলত—অমন খালি গায়ে হিমের মধ্যে বসে আছ কেন? শেষে বচ্ছরকার দিনে ঠাণ্ডা লাগিয়ে আমাকেই ভোগাও! বলে ঝুপ করে একটা গায়ের চাদর ফেলে দিত কোলের উপরে? দিবাকর হেসে তার আঁচলটা ধরতে যায়—চট করে সরে যায় সে।

দোরের আড়াল থেকে চুরি করে দেখে তার বসবার ভঙ্গিটি। দিবাকর যেন স্পষ্ট দেখতে পায় মেয়েটিকে। চওড়া লালপাড় একটা আকাশি-রঙের শান্তিপুরে শাড়ি—হাতে দুগাছি মোটা মোটা বালা, কানে ঢেঁড়ি ঝুমকো, পায়ে আলতা, কপালে কাঁচপোকার টিপ!

চমকে ওঠে গোঁসাই! এ কী! এতো তার কল্পনার বধূ নয়! কাল যে ঠিক এই

বেশেই সে দেখেছে তাকে—আনন্দময়ীর মন্দির চাতালে! মনকে সংযত করে দিবাকর। অপরের বিবাহিতা বধূর কথা এ ভাবে মনে মনে চিন্তা করাও পাপ!

হঠাৎ নজরে পড়ে কে একজন জানলার ওপাশে সরে আসে।—কে?, হাঁক পাড়ে দিবাকর।

—আঁজ্ঞে আমি।

—আমি? আমি কে?

লোকটা এগিয়ে আসে। নামিয়ে রাখে একটা ঝুড়ি, খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা।

—ও তুমি। মালাকার। তারপর, এত সকালে কী মনে করে? ওখানে কী করছিলে?

—আজ্ঞে একবার এয়েলাম দ্যাবতার কাছে। তাই উঁকি মেরে দ্যাখতেছিলাম দ্যাবতা গাত্র উৎপাটন করিছেন কি না।

এটা শ্রীনাথ মালাকারের একটা বৈশিষ্ট্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় সে কিঞ্চিৎ সংস্কৃতবহুল শব্দ ব্যবহার করে। সে শিল্পী, কলারসিক মানুষ, কথাবার্তায় তাকে একটু মার্জিত হতে হবে বইকি। শুধু কথাবার্তাতেই নয়, সব দিক দিয়েই মালাকার তার শিল্পীসুলভ বৈশিষ্ট্যটুকু সযত্নে রক্ষা করে চলে। তার বেশবাসও বেশ পরিচ্ছন্ন। ফর্সা একখানা খাটো ধুতি, গায়ে একটা শেলাইকরা, কিন্তু সাফা হাফ-হাতা শার্ট। কাঁধে পরিষ্কার একটা লাল গামছা। ভিন্ গাঁয়ের লোক সে। কমলপুরে তার বাস নয়—সে থাকে রায়নায়। অথচ যখনই শ্রীনাথ মালাকারকে দেখা গেছে কমলপুরে তখনই এমন ফিটফাট বেশ তার। যদিও লোকটার আকৃতি একটা পোড়া কাঠের মতো। লম্বায় চারহাতেরও বেশি। গাত্রবর্ণ যেন বার্নিশ করা আবলুশ কাঠ। নাকটা খাঁড়ার মতো উদ্ধতভঙ্গি। প্রতিমা সাজাবার সময় মুকুটের তলায় মায়ের কোঁকড়ান চুল কম দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করলে ভালুকের মতো সাদা একসারি দাঁত বার করে শ্রীনাথ হাসে, বলে—ভয় কি দ্যাবতা, যাবার পূর্বে মায়ের কপালে একটুকু হাত বুলায়ে যাব, সারা ললাটটি আবার গাত্তবন্যের অনুপান হবে।

দিবাকর হেসে বললে—গাত্র উৎপাটন আমি প্রত্যুষেই করে থাকি মালাকার, কিন্তু দৈবাৎ কোনও প্রভাতে উঠতে যদি বিলম্বই হয়ে যায়, আর তুমি গবাক্ষপথে তোমার ঐ কন্দর্পকান্তি মূর্তি নিয়ে অমন উঁকিঝুঁকি মার, তাহলে বিভীষিকায় গাত্রের পরিবর্তে আমার হৃদপিণ্ডই উৎপাটিত হয়ে যেতে পারে কিন্তু।

মালাকার রসিকতাটার মর্মোদ্ধার করতে পারে না, তবু লজ্জিত হয়ে বলে—আপনার ঘরে উঁকি দেওয়ায় আর দোষ কি দ্যাবতা, আপনার ঘরে তো আর স্ত্রীধন নাই?

—আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে; তোকে আর পণ্ডিতেমি করতে হবে না। কী ব্যাপার বল?

মালাকার এতক্ষণে স্পষ্টই লজ্জিত হয়। তারপর বলে নিজের দুঃখের কথা। আজ একমাস ধরে ওরা স্বামীস্ত্রীতে মিলে সোলা কেটে, সল্‌মা-চুমকি, মোমভিরাজ দিয়ে কল্কা বানিয়েছে। মহাজনের দোকানে গতবারের দরুন এগারো, এবারের উনিশ—একুনে ত্রিশটাকা ধার হয়েছে তার। আশা ছিল কল্কাগুলো পৌঁছে দিয়ে কিছু বায়না নিয়ে যাবে

সে—প্রতিবারের মতো। মালাকার থাকে রায়নায়, চাঁপাডাঙার মাঠ পেরিয়ে ফকিরডাঙার মাঠ—তারও ওপরে যে গাছের সারি দেখা যায় ওটাই রায়না গ্রাম। কমলপুর থেকে প্রায় আধবেলার পথ। কাল বিকালে কল্কার ঝুড়িটা মাথায় চাপিয়ে এসেছে এ গাঁয়ে। আজ কমলপুরে হাটবার। ইচ্ছা ছিল বায়নার টাকায় আজ সকালে হাট সেরে, আলের পথে এঁকেবেঁকে জলখাবার বেলায় গিয়ে পৌঁছাবে নিজ গ্রামে। তাছাড়া কল্কাগুলো পৌঁছে দিয়ে যেতে পারলে সে নিশ্চিন্ত। মালাকারের অবশ্য ছেলেপিলে নেই। একটি মাত্র মেয়ে ছিল। সে মারা যাবার পর ঘর তার শূন্য। কিন্তু তাই বলে মালাকারের ঘরে শিশুর দৌরাত্ম্য বড় কম নয়। নিঃসন্তানা মালাকার-গিন্নির মাতৃহৃদয় গাঁয়ের সবকয়টি শিশুর জন্য অবারিতদ্বার। এমনিতেই মালাকারের কাজের প্রতি শিশুমনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। রাঙতা, চুমকি, ছুট্কো সোলা অথবা কোনাভাঙা একটা বাতিল করা কল্কার প্রতি তীব্র আকর্ষণ আছে শিশুদের। এমনিতেই ওরা ভিড় করে আসে যখন-তখন। তার উপর মালাকার-গিন্নি মাঝে মাঝে শিশু দর্শকদের বিতরণ করে কখনও গুড়-মুড়ি, কখনও মোয়া অথবা নারকেলের মালা। ফলে এই বালখিল্য বাহিনীর কাছ থেকে ভঙ্গুর জিনিসগুলো রক্ষা করাই এক দায়। শ্রীনাথ তাই প্রতি বৎসরই এগুলো কমলপুরে নিয়ে এসে জমা করে দিয়ে যায় কুমোর ভায়া অথবা নায়েববাবুর জিম্মায়। নিজে এসে বসে চতুর্থীর রাত্রে প্রতিমা সাজাতে। সঙ্গে একটা ছোট টিনের স্যুটকেশ। নীল রঙ, মাঝখানে একটা লাল গোলাপ—ওর ভিতর থাকে তার জামা-কাপড়, হাত-আয়না, চিরুনি, মায় রুমাল, একশিশি ফুলের তেল। সৌখীন লোক শ্রীনাথ মালাকার। প্রতিবছর প্রতিমা সাজাতে আসবার সময় সে তার এই স্যুটকেশটি সঙ্গে আনে। চতুর্থী থেকে শুরু করে মহাষষ্ঠীর সকাল পর্যন্ত অক্লান্তভাবে প্রতিমা সাজায় সে। তখন ডাকলে তার সাড়া পাওয়া যায় না। তন্ময় হয়ে যায় সে শিল্পকর্মে। মায়ের শ্রীঅঙ্গে একটি একটি করে অলঙ্কার বসায়, হাতের পাঁচ আঙুলে বসায় রতনচূড়, মণিবন্ধে কঙ্কণ, বাজুতে কেয়ূর, সিঁথিতে সিঁথি বা ঝাপ্টা, গলায় দুলিয়ে দেয় শতনরী কণ্ঠহার, কানে পরায় বিঘৎ-প্রমাণ কান, মাথায় দেয় মুকুট। একটি একটি করে গহনা পরায় আর দূরে গিয়ে দেখে, সামনে থেকে, ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে। কখনও গহনা একটু সরিয়ে নড়িয়ে দেয়। কখনও একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মায়ের মূর্তির দিকে অপলক নেত্রে। রামকিষণ কাহার হয়তো মুনিষ দিয়ে চন্দ্রাতপটা টাঙাতে টাঙাতে লক্ষ্য করে মালাকারের ভাবাবিষ্ট মূর্তিটি। রহস্য করে ডাকে—এ মালাকার; ক্যা দেখ্তা হ্যয় রে? মাঈকা সুরৎ ঐসিন মৎ দেখ্তে রহো,—আ যাও ইধার। আয়, তামুক খেয়ে লে!

হয়তো শুনতেই পায় না শ্রীনাথ। পেলে চমকে ওঠে, কোঁচার খুঁটে একদৃষ্টে চেয়ে-থাকা করকরে চোখদুটো মুছে নিয়ে বলে—দূর মেড়ো ভূত, ঠাকুর সাজাতি সাজাতি কি তামুক খায়? পরে হবে রে বিটা, পরে হবে।

রামকিষণ কিন্তু নাছোড়বান্দা—আরে আ যাও পাগলা, দুটো টান দিয়ে যা—মন খোল্সা হোবে। এলেম খুলবে আরও।

হয়তো উপেক্ষা করতে পারে না আর। বারবার তামাকের কথায় নেশাটাও হয়তো

চেগে ওঠে। পূজা দালান থেকে নেমে আসে। নকশা-কাটা পঙ্খের কাজকরা খিলানটাতে ঠেসান দিয়ে টিকে তামাক ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে নেয়। তারপর এঁটো হাত ধুয়ে আবার গিয়ে বসে মায়ের অঙ্গ সাজাতে।

শ্রীনাথের এটা পৈত্রিক বৃত্তি। উত্তরাধিকার সূত্রে সে পেয়েছে এ কাজের অধিকার। শ্রীনাথের বাপ ছিল নামকরা কারিগর। করিমপুরে, চাপড়ায় এমনকি কৃষ্ণনগরের বালকেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মূর্তি পর্যন্ত সাজাবার বায়না পেয়েছে সে। শ্রীনাথ অতি শৈশব থেকেই শিখেছে এ বিদ্যা। মনে আছে ছেলেবেলায় বাপের হাত ধরে এ গ্রামে আসত ঠাকুর-সাজাতে। বাপের হাতে হাতে জোগান দিত। পাটকাঠি জ্বালিয়ে তিন ইঁটের উনানে ময়দার আঠা তৈয়ারী করত মাটির পাতিলে। বাপের হুকুমে টিকে-তামাক ধরিয়ে ডাকত তাকে। মনে আছে একবার জ্বলন্ত হুঁকাটি হাতে নিয়ে সে ঠাকুরদালানে উঠে গিয়ে বাপকে বলেছিল—লাও ধর।

শ্রীনাথের বাপ একমনে তখন মায়ের মাথার সিঁথিতে অলঙ্কার পরাচ্ছিল। কথাটা তার কানে যায়নি। ছিনাথ একটু উচ্চস্বরেই ডেকেছিল বাপকে। হঠাৎ তন্ময়তা ছুটে যায় ওর বাপের, ঘুরে দেখেই ছিনাথের গালে মারে এক চড়! হাত থেকে জ্বলন্ত কল্‌কেটা ছিটকে পড়ে।

—হতভাগা, আবাগির বিটা! পুজো-দালানে হুঁকো নিয়ে আসিচ তুমি হারামজাদা! এই শিক্ষে হতিছে দিনে দিনে।

শ্রীনাথ বাপের কাছ থেকেই শিক্ষা পেয়েছে জাতবিদ্যায়। পূজামণ্ডপ থেকে নেমে এসে সে হুঁকায় টান দেয়। তারপর হাতমুখ ধুয়ে আবার কাজে বসে।

শুধু এইটুকুই নয়—অশুদ্ধ কাপড়ে অশুচি দেহে সে কখনও প্রতিমার অঙ্গস্পর্শ করতো না। মায়ের 'পান-পিতিষ্ঠে' হয়নি—তা ঠিক; তবে ঐ অঙ্গেই তো মায়ের আগমন ঘটবে দুদিন বাদে। ঐ ঠাকুর প্রতিমাকেই তো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাবে সবাই—মায় পঞ্চগ্রামের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থ পর্যন্ত। অশুচি অবস্থায় কি ঐ অঙ্গ স্পর্শ করতে আছে? তা ছাড়া মা সরস্বতী, যিনি বংশানুক্রমে ওদের ঐ শিল্প-অধিকার দিয়েছেন তিনিও রুষ্ট হন এসব অনাচারে। এসব শিক্ষা তার বাপের কাছে পাওয়া। আজ ত্রিশবছর ধরে এমনি নিষ্ঠাভরেই সে কমলপুরের দুর্গাপ্রতিমা সাজিয়ে আসছে। গতকালও তার কল্কার ঝুড়িটি মাথায় নিয়ে সে এসেছিল অভ্যাসমতো—পড়ন্ত বেলায়।

এ গ্রামে পা-দিতেই শোনে অদ্ভুত কথাটা। বিশ্বাস হয় না। বাবুরা নাকি 'ডাকের সাজ' করবে! ডাকের সাজ ? সে সব তো সে করে না; তবে হয়তো চেষ্টা করে দেখতে পারত—কিন্তু কই সে রকম কোনও নির্দেশ তো সে পায়নি? মালাকার সোজা গিয়ে হাজির হল নায়েব গাঙ্গুলি-মশায়ের দরবারে। অনেক অনুরোধ-উপরোধ—শেষে সে পায়ে ধরেছে নায়েবের—তবু তিনি অটল। ডাকের সাজই হবে।

শ্রীনাথ বলে—তাই যুদি মনে ছিল তো আগে আমারে বলেন নাই কেনে? অ্যাদ্দেরীতে আমি ডাকের-সাজ গড়ি কেমন কর্‌্যা?

গাঙ্গুলি বলেছিলেন সে চিন্তা নাকি ওকে করতে হবে না। কৃষ্ণনগর থেকে কারিগর

আনতে গেছে জমিদারের লোক। স্তব্ধ হয়ে যায় শ্রীনাথ মালাকার।

দিবাকর প্রশ্ন করে—তুমি বললে না কেন যে তোমার কল্কা গড়া হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে বলিছিলাম দেবতা—বার বার করি বলিছিলাম। তা তিনি বললেন, বায়না না নিয়া কাজে হাত দিলি কেনে? আগে তেনাদের প্রত্যাশ্ করি নাই কেনে?

—সে কথা ঠিক। তুমি বায়না না নিয়েই কাজে হাত দিলে কেন শ্রীনাথ?

শ্রীনাথ বসেছিল, উঠে দাঁড়ালো এ কথায়। অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে দিবাকরের দিকে, তারপর উত্তেজিত কাঁপা গলায় বলে—আপনিও হেই কথাডা বললেন, দ্যাবতা? আমি শুধিয়ে মায়ের কাজে হাত দুব? আমি, ছিনাথ মালাকার? কমলপুরের পুজোয়? আমি তো ছার, আমার বাপ কোনদিন শুধিয়েছিল? আমার ঠাকুদ্দা কোনদিন প্রত্যাশ্ করতে আসছিল কাজে হাত দিবার পূর্বে? এ যে মোদের সাত-পুরুষের কাজ গো? আমি শুধিয়ে কাজে হাত দুব?

দিবাকর বুঝতে পারে ওর অভিমানের কথাটা, হাত ধরে বসায় তাকে; বলে—কিন্তু দিনকাল বদলে যাচ্ছে মালাকার। ওদের জিজ্ঞাসা না করে কাজে হাত দেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে। লোকসানটা তো তোমার কম হবে না।

—চুলোয় যাক লুকসান! আমি লাভ-লুকসান খতাতে দ্যাবতার দুয়োরে আসি নাই। আমি জানতে আস্ছি আমার হকের কথা!

—কিন্তু ওরা না দিলে তুমি ওদের ঠাকুর সাজাবে কী করে?

—ওদের ঠাকুর! কমলপুরের ঠাকুর সাজাবার হক নেই তাইলে আমার?

দিবাকর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে—পুজো কমলপুরের নয় শ্রীনাথ—পূজা জমিদারের।

—তবে চুলোয় যাক্ আমার কল্কা!—ঝরঝর করে ঢেলে ফেলে ঝুড়ি থেকে নকশাকাটা শোলার কল্কাগুলো। হাঁ হাঁ করে বাধা দেয় দিবাকর। চেপে ধরে ওর হাত;—কী করছ মালাকার পাগলের মতো? পুজার বাজারে এতগুলো টাকার জিনিস! চৌধুরীবাবুরা না নেয়—তুমি শহরে যাও। কেষ্টনগরে যাও। বিস্তর পূজা হবে সেখানে। কেউ না কেউ নেবেই।

—না! সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় পোড়াকাঠের মতো দীর্ঘ মানুষটি ;—শহরের মা আমার মাথায় থাকুন ! আমরা মাগ্পুরুষে এগুলান্ গড়িছিলাম্ আমাদের কম্লিপুরের মায়ের লেগে।

টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ে কৃশ শ্রীনাথের গাল বেয়ে। ধরা গলায় বলে—আপনারা কী বুঝবেন দ্যাবতা, মোদের দুশ্কু! আপনারা লেখাপড়া জানা-মানুষ—আপনাদের দুগ্গা মা, জগজ্জননী। আপনারা সংস্কৃত মন্তরপড়্যা মায়ের পূজা করেন। মোরা ছোটনোক, মোদের কাছে দুগ্গা মা লয়, বিটি ! কম্লিপুরের মা জননী মোর তিন-পুরুষের বিটি! মেয়ের নাম রাখছিলাম—দুগ্গা। আটকে রাখতে পারি নাই সেই মায়েরে। ছেলে হতি গিয়ে দুগ্গা মা আমার এ গাঁয়েই শ্বশুরঘরে মরে যায়। বউরে বলি—দুগ্গা মোদের মরে নাই রে, ঐ কম্লিপুরের মায়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। পূজার সময় দুগ্গা শ্বশুরঘর থিকা বাড়ি আসতো; হাতে হাতে সাজ গড়তো। কী

এলেম ছিল তার হাতের! আজ সে নাই, কিন্তুক্ বউ আজও আমার সাথে রাত জাগ্যা কম্‌লিপুরের দুগ্‌গার লেগে গয়না গড়ে। রেড়ির তেলের পিদিম জ্ব্যাল্যে মোরা মাগ-পুরুষে চোখের জলে গয়না গড়ি। সে তোমার চৌধুরী-বাড়ির ঠাকুরের লয়, সে আমার দুগ্গা মায়ের লেগে। সে গয়না যদি মোর দুগ্‌গা মায়ের গায়েই না উঠে তবে চুল্যোয় যাক!

হাতের আস্তিন দিয়ে চোখের জলটা মুছে ফেলে। দিবাকরের চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল। ওর পিঠে একখানা হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়—কেঁদো না মালাকার! মেয়ে কি চিরদিন আপনার থাকে? তোমার নিজের মেয়েকেও তো একদিন পরের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল। যখন-তখন কি তাকে নিজের ঘরে আনতে পারতে? সেই বেই-মশায়ের অনুগ্রহের উপরেই তো নির্ভর করতে হত? মেয়ে হওয়ার বড় জ্বালা শ্রীনাথ! ক'টা সখই বা মেটে মেয়ের বাপের?

এ কথায় শ্রীনাথের কান্না থামে না, বরং বেড়েই যায়। বলে—জানি দ্যাবতা, জানি। শ্বশুরঘরে আস্যে মায়ের আমার কী খোয়ার! কী? না তাদের মনের মতো গয়না দিতি পারি নাই! অরে আবাগির বেটা, মনের মত গয়না দ্যাবার ক্ষ্যাম্‌তা থাকলি কি তোদের বলার অপেক্ষায় থাকি রে? গয়নার ভালোমন্দ তোরা কী বুঝিস? আমরা তিন পুরুষে গয়না গড়ি! মেয়েরে গয়না দিতি পারি নাই, সেই দুশ্‌কেই মায়ের গয়না গড়ি দুজনে মিল্যা রাত ভোর! কল্কা বানাই মাগ্‌পুরুষে মিলি! তারপর সপ্তমীপূজার সন্‌জেবেলায় ঠাকুরমশাই যখন ঘিয়ের পঞ্চপিদিমটি মায়ের মুখের কাছে দুলাতে থাকেন—এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি দ্যাবতা—আমি স্পষ্ট দেখতি পাই মায়ের মুখে আমার মেয়ের মুখের আদল! বেটির মুখে তখন হাসি ফুটফুট করে! গয়নাগুলান ঝলমল করতি থাকে। বউরে নিয়ে যাই আরতিতলায়, বলি—দ্যাখ আবাগি, বেটি কেমন হাসতেছে দ্যাখসে!

দিবাকর অনুভব করতে পারে মালাকারের মর্মযাতনা। নিজের মেয়ে আজ ওর মিশে গেছে কমলপুরের মৃন্ময়ীর সঙ্গে। অশিক্ষিত মালাকার আর মালাকার-গিন্নির কুসংস্কার বলে এ সত্যটা সে উড়িয়ে দিতে পারে না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে—যাক। ওগুলো তুমি কুড়িয়ে নাও শ্রীনাথ। কিছু অবশ্য নষ্ট হয়ে গেছে। কম টাকার জিনিস তো নয়—এই পূজার সময় টাকারও তো দরকার।

—আর ট্যাকার কথাই যদি বললেন দ্যাবতা, তাহলে বলি শোনেন। এই আমার সাফা ধুতি আর সাদা পিরান দেখছেন—কিন্তুক্ বাড়ি গিয়ে দেখে আসুন গামছা পর্‌যা ঘরের কাজ করছে আমার পরিবার। চালে খড় নাই, ঘরে ধান বাড়ন্ত। শালা যমেরও যেন হুঁস নাই।

পণ্ডিত একটু অবাক হয়। বিরক্তও হয় বুঝিবা। শ্রীনাথ মালাকারকে যখনই দেখা গেছে কমলপুরে তখনই তার এই ফিট্‌ফাট্ সৌখিন পোশাক লক্ষ্য করেছে দিবাকর। ফর্সা ধুতি, ফর্সা পিরান, চুলগুলি সযত্নে আঁচড়ানো। যার সংসারের আর্থিক অবস্থা এত দীন তার পক্ষে এ বেশবাস বিলাসিতা নয় তো কি? প্রশ্নটা না করে পারে না। হাসে শ্রীনাথ—ওটা আবার আমার পরিবারের একটা উচাটন আজ্ঞে! এই ধুতি আর পিরাণ আজ সাত বছর ধরি পরতাছি। যখনই এ গাঁয়ে ঠাকুর সাজাবার লেগে আসি, মাগি

কাচা পিরাণটি এগুয়ে দেয়। মেয়ের বিয়ে দিবার পর বেই-বাড়ি যাবার লেগে এগুলি বানাইছিলাম। তাই যখনই কম্‌লিপুরে আসি—এগুলান আগ বাড়িয়ে দেয়, বলে, মেয়ের কাছে বেই-বাড়ি যাতিছ, কাপড়টা পালটে যাও কেনে। ছাড়ান দ্যান উয়ার ছেলেমানুষি!

ছেলেমানুষিই বটে! কমলপুরের দুর্দান্ত জমিদার চৌধুরী-বাড়ির মহাপূজার প্রতিমাটিকে কোথাকার কোন রায়না গাঁয়ের এক নিরক্ষর দম্পতি কন্যাত্বে বরণ করেছে তার খোঁজ কে রাখে?

★ ★ ★

এ রকম অদ্ভুত সখ কেন হল কমলাপতির তা বলা শক্ত। হঠাৎ স্থির করলেন দীর্ঘদিন পরে সাড়ম্বরে মাতৃপূজা করবেন গ্রামে গিয়ে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, দিনকাল পাল্‌টে যাচ্ছে; এখন আর নাচের আসর বসানো চলে না। তাই যুগোপযোগী ব্যবস্থাই করতে চাইলেন। একখানা নাটক মঞ্চস্থ করবার বাসনা হল তাঁর। ব্যবস্থাও হল সেই মতো। রঙমহাল ঝাড়াপোঁছা করতে হবে, আবার সেখান জ্বল্‌বে হাজার বাতির রোশনাই। স্ত্রীভূমিকার জন্য ক'লকাতা থেকে পেশাদার অভিনেত্রী আনাতে হবে—কমলাপতি মনে মনে সব ছকেই এসেছিলেন। সে আমলের ইয়ারবন্ধু কাকে কাকে আনাতে হবে তাও ভেবে রেখেছেন। সবই ভেবেছিলেন, শুধু একটা কথা তাঁর খেয়াল হয়নি—সেটা হচ্ছে যে, তাঁর বয়স হয়েছে। শাস্ত্রে এ বয়সে বানপ্রস্থ নেবার বিধান আছে। সেটা খেয়াল হল যখন কলকাতা থেকে শ্রীপতি এসে পৌছালো তিনটি বন্ধু এবং দুটি বান্ধবীকে নিয়ে। শ্রীপতি কমলাপতির একমাত্র পুত্র—বংশের একমাত্র প্রদীপ। কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়ে। ওর সঙ্গে যারা এসেছে তারা নাকি সব ওর সহপাঠী। অভিনয়ে সকলেরই দক্ষতা আছে। গাঁয়ের থিয়েটারটা উৎরে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা। কমলাপতি নিজেকে সামলে নিলেন। রঙমহল সাফা করিয়েছিলেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে—কিন্তু অভিনয়ের মহড়া যখন বসল তখন তিনি উপস্থিত থাকতে পারলেন না। বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে শ্রীপতিই এসে বসল আসর জমিয়ে। কলেজের ছুটি অবশ্য এখনও হয়নি—তাই মাত্র পাঁচজনকে নিয়ে এসেছে আপাতত। আরও কয়েকজন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁরা ইতিমধ্যে পার্ট মুখস্থ করে আসবেন। চরিত্র বণ্টন কার্য কলকাতাতেই সমাধা করে এসেছে শ্রীপতি।

রঙমহলের মাঝখানেই বসেছে সকলে। সে আমলে এই নাচঘরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। সারারাত মাইফেল চলেছে। আলো-ঝলমল করা সে-সব রাত্রি এখন ইতিহাসের ঝরাপাতার মতো। সে যুগে চৌধুরীরা গ্রামেই বাস করতেন। এমন বার-মুখো ছিলেন না। সমস্ত সম্পত্তির আয় গ্রাম থেকেই হত। পাঁচটা ব্যবসায়েও নামেননি তখন,—গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার প্রয়োজনও পড়ত না বিশেষ। চৌধুরী কর্তাদের বিলাসের স্রোত তখন বইতো এই রঙমহলের অববাহিকা দিয়েই। শত সুন্দরীর নূপুর-নন্দিত রঙমহলের নকশাকাটা মার্বেলের মেঝেটা মূক হয়েছিল এতদিন। পুরু হয়ে কার্পেটে জমেছিল ধুলো, খাস-গেলাসে মাকড়শার জাল, ঝাড়লণ্ঠনে ঝুল। সব সাফা করা হয়েছে; দীর্ঘদিন পরে এ ঘরেই বসেছে নাটকের মহড়া।

সমস্ত ঘর জোড়া সতরঞ্চ, জায়গায় জায়গায় ছিদ্র দেখা যায়। অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব। একদিকে জাজিম। সেখানেই বসেছে ওরা দর্শকের ভূমিকায়। অপরদিকে একটি নিচু চৌকির উপর ফর্সা চাদর পাতা। এটা মঞ্চের বিকল্প। একটা কৌচে বসে থার্ড ইয়ারের ছাত্র শ্রীপতি মোটা একটা চুরুট হাতে স্মারকের কাজ করছে—এ নাটকের সেই পরিচালক। চৌকির উপর দাঁড়িয়ে চাণক্য পণ্ডিত কাত্যায়নের সঙ্গে কথা বলছেন। গোটা পাঁচ-সাত ছাইদান ইতস্তত ছড়ানো—যদিও সকলেই প্রায় সতরঞ্চির উপর ছাই ঝাড়ছে। শ্রীপতির কাছে একটা তেপায়া—তার উপর কয়েকটি রঙিন কাচের পাত্র। পাত্র রঙিন নয়।—পানীয়ের রঙেই রঙিন হয়ে উঠেছে তারা। তরল পদার্থটা যেমন আধার বদলাচ্ছে, রঙিন-আভাসটাও তেমনি পাত্র বদলাচ্ছে। সকলেই কমবেশি বেসামাল। তেপায়ার উপর শ্বেতাশ্বচিহ্নিত একটি বড় বোতল, বরফের পাত্র আর সোডার মুখখোলা বোতল। চৌধুরী পরিবারে সাবালকত্বের পর মদ্যপান না-করতে পারাই একটা অক্ষমতা! কমলাপতির মনে আছে, তিনি বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর বাবা হরিহর গাঙ্গুলির বাপকে ডেকে বলেছিলেন—কমলকে এবার থেকে রঙমহলে এক-আধটু নিয়ে যেও...বংশের নাম না ডোবায় যেন...দু এক পেগ্ যেন সহ্য করতে শেখে সেদিকেও লক্ষ্য রেখ।

জনাদুয়েক চাপরাশি খিদমৎ করছে। একটা হারমোনিয়াম, গোটা দুই তবলা আর বাঁয়া ইতস্তত ছড়ানো। চাণক্যের দীর্ঘ স্বগতোক্তিতে ঘরটা থম্‌থম করছে। শ্রীপতির সামান্য নেশা হয়েছে।—ও পাশে একজন কাত হয়ে পড়ে আছে তাকিয়াটা টেনে নিয়ে। শ্রীপতির মনে হচ্ছে কোথায় কিসের যেন একটা অভাব রয়েছে—ঠিক যেন জমছে না। হঠাৎ বলে বসে—কেমন যেন মিইয়ে আসছে সব, মিস্ পাকড়াশী, আপনি একখানা গান ধরুন দেখি !

—গান? হঠাৎ এ সময়?

—কেমন যেন মেলাঙ্কালি লাগছে, আপনি ছায়ার একখানা গান শুনিয়ে দিন। তারপর আবার ধরা যাবে।

মিস্ পাকড়াশী আর দ্বিধা করে না। হারমোনিয়ামটা টেনে নেয় কোলের কাছে। শ্রীপতিও টেনে নেয় গ্লাসটা। স্বয়ং চাণক্য পণ্ডিত টেনে নেন বাঁয়া তবলা। কিন্তু মিস্ পাকড়াশীর গানের মাঝখানেই দেখা দিল অন্তরায়। অন্তরায় এসে থেমে গেল গান। দ্বারদেশে দেখা গেল দুটি মূর্তি। একজনের ধূলি-ধূসরিত খালি পা, পরনে আট হাতি ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে মটকার চাদরের তলা দিয়ে দেখা যায় যজ্ঞোপবিৎ। নেশার ঘোরটা বেশি না হলে শ্রীপতির চিনতে হয়তো অসুবিধা হত না আনন্দময়ী-মন্দিরের সেবাইত রসিকলাল শিরোমণিকে। অপরজন অবশ্য তার অপরিচিত একজন যুবক। কালো রঙের গলাবন্ধ একটা কোট তার গায়ে, ধুতিটা মালকোচা সেঁটে পরা।

গান থেমে গেল

ভ্রূ কুঞ্চিত হল শ্রীপতির—কী চাই?

শিরোমণি এমন বিপদে কখনও পড়েননি। বিপদতারণ মধুসূদনকে স্মরণ করলেন মনে মনে। তাঁর ধারণা ছিল কমলাপতিই মহড়া দিচ্ছেন রঙমহলে বসে—গ্রামের

পরিচিত অনেককেই দেখতে পাবেন এখানে। কিন্তু তাঁর সামনে যারা বসে আছে তাদের কাউকে তিনি চেনেন না—একমাত্র চৌধুরী কর্তার ঐ বকে-যাওয়া অপোগণ্ড ছেলেটা ছাড়া। সে-ও যে তাঁকে চিনবে এ ভরসা কম!

শ্রীপতি আবার প্রশ্ন করে—কে তোমরা?

শিরোমণি বুঝলেন, তাঁকে চিনতে পারার মতো অবস্থায় নেই ছেলেটা। না হলে আনন্দময়ী মায়ের পূজারী রসিকলাল শিরোমণিকে চৌধুরী বাড়ির ঐ অকালকুষ্মাণ্ডটা কখনও 'তুমি'-সম্বোধন করত না। আমতা আমতা করে বলেন—আমাকে চিনলে না বাবা, আমি রসিকলাল...

এর মধ্যে হাসির কী আছে? তবু উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে বাচাল। কাত হয়ে শুয়ে ছিল সে এতক্ষণ। উৎসাহে উঠে বসে বলে—নামটা ভালোই রেখেছিলেন দেখছি তোমার ঠাকুর—রসিক চূড়ামণি—

কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তিম হয়ে ওঠে শিরোমণির। এতবড় অপমান যে গ্রামের মধ্যে কেউ তাঁকে করতে পারে—এ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। তবু অবস্থা বিপাকে অপমানটা গায়ে না মেখে বলেন—চূড়ামণি নয়, শিরোমণি।

—ঐ একই কথা। যাঁহা শির তাঁহা চূড়া! আর সঙ্গে ওটি কে? বেরসিকলাল তর্কচঞ্চু?

শিরোমণির বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

জগবন্ধু ডাক্তার বাঙালের পোলা। তাছাড়া সে গ্রাম্য নয়। শহরে লেখাপড়া শিখেছে। বড়লোকদের মোসায়েব জীবটি তার অজানা নয়। শিরোমণির অবস্থা দেখে সে নিজেই এগিয়ে আসে। বাচাল ভূমিকার অভিনেতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শ্রীপতিকে বলে—আপনার বাবা শিরোমণি মশাইকে বলেছিলেন নাটক অভিনয়ে গ্রামবাসীর সাহচর্য চান। তাই উনি আমাকে নিয়ে এসেছিলেন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। আমার নাম জগবন্ধু রায়, আমি এ গ্রামের ডাক্তার।

—কে বলেছিলেন সাহচর্য চান?

—কমলাপতিবাবু।

—কমলাপতিবাবু? কে তিনি?

—আপনার বাবা।

—আমার বাবাকে এ গাঁয়ে 'কমলাপতিবাবু' বলে কেউ ডাকে না।

বাচাল তৎক্ষণাৎ যোগ দেয়—তাহলে তুমি কোন গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ? নাচতে জানো?

জগবন্ধুর আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে—আমি এখানে বিনা আহ্বানে আসিনি—আপনার বন্ধুদের ভদ্রভাষায় কথা বলতে বলুন।

—শাট আপ্! গর্জে ওঠে বাচাল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীপতি বলে—যিনি তোমাকে ডেকেছিলেন তাঁর কাছে যাও! আমরা গাঁয়ে প্লে করতে এসেছি বটে, কিন্তু গাঁইয়াদের সঙ্গে প্লে করতে আসিনি। আচ্ছা এস তোমরা।

জগবন্ধু ডাক্তারের সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। চাণক্য পণ্ডিত ধীরে ধীরে উঠে আসে। এই গ্রাম্য কোয়াক ডাক্তারটিকে নিয়ে একটু রসিকতা করার লোভ জাগে। এ লোভের মূল হয়তো অনেকটাই মাদকরস সঞ্জাত। জগবন্ধুর চিবুক স্পর্শ করে বলে—রাগ করছ কেন ভাই ? চাণক্যের পার্টটা শুনিয়ে দাও না এদের? বল, কলির গাঁইয়া ডাক্তার শোন, আজ জমিদারপুত্র বলছে, তুমি বেরিয়ে যাও! তবু ঝড় উঠছে না, পৃথিবী...

প্রচণ্ড ধাক্কা মারে তাকে বলশালী জগবন্ধু। ঘুরে পড়ে চাণক্য। শ্রীপতি উঠে দাঁড়ায়, ডাকে—জনাবালি !

লম্বা একহারা একজন লোক এসে দাঁড়ায়।

—এই দোনো আদমিকো গর্দানা দে কে নিকাল দো!

নির্বিকারভাবে এগিয়ে আসে লোকটা। পুষ্টদেহ জগবন্ধুর তুলনায় তাকে ক্ষীণজীবীই মনে হয়—তবু সে এগিয়ে আসে। মদমত্ত প্রভুর আদেশ অর্ধেক পালন করে। হাতখানা চেপে ধরে ডাক্তারের। জগবন্ধুর বাক্যস্ফুর্তি হয় না। সমস্ত শরীরের মাংসপেশী ফুলে উঠে। সে নিশ্চিত জানে তার হাতের একটি চড় খেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ঐ একহারা লোকটা। তার স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়ে যায় সে। কিন্তু অঘটন কিছু ঘটবার আগেই তাড়াতাড়ি উঠে আসে মিস পাকড়াশী। জনাবালিকে বলে—ছোড় দো! তারপর জগবন্ধুর দিকে ফিরে বলে—আপনারা বাড়ি যান। এদের অবস্থা তো দেখছেন। কিছু মনে করবেন না—যান।

জগবন্ধু বেরিয়ে আসে। রাগে, অপমানে সে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছে। খেয়াল নেই শিরোমণি কখন প্রস্থান করেছেন অলক্ষ্যে।

শিরোমণি সরে পড়েছেন জনাবালির নাম শোনামাত্র। তিনি জগবন্ধুর মতো ভিন্‌দেশী লোক নন। ঐ চার অক্ষরের নামের পিছনে যে একহারা বিভীষিকাটি আছে তাকে চিনতে বাকি নেই তাঁর !

ধূমায়িত অসন্তোষ অনতিবিলম্বেই নিল বিদ্রোহের প্রকাশ্যরূপ। চৌধুরী বংশের উপর শুধু কমলপুর নয়—পার্শ্ববর্তী কখানা গ্রাম, বস্তুত সমস্ত জমিদারীটাই বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। দীর্ঘদিন অবশ্য প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ কিছু হয়নি। কালযুদ্ধ পাড়ি দিতেই ব্যস্ত ছিল সকলে। চাল-কয়লা-কেরোসিনের সন্ধানেই ব্যস্ত ছিল ওরা—জমিদারও গ্রামে ছিলেন না। আদায়পত্র করতেন নায়েব হরিহর গাঙ্গুলি। সদরে টাকা জমা দেওয়া, পারাণিঘাট জমা, পুকুর জমা সব কাজই করতেন নিজ বিবেচনায়। এতবড় জমিদারীর সমস্ত আদায়-পত্র নিশ্চিন্তে হরিহরের উপর ন্যস্ত করে শহরে গিয়ে ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির ব্যবসা ফেঁদেছেন তিনি।

শুধু জমিদার নন, গ্রামের অনেক ধনবান গৃহস্থই আজ গ্রামবাসী নন। বড় বড় বাড়িগুলি অধিকাংশই খালি পড়ে থাকে। ওদের মালিক এখন একজন দুজন নয়—অনেকে। এক আনা, ছয় পয়সার স্বত্ব এক এক জনের। ফলে কেউই মেরামত করে না। বড় বড় কোঠাবাড়ির কার্নিসে, খিলানে দেখা দেয় শিশু বনস্পতি। আলো হাওয়ায় বাড়তে থাকে। ফাট ধরে দেওয়ালে। চুনবালি খসে খসে পড়ে। জানলা-দরজার মরচে ধরা ছিটকানি আলগা হয়ে যায়। বাতাসে আপসাতে থাকে কপাটগুলো কালবৈশাখীর রাত্রে—যেন অতীতের আনন্দমুখরিত দিনগুলির স্বপ্ন দেখে ঘুমভেঙে জেগে ওঠে ওরা

দুর্যোগের রাত্রে। বুক চাপড়ে কাঁদে। জং-ধরা কব্জায় শোনা যায় আর্তকান্নার আওয়াজ। তারপর একদিন খুলে পড়ে যায় পাল্লাটা। বর্ষার জল অবাধে প্রবেশ করে ঘরে। ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এককালের আনন্দ উদ্বেল ভদ্রাসনগুলি। হয়তো কোনও বাড়িতে আবার এক কোনায় জলে সন্ধ্যাদীপ; তুলসীমঞ্চে প্রণাম জানায় লোলচর্মা বিধবা বুড়ি। সকল পরিবারেই থাকে অনাথা বিধবা, পঙ্গু বৃদ্ধ, পিতৃমাতৃহীন বালক। একটি কোনায় পড়ে থাকে ওরা। কমলপুরের অতীত ইতিহাসের সাক্ষী, গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির প্রতীক এই বিশালায়তন হাড়-বের-করা ভগ্ন দেউলগুলি। বেশিদিনের কথা নয় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও কমলপুরে বর্ধিষ্ণু পরিবার ছিল অনেকগুলি। ক্রমে ক্রমে তারা চলে গেছে শহরের—কৃষ্ণনগরে, রাণাঘাটে, কুষ্টিয়ায়, যশোরে। এ ছাড়া চাষীগৃহস্থও ছিল অনেকগুলি—সম্পন্ন গৃহস্থ। জলাঙ্গীর বন্যায় অবশ্য ক্ষতি হয়েছে প্রতি দশকেই দু একবার, তেমনি পলিমাটির আস্তরণে জমিও হয়েছে উর্বর। বিঘে-প্রতি দশ-বারো মণ আউস এরা আশা করে এখনও। ত্রিশচল্লিশ বছর আগেও প্রায় প্রত্যেক চাষীরই ছিল নিজস্ব জমি। এখন প্রায় সকলেই ভাগচাষী অথবা মজুর চাষী। সম্পদ হয়তো তখনও ছিল না সব ঘরে, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, শান্তি ছিল। কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব আনন্দ-কলরব-মুখরিত চাষীদের সংসারগুলি! বন্যা আর ম্যালেরিয়ায় যত উজাড় হয়েছে তার চেয়ে বেশি গেছে জোতদারের ঋণজালে, জমিদারের বেড়াজালে আর মহাজনের সইজালে। তা সত্ত্বেও কোনক্রমে যে কটি পরিবার টিকে ছিল তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেল কাল যুদ্ধ!

যেমন কৃষির অবস্থা তেমনি অবস্থা গ্রাম্য শিল্পের। ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে গ্রাম্যশিল্প। যন্ত্রে উৎপন্ন সওদার সঙ্গে তারা পেরে উঠছে না। পড়তায় কুলাচ্ছে না। কমলপুরে আগে তাঁতের কাপড় তৈরি হত যথেষ্ট। গাঁয়ের চাহিদা মিটিয়েও পাঁচ হাটে বিক্রি হত ওদের হাতে-বোনা কাপড়। শান্তিপুর-ফরাসডাঙার মতো মিহি ধুতি-শাড়ি তৈরি হত না বটে তবে আটপৌরে কাপড় হত প্রচুর! এখন গোটা তাঁতিপল্লীটায় মাত্র একঘর তাঁতি আছে—নবীন যুগী। তাঁত তার মাসে কদিনই বা চলে? পেটও চলে ঐ ক'টা দিনই। তবু জমিদারের পাওনা আদায়ের বিরাম নেই। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ মড়ক—যাই হোক না কেন ভূম্যধিকারীর দাবিটা আগে মেটাতে হবে। বাঙলা উনপঞ্চাশ সনের অতবড় দুর্ভিক্ষের বছরেও খাজনা মাপ করা হয়নি। তাও যদি জমিদার ওদের সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়ে গাঁয়েই থাকতেন তাহলে এতটা জ্বালা থাকত না ওদের। কিন্তু আজ পনের বছর ধরে তাও থাকেন না জমিদার। তাই জমিদারের বিরুদ্ধে এদের একটা জাতক্রোধ ছিল বরাবরই। এই সুযোগে সেটা প্রকাশ্যরূপ নিল।

অতীতে কেউ কখন প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। একক প্রচেষ্টা অবশ্য অনেকেই করেছে—যার ফলাফলও হয়েছে ভয়াবহ। সে সব ঘটনা আজ গল্পকথা। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। প্রজা-শাসনের সে সব গল্পগুলি এখনও শোনা যায় গ্রামের প্রবীণ জনের মুখে। গল্পগুলি লোমহর্ষক সন্দেহ নেই—কিন্তু পুনরুক্তি দোষ তাতে প্রকট। সবগুলি গল্পের শেষে সেই একই কথা—'আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো'।

চৌধুরী কর্তাদের হাতে এ তল্লাটে অনেক কটি নটেগাছই মুড়িয়ে গেছে। দিবাকরের মতো লোক, যারা একটু চিন্তা করে দেখতে চায়, তারা ভাবে—এভাবে নটে-গাছকে মুড়িয়ে দেবার কারণটা কী? আসল গলদ কোথায়? কিন্তু সে জটিল প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়। অনেক লোকের সাক্ষ্য, জবানবন্দী, যুক্তি তর্কের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাজশক্তি, সমাজ-ব্যবস্থা, ধনবন্টন-ব্যবস্থা সব খতিয়ে দেখতে হয়। অর্থাৎ গরুর অভিযোগ রাখালের বিরুদ্ধে,—রাখাল নালিশ আনে বউয়ের নামে, বউ ফরিয়াদী হয় কলাগাছের বিরুদ্ধে, এমনি করে মেঘ, ব্যাঙ, সাপ অনেক বাদী প্রতিবাদীর বিবর্তে আসল প্রশ্নটাই যায় গুলিয়ে। অবশ্য যত ঘুরপথেই যাও না কেন, আসল বক্তব্যটা প্রকাশ পাবেই। পায়ও। শেষ পর্যন্ত শাসক আর শোষিতের সম্পর্কে চরম কথাটি বেরিয়ে আসে ঠিকই—'খাবার জিনিস খাবুনি?'

যৌথ প্রতিবাদও হয়েছে মাঝে মাঝে। একবার তো করেছিল মোহনডাঙার বায়েনরা। ওদের আবহমানকালের পিতৃপিতামহের আমল থেকে ভোগ-করে-আসা জমিটা যখন জমিদার বিক্রি করে দিলেন ঝাগরমল কোম্পানির কাছে ধানকল বসাবার জন্যে তখন ওরা একবার এককাট্টা হয়েছিল শাসকের বিরুদ্ধে। চৌধুরীরা ওদের উঠে যেতে বলেছিলেন চাঁপাডাঙায়—জঙ্গল সাফা করে নতুন ঘর তুলতে বলেছিলেন—স্বল্প খাজনায় পাকা প্রজাস্বত্ব দেবার লোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সাতপুরুষের বাস্তুর কী মোহ! এর বদলে যদি স্বর্ণপ্রসূ উর্বর ভূখণ্ড পেত—তাহলেও হয়তো মানুষগুলো বাসস্থান বদলাতে রাজি হত না। ফলে এ জমি ছেড়ে কেউটে আর গোখরোর আবাস ঐ চাঁপাডাঙায় গিয়ে নতুন ঘর বাঁধতে রাজি হল না ওরা। দখল দেব না—বলে ঘুরে দাঁড়ালো। সব কয়টি নটে গাছকেই মুড়িয়ে দিয়েছিলেন চৌধুরী কর্তা। তখন সবে মসনদে বসেছেন তিনি। ওদেরই ধ্বংসাবশেষ ঐ প্রহ্লাদ বায়েনের দল। আজ ওরা গৃহহীন—খ'ড়ের গর্ভে মানায় গিয়ে ওরা অস্থায়ী ঘর বেঁধেছে—বর্ষায় উঠে আসে ছাতিমতলায়।

জমিদারের শক্তিকে ওরা স্বীকার করে নিয়েছিল। বন্যা, অনাবৃষ্টি, ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, পঙ্গপাল—সেই তালিকার সঙ্গে ওরা যুক্ত করে দিল আর একটি নাম—চৌধুরী জমিদার। মা-মনসা, শীতলা, ওলাবিবি আর হরিহর গাঙ্গুলিকে ওরা মনে মনে একসারিতে বসাতে শিখল—সকলের সামনেই ওরা যুক্তকর।

দু পুরুষ আগে হয় তো ঠিক এ অবস্থা ছিলনা। সামন্ত্র-তন্ত্রের সে স্বর্ণযুগে জমিদার আর প্রজার সম্পর্কটা এত তিক্ত হয়ে ওঠেনি। জমিদার তখন প্রজাদের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখের ভাগ নিতেন। গ্রামেই থাকতেন তিনি। গ্রামে মহামারী, বন্যা হলে তিনিও ওদের সঙ্গে ভুগতেন, যুঝতেন। গ্রামের কোন উৎসব হলে তিনিও যোগ দিতেন। রাজা-প্রজায় একটা দেখা-দেখি, চেনা-জানার সম্পর্ক ছিল। খ'ড়ের বাঁধে ভাঙন ধরলে তিনিও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতেন, ইউনিয়ন-বোর্ড সড়কের সাঁকোটা জখম হলে তাঁরও অসুবিধার কারণ ঘটত। তিনি ছিলেন ওদের গ্রাম্যজীবনের ভাগীদার।

কিন্তু চাকা পালটে গেছে বর্তমান যুগে। এখন জমিদার গ্রামে থাকেন না। তিনি ওদের সুখদুঃখের ভাগীদার নন। সম্পর্কটা এসে ঠেকেছে শুধু খাজনা আদায়ে। তাই

আজকের কমলপুরের বাসিন্দা সামন্ত-তন্ত্রের আশীর্বাদটুকু পায়নি—পেয়েছে শুধু অভিশাপটুকুই। তাই রাজা-প্রজার সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা কোথাও নেই—শুধুই তিক্ততা। বাইরে থেকে এটা বোঝা যায় না, জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থা চলেছে টিকিয়ে টিকিয়ে গো-গাড়ির মতো। গলদটা বোঝা যাবে যদি বাইরে থেকে আসে কোন আঘাত। সৌভাগ্যক্রমে সে সম্ভাবনা এখন নেই।

সে যাই হোক, পূজার নববিধান শুনে দিবাকর একবার ভেবেছিল জমিদারকে গিয়ে অনুরোধ করবে সাবেক ব্যবস্থাই বজায় রাখতে। কিন্তু গ্রামে কেউ তাকে মানে না, সবাই তাকে ভয় করে, এড়িয়ে চলে—জমিদারও নানা কারণে তার উপর চটে আছেন। বাধ্য হয়ে চুপ করে সহ্য করে গিয়েছিল পণ্ডিত।

প্রতিবাদটা প্রথম ধ্বনিত হয়ে উঠল ডাক্তার জগবন্ধুর কণ্ঠে। শিরোমণি মশায়ের মনোভাবটা আন্দাজ করা কঠিন। অপমানিত তিনিও বড় কম হননি—তবু যেন ক্ষমা করার জন্যই তিনি উন্মুখ। কারণটা বোঝা যায় না। শিরোমণি এবং জগবন্ধুর অপমানের কথা গ্রামে চাপা থাকল না। মুখে মুখে পল্লবিত আকারে ছড়িয়ে পড়ল এ পাড়ায়, সে পাড়ায়। শহরবাসী চৌধুরীরা যে গ্রামের লোককে হীনচক্ষে দেখেন—এই অনুভব করা সত্যটা প্রত্যক্ষ গোচরে এল এবার। বিশ্বযুদ্ধ সব মানুষকেই কমবেশি বেপরোয়া করে দিয়ে গেছে। মানুষের জীবনবোধের মূল্যায়ন গেছে বদলে। তাই এরা নীরবে অপমানটা হজম করতে রাজি হল না। জগবন্ধুর ডাক্তারখানায় উত্তেজিত-কণ্ঠে আলোচনা চলে। রায়মশাই, ঘোষজা, সাঁইমশাই, ননীমাধব প্রভৃতি সকলেই জড়ো হলেন। ডাক্তারের ইচ্ছা গ্রামবাসী সর্বান্তঃকরণে বর্জন করুক জমিদারবাড়ির পূজা। কেউ বেগার দেবে না—পূজামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে যাবে না—নিমন্ত্রণ খাওয়া আর থিয়েটার দেখা তো দূরের কথা। প্রয়োজন হলে আর ক্ষমতায় কুলালে গ্রামের মধ্যে সর্বজনীন পূজার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিরোমণি বলেন, মায়ের দিনুরীটাও জমা আছে আমার কাছে। সেটাও আমরা সর্বজনীন পূজার খরচ করতে পারি।

রায়মশাই কিন্তু সায় দেন না। প্রস্তাবটা তাঁর মনঃপূত নয়। সর্বজনীন পূজার আর্থিক দায়িত্বটাও তো বড় কম নয়—আর সে-বাবদ তাঁর উপরে ঝুঁকিটা এসে পড়বে অনেকখানি। যুদ্ধের বাজারে চাল সরবরাহ করে তিনি যে মোটা মুনাফা লুটেছেন এটা গ্রামে কারও অজানা নেই। তিনি বললেন—ছেলেমানুষি কর না শিরোমণি। মায়ের পূজা কি করব বললেই হয়? দায়িত্বটা একবার ভেবে দেখ। এ তোমার শীতলা, রক্ষাকালী নয়, স্বয়ং মা! আর মাত্র বারোটা দিন বাকি আছে—সে খেয়াল আছে কারও?

সকলেই চুপ করে যায়। ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে। রায়মশাই নিজেই আবার বলেন—তার চেয়ে চল, সবাই মিলে মেজকর্তার কাছে যাওয়া যাক। তিনি অভিযোগ শুনে কী বলেন শোনা যাক। মত্তাবস্থায় কতকগুলি অপোগণ্ড কী করে ফেলেছে তারই উপর ভিত্তি করে এতবড় সিদ্ধান্ত করা চলে না। চৌধুরী মশাই যদি অনুতপ্ত হন—আর তাঁর ছেলে যদি ক্ষমা চায়, তা হলে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই ভালো।

অনেক বাকবিতণ্ডার পর সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হল মজলিসে। রায় মশাইকে পুরোভাগে নিয়ে সমস্ত দলটা যাত্রা করে চৌধুরীবাড়ির দিকে।

* * *

কাছারি বাড়ির উল্টোদিকে পূজার দালান। মাঝখানে একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এককালে নানান ফুলের গাছে সুশোভিত হয়ে থাকত বাগানটা। এখন কয়েকটি বড় গাছ ছাড়া চারাগাছের চিহ্নমাত্র নাই। গন্ধরাজ, কামিনী আর বকুলগাছ ক'টি টিকে আছে। পূজা মণ্ডপের দক্ষিণে উঁচু পাঁচিলে বড় একটা দরজা। ভারী কাঁঠাল কাঠের। লোহার গুলবসানো। এটাই অন্দরে যাওয়ার পথ। বাগানে একটা ইজি-চেয়ারে বসে একখানি ইংরাজি উপন্যাস পড়তে পড়তে কমলাপতি কাজ তদারক করছিলেন। কয়েকজন জনমজুর বাগানের আগাছা তুলে সাফা করছিল উঠানটা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে কমলাপতি বই পড়তে পড়তে কাজ তদারক করছেন—আসলে কিন্তু এ দুটো কাজের একটাও করছিলেন না তিনি। খোলা বইটা হাতে ধরাই আছে—তিনি মনে মনে ফুঁসছিলেন নিরুদ্ধ রাগে।

—দিনকাল কী হল? উমা এসে একটু আগে তাঁর কাছে অনুযোগ করে গেছে, তাকে যেন থিয়েটার পার্ট না দেওয়া হয়। অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কমলাপতি। উমা—চৌধুরীবাড়ির স্বর্গগত বড়কর্তা সারদাপতির কন্যা উমা—রঙ মেখে অভিনয়-মঞ্চে নামবে? এ প্রশ্ন জাগে কি করে তার মনে? প্রশ্নটা করে তিনি জানতে পেরেছিলেন শ্রীপতি নাকি পীড়াপীড়ি করছে উমাকে এই নিয়ে। বলেছে বাবার মত সে করিয়ে নেবে। কমলাপতি ডেকে পাঠিয়েছিলেন ছেলেকে। পিতাপুত্রে যে আলোচনাটা হয়েছিল সেটা খুব সুখের নয়। সংযত কিন্তু সুদৃঢ় ভাষায় শ্রীপতি বুঝিয়ে দিয়েছিল কমলাপতিকে যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এ যুগে অচল। ভদ্রঘরের মেয়েরা সকলেই এ যুগে একসঙ্গে মঞ্চে নামে। এটা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল। বোনকে সে 'গাঁইয়া' করে রেখে দিতে দেবে না। এই তো কলকাতা থেকে তার যে দুজন সহপাঠিনী এসেছে—ওরাও তো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। ওরা যদি অনাত্মীয়ের বাড়িতে এসে অভিনয় করতে পারে, তবে উমাই বা পারবে না কেন? কমলাপতি একবার জামাইয়ের কথা তুলেছিলেন—অমলের অনুমতি দরকার। শ্রীপতি উত্তরে বলেছিল তার ভগ্নিপতি বিলাত যাচ্ছে ব্যারিস্টারি পড়তে, তার অমত হবার কোনও কারণ নেই। ভেবে দেখবেন বলে তিনি বিদায় দিয়েছিলেন পুত্রকে।

আপন মনেই তাই তিনি ভাবছিলেন বসে। দিনকাল কী তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে! সাহেব-সুবোর সঙ্গে তাঁরও কারবার আছে—জামাইয়ের বিলাত যাওয়ার কথায় তিনি আপত্তি করেননি, কিন্তু আধুনিকতা তাঁর আভিজাত্যের উপরে যেতে পারেনি কোনদিন। ঐ লোহার গুলবসানো কাঁঠাল কাঠের দরজার ওপারের স্বাতন্ত্র্য আর মর্যাদা তিনি ক্ষুণ্ণ করতে পারেন না কোনমতে। সহস্র লোকের চোখের সামনে উমা—চৌধুরীবাড়ির মেয়ে উমা—প্রেমের অভিনয় করবে পরপুরুষের সঙ্গে! উমার স্বামীর এতে আপত্তি না থাকতে পারে—কমলাপতির আছে। আর ঐ মেয়েদুটিই বা কেমন? ওরা নাকি শ্রীপতির সহপাঠী, একই কলেজে একই ক্লাসে বি. এ. পড়ছে ওরা একসঙ্গে। অতবড় অবিবাহিতা মেয়েকে সহপাঠীর সঙ্গে যেতে দিয়েছে ওদের অভিভাবক?

ঠিক এই সময়ে কমলাপতির নজরে পড়ে শ্রীপতির একজন সহপাঠিনী একটি বেঁটে রঙিন ছাতা মাথায় বেরিয়ে আসছে অন্দরমহল থেকে! একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন কমলাপতি। কী বিশ্রী পোশাক আজকালকার মেয়েদের! এই সাত সকালেই একগাদা রঙ মেখেছে মুখে। সিল্কের ছাপা শাড়ি পরেছে ড্রেস করে। ব্লাউজের গলার কাট্‌টা মর্মান্তিকভাবে নির্লজ্জ। কাপড় পরার ধরনটাও সুরুচির পরিচায়ক নয়। কমলাপতিকে দেখে মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার করে। চৌধুরী কর্তা ওকে ডাকেন। টুলের ওপর থেকে পা নামিয়ে নেন, বসতে বলেন ওকে। মেয়েটি বসে। কোনও জড়তা নেই—যেন কোন নিকট আত্মীয়ের কাছে এসে বসেছে। মুগ্ধ হন কমলাপতি, বলেন—তোমরা এসেছ শ্রীপতির সঙ্গে, অথচ আলাপ করার সময়ই পাই না।

—আপনি তো দেখি সারাদিনই ব্যস্ত থাকেন কাজে কর্মে।

—তা থাকি। তোমার নামটি কী মা?

—মিস মল্লিকা পাকড়াশী।

কমলাপতির মনে হল উমাকে কেউ প্রাক্‌বিবাহ জীবনে এ প্রশ্ন করলে সে বলত 'শ্রীমতী' অথবা 'কুমারী'।

—তুমি বুঝি শ্রীপতির সঙ্গে পড়?

—হ্যাঁ; তাই তো চলে আসতে দিলেন মা।

—একই ইয়ারে?

—হ্যাঁ, তাই তো ঘনিষ্ঠতা ছিল আগে থেকেই।

একটু বিরক্তবোধ করেন চৌধুরীকর্তা। মেয়েটি বোধহয় বেশি কথা বলে। তবু প্রশ্ন করেন—তোমার কম্বিনেশন কী?

—হিস্ট্রি, সিভিক্স আর লজিক্স।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান কমলাপতি। শ্রীপতি থার্ড ইয়ারে পড়ে! মেয়েটিকে আপাদমস্তক একবার দেখে নেন। কে বলবে অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলছে! কোন জড়তা নেই, কুণ্ঠা নেই! আমতা আমতা করে বলেন—অনার্স নিয়েছ নাকি কিছু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনার্স তো নিতেই হবে।

—কিসে? সিভিক্সে, না 'লজিক্সে'?

—না হিস্ট্রিতে। ইতিহাসটাতেই আমি বরাবর বেশি নম্বর পাই।

—ও!

চুপ করে যান কমলাপতি। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। মেয়েটি বলে—আপনি তো আমাদের রিহার্সালে এলেন না একদিনও।

কমলাপতি সামলে নেন নিজেকে ; বলেন—যাব। ভালই হল, তুমি ইতিহাসের ছাত্রী। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। সেদিন আমাকে প্রফেসর সেন বলছিলেন, জুলিয়াস সিজার প্রটেস্টান্ট ছিলেন—অথচ আমার বেশ মনে আছে ছেলেবেলায় পড়েছিলাম সিজার রোমান ক্যাথলিক ছিলেন ধর্মে। তবে অতবড় পণ্ডিত বলছেন—তাই কেমন গুলিয়ে গেল যেন। সত্যিই কি জুলিয়াস সিজার প্রটেস্টান্ট ছিলেন?

মেয়েটি হাসল। বেতের কাজকরা বটুয়া থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘামটা

মুছে নিয়ে স্বচ্ছন্দে বললে—প্রফেসর সেন কে তা জানি না। তবে তিনিই ভুল বলেছেন। আপনার ধারণাই ঠিক। জুলিয়াস সিজার রোমান ক্যাথলিকই ছিলেন।

আর বাক্যস্ফূর্তি হয়নি কমলাপতির।

কোথা থেকে ধরে এনেছে এদের শ্রীপতি? অনায়াস পদবিক্ষেপে এরা অন্দর বাহির করছে! বৌঠানকে, উমাকে এই জীব দুটির সঙ্গে সকালসন্ধ্যা উঠতে-বসতে খেতে-শুতে হচ্ছে! শ্রীপতির এ ঔদ্ধত্য অসহ্য।

ঠিক এই সময়ে এসে লম্বা সেলাম করে হরকিষণ চাপরাশী। মাথা নিচু করে বললে—দিলে না হুজুর!

—দিলে না! সে কী? কেন? কী বললে?

হরকিষণ ইতস্তত করে।

—তুমি এখন যাও। মেয়েটিকে আদেশের ভঙ্গিতে বলেন কমলাপতি। সমস্ত দেহ হিন্দোলিত করে, লুটিয়ে পড়া আঁচলটা বুকে তুলে মেয়েটি চলে যায়।

—কী বল্‌লে? —পুনরায় প্রশ্ন করেন চৌধুরীবাড়ির মেজকর্তা।

—বললে কি উ বাঁশ হামি বেচব না।

হঠাৎ খেপে ওঠেন চৌধুরী কর্তা—হারামজাদা, শূয়ারকা বাচ্ছা! সে কথা বলতে এসেছিস আমাকে? যা এক্ষুনি,...জোর করে কেটে আনবি...লছমনপ্রসাদ, কাদের...আর হ্যাঁ, জনাবালিকে নিয়ে যাবি! বাঁশ নিয়ে না ফিরতে পারিস তবে আসিস না। যা বেরো!

লম্বা সেলাম করে বেরিয়ে যায় হরকিষণ।

জনমজুরগুলো হাতের কাজ ছেড়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে শুনছিল সব কথা। কেউ লক্ষ্য করল না, মজুরদের একটা ছেলে, ট্যানা, সরে পড়ল আদেশটা শুনে।

কমলাপতি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেছে তাঁর। একটা সাধারণ প্রজার এত সাহস? প্রতিমার সাঙের বাঁশটায় ঘুণ ধরে গেছে। ওটা বদল করা দরকার। নায়েব গাঙ্গুলিমশাই সন্ধান দিয়েছিলেন চাঁপাডাঙার মাঠ পারে রতন ঘোষের বাস্তুজমির পশ্চিম দিকের ঝাড়ে বেশ মোটা মোটা কয়েকটি বাঁশ আছে। ওর মধ্যে একটা আবার অস্বাভাবিকরকম মোটা আর লম্বা। গাঙ্গুলির সন্ধানী চোখের দৃষ্টি ভুল করে না। জমিদারের লোক সেই বাঁশ কাটতে গিয়েছিল। বাধা দেয় রত্নাকর ঘোষ। বলেছে, এ বাঁশঝাড় এজমালি জমিতে নয়—তার বাস্তুজমির বাঁশ। গাঙ্গুলি খেপে গিয়েছিলেন বাধা পেয়ে। রতন ঘোষকে শায়েস্তা করার একটা সুযোগই খুঁজছিলেন তিনি। কিন্তু কমলাপতি আপত্তি করলেন, বললেন—কেন গণ্ডগোল করছ গাঙ্গুলি? লোকটা তো অন্যায় কিছু বলেনি। ও যা দাম চায় মিটিয়ে দাও।

গাঙ্গুলি চুপ করে যেতে বাধ্য হন। বাঁশ কিনবার প্রস্তাব নিয়ে হরকিষণ গিয়েছিল রতন ঘোষের কাছে। এবার সে বলেছে—বাঁশ সে বেচবে না। এবার চৌধুরী নিজেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এরা ভাবে কী? গাঁওয়ার গোয়ালার বাচ্চা! ভেবেছে মাথায় উঠেছি! অস্থিরভাবে বাগানে পদচারণ করতে থাকেন তিনি। এই জন্যেই বলে কুকুরকে লাই দিতে নেই। গ্রামবাসীর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করলেই ওরা মনে করে জমিদারের সমকক্ষ মানুষ হয়ে পড়েছি বুঝি। গ্রামসমাজের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি—উদারতা

দেখিয়ে ওদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে যান। আর ওরা ভাবে সংহত জনশক্তিকে ভয় করেন বলেই বুঝি উনি আজকাল ডেকে কথা বলেন সকলের সঙ্গে। ভয়! কমলাপতির ইচ্ছে করে ওদের শিক্ষা দিয়ে দেন নির্মমভাবে একবার। লক্ষ্মীপতির আমলে একথা কেউ বললে চাপরাশী কখনও শুধু হাতে ফিরে আসত না প্রভুকে সংবাদটা দিতে। গোটা বাঁশঝাড় সমেত ঝাড়ের মালিকের মাথাটাও এসে পৌঁছাতো দেউড়ির এপারে।

ঠিক এই শুভ মুহূর্তেই রায়মশায়কে পুরোভাগে নিয়ে প্রবেশ করে গ্রামের দলটি। কমলাপতি একবার ওদের দিকে দৃষ্টিপাত করে উপবেশন করেন ইজিচেয়ারে। টুলের উপর তুলে দিলেন যুগল চরণ।

মানুষকে আমরা বিচার করি তার আচরণ দেখে। কোন মানুষ কী করেছে এটাই শুধু দেখি আমরা। কখন করেছে এ প্রশ্নটা ভেবে দেখি না। তাই মনুষ্যচরিত্র বিশ্লেষণে ভুল করি বারে বারে। এ বছর মেঘমুক্ত আশ্বিনের প্রথম আলোয় গ্রামের জন্য মন-কেমন-করে ওঠা যে-কমলাপতি কাশ্মীর ভ্রমণের আয়োজন বন্ধ করে মায়ের পূজা করতে দীর্ঘদিন পরে গ্রামে ছুটে এসেছিলেন সেই কমলাপতিই কি বসে আছেন ওখানে টুলের উপর পা তুলে? নিশ্চয়ই না! ওঁরা দুটি ভিন্ন মানুষ। সেকথা জানতেন না রায়মশায়েরা।

রায়মশাই প্রমুখ সকলে এসে দাঁড়ালেন সামনে। দ্বিতীয় আসন নেই বসার। বসতে গেলে একেবারে চৌধুরীর পদতলে ভূশয্যাতেই বসতে হয়। চৌধুরী ইচ্ছা করলেই কাছারি বাড়িতে উঠে গিয়ে ওঁদের বক্তব্য শুনতে পারতেন। তাহলে সকলে বসতেও পারত। তা তিনি করলেন না, বললেন—কী চাই?

অপমানটা নিরাবরণ। সকলেই সেটা উপলব্ধি করলেন। আর সবচেয়ে বেশি করলেন নন্দদুলাল রায়। শুধু গ্রামের নয়—এ অঞ্চলটায় তিনি একজন অত্যন্ত মানী সম্পন্ন ব্যক্তি। গম্ভীরভাবে নমস্কার করে বললেন—আমাদের অভিযোগ আছে। এখানে তো অসুবিধা হবে। আপনি একবার কাছারিতে আসুন।

—ও অভিযোগ। কিন্তু এবেলা তো আমার সময় হবে না। আপনারা বরং ওবেলা আসবেন। এখন আমি বাগান সাফা করাচ্ছি।

অবজ্ঞার ভঙ্গিটায় রায়মশায়ের আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে। জবাব দেন ননীমাধব—কিন্তু এতগুলি ভদ্রলোক যখন এসেছেন, তখন সময় করে অভিযোগটা যে এখনই শুনতে হবে হুজুর।

—বেশ, বলুন তাহলে।

অর্থাৎ অভিযোগটা জ্ঞাপন করতে হলে তোমাদের এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তা বলতে হবে। রায়-মশায়ের আর বাক্যালাপের ইচ্ছা ছিল না। ননীমাধব বলেন—হুজুরের ছেলে ছোটহুজুর আমাদের ডাক্তার আর শিরোমণিকে অপমান করেছে।

—কেন?

—কেন তা তিনিই বলতে পারেন। হুজুর বলেছিলেন, আপনি থিয়েটারে আর্থিক সাহায্য চান, তাই শিরোমণি মশাই আমাদের ডাক্তারকে নিয়ে এসেছিলেন। তা উনি এদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন।

ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন বলে—চাকর ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে।

কমলাপতি পকেট থেকে একটা সিগার কেস বার করেন। একটি সিগার নিয়ে নিপুণভাবে ধরিয়ে নেন। তারপর ধীরে-সুস্থে বলেন—আমি শিরোমণি মশাইকে বলেছিলাম, আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে, অভিনেতা নির্বাচন আমরাই করব, সে আপনাদের ভাবতে হবে না। তা সত্ত্বেও আপনারা উপরপড়া হয়ে এলেন কেন?

—তাই বলে গলাধাক্কা দেবে?

—না গলাধাক্কা দেয়নি। ডাক্তার আপনাদের বাড়িয়ে বলেছে। ঘটনাটা আমিও শুনেছি। তাছাড়া জগবন্ধু ডাক্তার আমাকে কমলাপতি 'বাবু' বলে উল্লেখ করায় শ্রীপতি বুঝতে পারেনি সে কাকে 'মিন' করছে।

একটু নীরবতা। রায় এতক্ষণে বলেন—কিন্তু আপনার নাম তো কমলাপতিই—বুঝতে না পারার হেতুটা?

—হেতুটা তো আপনার বোঝা উচিত নন্দদুলালবাবু। এ গাঁয়ে আমাকে নাম ধরে বাবু বলে ডাকে না কেউ। কথাটা কিন্তু সে ঠিকই বলেছে—গাঁয়ে থিয়েটার করতে এসেছে বলে গাঁইয়াদের সঙ্গে থিয়েটার করতে আসেনি ওরা। আচ্ছা এখন আপনারা আসতে পারেন। নমস্কার!

রায় সংযম হারান না। হেসে বলেন—স্থান ও পাত্রটা নতুন নয়; কিন্তু কালটা পাল্টে গেছে, সেটা ভুলে গেছেন আপনি। আচ্ছা আপনার কথাটা আমরা মনে রাখব কমলাপতি'বাবু'। নমস্কার!

সমস্ত দলটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে রায়মশায়ের পিছনে।

* * *

বাঁশ কেটে আনার হুকুম নিয়ে হরকিষণ বেরিয়ে যেতেই—ঘোষপাড়ার ট্যানা সরে পড়েছিল। সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল আলপথ দিয়ে। রতন ঘোষকে আগেভাগে সংবাদটা পৌঁছে দিতে হবে। খুন-জখম যে হবেই এতে কোনও সন্দেহ ছিল না ট্যানার। হরকিষণ, লছমনপ্রসাদ, কাদের যাচ্ছে—তার সঙ্গে আছে এ তল্লাটের বিখ্যাত লাঠিয়াল জনাবালি শেখ। কিন্তু ও তরফেও আছে রতন ঘোষ! রতনখুড়ো রুখে দাঁড়ালে অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে ভাবতেও ট্যানার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দিয়ে উঠল। রত্নাকর ঘোষকে লাঠি হাতে লড়তে অবশ্য সে কখনও দেখেনি—তার জন্মের পরে কখনও লাঠি ধরেইনি খুড়ো। তবু ঘোষপাড়ারই সন্তান সে। মাঠাকুরমায়ের কাছে শুনেছে রতন ঘোষ—ভীমা ঘোষের ডাকাতির রোমাঞ্চকর কাহিনী। খুড়ো-ভাইপো নাকি একসঙ্গে দুশো লোকের মহড়া নিতে পারত সঙ্কীর্ণ গলিপথে। মনে মনে রত্নাকরকে সে স্থাপন করেছে সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে।

বস্তুত রত্নাকর ঘোষ এ অঞ্চলের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। কমলাপতির মতো আভিজাত্য-গৌরব তার নেই—নেই রায়মশায়ের মত বিশাল সম্পত্তি অথবা তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থের মত অগাধ পাণ্ডিত্য—তবু রতন গয়লাকে একডাকে চেনে পাঁচখানা গাঁয়ের মানুষ! কমলপুরের বিখ্যাত ঘোষপল্লীর এই ধ্বংসাবশেষটির আছে আলাদা

একটা মর্যাদা—ছোটলোক মহলে। চাঁপাডাঙার পড়ো জমিটার পশ্চিমে বিশ বছর আগেও বাস করত ত্রিশ-চল্লিশঘর গোয়ালা। ধানকলের উত্তর সীমানায়। ওরা নাকি গোপরাজার বংশসম্ভূত। কমলপুরের প্রথম প্রতিষ্ঠা নাকি এই ঘোষেদেরই আদি পুরুষের বীর্যে। ওদের সকলেরই ছিল নিজস্ব গরু ও মহিষ। শুধু গ্রামেরই দুধ, দই, ক্ষীর, মিষ্টান্ন সরবরাহ করতো না—ছানা, ক্ষীর, সর চালান যেত শহরে। কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া সরভাজার মধ্যে সন্ধান করলে পাওয়া যেত ওদের অবদান! বলিষ্ঠ জোয়ান চেহারা ছিল ওদের! লাঠিখেলায় ছিল জন্মগত পারদর্শিতা। বীরাষ্টমীর দিন ঝাঁকড়া চুল সমেত মাথা ঝাঁকিয়ে খেলা দেখাত। রতন ঘোষ লাঠি ঘোরালে তাকে ঢিল ছুড়ে মারা যেত না। লাঠিতে ঠেকে ফিরে আসত ঢিল। পুলিসের খাতায় ছিল অনেকের নাম। আশেপাশের ডাকাতি কেসে অনেকেই ধরা পড়েছে। বুড়ো ভীমা ঘোষের কথা আজও মনে আছে গাঁয়ের বয়স্কদের। ইয়া দশাসই চেহারা। মাথায় বাবরি চুল; চোখ দুটো সর্বদাই লাল হয়ে থাকত। সে নাকি ছিল ডাকাত দলের সর্দার। বার দুই ডাকাতি কেসে ধরা পড়ল ওরা। বি. এল. কেসেও ধরে নিয়ে গেল ক'টাকে। জোয়ানগুলো পাঁচ-সাত বছর মেয়াদ খেটে এল কয়েক ক্ষেপ। মেয়েগুলো ধীরে ধীরে অপসারিত হল গ্রাম থেকে। কতক গেল ম্যালেরিয়ায়, কলেরায়—কতক বেরিয়ে গেল প্রলোভনে পড়ে যুদ্ধের বাজারে। এখন ঘোষপাড়ায় অবশিষ্ট আছে ছয় ঘর ঘোষ। পুরুষগুলো আজ অধিকাংশ মেয়াদ খাটছে। অল্প কয়েকজনের এখনও আছে বিয়ানগাই। লাঙল বলদ কারও নেই—থাকবে কী করে? নিজস্ব জমিই নেই কারও। আগে ওরা দুধের ব্যবসার সমান্তরালে নিজ জমিতে ফসলও ফলাতো। আজ যে কয়জন পুরুষ আছে পাড়ায়, তারা হয় ভাগে চাষ করে অথবা মজুর খাটে। একমাত্র ভীমা ঘোষের ভাইপো রতন ঘোষই হচ্ছে ব্যতিক্রম। এখনও তার বিঘে কুড়ি নিজ ভূমি আছে, একজোড়া বলদ আছে। নিজস্ব গোলা আছে—আর আছে হৃদয়! ওর কৃপাদৃষ্টি না থাকলে, সময়ে অসময়ে ওর কাছে হাত পাতবার সুযোগ না থাকলে বোধকরি ঘোষপাড়ায় ঐ মুষ্টিমেয় কটি প্রাণী এ কাল-যুদ্ধ পাড়ি দিতে পারত না। রত্নাকরের নামও আছে পুলিসের খাতায়। গ্রাম্য চৌকিদার নন্দ বলে রতনা একটি বাস্তুঘুঘু। কিছুতেই ওকে জড়াতে পারা যায়নি কোনও ডাকাতি কেসে।

এই স্বনামধন্য রতন ঘোষের বাড়িতেই ছুটতে ছুটতে এল ট্যানা।

—মোড়ল গো, খুড়োগো, তোমার বাঁশ কাটতি প্যায়দা আসতিছে।

গুলাব বেরিয়ে আসে। সঙ্গে তার বছর আষ্টেকের একটি ছেলে। মনুয়া। রতনের নাতি। ট্যানার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে—মোড়লমশায় কই? তেনার বাঁশ কাটতি প্যায়দা আসতিছে।

চকিত হয় গুলাব। রতন বাড়ি নেই। সেই সকালে উঠেই সে গেছে থানাসদরে। তার গোযানের চাকার পাটি পালটাতে। ধানকাটার সময় আসছে—গাড়িটা মেরামত করা দরকার—গ্রামে সে ব্যবস্থা আগে ছিল, আজ নেই। দ্বিজপদ কর্মকার এ কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে। ফলে ফিরতে তার সন্ধে হয়ে যাবে। গুলাববউ অস্থির হয়ে ওঠে। বাড়িতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই। রতনের দুই জোয়ান ছেলে ছিল—তারা আজ নেই।

বড়টার দ্বীপান্তর হয়েছিল—আর ফেরেনি। ছোটটা যায় ডেঙ্গুজ্বরে। গুলাবের সংসারে আছে তার প্রৌঢ় স্বামী আর বড় ছেলের একমাত্র ছেলে নাবালক মনুয়া আর তার মা। ফুলটুসীও বাড়ি নেই—জল আনতে গেছে। পাড়ায় অবশ্য পুরুষ আছে। মনুয়াকে দিয়ে খবর পাঠালে মোড়লের ইজ্জত রাখতে নিশ্চয় সমবেত হবে ঘোষপাড়ার অবশিষ্ট ক'টা জোয়ান। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

ইতস্তত করতে করতেই এসে পড়ে হরকিষণ, কাদের আর জনাবলি। হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে আসে হরকিষণ। একটা অশ্লীল গাল দিয়ে সে আহ্বান করে রতনকে। গুলাব অবাক হয়ে যায়! তার স্বামী যে বাড়ি নেই এটা ওদের জানার কথা নয়—তা সত্ত্বেও ওরা এভাবে প্রকাশ্য-যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহস পাবে এটা তার কল্পনাতীত। হোক ওরা তিনজন—ওর স্বামীও তো রতন ঘোষ! তাকে আর কেউ না চিনুক, হরকিষণ আর জনাবালি চেনে ভালো করেই। ওরা তিনজনই এ গাঁয়ের লোক! ওদের না-জানা নয় যে, তেলপাকা চারহাত লম্বা লাঠিখানা নিয়ে যদি একবার রতন ঘোষ ঘুরে দাঁড়ায়—তাহলে ওদের তিনজনের মিলিত শক্তিরও সাহস হবে না তাকে আক্রমণ করতে। হরকিষণের এতটা সাহস হয় কোথা থেকে? বন্দুক নিয়ে এসেছে নাকি ওরা?

বন্দুক অবশ্য ওরা আনেনি; কিন্তু হরকিষণ নিঃসংশয়ে জানে রতন বাড়ি নেই। সকালবেলা সে যখন বাঁশ কিনবার প্রস্তাব নিয়ে প্রথমবার আসে তখন রতনের সঙ্গে তার দেখা হয় খ'ড়ের বাঁধের উপর। উনপঞ্চাশ সনের বন্যায় বাঁধের যেখানটা ফেঁসেছিল সেখানে। বাঁশ বিক্রি করতে রতন যখন গররাজি হল তখন হরকিষণ বলেছিল—তবে হুজুরের কাছে চল।

রতন জবাবে বলেছিল—আমার সময় নাই এখন। আমারে সদরে যাতি হবে পাটি পালটাতে। ফিরতি যার নাম সেই সন্ঝে।

হরকিষণ তাই সন্দেহাতীতরূপে জানে প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত। দ্বিতীয়বার সে আহ্বান করে ঘোষকে। গুলাব ঘরের ভিতর থেকেই জানায়, ঘোষ বাড়ি নেই।

—ফিরে এলে তবে বলে দিস্ বাঁশ কেটে লিয়ে গেছি হামি।

হরকিষণ ধারালো কুঠারটা বারে বারে আঘাত করে মোটা বাঁশগাছের গোড়ায়।

গুলাব বউ ঘরের ভিতর থেকেই বলে—আমাদের বাঁশ কাটতিছ কেনে?

হরকিষণ আবার একটা অশ্লীল রসিকতা করে বলে—তো কী করবে হামি? রতন-শালা থাকলে ওর শিরটো কাটতোম—এখন উ ঘরে না-আছে তো ওকরাকা বাঁশ কাটছে!

জনাবালি ধমক দেয়—কী হচ্ছে হরকিষণ! অত কথায় তোর কাজ কী? বাঁশ কাটছিস, কেটে লিয়ে চল!

কাদের বলে—জনাবালি মিঞাভাইয়ের মেজাজটা সরিফ নেই, মনে লাগে?

জনাবালি জবাব দেয় না। একটু দূরে গাছতলায় গিয়ে বসে। হাতের লাঠিটা শুইয়ে রেখে বিড়ি ধরায়। হরকিষণ আর কাদের ক্রমাগত আঘাতে বাঁশটাকে কায়দা করে ফেলে। অসহায় নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে গুলাব বউ। উপায় নেই—এ অপমান আজ তাকে সহ্য করতে হবে। কিন্তু রাগের চেয়ে তার ভয় হচ্ছিল বেশি। রতন ফিরে এলে? তার

অপমানের কথা, অশ্লীল কথাগুলো যদিও সে গোপন করবে—কিন্তু জোর করে বাঁশ কেটে নিয়ে যাওয়ার কথা তো আর লুকানো যাবে না। রতনের রুদ্রমূর্তিকে তো তার চিনতে বাকি নেই! দীর্ঘদিন অবশ্য সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো শান্ত হয়ে আছে সে। নীলুর মেয়াদের পর রতন আর লাঠি ধরেনি। তার তেল চুকচুকে লাঠিগাছখানা গোঁজাই আছে আজ দীর্ঘদিন চালের বাতায়। এবার তো সেটা আবার উঠবে রতনের হাতে! ঐ বাঁকা বাঁশখানা যেমন করে লুটিয়ে পড়ল গুলাবের চোখের সামনে—ঠিক তেমনি করেই সে যে শুইয়ে দেবে জমিদারের ঐ পেয়াদা কটাকে। তারপর? তার অনিবার্য পরিণাম যে ফাঁসিকাঠ—অথবা নীলাম্বরের মত দ্বীপান্তর। সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে ওঠে গুলাব বউয়ের!

ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় মনুয়া। সে একেবারে ছুটে গিয়ে পড়ে হরকিষণের কছে। চিৎকার করে ওঠে গুলাব। মনুয়া হরকিষণের হাতটা চেপে ধরে, বলে—দাদাভাইয়ের বাঁশ কাটতিছ কেনে?

—আরে হারামির বাচ্ছা! ভাগ্! প্রচণ্ড ধাক্কা মারে হরকিষণ। তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ে মনুয়া। উঠে দাঁড়ায় ফের। ঠোঁটের কাছটা কেটে গেছে। চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। গুলাব চমকে ওঠে। ঠিক অমনি করে তাকাতো নীলু, নীলাম্বর! হরকিষণ কুঠারটা তুলে নিয়ে ভয় দেখায়—কী রে? ফিন আসবি?

গুলাব চিৎকার করে ওকে ডাকে। ছেলেটার কানে সে ডাক পৌঁছয় না। সে ক্ষিপ্ত হাতে তুলে নেয় একটা আধলা ইট। সজোরে ছুড়ে মারে হরকিণের মাথা লক্ষ্য করে। অব্যর্থ আমপাড়া লক্ষ্য! 'বাপ'...বলে বসে পড়ে হরকিষণ। বাঁ চোখ বেয়ে নেমে আসে একটা রক্তের ধারা। তড়িৎগতি হরিণশাবকের মতো মনুয়া ছুটে পালিয়ে আসে ঠাকুরমায়ের আঁচলের তলায়! গুলাব তাড়াতাড়ি ওকে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে আগড় দিয়ে দেয়।

বিরাট বাঁশখানা নিয়ে ওরা তিনজন যখন হাজির হল পূজামণ্ডপে তখনও মেজকর্তা সেখানে উপস্থিত। হরকিষণের আঘাত চিহ্নটা তাঁর নজরে পড়ল। এতক্ষণ বেশ উন্মনাই হয়ে ছিলেন তিনি। রতন ঘোষ লোকটি জমিদারেরও অপরিচিত নয়। ওঁর মনে হচ্ছিল বন্দুকটা নিয়ে যেতে বলা উচিত ছিল। তবে জনাবালি সঙ্গে আছে এইটুকুই ভরসা। রতন ঘোষের বাঁশ নিয়ে সশরীরে তিনজকেই ফিরে আসতে দেখে আশ্বস্ত হলেন তিনি। ঐ সামান্য আঘাতচিহ্নটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। হরকিষণকে ডেকে তার হাতে একখানা দশটাকার নোট দিলেন মেজকর্তা।

হরকিষণ চাকর হলেও লাঠিয়াল। হাত পেতে টাকাটা নিতে তারও মাথাটা যেন লজ্জায় নুয়ে পড়ল।

★ ★ ★

আশায় আনন্দে ভরা বুকে দিবাকর গিয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপে—পঞ্চায়েতের বিচার শুনতে। ফিরে এল যখন তখন আর তার সে উন্মাদনা ছিল না; মনে তার সংশয় জেগেছে। নানান অদ্ভুত চিন্তা জেগেছে। সেসব প্রশ্নের মীমাংসা কে করবে? উঃ, আজ যদি নিশীথদা থাকতেন? এখানে তার আশেপাশে যারা আছে তারা প্রশ্নটার মীমাংসা তা দূরের কথা—প্রশ্নের আলোচনাও বোধহয় করতে পারবে না।

রায়মশাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে সন্ধ্যাবেলায় ষোল আনার ডাক দিয়েছিলেন চণ্ডীমণ্ডপে। যে গ্রাম-পঞ্চায়েতের বস্তুত কোন অস্তিত্বই ছিল না এ কয় বৎসর, যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের বাজারে যার অকালমৃত্যু হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিল সবাই, সেই পঞ্চায়েত বসল সন্ধ্যাবেলায়। বহুদিন গ্রামের সকলে এভাবে মিলিত হয়নি—তাই অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিল দিবাকরও।

গ্রামের গণ্যমান্য মাতব্বর স্থানীয় প্রায় সকলেই এসেছিলেন। সাধারণ প্রজাও কেউ অনুপস্থিত ছিল না। রায়মশাই, শিরোমণি, ননীমাধব, সাঁইমশাই আসর জমিয়ে বসেছিলেন। রায়নার বিভূতি ঘোষ, পলাশডাঙ্গার নিমাই গরাঞ্ঞ পর্যন্ত এসেছিলেন গ্রামান্তর থেকে। ধানকলের রত্নেশ্বর শিকদারও যোগদান করেছেন পঞ্চায়েতের সভায়।

চণ্ডীমণ্ডপের গঠনটি বড় বিচিত্র। ছাতিম গাছটিকে কেন্দ্র করে ছাতির শিকের মতো চারিদিকে নেমে গেছে আধলা-তালের চালসাঙা বা রলা। তার উপর পাড়, পাড়ের উপর পাটি, তার উপর সাঁরক, কোঁড়, শলা বাকারির ঘন ঠাস-বুনানি। চণ্ডীমণ্ডপটা ছেয়েছিল ভীমা ঘোষের বাপ লক্ষ্মণ ঘোষ বাংলা সাতসনে। গোয়ালার সন্তান হলেও ভাল ঘরামি ছিল সে। খড়ের চালার উপর চাপান দেওয়া হয়েছে মাঝে মাঝে—কিন্তু চালের কাঠামোটা পালটাবার প্রয়োজন হয়নি পঞ্চাশ বছরেও! আজকাল এমন উলুছনের ছাউনির কাজ জানে না কেউ। জানবে কোথা থেকে? এটা যে টিন আর টালির যুগ।

চণ্ডীমণ্ডপের উপর যাদের ঠাঁই হয়নি তারা দাঁড়িয়েছে চারিধারে। ধানকলের বড়বাবু রত্নেশ্বরের উৎসাহটাই যেন বেশি। বড় সতরঞ্চিটা সেই এনেছে ধানকলের গুদাম থেকে—পেট্রোম্যাক্সও এনেছে একটা। দিবাকর যখন এসে পৌঁছাল তখন মজলিস অনেকটা এগিয়ে গেছে। জগবন্ধু ডাক্তার জমিদারের অত্যাচারের একটা মর্মান্তিক বিবরণ পেশ করে তার মতামত জানাচ্ছিল। চৌধুরীবাড়ির পূজা যে গ্রামের পূজা নয় একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন কমলাপতি তাঁর রূঢ় ব্যবহারে। এতদিন সকলে এ বিষয়ে মাথা ঘামায়নি—কারণ ঘামাতে গেলেই তার ঘর্মসিক্ত মাথাটি মুড়িয়ে দিয়েছেন জমিদার। কিন্তু দিনকাল পালটে গেছে। অতবড় জাঁদরেল হিটলার-মুসোলিনি পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তা সামান্য বনগাঁয়ের শেয়ালরাজা! আজ অন্তত জমিদারের বোঝা উচিত যে, পূজার তিন দিন চাল-ডালের লপ্‌সি আর কুমড়োর ঘন্ট খেতে ছুটবে না গ্রামের লোক পুজো-বাড়ির লঙ্গরখানায়। এতদিন এরা পূজায় প্রসাদ নিতে গিয়েছে—অধিকার আছে বলেই গিয়েছে। আজ যখন জমিদার নিজমুখেই বলেছেন যে, পূজা তাদের নয়—গ্রামে তাঁরা থিয়েটার দেখাতে এসেছেন কিন্তু গাঁইয়াদের প্রতি তাঁদের ঘৃণা বিন্দুমাত্র কমেনি তখন সেই গাঁইয়ারাও গিয়ে পাত পাতবে না জমিদার বাড়ি।

—ভাইসব, বক্তৃতা দিচ্ছিল ডাক্তার—আমরা প্রমাণ করব যে, আমরা কুকুর নই। দু টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিলেই ছুটে গিয়ে পড়ব ওখানে, এ ধারণাটা ওদের ভুল। স্বাধীনতা আসন্ন, সামন্ততন্ত্রের যুগ শেষ হয়েছে; প্রজাতন্ত্রের নূতন সূর্য এবার উঠবেন উদয় গগন—

শিরোমণি একটা মস্ত হাই তুললেন, সশব্দে তুড়ি বাজিয়ে। ডাক্তার বিরক্তভাবে একবার তাকাল তাঁর দিকে। শিরোমণি নির্বিকার। মজলিসের অনেকেই নিম্নস্বরে

নিজেদের ভিতর আলোচনা করছে। ডাক্তার আবার তার বক্তৃতার হারানো খেই ধরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ রায় বললেন—এবার তুমি বস।

—বসব? —অবাক হয়ে যায় ডাক্তার। এত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, তার। কিন্তু রায়মশাইকে উপেক্ষাও করা যায় না। বলে, আমার প্রস্তাবটা তাহলে এবার পেশ করি, আপনি সমর্থন করুন।

রায়মশাই বিরক্ত হয়ে বলেন—কী পাগলামি করছ! প্রস্তাব করা, সমর্থন করা আর হাত তুলে ভোট দেওয়া সিকেয় তুলে রাখ! একি তোমার ইউনিয়ন বোর্ডের মিটিং? বস চুপ করে। পঞ্চায়েতের মজলিস সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই।

ডাক্তার আর কোন কথা বলে না। ছাত্রজীবনে অনেক বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করা আছে তার। এই গ্রাম্য মিটিংটার সম্বন্ধে তার ধারণা নেই একথাও শুনতে হল? রায়মশাই এবার মজলিসের দিকে ফিরে বললেন—ব্যাপার তো সবই শুনলেন, আপনারা, এবার বিচার করে বলুন আমাদের কী করা উচিত। ঘোষমশাই কী বলেন? ননীমাধব ভায়া কী বলছ?

ঘোষমশাই জবাব দেন না। ননীমাধবও নীরব। কথা বললেন পলাশডাঙার বৃদ্ধ নিমাই গরাঞ। বলেন, রায়, ছিপে গেঁথে তোলার মাছ যে নয় তা তুমিও বুঝছ, আমরাও বুঝছি। কমলপুরের পঞ্চয়েতের ডাকে তাই এই বুড়োকে পলাশডাঙা থেকে দৌড়ে আসতে হয়েছে। এ ব্যাপারে যা করব তা দশে মিলে করতে হবে। পাঁচখানা গাঁ যেন এক রা কাটে। দিনকাল অবশ্য পালটে গেছে;—কুলোপানা চক্করটাকে তোমরা আমল না দিতে চাও না-ই দিলে—আমি তো শুধু সে কথাই ভাবছি না, আমি ভাবছি মায়ের কথা। অপমানটা যেন শেষে মা না নিজে গায়ে পেতে নেন। তাহলে শুধু কমলপুর নয়—এ তল্লাটে আর আমাদের মুখে জল দেবার কেউ থাকবে না।

এ কথায় সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়। কথাটা মনে লাগে। মায়ের পূজায় যাবো না বলাটা কি ঠিক? ডাক্তারের ভীষণ রাগ হয়। যত সব 'ফুলিশ সেন্টিমেন্টালিটি!' শিরোমণি টিকি-সমেত মাথাটা নেড়ে বলেন—আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম, বুঝলে? তাই তো রায়ভায়াকে বললাম, পলাশডাঙার গড়াঞমশাইকে খবর দাও। বিপদে পড়লে—তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার!

বৃদ্ধ গরাঞ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সত্যিই তিনমাথাওয়ালা হয়ে বসেছিলেন এতক্ষণ।

ননীমাধব বলেন—তাহলে?

মজলিসের গতি কোনমুখে তা বুঝতে দেরি হয় না ডাক্তারের। সে আর স্থির থাকতে পারে না। বলে ওঠে—আহা, আমরা তো আর দুর্গাপূজা বন্ধ করতে চাইছি না। চৌধুরীবাড়ির পূজা বর্জন করা মানে এ নয় যে, আমরা গ্রামে দুর্গোৎসব করব না। আমরা সার্বজনীন পূজা করব।

সচকিত হয়ে বাধা দেন রায়মশাই—ফের তুমি কথা বলছ, ডাক্তার? বোঝ না সোঝ না ফরফর কর কেন? বারোয়ারী পূজা কি আর কমলপুরে সম্ভব? যুদ্ধে আর দুর্ভিক্ষে কারও কি আর সেদিন আছে? কে দেবে এত টাকা? গাঁয়ে সম্পন্ন মানুষ

কই? তা যদি থাকত তাহলে অনেকদিন আগেই আমরা ও কাজে হাত দিতাম—না কি বল মেজভায়া?

ননীমোদকও কমলপুরের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। রায়মশায়ের পরেই তাঁর স্থান। হেসে বলেন—তাতো বটেই!

ডাক্তার আবার কী বলতে যায়। তাকে থামিয়ে দিয়ে রায় বলেন—তাছাড়া আমার অত বুকের পাটা নেই। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি—মায়ের পূজা করতে চাওয়া কি চাট্টিখানি কথা?

সাঁইমশাই বলেন—সে হয় না; নমো নমো করে সারলেও এ বাজারে ছ'সাতশো টাকার ধাক্কা! কে নেবে সে দায়িত্ব?

বৃদ্ধ নিমাই গড়াঞ বলেন—বুঝলাম! তাহলে আর বেশি লাফালাফি কর না বাপু। চিরকাল যেমন চলছে তেমনিই চলুক। থ্যাটার দেখতে না যাও—যেও না, কেউ মাথার দিব্যি দিচ্ছে না; কিন্তু মায়ের পূজায় যেতেও হবে—পাত পেড়ে প্রসাদও খেয়ে আসতে হবে।

শিরোমণি হেসে সায় দেন—ঠিক এই কথাই আমিও এতক্ষণ বলব বলব ভাবছিলাম, বোয়েছ? জমিদার অন্যায় করেছেন বলে তো মায়ের পূজা বর্জন করতে পারি না? ওরে বাবা! মা আমার দশভুজা! একখানা হাত বার করে দিলেই কমলপুর শ্মশান! তাই আমি রায় ভায়াকে বলছিলাম—পূজায় যেতেও হবে, খেতেও হবে; তবে ঐ হ্যাঁ—থ্যাটার আমরা দেখব না কেউ!

রাগে ফুলতে থাকে ডাক্তার! শিরোমণি যে হঠাৎ কেন এত দয়াপ্রাণ হয়ে উঠেছেন তা বুঝতে বাকি নেই তার। তিনিই জমিদারবাড়ির আবহমান কালের পূজারী। বাৎসরিক পূজারী। বাৎসরিক প্রাপ্যটা বড় কম নয় তাঁর সংসারে।

রায় বলেন—ষোল-আনার বিচারে তাহলে এই সিদ্ধান্ত হল? আর কারও কিছু বলার নেই তো?

বলার অনেক কিছুই ছিল ডাক্তারের। দিবাকরেরও। কিন্তু তারা নিরুপায়।

উঠে দাঁড়ায় রত্নেশ্বর। আব্বাসভাই কোম্পানির ম্যানেজার রত্নেশ্বর শিকদার। হাতদুটি জোড় করে বলে—অনুমতি যখন করলেন রায়মশাই, তখন আমিও কিছু নিবেদন করি। আমরা অবশ্য গাঁয়ে নতুন এসেছি। তবু এটাকে নিজের গাঁ বলেই মনে করি। অপমানটা আমাদের গায়েও কম বাজেনি। কাল ক'লকাতা থেকে বড়সাহেব এসেছেন। তাঁকে সময়মতো সব কথা বললাম। ডাক্তারবাবু আর শিরোমণি মশায়ের অপমানের কথা। রতনের বাঁশ কাটার কথা। খানদানি পাঠানের রক্ত তো—হঠাৎ আগুন হয়ে উঠল। বললেন—তা গাঁয়ে কি মরদ নেই? আমি সুযোগ বুঝে বলি—হুজুর, তা আপনিও তো আজ গাঁয়ের মরদ! পাঠানকোটের মানুষ সেজে সরে দাঁড়ালে চলবে কেন? আপনি একবার হুকুম করুন; আমরা দেখিয়ে দেই গাঁয়ে মরদ আছে কি না?

এই পর্যন্ত বলে রত্নেশ্বর একবার মজলিসের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে নেয়। উৎসাহভরা চোখে চেয়ে আছে মানুষগুলো। কে একজন বলে—তারপর! শুনে আব্বাসভাই কী বললেন?

বললেন—আপনাদের পুতুল পুজোর ব্যাপারে আমার সাহায্য করা কি ঠিক হবে? আমি বললাম—সে আপনার মর্জি! তবে সাহায্য গ্রহণ করতে এঁরা বোধহয় গররাজি হবেন না। তখন উনি বললেন—সেটা ওঁদের জিজ্ঞাসা করে দেখ। ওঁরা আলাদাভাবে উৎসব করতে চাইলে আমি অর্ধেক খরচ দেব!

ডাক্তার উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে। অর্ধেক খরচ যদি আব্বাসভাই কোম্পানি বহন করে তবে বাকি অর্ধেক কি সকলে মিলে তুলতে পারবে না! রত্নেশ্বর তারপরেও জানায়, বড়হুজুর অর্ধেক খরচ দিচ্ছেন—এ ছাড়া ছোট-তরফ আহ্‌মেদজি ভাইকে ধরলেও কিছু না হক শ'দুই চাঁদা পাওয়া যাবে। আসলে ধানকল কোম্পানিই সব ব্যয়ভার বহন করতে রাজি—তবে পূজাটা হিন্দুদের, তাই এঁরা নামমাত্র। চাঁদা তুলে সার্বজনীন বারোয়ারী পূজার রূপটা বজায় রাখুন।

সমস্ত মজলিসটা উৎসাহে একযোগে কাজ করে। অনতিবিলম্বেই অনুভূত হয় মজলিসে বড়হুজুরের উপস্থিতিটা একান্ত প্রয়োজনীয়। যুদ্ধের বাজারে আব্বাসভাই কোম্পানি এ গ্রামে প্রোকিওরমেন্ট গুদাম খুলে বসেছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ফুলে ফেঁপে গেছে ব্যবসা। চৌধুরীদের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে ধানকল বসিয়েছে তারপর। লিগ মিনিস্ট্রির কোন বড়কর্তার সঙ্গে উত্তর ভারতের এই আব্বাসভাই পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক আছে। রাতারাতি গ্রামে ওরা জমিদারের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। আব্বাসভাই, আহ্‌মেদজীভাইও গ্রামে থাকেন না—কারবারের দেখাশোনা করে রত্নেশ্বর ম্যানেজার। সেই মজলিসকে জানায় বড়হুজুর এখনও শুয়ে পড়েননি। সুতরাং আজ রাত্রেই তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। মৌলানা আব্বাসভাই চণ্ডীমণ্ডপে আসবেন এটা আশা করা চলে না—অগত্যা স্থির হল মজলিসটাই ধানকলের দ্বারস্থ হবে। উৎসাহে উত্তেজনায় তখন সকলে উঠে পড়ে। পলাশডাঙার বৃদ্ধ গড়াঞি হাতদুটি জোড় করে বলেন—এবার তাহলে আমাকে ছুটি দেন আপনারা। আমাকে অনেকটা পথ যেতে হবে। কেষ্টপক্ষের রাত—বেশি দেরি করব না।

রায়মশাই দু একবার অনুরোধ করেন; কিন্তু গড়াঞিমশাই আর থাকতে রাজি নন। গাড়োয়ানটাকে ডেকে বলেন—টাপরটার দুধার ঢেকে দে বাবা, হিম পড়তে শুরু করেছে।

রায় বলেন—আপনি তাহলে অনুমতি দিয়ে যান গড়াঞি কাকা।

বৃদ্ধ নিমাই গড়াঞি মুখটা রায়ের কানের কাছে এনে বলেন—ভাল করে ভেবে দেখ রায়—মায়ের পূজায় ম্লেচ্ছের টাকা নেবে তো তোমরা?

রায় বাঁ চোখটা ছোট করে বলেন—সে আমি ভেবে রেখেছি কাকা, নোটগুলো গঙ্গাজলে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেব!

দিবাকরের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না এ ব্যাপারে গ্রামের লোক শেষ পর্যন্ত আব্বাসভাই কোম্পানির দ্বারস্থ হয়। না, ম্লেচ্ছের টাকা বলে আপত্তি নেই তার। সে ভাবছিল অন্য কথা। চৌধুরীরা হাজার হলেও গ্রামের মানুষ। এই গ্রামের জল-হাওয়ায় মানুষ হয়েছে তাদের পূর্বপুরুষ। আজই না হয় জমিদার গ্রামে থাকেন না—কিন্তু চৌধুরীবাড়ির যোগাযোগ আজও আছে গাঁয়ের সঙ্গে। কমলাপতির বড়ভাই সারদাপতির

মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা জাহ্নবী দেবী একমাত্র মেয়ে উমাকে নিয়ে গ্রামেই বাস করেন। দেওরের সঙ্গে শহরবাসী হননি তিনি। চৌধুরীবাড়ির পূজার সঙ্গে শুধু কমলাপতি আর শ্রীপতিই নয়, জড়িত আছেন জাহ্নবী দেবী আর উমা। চৌধুরীরা এ গ্রামেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। গ্রামকে যদি বাঁচতে হয় তবে ঐ চৌধুরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে বটে—তবে কোনও তৃতীয়পক্ষের অঞ্চলতলে আশ্রয় নিয়ে নয়। জমিদারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তিনি যদি গ্রামবাসীর কাছ থেকে জমিদারের প্রাপ্য সম্মান প্রত্যাশা করেন তবে গ্রামবাসীও তাঁর কাছ থেকে আশা করবে প্রজার মর্যাদা। এ বোঝাপড়া গাঁয়ের ঘরোয়া ব্যাপার। এখানে তৃতীয়পক্ষ অবান্তর বা অবাঞ্ছনীয় শুধু নয়—এর পরিণাম ভয়াবহ! পলাশীর ইতিহাস মনে পড়ে দিবাকরের। কমলাপতি আজ আবার আলিবর্দীর ভূমিকা নিয়ে নেমেছেন। শ্রীপতি চমৎকার অভিনয় করে চলেছে সিরাজের চরিত্র! দুর্ভাগ্য গ্রামবাসীর—এ বিবাদে সাহায্য ভিক্ষা করতে ওরা দ্বারস্থ হয়েছে আব্বাসভাই কোম্পানির বড় কর্তা লর্ড ক্লাইভের কাছে! একবার মনে হল তার আশঙ্কার কথা এদের বুঝিয়ে বলা দরকার। কিন্তু পরমুহূর্তেই বোঝে—বৃথা চেষ্টা। রায়মশাই আর ননীমাধব আজ জগৎশেঠ আর রায়দুর্লভ! এ সময় এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অর্থ হল মোহনলালের ভাগ্যকে বরণ করে নেওয়া।

ভাল হল না, এ ভাল হল না—এ কথাই ভাবতে ভাবতে দিবাকর নেমে আসে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। হঠাৎ তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রত্নাকর ঘোষ—আপনারে তো যাতি দুব না। আমার বিচারটা করি দিয়ে যাতি হবে আপনারে!

বিস্মিত হয় দিবাকর। পরমুহূর্তেই তার মনে হয় সকলের কাছেই তো সে অপ্রয়োজনীয় নয়। তাকে শ্রদ্ধা করে এমন লোকও তো আছে গ্রামে। প্রহ্লাদ বায়েন, শ্রীনাথ মালাকার, রতন ঘোষ তো আজও তারই দিকে তাকিয়ে আছে! কেন এমন হয়? ওরা তো জানে দিবাকরের ক্ষমতা কত অল্প। তার না আছে লোকবল, না অর্থবল। তবু ওরা রায়মশাই-ননীমাধবের কাছে না গিয়ে তার কাছেই বা আসে কেন? গ্রামের যারা তথাকথিত মাতব্বর তারা গ্রামবাসীর স্বার্থ দেখে না বলেই? গ্রামের সমাজ ব্যবস্থার গভীরে ঘুণ ধরেছে বলেই এমন হয়। গ্রাম্য-সংহতি নষ্ট হয়ে গেছে! বাইরে থেকে কোন আঘাত আসছে না বলেই বনিয়াদের এই ফাটল বোঝা যায় না। যদি কোনদিন আঘাত আসে তাহলেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা! রতনকে বলে—আমাকে আবার কেন ডাকছ রতন? আমি তো কোন সাহায্য করতে পারব না তোমাকে। ওঁদের কাছে বল, ওঁরা যদি থানায় যেতে বলেন যেও—অথবা যা পরামর্শ দেন...

ডাক্তার ওপাশ থেকে বলে—কই হে পণ্ডিত? তুমি আবার দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এস।

দিবাকর বলে—আমি এবার বাড়ি যাই ভাই। আমার এসব ভালো লাগছে না।

ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে ডাক্তার বলে—ভাল লাগছে না? তা লাগবে কেন? অথচ তুমিই না প্রথমে উস্‌কেছিলে? যাক! এ রকম হবে তা জানি। কাজের সময় অনেকেই যে

পিছিয়ে যাবে তা আমার অজানা নেই। তাই বলে তো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে পারি না! চলুন রায়মশাই, আমরা এগোই।

পণ্ডিত পায়ে পায়ে ফিরে চলে। অন্যমনস্কের মতো অতিক্রম করে পথ। ডাক্তারের অভিযোগটা একেবারে মিথ্যা নয়। সেই তো প্রথম ধুয়ো তুলেছিল। কিন্তু সে কি চৌধুরীদের কবল থেকে আব্বাসভাই কোম্পানির খপ্পরে পড়ার জন্য? তবু উপায় কী? এতগুলি লোক যে যার স্বার্থ দেখছে। গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন, সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনের দিকে কারও দৃষ্টি নেই। যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এ স্বার্থপরতার ফল কখনও ভালো হতে পারে না। রায় চাইছেন কীভাবে কমলাপতিকে অপদস্থ করবেন—নবাবকে অপদস্থ করতে চাইছেন জগৎ শেঠ। ডাক্তার চাইছে কী করে একটা থিয়েটার লাগিয়ে দেওয়া যায় যাতে সে নিজে চাণক্যের ভূমিকা অভিনয় করতে পারে। শিরোমণির উদ্দেশ্য জমিদাব বাড়ির বাৎসরিক প্রাপ্যটা যেন মাঠে মারা না যায়। প্রহ্লাদ বায়েন বাজনদারের পদপ্রার্থী, শ্রীনাথ মালাকার সোলার সাজ পেলেই সন্তুষ্ট, আব্বাসভাই জনমতকে নিজের দিকে টানতে চান, সুবল কাওরা কবিগানের পালা চায়, আর রতন চায় তার বাঁশখানা ফেরত। না ভুল হল পণ্ডিতের—রতন শুধু বাঁশখানা ফেরতই চায় না—সে চায় জমিদারের আভিজাত্যকে চিৎ করে ফেলে ঐ বাঁশখানা দিয়েই চেপে ধরতে। ধনগৌরবমত্ত জমিদার ওদের অপমান করেছেন—এটা ওরা সবাই মেনে নিয়েছে—সেটা যেন ওদের স্বার্থসিদ্ধির মূলধন, তার বেশি কিছু নয়। ঘটনাটা দিবাকর যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখছে সে দৃষ্টি কারও নেই ওদের। ঘটনা সামান্য কিন্তু এ থেকেই বোঝা যায় সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদে কোথাও ঘুণ ধরেছে। এমন স্বার্থপরের সমাজব্যবস্থা টিকতে পারে না—এর ভাঙন অবশ্যম্ভাবী—বাইরের একটি আঘাতের অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য বাইরের আঘাত আসবার কোন সম্ভাবনা আর নেই, যুদ্ধ শেষ হয়েছে। হয়তো পঙ্গু বৃদ্ধের মতোই টিকে থাকবে এই গ্রাম্য সমাজ আরও অনেক দিন।

হঠাৎ থেমে পড়ে দিবাকর। এ কোথায় এসে পড়েছে সে ? গ্রামপ্রান্তে জলাঙ্গীর বাঁধের ধারে চলে এসেছে অন্যমনস্কের মতো। ওরা বলে খ'ড়ের বাঁধ—জলাঙ্গী নামটা পোশাকি—ম্যাপে পাওয়া যায় মাত্র। ওর ডাক নাম খ'ড়ে। দিবাকর মাটির বাঁধের উপর উঠে বসে। জলাঙ্গীর জলে নেমেছে কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির ঘন যবনিকা। জল দেখা যায় না! ওপারের মোল্লাহাটির কুটিরে দূরে দু-একটি বাতি জ্বলছে। বায়েন পল্লীতেও জ্বলছে এক-আধটা টেমি। বাঁধের উত্তর ধারে লণ্ঠন হাতে চলেছে একজন পথচলতি মানুষ। অন্ধকারে মানুষটাকে দেখা যায় না। লণ্ঠনটা দুলছে শুধু। সূর্য এখন কন্যারাশিতে। পশ্চিম দিগ্বলয়ে বৃশ্চিকরাশির বঙ্কিম জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে দিবাকরের মনের প্রশ্নের মতোই। রাত তাহলে একপ্রহর হয়েছে। নাম-না-জানা মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে কোথা থেকে। গ্রামপ্রান্তে এই নির্জন অবকাশে দিবাকর কেমন যেন নিঃস্ব রিক্ত বোধ করতে লাগলো। কেন সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না এই গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে? এই গাঁয়ের জলে-হাওয়ায় সে বড় হয়ে উঠেছে—তার প্রতি জীবকোষে এই গ্রামের আশীর্বাদ লেগে আছে, তবু গ্রামে থেকেও সে গ্রামছাড়া। তার কথায় নাকি আছে ঘরভাঙার সুর। তার আহ্বানে আছে বিষের বাঁশীর তান। সে স্বদেশী দলের লোক!

ইংরাজ এদেশের যত ক্ষতিই করুক—একটি মহা উপকার করে গেছে তারা দিবাকরের ব্যক্তিগত জীবনে। সে ছিল নদীয়ার পল্লীপ্রান্তে এক নগণ্য কিশোর পণ্ডিত! নিতান্ত চাষীঘরের ছেলে। তার বাবা নিজে হাতে লাঙলের মুঠ ধরেছে; তার মা বীজধান আঁটি বেঁধে নিয়ে গেছে এ-মাঠ থেকে ও-মাঠে। ছেলেবেলায়, মনে আছে দিবাকরের, আধ হাত কাদার মধ্যে বাপকে দেখেছে—ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির ভিতর মাথায় টোকা চাপিয়ে খালি গায়ে ধানের রোয়া দিতে। নিজেও সে সাহায্য করতে গিয়েছে বাপকে—তার চাষের কাজে। ওর বাপ কিন্তু ওকে বেশি ডাকতো না। তার স্বপ্ন ছিল দিবাকর লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে। হাকিম হবে সে, দারোগা হবে! সে সব কিছুই সে হয়নি। গাঁয়ের পাঠশালার মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছিল তার শিক্ষা। ইংরেজি শিখবার সুযোগ তার আসেনি। এই বয়সেই সে পিতৃহীন হয়। লেখাপড়া ছাড়তে হয় তাকে। সে চাষে মন দিল—খুলে বসল একটি পাঠশালা কিশোর বয়সেই; তারপর এল বেয়াল্লিশ সাল। তারকদা, জগন্নাথদা, স্মরজিতদা কারারুদ্ধ হলেন! অর্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজারে খবর বের হল মেদিনীপুরের, বালুরঘাটের, বালিয়ার আন্দোলনের কথা! কিশোর দিবাকরের রক্ত গরম হয়ে উঠল! একরাত্রে বের হয়ে পড়ল টেলিগ্রাফের তার কাটতে...

তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল যেন। ভাল মনে নেই ঘটনাগুলো। থানা—অত্যাচার...পুলিস ভ্যান...আদালত! বন্দী হয়ে পড়ল কৃষ্ণনগরের জেলখানায়—পরে বহরমপুরে। ইংরেজি স্কুলে কোনদিন যার অক্ষর পরিচয় হয়নি, সেই শুভঙ্করী আর আদ্য পর্যন্ত বিদ্যা সম্বল করে দিবাকর গোস্বামী গিয়ে হাজির হল এমন একটি পিঁজরাপোলে যেখানে কেউ দর্শনে, কেউ ইংরেজিতে এম, এ. দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। জেলার জন-নেতাদের সেই চাক্ষুষ দেখবার সুযোগ হল। কবি বিজয়লালকে দেখল—হরিপদদাকে দেখল, তারকদাকে দেখল। ওঁরা এই কিশোরটিকে সানন্দে লুফে নিলেন। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করল সে। নিশীথদা স্বয়ং নিলেন ওকে পড়াবার ভার। ফার্স্টবুকের সেই 'একটি ধূর্ত শৃগাল একটি মুরগীর সাক্ষাৎ পাইল' দিয়ে শুরু হল সে শিক্ষা—তিন বছর পর নিশীথদা অধ্যাপনা সারা করেছিলেন শিখিয়ে কীভাবে সঙ্ঘবদ্ধ মুরগীর দলের পক্ষেও ধূর্ত শৃগালকে বিতাড়ন করা সম্ভব! সৌভাগ্যক্রমে নিশীথদার সান্নিধ্যে তিন বছরই থাকতে পেয়েছিল সে। ইতিমধ্যে নিশীথদাও পোলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ. পাশ করেন জেল থেকেই। দিবাকরও আই. এ. পাশ করেছিল। ইংরেজের কাছে দিবাকর এই একটিমাত্র কারণে কৃতজ্ঞ!

গ্রামে ফিরে দেখে সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। সে স্বদেশী দলের লোক—তাকে ওরা বিশ্বাস করতে পারে না কেউ। তার যুক্তিতে কান দেয় না।

কিন্তু ঠিক কি তাই? গ্রামে এমন লোকও তো যথেষ্ট আছে যারা তাকে স্নেহ করে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। ঐ শ্রীনাথ মালাকার তো আর কারও কাছে জানতে যায়নি মায়ের সাজে তার হক আছে কি না। রতন ঘোষও তো তাকেই ডাকল বিচার করে দিতে। তারাপ্রসন্ন তাকে স্নেহ করেন, করেন জাহ্নবী। এই প্রসঙ্গে আরও একটি রাত্রির কথা মনে পড়ে যায় ওর। এই গাঁয়েরই একটি মেয়ের কথা। সেও তো মনের কথা বলতে এসেছিল একমাত্র তাকেই। তার কুমারী হৃদয়ের গোপন দুয়ার মেলে ধরেছিল

তার সামনে। দিবাকর নিজেই সরে এসেছিল। সে কি ওর দুর্বলতা? ভাল করেছিল কি? এ প্রশ্নের জবাব আজও মেলেনি। আজকের এই নির্জন সন্ধ্যায় সেই রাত্রির কথাটাই বা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে কেন? এতদিন তার ধারণা ছিল ভালই করেছে সে। তার চাল নেই, চুলো নেই, সে ছিল সরকারের চোখে সন্দিগ্ধ ব্যক্তি। যে কোনদিন আবার তাকে বিনা কারণে ধরে নিয়ে যেতে পারে ওরা। তখন? উমা না হয় ছিল ছেলেমানুষ, সে তো তা ছিল না!

কমলাপতি সপরিবারে যশোরবাসী। সেখানেই তাঁর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির ব্যবসা। উমা আর তার মা জাহ্নবী দেবী গ্রামেই থাকতেন। জায়ের সংসারে গিয়ে থাকতে রাজি হননি সারদাপতির বিধবা। দয়াময়ী অবশ্য লোক খুবই ভাল, জাহ্নবীকে বড় বোনের মতোই শ্রদ্ধা করতেন; কিন্তু জাহ্নবীই রাজি ছিলেন না গ্রাম ছেড়ে যেতে। উমা ছেলেবেলা থেকেই পড়তে আসত দিবাকরের পাঠশালায়। মেধাবী ছাত্রী ছিল সে। পাঠশালার সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়ে বলে স্নেহটা তাকে বেশিই করত দিবাকর। তারপর একটু বড় হতে পাঠশালায় আসা বন্ধ হয়ে গেল উমার। গ্রামের সমাজে নয় দশ বছর বয়েসই বা কম কী? জাহ্নবীর ইচ্ছা ছিল বাড়িতে পড়ে উমা বৃত্তি পরীক্ষা দেয়। দিবাকর তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাকে পড়াতে যেত চৌধুরীবাড়ি। অতবড় বাড়িটাতে একপ্রান্তে বাস করতেন জাহ্নবী মেয়েকে নিয়ে। মহলের পর মহল পড়ে থাকতো তালাবন্ধ। বার-বাড়ির ঘরগুলোয় অবশ্য থাকত জমিদারীর কর্মচারীরা। বার্নিশকরা আবলুশের টেবিলে সবুজ ডোমবসানো সেজ-বাতি মাঝখানে রেখে মুখোমুখি বসত মাস্টার আর ছাত্রী। পড়া দিত, পড়া নিত। এ ঘরটা উমার নিজস্ব। দাবার ছকের মতো পাথর বসানো মসৃণ মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে কখনও কখনও জাহ্নবী দেবীও এসে বসতেন। মাঝারি আকারের ঘর। বড় বড় জানলা। সেগুনকাঠের কাজ করা একটা পালঙ্ক, কাচের গা-আলমারি ভর্তি রঙ-বেরঙের পুতুল, দেওয়ালে খানকয়েক বড় বড় ছবি। টেবিলে থাকত একটা ফুলদানি—রোজই সেখানে দেখা যেত টাটকা ফুলের গুচ্ছ। উমা শ্রদ্ধা করত দিবাকরকে। ওর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার দিকে ছিল তার অন্ধ মনোযোগ। শুধু লেখা-পড়াই নয়, উমাকে সে গার্হস্থ্য জীবনের নানান বিষয়ে উপদেশ দিত। মনে আছে, একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল...আলমারি ভর্তি ঐ সব কাচের পুতুল কার?

—আমার, দেখবেন? কী সুন্দর সব পুতুল! মায়ের কাছ থেকে চাবি এনে আলমারি খুলে দেখিয়েছিল উমা। চীনামাটির বিলাতি পুতুল। দিবাকর বলে—এসব বিলাতী পুতুল আর কিনো না...

—কেন মাস্টারমশাই? অবাক হয়ে যায় উমা। তখন ওর বয়স কতই বা? কী জানে সে দুনিয়ার? দিবাকর ওকে বোঝাতে থাকে। দেশের শিল্প কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিদেশীরা কেমন করে চটকদার পুতুল এনে হারিয়ে দিচ্ছে ঘূর্নির পটুয়াদের; সোনার ভারতের সমস্ত সম্পদ চলে যাচ্ছে সমুদ্রের ওপারে। উমা চুপ করে শোনে। সব শুনে বলে—তাহলে এগুলো ফেলে দেবো মাস্টারমশাই?

—না, ফেলে দেবার দরকার নেই। আর কিনো না।

উমার পুতুলের আলমারিতে আর নতুন পুতুল আসেনি।

আর একবার দেওয়ালের একখানা ছবি দেখিয়ে বলেছিল—এ ছবিখানা তোমার পড়ার ঘর থেকে সরিয়ে রেখ।

জাহ্নবী ছিলেন ঘরে। প্রশ্ন করেছিলেন—কেন দিবাকর?

—ওটা পড়ার ঘরে ঠিক মানায় না!

বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের ছবি একখানা। রবিবর্মার প্রিন্ট।

উমা প্রশ্ন করেছিল—কেন মানায় না মাস্টারমশাই?

উত্তর দিয়েছিলেন জাহ্নবী—আমি পরে তোমায় বুঝিয়ে দেব।

পরের দিন থেকে ওঘরে আর ছবিটাকে দেখা যায়নি। তার বদলে এসেছিল অন্য একখানি ছবি। অপর্ণা উমা হিমালয়ে বসে তপস্যা করছেন।

বেশিদিন কিন্তু উমাকে পড়াবার সুযোগ পায়নি। কিশোরী মেয়েটি অল্পদিনেই পার হয়ে গেল গ্রাম্যপণ্ডিতের জ্ঞানের সীমারেখা। উমার পড়াশুনা ব্যাহত হল। কমলাপতি ভাইঝিকে শহরের স্কুলে ভর্তি করাতে চেয়েছিলেন—তাতেও আপত্তি জানিয়েছিলেন জাহ্নবী।

তারপরেই এল আগস্ট আন্দোলন। দিবাকর কারারুদ্ধ হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—সে নাকি টেলিগ্রাফের তার কেটে বিদ্রোহের সাহচর্য করেছিল। দিবাকর আদালতে শপথ নিয়ে বলেছিল যে, তার সে কাটেনি—কিন্তু বিচারক বোধহয় বিশ্বাস করেননি সে কথা। মেয়াদ হলে গেল তার।

বছরচারেক পরে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরে অবাক হয়ে গিয়েছিল দিবাকর। সবকিছুই বদলে গেছে গ্রামে—দুর্ভিক্ষে, মন্বন্তরে, যুদ্ধের ডামাডোলে তছনছ হয়ে গেছে সব। গ্রাম তাকে ঠিক সাদরে গ্রহণ করেনি ফিরে। সবাই তাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। সে যে রাজবন্দী থাকা অবস্থায় আই. এ. পাশ করেছিল এ সংবাদ অবশ্য পৌঁছেছিল গ্রামে। জাহ্নবী দেবী ওকে ডেকে পাঠালেন। দিবাকর দেখা করতে গেল তাঁর সঙ্গে। প্রণাম করল তাঁকে।

জাহ্নবী বলেন—এত রোগা হয়ে গেছিস?

—যাব না? জেলে কি রাজভোগ খেতে দিত নাকি?

—তা বটে। জাহ্নবী অবশ্য বললেন না ঊনিশ শ' বেয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে বাঙলার গ্রামেও কেউ রাজভোগ খায়নি।

উমা এসে প্রণাম করে। চমকে ওঠে দিবাকর। এ কে?

এ কয়বছরে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তার। ওর বয়ঃসন্ধির সময় দিবাকর জেলে যায়—ফিরে এসে যেন চিনতেই পারেনি তাকে। তার সে চটুল ভঙ্গি নেই, কথায় কথায় খিলখিল হাসির উচ্ছ্বাস নেই। মাথায় যতটা লম্বা হয়েছে, দেহে হয়েছে তার চেয়েও ভারী—মনে বোধ করি তার চেয়েও বেশি। দৃষ্টি হয়েছে নত, গতি হয়েছে ধীর। গিরিবর্ত্মের উপলখচিত অপরিসর গতিপথে ছুটে চলেছিল একটা ঝরনা, অবাক বিস্ময়ে তার চঞ্চল গতিচ্ছন্দ লক্ষ্য করেছে এতদিন। আজ ফিরে এসে দেখে নির্ঝর তার যাত্রা শেষ করেছে কাকচক্ষু হ্রদে। ঝরনাকেও যেমন ধরা যায় না, বাঁধা যায় না—অতল হ্রদের গম্ভীরতাও যেন তেমনি মাপা যায় না। বোঝা যায় না।

—কবে এসেছেন গ্রামে?

—দিন সাতেক।

—সাত দিন নয়, আট দিন।

—তবে তো জানই দেখছি।

একটু রাঙিয়ে ওঠে উমার মুখ। সামলে নিয়ে বলে—জানব না? এ যে আমাদের গ্রামের জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা। আপনিই যে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের গ্রামের প্রতিনিধি! আসুন, ঘরে এসে বসবেন না?

—চল। উমার পিছুর পিছুন দিবাকর বড় তরফের মহলের দিকে এগিয়ে যায়। চকমিলানো বিরাট প্রাসাদ। চওড়া বারান্দা। সারি সারি চৌকোনা থাম, প্রশস্ত কার্নিস। অসংখ্য পায়রার আবাসস্থল। কালবুদের উপর পঙ্খের কাজকরা নকশার আস্তর। ডান দিকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়—সেগুনের পালিশ করা গামছা-মোড়-রেলিঙের পালিশ উঠে গেছে। সিঁড়ি উঠে গেছে টিপকারী-করা চিলেকোঠার ঘরে। চক-মেলানো গোটা বাড়িটাই অন্দরমহল। সে কালে দিবাকরের মত সাধারণ প্রজার প্রবেশাধিকার ছিল না, এই চকমেলানো অন্দমহলের চৌহদ্দিতে। বার-মহল পার হয়ে অনাত্মীয় কেউ ভিতরে আসতো না! এ মহল থেকেও যারা বাইরে যেত তারা যেত ঘেরাটোপের পাল্কী চেপে। বাঁয়ে একটা বড় হলঘর। সারদাপতির লাইব্রেরি ঘরখানায় আলমারি বোঝাই শুধু বই, বই আর বই। দেওয়ালে টাঙানো বীণ, তানপুরা, সারেঙ। ঘরটা তালাবন্ধ থাকে। তারপরেই জাহ্নবীর শয়নকক্ষ। পরেরখানায় থাকে উমা।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দিবাকর। দেওয়ালের গায়ে পুরানো ছবি একখানাও নেই। জাতীয় নেতাদের ছবি সব টাঙানো। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু, তিলক মহারাজ। এতক্ষণে লক্ষ্য করল দিবাকর—উমার পরিধানে খদ্দরের শাড়ি। মিহিসুতোয় বোনা বলে লক্ষ্য হয়নি এতক্ষণ। মনটা খুশিতে ভরে ওঠে—বসে গিয়ে নিজের চেয়ারে। পাশের ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

হেসে বলে—ঘরটায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি, ঘরণীও বদলেছেন, একটা জিনিস কিন্তু বদলায়নি।

—কী?

—এই ফুলদানি আর ফুলের গুচ্ছ। চার বছর আগেও যে টাটকা ফুল দেখে গিয়েছিলাম—আজও দেখছি সে ফুলের গুচ্ছ তেমনিই আছে, শুকায়নি একটুও।

কী বুঝল তা সেই জানে—লজ্জা পেল উমা—বলল না—যে দীর্ঘ চার বছর পরে ফুলদানিটা আলমারি থেকে বার করেছে সম্প্রতি।

দীর্ঘদিনের অসাক্ষাতে যে অস্বস্তিটা অনুভব করছিল উমা ক্রমে তা কাটিয়ে উঠল। দিবাকর বলতে থাকে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। কবে কোন জেল থেকে কোথায় পাঠাল—জেলে কী খেত, কী করত এইসব কথা। বিশেষ করে বললে তারকদার কথা, নিশীথদার কথা। উমাও গল্প শোনাল গ্রামের। তেতাল্লিশ সালের দুর্ভিক্ষের কথা—চাল, কেরোসিন, গম, এক টুকরো কাপড়ের অভাবে কী যন্ত্রণা ভোগ করেছে গ্রামের মানুষ। নিজের কথাও বললে। সে আরও পড়াশুনা করতে চায়। ম্যাট্রিক

পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা আছে তার। বইপত্র আনিয়েছে। শ্রীপতি ওকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে চায়। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে যেতে মায়ের আপত্তি। আর মা না গেলে সেও যাবে না।

—তুমি বুঝিয়ে বললে মাসিমা নিশ্চয় যাবেন কলকাতায়।

—কিন্তু আমিও চাই না মা গ্রাম ছেড়ে যান কোথাও।

কৌতূহলের বশেই কারণটা জানতে চেয়েছিল দিবাকর। উমা ধীরে ধীরে সব কথা বলে যায়। যেটুকু সে বুঝতে পেরেছে সেটুকুই বলে। সারদাপতি কোনদিন গ্রামের বাইরে যাননি। এখানেই ছড়িয়ে আছে তাঁর স্মৃতি। যশোরের বাড়ি কমলাপতি করিয়েছেন, সারদাপতির মৃত্যুর পর। প্রতিদিন সব কাজকর্ম সেরে শুতে যাবার আগে জাহ্নবী সারদাপতির লাইব্রেরি ঘরে যান। নিজে হাতে ঝাড়ামোছা করেন। কখনও মায়ে-মেয়েতে বইপত্র রৌদ্রে দেন, ন্যাপথালিন দেন, আবার সাজিয়ে রাখেন। লক্ষীপতি নিজ সম্পত্তি থেকে সারদাপতিকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে যান—শুধু এই তিনখানা ঘরে জীবনস্বত্বের অধিকার আছে জাহ্নবীর। দুরন্ত অভিমানী তিনি—এ ঘর তিনখানিতে আর কাউকে আসতে দেন না—নিজেও যান না অন্য কোনও ঘরে। কমলাপতির শহরের বাড়িতে তাঁর যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

কথায় কথায় অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে ওরা দুজনে। দিবাকর স্থান-কাল ভুলে একটা অশোভন প্রশ্ন করে বসে। সারদাপতিকে কেন হঠাৎ এমনভাবে বঞ্চিত করেছিলেন তাঁর বাবা? প্রশ্নটা করেই লজ্জা পায়, বলে—কিছু মনে কর না, হঠাৎ বলে ফেলেছি কথাটা। জবাব দিতে হবে না তোমাকে।

উমা কিন্তু কিছু মনে করে না। অসঙ্কোচেই বলে—কারণটা আমি ঠিক জানি না। কর্তাদাদার শেষ জীবনে কাকা আর বাবার মধ্যে কী একটা ব্যাপার হয়। আমি তখন ছোট। সব বুঝতে পারিনি। কী একটা ঘটনা ঘটে, সেটা জানতেন শুধু বাবা আর কাকা। মাও জানেন না বোধহয়। আর সেই জন্যেই কর্তাদাদা বাবাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে যান। এই আঘাতেই বাবা মারা যান শুনেছি। কর্তাদা যখন মারা যান তখনও বাবার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। ঘোড়ায় চড়ে মহাল দেখতে যেতেন। কুস্তি করতেন, লাঠি খেলতেন জনাবালির বাপের সঙ্গে। তারপর কর্তাদা মারা যাবার পর তিনি আর নাকি চৌধুরীবাড়ির বাইরে যাননি। শুধু বই পড়তেন আর বাজনা বাজাতেন। ঐ লাইব্রেরি ঘরে। বেঁচেছিলেন আরও দু'বছর। আচ্ছা,—একটু ইতস্তত করে উমা,—আপনি রুমাবাঈ বলে একজন বাইজির নাম শুনেছেন?

—শুনেছি। থাক ও কথা। তোমার কথাই বল। তাহলে প্রাইভেটেই ম্যাট্রিক দিচ্ছ? আমি অবশ্য তোমাকে একটু-আধটু সাহায্য করতে পারি। শুনেছ তো আমি জেলে খানিকটা লেখাপড়া শিখেছি?

—আপনি...আপনি নেবেন আমার ভার?

—তোমার ভার?

লাল হয়ে ওঠে উমার মুখ। আমতা আমতা করে বলে—আমায় পড়ানোর ভার?

দিবাকরও লজ্জা পায়। বলে—দেখি মাসিমাকে বলে।

উঠে পড়ে দিবাকর। উমা না হয় মুখ ফসকে একটা অসতর্ক কথা বলে ফেলেছে, কিন্তু তাই বলে কি সে কথার প্রতি এভাবে দৃষ্টি টেনে আনতে হয়? কী ভাবল মেয়েটা!

উমাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল নিচের মহলে। অন্দরমহল থেকে বার-মহলে যাবার ভারী কাঁঠালকাঠের দরজাটার কাছে এসে দিবাকর বললে—অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখলাম গ্রামের—তোমার ঘরেও এসে দেখলাম পালাবদল হয়েছে—নতুন ধরনে সাজিয়েছ ঘরখানাকে—

—আপনার পছন্দ হয়নি?

—আমার পছন্দ-অপছন্দ অবশ্য অবান্তর। ও ঘরে বাস করবে তুমি। তোমার পছন্দ নিয়েই কথা। তবে একটা পরিবর্তন আমার ভালো লাগেনি।

চকিতে মুখ তুলে উমা বলে—কী?

—পড়ার টেবিলের উপর একখানা ছবি ছিল—উমার তপস্যা—সেটা নেই দেখলাম।

উমা বলল না, যে ফটো দিয়ে দেওয়াল সাজিয়েছে, তার মধ্যে হঠাৎ রবিবর্মার একখানা ছবি বেমানান লাগতো বলেই সরানো হয়েছে। পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে—ছবিটা দেখতে পেলে খুশি হতেন আপনি?

—নিশ্চয়ই! একদিন আমার কথাতেই ওটা ওখানে এসেছিল। অপর্ণা উমা শিবের জন্য তপস্যা করছেন,—ভারি সুন্দর ছিল ছবিটি।

একটু চুপ করে থাকল উমা। তারপর মাটির দিকে চেয়েই বললে—ছবিটা ঘরেই ছিল, আপনার সামনেই ছিল, অথচ আশ্চর্য, নজরে পড়েনি আপনার।

—অসম্ভব। আমি রীতিমত খুঁজেছি প্রত্যেক দেওয়ালে।

ম্লান হাসল উমা। দিবাকর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মনে মনে দেওয়ালের ছবিগুলো আর একবার দেখে নেয়। না, সে ছবিখানা সে নিশ্চয়ই দেখেনি ওঘরে। সেই কথাই বলতে যায়, কিন্তু দেখে উমা চলে গেছে।

সেদিন উমা ওকথা কেন বলেছিল তা বোঝা যায়নি বটে, কিন্তু সমস্যাটা বুঝতে পারা গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত একদিন। অনেকদিন পরে। উমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়ে যাবার পর। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়ে উঠল না উমার। হঠাৎ একটি সুপাত্রের সন্ধান পেয়ে মেয়ের বিয়ে স্থির করে ফেললেন জাহ্নবী। ছেলেটি শ্রীপতির বন্ধু—পড়াশুনায় ভাল। বিলাত যাওয়ার সব স্থির আছে। উমাকে দেখে পছন্দ হয়ে যায় তার। খবরটা পাওয়ার পর দিবাকর আর পড়াতে যায়নি চৌধুরীবাড়ি। কী হবে গিয়ে? ওর পড়াশুনার তো এখানেই ইতি। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় অতর্কিতে উমা এসে হাজির হল তার ঘরে। অভাবনীয় কাণ্ড। বিয়ের তখন আর দিন-সাতেক বাকি। নির্লজ্জের মতো স্বীকার করে বসল উমা—হ্যাঁ, দিবাকরকে সে ভালবাসে। অন্য কারও সংসারে সে যেতে পারবে না।

চমকে উঠেছিল পণ্ডিত, কিন্তু সংযম হারিয়ে ফেলেনি। সে বুঝেছিল তা অসম্ভব। লক্ষ্মীপতি চৌধুরীর পৌত্রী, কমলাপতির ভাইঝি কখনও তার জীবনসঙ্গিনী হতে পারে না। সে বৈষ্ণব, চৌধুরীরা বঙ্গজ কায়স্থ, ধর্মমতে শাক্ত। গ্রাম্যসমাজ এ বিবাহ কিছুতেই মেনে নেবে না। তাছাড়া সে নিতান্ত গরিব ঘরের ছেলে—গ্রামের মধ্যে প্রায় একঘরে হয়ে দিন কাটাচ্ছে। মনের কথা সে কিছুতেই প্রকাশ পেতে দিল না উমার কাছে।

শুধু সেদিনই নয়—কোনদিনই সে ধরা দেয়নি। উমার বিবাহে সে উপস্থিত ছিল না। নিশীথদার আহ্বানে একটি স্বেচ্ছাসেবকদলের সঙ্গে বাইরে যেতে হয়েছিল। বিয়ের পরও উমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সেদিন প্রথম দেখল আনন্দময়ী মন্দির থেকে পূজা দিয়ে ফিরছিল যখন। কথাবার্তা হয়নি, সুযোগও হয়নি। উমার স্বামীকেও সে দেখেনি। উমার কথা ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে যায়।

হঠাৎ যাম ঘোষণা করে শেয়ালেরা। যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে বসে। রাত অনেক হয়েছে। পল্লীগ্রামের রাত্রি। কৈশোরেই বৃদ্ধা। নয়টার মধ্যেই নিশুতি। দিবাকর উঠে পড়ে। নেমে আসে বাঁধের উপর থেকে। আব্বাস-ভাইয়ের ধানকলে পেটা ঘড়িতে নটার সঙ্কেত। মিষ্টিফুলের গন্ধটা এখনও লেগে আছে। গোবর্ধন ঘোষের বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে, মণ্ডলদের মজাপুকুরের পাড় দিয়ে পায়ে-চলা পথে এসে পৌঁছালো হাটতলায়। জগবন্ধু ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারির দাওয়ায় কে যেন গুঁড়ি মেরে শুয়ে আছে। আনন্দময়ীর মন্দিরের দ্বার এখনও বন্ধ হয়নি। আধ-ভেজান দ্বার দিয়ে আলোর একটা রশ্মি এসে পড়েছে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার পথে; থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে দিবাকর। ওর হঠাৎ মনে হল এই আলোর ইঙ্গিতের পিছনে একটা ইশারা আছে। ওর উদ্‌ভ্রান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতেই যেন এই আলোর আহ্বান। দিবাকর বৈষ্ণব—কিন্তু গোঁড়ামি তার নেই। পায়ে পায়ে মন্দিরের ধাপে উঠে আসে। ছোট ছোট ইটের গাঁথনি। অনেক জায়গায় চুনবালি খসে গেছে। মন্দিরের জগমোহনে বাইরের দিকে একসারি মূর্তি দিবাকরের ভারি ভালো লাগে। অন্নপূর্ণা শিবকে ভিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর দু পাশে যে সব প্রহরী রয়েছে তাদের গালে গালপাট্টা, হাতে বন্দুক। অন্নপূর্ণার দরবারে কোম্পানির আমলের সেপাই কীভাবে এল তা অবশ্য বোঝা যায় না। আজ অবশ্য এ সব কিছু লক্ষ্য করল না দিবাকর। সিঁড়ি পার হয়ে মূল মন্দিরের দ্বারের সামনে এসে দাঁড়াল। লক্ষ্য করল, একটি মেয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে। দ্বারের বাইরে দিবাকরও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখে চমকে ওঠে। উমা! সেও চকিত হয়ে মাথায় আঁচল তুলে দেয়। দিবাকর একটু আবাক হয়। উমা গ্রামেরই মেয়ে—দিবাকরকে দেখে এতটা লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই। বলে—কবে এলে?

উমা প্রত্যুত্তর করে না।

দিবাকর আবার বলে—থাকবে নাকি কিছুদিন এখন?

উমা ধীরে ধীরে বলে—ঠিক বলতে পারি না।

বিয়ের পর উমার সঙ্গে দিবাকরের এই প্রথম সাক্ষাৎ। বোধহয় সেইজন্যই উমার এ আড়ষ্টতা। বিয়ের আগে একরাত্রে ক্ষণিক উত্তেজনায় যে ছেলেমানুষি করেছিল সে কথা বুঝি আজও সে ভুলতে পারেনি। তাই আজ নির্জনে দিবাকরের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে।

দিবাকর পরিবেশটা হালকা করবার জন্যে বলে—জান ঠিকই, দাশমশাই কি বেশি দিন ছেড়ে থাকতে পারবেন? দু দিনের বেশি তোমারও ভাল লাগবে না এ গাঁইয়াদের জীবন।

উমা প্রতিবাদ করে না। একটু আহত হয় দিবাকর। প্রতিবাদই প্রত্যাশা করেছিল সে-কথা বুঝতে পারে প্রতিবাদটা না আসায়। নতনেত্রে মার্বেলের উপর মেঝেতে

খোদাই করা কি একটা লেখা পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে উমা। অবগুণ্ঠনের তলায় তার মুখের একপাশ দেখা যায় প্রদীপের আলোয়।

—তারপর, কেমন লাগছে শ্বশুরবাড়ি?

—ভালই, নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে উমা।

—পরীক্ষাটা দিচ্ছ তো আগামী বছর?

—না।

—না কেন? দাশমশাইকে বলেছিলে পরীক্ষার কথা?

—সে সুযোগ আর পেলাম কই?

দিবাকর হেসে ফেলে—সুযোগ পেলে না? চার-পাঁচ মাস বিয়ে হয়েছে, এরমধ্যে ও কথাটা বলবার সুযোগই পাওনি? কী গল্প কর এত?

উমা এতক্ষণে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে। তারপর নামিয়ে নেয় দৃষ্টিটা। নাকের একটা পাশ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। প্রদীপের আলোয় ঝিলিক দিয়ে ওঠে হীরার নাকছাবিটা। উমা বলে—কী আর হবে বলুন পরীক্ষা দিয়ে? মেয়েদের পড়াশুনা তো সৎপাত্রে বিয়ে দেবার জন্যেই। এখন তো বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স কোন কিছুরই অভাব নেই আমার। পরীক্ষা দিয়ে কী করব? মাস্টারি তো করতে হবে না কোনদিন!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় দিবাকর মাস্টার। এ কি সেই উমা! মুর্শিদাবাদের ছাপা সিল্কের একটা লালপাড় শাড়ি, গায়ে জর্জেটের ব্লাউজ, এক গা গহনা। বড়লোকের মেয়ে, বড় ঘরের বধূ। মাত্র পাঁচ মাস আগে এর বিয়ে হয়েছে। এই কয় মাসেই আকৈশোরের শিক্ষা-দীক্ষা-ধ্যান-ধারণা সব বদলে গেছে তার। এতটা শহুরে হয়ে পড়েছে উমা—তার হবু-ব্যারিস্টার স্বামীর সহবাসে? নিজের সৌভাগ্যগর্ব সম্বন্ধে সে এখন পূর্ণসচেতন। আর সে সৌভাগ্যের কথা জাহির করার মতো ভাষাও সে আয়ত্ত করেছে অল্পদিনে। অথচ এই উমাকে নিয়েই কত স্বপ্ন দেখেছে দিবাকর। একেই যাজ্ঞবল্ক্য—মৈত্রেয়ীর গল্প বলেছিল একদিন, ভাবলেও হাসি লাগে! উমা, গ্রামের মেয়ে; উমা দিবাকর পণ্ডিতের পাঠশালার সেরা ছাত্রীটি বিয়ের পরেই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এমন মৌলিক মন্তব্য প্রকাশ করবে এটা যেন ধারণাই করা যায় না। শুধু তাই নয়—গ্রাম্য পণ্ডিতের জাতব্যবসাকে খোঁচা দিতেও ছাড়েনি।

পণ্ডিত হেসে বলে—যাক ভুলটা এতদিনে বুঝেছ দেখে খুশি হলাম। কী বোকামিটাই না করতে বসেছিলে সেদিন। তাহলে তো গাড়ি-বাড়ি-ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স সবই ফাঁকা হয়ে যেত।

—ঠিক তাই! আর ভুলটা শুধরে দিয়েছিলেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ!

ধন্যবাদ! চমকে ওঠে দিবাকর। মুখ তুলে তাকায়। মাথা থেকে কখন খসে পড়েছে ঘোমটা—প্রদীপের ক্ষীণ আলো পড়ছে মুখে, তবু সেই ক্ষীণ আলোতেই মনে হল অদ্ভুত একটা অনুভূতি ফুটে উঠেছে উমার। নাকের কোণটা কুঞ্চিত, চোখদুটিতে জ্বালা-ধরানো দৃষ্টি। উমা শ্রদ্ধা করত দিবাকরকে গুরুর মতোই। আজ তার এই মৌখিক ধন্যবাদটা গ্রহণ করতে পারে না দিবাকর, বলে—ভুল শুধরে দেওয়াই যে মাস্টারের কাজ উমা। কিন্তু তার বিনিময়ে নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে মৌখিক ধন্যবাদ প্রত্যাশা করব না আমি।

—তবে কী প্রত্যাশা করেন?

—কী আশা করি তাও কি মুখ ফুটে বলে দিতে হবে? পরক্ষণেই সে সংযত হয়। দিবাকর বলতে চেয়েছিল শিষ্যের কাছে গুরু প্রত্যাশা করে শ্রদ্ধানম্র প্রণাম। কিন্তু সে কথা না বলে মাঝপথেই থেমে যেতে হয়। অনেক শাড়ি-বাড়ি-গহনার এই মালিক যদি সত্যই আন্তরিকভাবে গ্রাম্য পণ্ডিতেক আজ শ্রদ্ধা না করে, তবে সে কথা উচ্চারণ করে আরও অপদস্থ হওয়া কেন? দীর্ঘদিন পরে মাস্টারমশাইকে দেখে উমা যে অভ্যাসমত তাকে প্রণাম করল না আজ, এটা তার নজর এড়ায়নি। তবে তার একটা মনগড়া কারণও বার করেছিল। কারণটা আরোপ করেছিল স্থান-মাহাত্ম্যের উপর। দেবমন্দিরে একমাত্র দেবতাই প্রণম্য—তাই মন্দিরচত্বরে অপর কাউকে প্রণাম করার বিধি নেই।

—কই, কী আশা করেন তা তো বললেন না? তাহলে ধন্যবাদটা ফিরিয়ে নিয়ে সেটাই দেবার চেষ্টা করি।

দিবাকর বুঝলে শুধু উপেক্ষা নয়—আঘাতই করতে চাইছে উমা। বললে—মাপ কর উমা। সে এমন একটা জিনিস যা চেয়ে নেওয়া যায় না! সেটা স্বতঃস্ফূর্ত! একদিন অযাচিত তা পেয়েছিলাম আমার একটি ছাত্রীর কাছে; অকুণ্ঠভাবে। তোমাদের শহুরে ধন্যবাদটার প্রয়োজন নেই—

উমা এই ক'টি কথাতেই যেন জ্বলে উঠল। কী বুঝলে তা সেই জানে। তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে দিবাকরকে সচকিত করে বলে—আপনি মুখ ফুটে না বললেও বুঝতে আমার কিছু বাকি নেই মাস্টারমশাই! কিন্তু ছিঃ! আপনার অন্তত ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আজ আমি পরস্ত্রী!

—কী বলছ তুমি?

—কী বলছি তা বেশ ভালই বুঝছেন আপনি। না হ'লে একটি কুমারী মেয়ের অকুণ্ঠ আকুতির উল্লেখ করতেন না! মাস্টারমশাই! সে রাত্রের ছেলেমানুষির কথা মনে পড়লে আজও আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। মনে হতো, মাস্টারমশাই আমার পাগলামি মনে করে বুঝি আজও হাসেন—সে লজ্জা আমার ঘুচল আজ! আজ রাত্রে পরস্ত্রীর প্রতি আপনার এ প্রেম নিবেদনটাও কম হাস্যকর নয়! এরপর থেকে আমিও কম হাসব না!

দিবাকর স্তম্ভিত হয়ে যায়। মেয়েটা এত অধঃপাতে গেছে? সে মনে করেছে দিবাকর পণ্ডিত উমার প্রণয়ভিখারী? ধন্যবাদের পরিবর্তে অবৈধ-প্রেম প্রার্থনা করছে সে উমার কাছে! দিবাকর জ্বলে ওঠে—শোন উমা!

—থাক মাস্টারমশাই, কথা বাড়িয়ে আর লাভ কী?

—না, তোমার ভুলটা ভেঙে দিতে চাই।

—কেন কতকগুলো মিছে বলা বলবেন?

বিস্ময়ের মাত্রা হারিয়ে ফেলছে দিবাকর। উমা অভিযোগ করছে দিবাকর পণ্ডিত মিথ্যা কথা বলছে! পণ্ডিত দিবাকর গোস্বামী? দেবীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে? আর কেন মিছে কথা বলছে? না, পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম নিবেদনের লজ্জা গোপন করতে। আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে ওর। ইচ্ছা করে ঠাস করে একটা চড় মারে ঐ ধনীর ঘরণীকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—মিছা কথা আমি বলি না! সে তো তুমি জানো।

—মিছে কথা আপনি বলেন তাই জানি! উমার যেন রোখ চেপে গেছে! যেন তার আক্রোশ মিটছে না; বলে—আদালতে দাঁড়িয়ে আপনি হলপ করে মিথ্যাকথা বলেছিলেন বলে শুনেছি—বলেছিলেন, যে তার আপনি কাটেননি! কিন্তু মিথ্যা দিয়ে সত্যকে গোপন করা যা না—তাই জেল খাটতে হয়েছিল আপনাকে!

সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে থাকে দিবাকরের। কত কথা মনে পড়ে যায়। আগস্ট-আন্দোলনের উন্মাদনার কথা। খবরের কাগজে ভারতবর্ষের গণআত্মার বিক্ষোভ শুনতে পেয়ে সে বেরিয়েছিল টেলিগ্রাফের তার কাটতে। যোগাযোগ সত্যই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বৈদ্যুতিক তারের। আদালতে সে অভিযোগ অস্বীকার করেছিল, বলেছিল তার সে কাটেনি। সেই জীবনের ছবিগুলি ভেসে ওঠে মনের পটে। এজন্য গ্রামে তাকে সকলে এড়িয়ে চলে বটে, তবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কমলপুরের অংশীদার হিসাবে তার একটা বিশিষ্ট সম্মানও ছিল। সে সম্মান আজ ধুলায় লুটিয়ে দিল এই মেয়েটি। কী একটা জবাব দিতে যায় দিবাকর—তার পূর্বেই মন্দিরদ্বারে কে যেন গম্ভীর স্বরে ডাকে—আনন্দময়ী মা গো। জয় শিবঅ শম্ভু, জয় বাবা, বুড়োরাজা!

উমা পাশ কাটিয়ে নেমে আসে তাড়াতাড়ি। দিবাকরও বেরিয়ে আসে। চাবির গোছা পিঠে ফেলে পূজার জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায় উমা।

—কে, রতন নাকি রে?

—পণ্ডিতমশায়? দেখেন, দেবতার বিচারটা দেখেন!

—কী হল? দেবতা আবার কী করলে তোর?

—আজ্ঞে আমার নয়, আমি উমামায়ের কথা বলতিছিলাম।

—কী ব্যাপার? কৌতূহলী হয় পণ্ডিত। রত্নাকরের কাছে কয়েকটা টুকরো খবর পেয়ে চমকে গেল সে। আশ্চর্য, এতবড় সংবাদটাও তার অজানা! জানবে কোথা থেকে? না মেয়েমহলে, না পুরুষমহলে কোথাও যাতায়াত নেই!

উমার বিয়ে না কি সুখের হয়নি। বিয়ের মাত্র কয়েকদিন পরেই উমা ফিরে আসে। জামাই আসেনি সঙ্গে। চৌধুরীবাড়ির ঝিকে সঙ্গে করে উমা একা ফিরে এসেছিল। কারণটা কী রতন অবশ্য জানে না। অনেকে অনেক কথা বলে। তবে এটা ঠিক যে, উমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কেউ আসেনি। উমাও ফিরে যায়নি। রসিকলাল শিরোমণির মেয়ে কালিতারার বিয়ের পর আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরের চাবির গোছাটা উমাই দখল করেছে। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো? উমা মন্দিরে যাবতীয় পূজার যোগাড় দেয়। পূজা, সন্ধ্যারতি, চন্দনবাটা থেকে মন্দিরে চাবি দেওয়া পর্যন্ত। কমলাপতি নাকি আপত্তি করেছিলেন। বাধা দিয়েছিলেন উমার মা। থাক না মেয়েটা ঐ নিয়ে কিছুদিন ভুলে। দাম্পত্য-কলহ হচ্ছে শরতের মেঘ—এ যে একদিন মিটে যাবেই সে সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না জাহ্নবীর। কমলাপতিরও। স্বামী ছাড়া স্ত্রীর গতির নেই। বোঝাপড়া একটা হবেই। আর সেটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সে চেষ্টাও হচ্ছে। তবে এখনও চেষ্টা ফলবতী হয়নি। জামাই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন, মেয়ে কর্ণপাত করেনি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার কথায়।

—তাই বলতিছিলাম পণ্ডিতমশায়, কাউকে দেবতা সব দেন অথচ কিছুই দেন

না—যেমন উমা মা। আবার কাউকে কিছুই না দিয়ে সব দেন, যেমন আমাদের তারা ঠাকুর। তা যাক্। এখন মজলিসের কথা শোনেন।

রতন বলতে থাকে মজলিসের কথা। স্থির হয়েছে আলাদা পূজাই করা হবে। আব্বাসভাই কোম্পানিই বস্তুত সব খরচ দেবে। আলাদা থিয়েটারও করা হবে। ডাক্তার সব ভার নিয়েছে। এক নাগাড়ে বক্‌বক্ করে রতন। দিবাকরের কানে কিন্তু একটা কথাও যায় না। সে ভাবছিল উমার কথা। উমার বিয়ে সুখের হয়নি। তাই কি সে কথার উল্লেখ করায় চটে গেল ও? না কি উমা ভেবেছে ওদের দাম্পত্য-কলহ সম্বন্ধে সব খবর জেনেই রসিকতা করেছে দিবাকর। কী এমন কারণ থাকতে পারে যাতে উমা এতবড় অপমান করে বসল তাকে? সে দেবস্থানে দাঁড়িয়ে মিথ্যকথা বলছে—এ কথা উচ্চারণ করল কী করে?

—আপনে আমার কথা শুনতাছেন না পণ্ডিতমশায়।

অপ্রস্তুত হয় দিবাকর। স্বীকার করে—হ্যাঁ, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—সে তো বুঝতাছি। নইলি আমার বাঁশকাটার বিচারের কথাটা তো অন্তত জিজ্ঞেস করতেন।

—ঠিক কথা। তা কী স্থির করলেন ওঁরা?

—চিরকালটা যা হয়ে আসতিছে তাই।

ওঁরা রতনকে ব্যাপারটা চেপে যেতেই পরামর্শ দিয়েছেন। থানায় গেলে কেউ ওর পক্ষে সাক্ষী দেবে না। কে আর যেচে জমিদারের শত্রু হতে চায়? রায়মশাই না কি বলেছেন—কী আর করবি বল রতন? জমিদারের সঙ্গে থানা-পুলিস মামলা-মোকদ্দমা করতে পারবি তুই?

দিবাকর মনে মনে হাসে। একই অপরাধে জমিদারের পূজাই বর্জন করলেন এঁরা—অথচ রতনকে উপদেশ দিলেন অপমানটা হজম করে নিতে। স্বার্থসিদ্ধিই এঁদের মূল উদ্দেশ্য।

—কী ঠিক করলি শেষ পর্যন্ত? থানায় যাবি?

—আজ্ঞে না।

—বাঁশটা তাহলে ওরাই ভোগ করবে?

—আজ্ঞে না।

—তাও আজ্ঞে না? তবে কী করতে চাস তুই?

রতন হাসে। সে হাসি দেখে শিউরে ওঠে দিবাকর। বলে—খবর্দার রতনা! সে সব কিন্তু মতলব করিস না। তোর অসাধ্য কাজ নেই জানি; কিন্তু ও পক্ষ সজাগ আছে। তাছাড়া পাথরে মাথা ঠুকতে নেই রে—ওতে শুধু মাথাটাই ভাঙে—আর কিছু ভাঙে না!

—এ কথাটা জমিদাররে বলে আসেন মাস্টারমশায়। আমাদের খুড়ো-ভাইপোরে লোকে পাথর বলেই জানে সবাই। জমিদার যেচে এ পাথরে মাথা ঠুকিছে—মাথা ফাটলি আমারে দোষেন কেন?

দিবাকর ধমক দেয়—পাগলামি করিস না রতন! ও পক্ষ প্রবল; ওদের বন্দুক

আছে। জমিদারের সঙ্গে লড়তে আমাদের হবেই—তবে তুই যে কারণে লড়তে চাইছিস সে কারণে নয়—অনেক বড় কারণে। তুই যে ভাবে লড়তে চাইছিস সেভাবেও নয়—অনেক বড় আকারে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এই লড়াই লড়ব বলেই এসেছি আমি গাঁয়ে। এখন তোর একটা কিছু হলে শুধু তোর পরিবারই নয়—গোটা ঘোষ পাড়াটাই উৎসন্নে যাবে। তোদের সব কটা মরদই মেয়াদ খাটছে, সেটা মনে আছে? প্রবলের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ওভাবে একা একা লড়তে নেই।

রতন হাসে। বলে—আর কেউ এ কথা বললি মানাতো, কিন্তু আপনে এ কথা কী করি বলেন, মশাই? চৌধুরীদের ক্ষ্যামতা কি ইংরেজ সরকারের চাইতেও বিশি? তবে কেন আপনে একা একা গেইছিলেন টেলিগ্রাফের তার কাটতি, মোল্লাহাটির দিকে?

দিবাকর গম্ভীরভাবে বলে—আমি টেলিগ্রাফের তার কাটিনি রতন। আদালতে মিছে কথা বলিনি আমি। পুলিশে ভুল করে ধরেছিল আমাকে—

প্রাণখোলা হাসি হাসে রতন, বলে—তা জানি। আদালতে ডাঁইরে আপনি যদি হলপ করি বলতেন যে, আপনেই তার কাটিছেন তা হলিই বুঝতাম মিছে কথা বলছেন আপনি। আর কেউ না জানলিও আমি যে সব জানতাম গো!

—তুমি সব জানতে? কী জানতে? কে তার কেটেছিল তাও জানতে?

—আজ্ঞে হাঁ, তাও জানতাম। কেন আপনি জানেন না?

—না! স্বীকার করলে দিবাকর—কে কেটেছিল?

হাহা করে হাসে রতন—আজ্ঞে, আমি! সে রাতে আপনার মতো আমিও বেইরেছিলাম 'কাজে'। বাঁধের উপর উঠে দেখি কে আমার আগুআগু চলছে। পেরথমে মনে লাগল নন্দ চৌকিদার, পরে দেখি আপনে। সন্দ লাগল মনে! রেতের বেলায় মাস্টারমশায় কুথা যায়? বলদা-পোতার বিলের কাছে পুলিশে তাড়া করলে আপনারে। আপনে পুবমুখো ছুটলেন। আমি দেখলুম খেজুর ঝোপের মধ্যে কী একটা ফেলি দিলেন আপনে। পুলিশের লোক আপনার পিছু পিছু মিইলে গেলে কুইড়ে নিলাম জিনিসটা। হায় শিবো! হায় বুড়োরাজা! তার-কাটার যন্তর! পণ্ডিতমশায়! ভারি দুখকু পেইছিলাম সেদিন। মনে হল আপনে কেন এ কাজ করতি আসেন! কেন একবার ডাকি বললেন না—রতন, করিমপুর ইস্তক সব ক'কাছা তার কাটে দে আয়! তার আপনে কাটেন নাই, হক কথা, কিন্তুক কাটবার তরেই তো রেতের বেলা বেইরেছিলেন।

দীর্ঘদিনের কৌতূহল মেটে দিবাকরের। কে যে তার কেটেছিল তা সে সত্যই জানতো না।

—তাই বলতাছিলম ঠাকুর, কারও ক্ষ্যামতা নাই যে, রতনার চুলের ডগাটি ছোঁয়! থানায় মেজবাবুর ছেলের কাল মুখে-ভাত। ভোর রেতে তার ঘরে ছ্যানা পৌঁছে দেবার বরাত আছে। সনযে রেতে কাজ সেরে ভুলকো তারা না-ডুবতেই মেজবাবুকে ছ্যানা পৌঁছে দেব। রতনাকে ছোঁয় কোন শা—

দিবাকর ওর দুটি হাত ধরে বলে—এ কাজ তুই কিছুতেই করতে পারবি না রতন। শুধু জমিদার আমাদের শত্রু নয় রে—শত্রু আমাদের অনেক। কী করে এদের বিরুদ্ধে

লড়তে হয় তা আগে জানতাম না—এ ক'ছর জেলে তাই শিখে এসেছি আমি। অনেক স্বপ্ন আমার কাছে—অনেক লড়াই লড়ব বলে ফিরে এসেছি আমি—এ সামান্য ব্যাপারে আমি তো আমার ডান হাতখানা হারাতে পারি না!

—অ্যাই দেখ, কী বলছ গো তুমি মাশায়?

—বলছি যে, জমিদারের বাড়ির কোন লোক—তা সে চাপরাশীই হক আর বাবুই —কারও গায়ে এ নিয়ে তুই হাত দিতে পারবি না!

—অ্যাই লাও! তা বাঁশগাছখান তো ফিইরে আনতে হবে?

—না! একখানা বাঁশ গেলে তোর মত লোকের কিছু হয় না।

—হয়। সে তুমি বুঝবা না ঠাকুর! খুড়ো বলত, রতনা, খুইয়েছি তো সব—বাকি রইল ইজ্জৎ আর রইল বাঁশের লাঠি! দেখিসরে জীবন থাকতি সে দুটি কেউ না কেড়ে নেয়। তা জমিদার আমার ইজ্জতের মাথায় পয়জার মারিছে, কেড়ে নে-গেছে আমার বাঁশ! ফিইরে আনব না? বলছ কী গো তুমি? খুড়ো আজ নাই, কিন্তুক ভাইপো তো আছে?

—না ফিরিয়ে আনতে যাবি না! তোর উপর ধর্মরাজের দিব্যি রইল কিন্তু!

এক ঝাঁকি দিয়ে ওর হাতখানা ছাড়িয়ে নেয় রতন। হন্‌হন্ করে হাঁটতে শুরু করে অন্ধকার ভেদ করে।

দিবাকর হাঁক দেয়—রতন ফিরে আয়, শুনে যা...

—না!

—কথা আছে, শোন, এই পাগলা...

—অন্ধকার রেতে পথে ডাঁইড়ে আমি মেয়েমান্‌ষের সাথে কথা বলি না।

—মেয়েমানুষ?

—না তো কী? কথায় কথায় যে দিব্যি গেলে মানা করে তারে আবার কী বলে?

রতন আর দাঁড়ায় না—হন্‌হন্ করে চলে যায়।

দিবাকর হাসে। মর্মান্তিক চটেছে তাহলে রতন ঘোষ। চটুক. দুঃখ নেই, ধর্মরাজের দিব্যি অগ্রাহ্য করে সে কিছুতেই যাবে না বাঁশটা ফেরত আনতে। রত্নাকর ঘোষ দিবাকরের আজ্ঞাবাহী একাঘ্নী ব্রহ্মাস্ত্র। এভাবে অপব্যয় করা চলে না তাকে।

দিবাকর ফিরে আসে নিজের ঘরে। নবীন যোগীর মেয়ে রাধা রান্নাঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। রাখাল ছেলেটা গরুকে খাইয়ে-দাইয়ে নিজে গুটি মেরে শুয়ে আছে দাওয়ার কোণে। গোপাল কাওরার এই মা-বাপ মরা ছেলেটার ভার নিয়েছে সে। গরুর সেবা করে মাঠে কাজ দেখে, আবার বর্ণপরিচয় নিয়েও বসে মাঝে মাঝে। এই দুলালই এখন তার সখা, সচিব এবং গৃহিণী।

আহারান্তে শুয়েও দিবাকরের ঘুম আসে না। উমার সেই একদিনের আকুলতার স্মৃতি তো তার কাছে হাসির উপাদান হয়ে নেই। অতি করুণ সে স্মৃতি। তবে ও কথা কেন বলল উমা? দিবাকর বৈষ্ণব, উমার বাবা শাক্ত-কায়স্থ। গ্রামের বুকে বসে এ অসবর্ণ বিবাহকে স্বীকার করে নিতে পারেনি দিবাকর। উমা হয়তো ভেবেছে সে ভয় পেয়েছিল। আসলে তা সত্য নয়। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার এই জাতিভেদ প্রথাটা সে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছিল। সমাজের একজন হয়ে সমাজকে সে উপেক্ষা

করতে চায়নি। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার এই জাতিভেদের বনিয়াদটাকে সে কুসংস্কার বলে মনে করেনি—আজও করে না। সমাজের দুঃশাসককে উপেক্ষা করার মধ্যেই শুধু বীরত্ব আছে—আর সে নিয়মকে, কাঠিন্যকে স্বীকার করে তার অনুশাসন নম্রভাবে সহ্য করে যাওয়ায় গৌরব নেই একথা সে বিশ্বাস করে না। তাই রাজনৈতিক জীবনেও একদল উগ্রপন্থীর সঙ্গে একমত হতে পারেনি। ধর্মকে বাদ দিয়ে, সমাজকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব এ কথা সে বিশ্বাস করে না। তার বিশ্বাস ভারতবর্ষে এ পরীক্ষার ফলাফল ভাল হবে না—হতে পারে না। তাই সে গ্রহণ করতে পারেনি উমাকে। তাছাড়া ওর তখন সুপাত্রে বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল। সে যাই হোক উমার সেই আকুলতাকে কখনও সে তো হাস্যকর মনে করেনি। নিষ্কাজ অবসরে তার মনের চোখে ভেসে উঠত সেই নিভৃত রাত্রির ছবি—মধুর স্মৃতি! আজ উমা সেই স্মৃতিচিত্রের ক্যানভাসের উপর স্বহস্তে কালি ঢেলে দিল। ধনীর দুলালের শহুরে স্ত্রী পরুষ-হস্তে কালিমালিপ্ত করে দিল একটি গ্রাম্য কুমারী হৃদয়ের অন্তর্লীন আত্মদানের ইতিকথা।

উমা তাকে ঘৃণা করে। নিজের ভুল আজ সে বুঝতে পেরেছে, ভালই হয়েছে। এতে তো খুশি হয়ে ওঠা উচিত দিবাকরের। তবু কোথায় যেন খচখচ করে ব্যথা লাগে। সে চেয়েছিল—সেই একদিনের কথা ভুলে যাক উমা। তার কাছে আগেকার সেই ছাত্রীটির ব্যবহারই প্রত্যাশা করেছিল দিবাকর। কিন্তু উমা তাকে ভুল বুঝেছে। এ ভুলটা তার সংশোধন করে দিতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে পরস্ত্রীর অবৈধ প্রেমের ভিখারি নয় দিবাকর পণ্ডিত! সে শুধু প্রত্যাশা করেছিল তার প্রাক্তন ছাত্রীটির কাছে একটু শ্রদ্ধানম্র সম্ভাষণ!

সারারাত ছটফট করে কখন ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে দুলাল একটা অদ্ভুত খবর দিল। কাল রাত্রে নাকি চৌধুরীবাড়ি চোর ঢুকেছিল। বিশ্রী শব্দে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। দারোয়ান, চাপরাশী ছুটে আসে। কমলাপতি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজও করেন। আলো নিয়ে খোঁজাখুজি শুরু হয়। চোর ধরা পড়েনি। জিনিসপত্রও খোয়া যায়নি কিছু। শুধু পূজামণ্ডপে একখানা সদ্যকাটা মোটা ভরাট বাঁশে একটা ধারালো অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। দ্বিখণ্ডিত হয়নি বটে—তবে যে-কাজের প্রয়োজনে সেটাকে আনা হয়েছিল সে-কাজে আর তাকে ব্যবহার করা যাবে না।

ক্রমেই নৈরাশ্য এসে জমা হচ্ছে জীবনে। জেল থেকে ফিরে এসে মাতৃহীন বাস্তুভিটা ফাঁকা বোধ হয়েছিল; তারপর ধীরে ধীরে মনকে শক্ত করেছিল। অনেক আশা ছিল তার জেল থেকে বের হওয়ার সময়। বেয়াল্লিশের আন্দোলন তাকে দিয়ে গেছে দেশ-সেবকের খেতাব। গ্রামের একাংশ এজন্যে তাকে এড়িয়ে চলে সত্য, তেমনি অপর এক অংশ—নিঃস্ব, বঞ্চিত, রিক্ত অংশ—হয়ে পড়ল আপনজন। জেলে

তো অনেকেই যায়। ঘোষপাড়ার বোধহয় রতন ঘোষ ছাড়া একটা মরদ নেই যে চুরি-ডাকাতি অথবা বি. এল. কেসে কয়েকমাস মিয়াদ না খেটে এসেছে। কিন্তু এ যে স্বতন্ত্র কথা;—চুরি না, ডাকাতি না, বি. এল. কেস্ নয়—এমন কি জমি নিয়ে ফৌজদারিও নয়—শুধু পরের জন্য, দেশের ভালোর জন্য একটা মানুষ জেল খেটে এল! দিবাকরের জন্য একটা সম্মানের আসন তৈরি হয়ে গেল ওদের মহলে। গ্রামের ভাল-করা যেন দিবাকরের এক নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কারও ভালো তো সে করতে পারছে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, আজ নয় কাল—কিন্তু এ লোকগুলোর কী সুবিধা হবে তাতে? ওরা জানতে চায় খাজনার হার কমবে কি না, অনাবাদী বছরে ওদের গলায় গামছা পড়বে কি না। নন্দদুলাল রায়ের সুদের হার আর বক্রী-মামলায় ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা কমবে কি না। মোল্লাহাটির বরকতুল্লা একটা দামী কথা বলেছিল—ইংরেজ আর মোর কী ক্ষেতি করিছে? যা ক্ষেতি করল তা তো আপনকার রায়-চৌধুরী আর আমাগো খালেক-ছাহেব।

কিছু ভাষ্য প্রয়োজন বরকতুল্লার ভাষণের। প্রথমত খালেক সাহেব হচ্ছেন মোল্লাহাটির দর্পণে নন্দদুলাল রায়ের প্রতিবিম্ব। আর দ্বিতীয়ত রায়-চৌধুরী কোন বহুব্রীহি নয়—দ্বন্দ্বসমাস! নন্দদুলাল রায় আর কমলাপতি চৌধুরীর যুগ্ম উল্লেক।

★ ★ ★

চাষী প্রধান গ্রাম। এককালে অধিকাংশেরই জমি ছিল, লাঙল ছিল। তারা নিজেরা নিজেদের জমি চাষ করত—ছিল, যাকে বলে মালিক চাষী। ওরা চাষ করতো সপরিবারে—নিজের জমিতে, নিজের বলদ দিয়ে, নিজস্ব লাঙলে। শুধু ধান রোয়ার সময় অথবা ধানকাটার সময় ডাক পড়ত বায়েনদের—দৈনিক মজুরির চুক্তিতে। দিবাকরের বাপের আমলে গাঁয়ের প্রায় অধিকাংশই ছিল এই মালিক-চাষী। কিন্তু অজন্মা আছে, অতিবৃষ্টি আছে, আছে বন্যা। ফলন হয় না সে বছর। চাষীরা ঋণ করে—কখনও রায়মশায়ের দরবারে আসে—কখনও ছোটে মোল্লাহাটিতে খালেক ছাহেবের কাছে। ঋণ ওঁরা দিতেন—না দিলে গরিব চাষী বাঁচবে কী করে! তারপর সেই ঋণের জালেই জড়িয়ে পড়ল ওরা—সে জাল ছিঁড়ে আর বের হতে পারত না। বাঙলা ১৩৪০ সালে মহাজন-আইন পাশ হল। তাতে সুদের উচ্চতম হার বেঁধে দেওয়া হয়েছে—আসলের যে পরিমাণ তার বেশি সুদ মহাজন আর দাবি করতে পারে না। পাঁকাল মাছের মতো এ আইন পাশ কাটিয়ে গেল মহাজন। তারা এরপর থেকে যে টাকা ধার দিত তার দ্বিগুণ অঙ্কের তমসুক লিখে নিত। অধমর্ণকে গোপন করে নয়—অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে এই নির্মম শর্তে ঋণ করতে আসত তারা। ধর্না দিয়ে পড়ে থাকত রায়মশায়ের দাওয়ায়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সম্পত্তি থাকলে বিক্রি কোবালা করতে হত দ্বিগুণ অঙ্কের নিচে ঠিপছাপ দিয়ে। সে ঋণ আর শোধ করা সম্ভব হত না। গ্রাসাচ্ছাদনের পর এমন কিছু উদ্‌বৃত্ত অর্থ ওদের হাতে থাকে না যাতে সুদের উপর আসলের কিছু অংশ পরিশোধ করে! ফলে জমি বিক্রি করে দিতে হত সেই মহাজনকেই দু-পাঁচ বছর সুদ টেনে নিরুপায় তথা নিঃস্ব হয়ে। যে জমি

মালিকচাষী হিসাবে এতদিন চাষ করেছে সেই জমিই চাষ করতে হত এবার—মালিকচাষী হিসাবে নয়, ভাগচাষী হিসাবে। আধাআধি ভাগে। বীজ, বলদ, লাঙল আছে, নাই জমি—তাই উৎপন্ন ফলনের অর্ধেক থেকে হত বঞ্চিত। কাটে হয়তো আরও দু-পাঁচ বৎসর। আবার আসে অনাবৃষ্টি, বন্যা অথবা পঙ্গপাল। আবার অজন্মা। ভাগচাষী লাঙল বলদ বিক্রি করে; বীজধান খেয়েই পাড়ি দেয়—অজন্মার বছরটা। তারপর? তারপর আর বর্গাদারী করবে কী দিয়ে? বলদ-লাঙল নাই, বীজধান নাই—নিধিরাম সর্দার কাঁদো কাঁদো মুখে এসে ধর্না দেয় আবার সেই মহাজনের কাছে, পত্তনিদারের কাছে—ইবার আর বর্গা লিব না হুজুর। বীজ নাই, গরু নাই, লাঙল নাই—কী করি কন?

—আরে গতর তো আছে? আমরা তো আছি? আর উপরে ভগমান আছেন! ভয়টা কী? লেগে যা। তোকেই বন্দোবস্ত দিলাম। বীজ, গরু, লাঙল আমার। যা, কাঁদিস না, পালা!

পত্তনিদারকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ি পেরে কৃষাণ চাষী, অর্থাৎ ভূতপূর্ব ভাগচাষী : মালিক না দেখলি আর দেখবেটো কে? এবার ফসলের ভাগ আর অর্ধেক নয়—তিন ভাগের একভাগ।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর পরের ধাপে তিনি উন্নীত হবেন—দিনমজুরে। দৈনিক মজুরির হিসাবে তাকে কাজ করতে হবে অন্য ভাগচাষীর কাছে—হয়তো সেই একই জমিতে, যতদিন না শেষ অঙ্কে নামবে পতন ও মৃত্যুর বিয়োগান্ত যবনিকা। যতদিন না—আমার কথাটি ফুরাবে, নটে গাছটি মুড়াবে।

চাষীপ্রধান গ্রাম হলেও গ্রাম্যশিল্পও আছে কিছু কিছু।

দ্বিজপদ কর্মকারের আছে কামারশালা। বাড়ির সংলগ্ন একটা তালপাতায়-ছাওয়া ঘরে হাতুড়ি, নেহাই, হাপর নিয়ে ঠুকঠুক করে। চার-পাঁচ ঘর কামার ছিল শতাব্দীর প্রারম্ভে। পাঁচখানা গাঁয়ের কাজের যোগান দিল ওরা। সবচেয়ে বড় কাজ ছিল গরুর গাড়ির চাকা মেরামত। দ্বিজপদ শুধু কর্মকারই নয়—গ্রামে সূত্রধর না থাকায় প্রয়োজনবোধে ছোটখাট ছুতারের কাজও সে হাতে নেয়। দ্বিজপদের ঠাকুর্দার আমলে চাষের ক'মাস ওদের নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ থাকত না। সাত-আটটা হাপর জ্বলত কামারপাড়ায়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শুরু হত ঠকাঠাই, ঠকাঠাই—সে আওয়াজ থামতো সেই দুপুররাতে। দ্বিজপদের বাপের আমলেই ব্যবসাটায় মন্দা পড়ে এল। একে একে কর্মকারেরাও উঠে গেল গ্রাম ছেড়ে। দ্বিজপদের বাপ বিপ্রপদ গ্রাম ছাড়ল না, সাত পুরুষের ভিটের মায়ায় পড়ে রইল গ্রামেই। কিছু যন্ত্রপাতি বিক্রি করে কিনল বিঘে কয়েক জমি। ভাগে চাষ করতো সেই জমি—আর ঠেকা দিত নিজ ব্যবসায়ে। দ্বিজপদের আমলে ব্যবসাটা আরও পড়ে এল। কলের তৈরি মালের সঙ্গে আর সে যুঝতে পারে না, পড়তায় পোষায় না—ফলে হাটে তার মাল কাটে না। সে আরও কিছু যন্ত্রপাতি বিক্রি করে আরও কিছু জমি কিনেছে। এখন চাষই হচ্ছে কর্মকারের প্রধান উপজীবিকা—যদিও পৈত্রিক জাতব্যবসাটা সে একেবারে ছাড়েনি। গো-গাড়ির চাকা বানানো আর মেরামত—যা ছিল তার প্রধান কাজ সেটা একেবারেই ছেড়ে

দিয়েছে। মাসে একখানি কি দু'খানির বেশি কাজ সে পায় না। অথচ যে যখনই কাজ দেয় চালায় তাগাদার পর তাগাদা। এতে খেতের কাজে বড় অসুবিধা হয়! তাগাদা সে একেবারেই সইতে পারে না। তাই চাকা বানানোর কথা তুললে হাত দুটি জোড় করে বলে—ওইটি পারবনি আজ্ঞে

জংশনের ছট্টুলালকে বড় হাপরটা সেকেন্ড হ্যান্ড দামে বিক্রি করার পর সে শুধু ছোটখাট কাজই করে এখন। কাস্তে, খোন্তা, সাঁড়াশী, দা বানায়। বেশি তৈরি করে না। হাটে সপ্তাহে গড়ে কোন মাল কত কাটে তার একটা হিসাব জানা আছে। সেই অনুপাতে বানায়। যাতে কাঁচামাল আটক না পড়ে। কোদাল, ফাতড়া, ট্যামরা বানানো ছেড়ে দিয়েছে। কলের তৈরি মালের সঙ্গে একেবারেই পড়তায় পোষায় না। একদিকে কয়লা হয়ে পড়েছে দুষ্প্রাপ্য অন্যদিকে লোহার দরও বেড়ে উঠেছে সোনার মত।

এ ছাড়া আছে তিনঘর তন্তুবায়। ওদের মধ্যে নবীন যুগীর অবস্থাই একটু ভালো। তিনঘর তাঁতি বললে অবশ্য অন্যায় বলা হয়—আসলে একঘর ভেঙেই তিনঘর হয়েছে। নবীনের ভাই হরু বাপ মরলে পৃথগন্ন হয়েছিল। আর নবীনের বড় ছেলে ছিনিবাস বাপের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই আলাদা হয়েছে বিয়ে করার পর। সুতরাং তিনঘর। নবীনের বড় তাঁত আছে, পৈত্রিক সম্পত্তি। বাপ বড়ছেলে নবীনকেই দিয়ে গেছে সেটা। প্রমাণ মাপের চাদর বোনা যায় তাতে। এতবড় তাঁত নজরে পড়ে না। নবীন অবশ্য কৃতজ্ঞ নয় এ জন্য বাপের প্রতি। তাঁতটা কাজে লাগছে না। নবীনের বাপ এ গাঁয়ে উঠে আসে তার ঠাকুর্দার সঙ্গে ঝগড়া করে। ওদের আদি বাস শান্তিপুরের কাছে বাঘআঁচড়া গাঁয়ে। তাঁতটা সে সেখান থেকেই আনে—কিন্তু ঐ তাঁত বসাবার মতো বৃহদায়তন ঘর বানিয়ে উঠতে পারেনি বেচারি। পারেনি নবীনও। ফলে অকেজোই পড়ে আছে সেটা। নবীন আক্ষেপ করে বলে : হঃ। কী সুখই হয়েসে ওটায়? বলে আপনি শুবার ঠাঁই নাই, তো তাঁত থুব কোথা?

বোধকরি মা লক্ষ্মীর কৃপণতার দুর্নাম মোচন করতেই মা ষষ্ঠী অকৃপণ হাতে বরদান করেছেন যুগীকে। বড় ছেলে শ্রীনিবাস এই রাবণের গোষ্ঠী থেকে আত্মরক্ষা করতে বিয়ে করার পর পৃথগন্ন হয়েছে। বড় মেয়ে রাধা অনূঢ়া। মাঝে একটি মেয়ে মারা গেছে। সেটি থাকলে তারও বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা এতদিনে। রাধারও হওয়া উচিত। কিন্তু নবীন নাচার। আশপাশের পাঁচদশখানা গাঁয়ে স্বজাতি নেই। পাত্র কোথায় পাবে? নবীনের বাপের অসুবিধা হয়নি। তার মেয়ে ছিল না, হয়েছে নবীনের—তার পাঁচটি ছেলে ছাড়াও চারটি মেয়ে। সর্বাণী বলে,—গাঁয়ে যুগী নাই বলি মেয়েরে থুবড়ো করি রাখবা? গাঁয়ে নেই তো ভিন্ গাঁয়ে দেখ। একটু খোঁজখবর করে তো মানুযে। আর নেহাৎ নাই যদি মিলে কুথাও তো ভিনজাতেও দাও না কেনে। আজকাল তো আকছার হতিছে।

নবীন বলে—দ্যাখ, রাধার মা, বাজে কথা বুলবি না। গাঁয়ে পাত্তর না থাকলি কি হয়, দ্যাশে সমাজ আছে। আর ভিন্‌জাতের ভাল ছেলেই বা পাই কুথা?

—কেন? ঐ তো সৎশে আছে—বেশ তো দুটিতে ছেলেবেলা থিকেই—

হো হো করে হেসে ওঠে নবীন। কথাটা শেষ হয় না সর্বাণীর!

—ওরে, আমরা হলাম গে যাটের ঘরের যুগী! চল্লিশের ঘরে কখনও মেয়ে দি-

না, তা এ তো কম্মোকার! কামারের পোলার সাথে মেয়ের বে দুব? আমাদের পৈতা আছে; আমরা হলাম গে দ্বিজ—আর ও বেটা দ্বিজপদ—কামার! পায়ের সাথে মাথার বে হয়?

যুক্তিটা অকাটা। নবীন যুগীর বাপ ষাটের সুতো বুনতো। বিশের সুতোয় যারা গামছা বোনে তাদের কথা যাক চল্লিশের সুতোয় যারা কাজ করে তাদের সাথেও মেয়ের বিয়ে দিতে নবীন নারাজ। সর্বাণী চুপ করে যায়। অবশ্য মন মানে না। আহা, দুটিতে বেশ মানায়।

নবীনের পৈত্রিক বড় তাঁতটা পড়েই আছে অকেজো। জাতের গরব সিকেয় তুলে রেখে নবীন বর্তমানে ছোট তাঁতে গামছা বোনে। তা বুনলে কী হয়, সে যে ষাট-কাউন্ট-সুতোর ঘরানা এটা ভোলেনি। ছিনিবাস কিন্তু পৈত্রিক ব্যবসা ত্যাগ করেছে। সাবধানী লোক সে। হাটতলায় একখানা ছাপরা তুলে দোকান দিয়েছে তেলেভাজার। ছিনিবাসের হাতটাও বেশ ভাল ছিল। পৃথক হবার সময় সকলে তাকে পরামর্শ দিয়েছিল দাদামশায়ের টাকায় একটা ভালো তাঁত কিনতে। সর্বাণীর বাপ মারা যাবার সময় কিছু সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিল দৌহিত্রকে। সেটাকেই পুঁজি করে ছিনিবাস পৃথক হয়। সৎ পরামর্শ যারা দিতে এসেছিল তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি ছিনিবাস। অল্প বয়সেই সে বুঝে নিয়েছিল যে, রায়মশায়ের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই। তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ সে বুঝে নিয়েছিল। তাই ছোট্ট একটি দোকান খুলে বসেছে হাটতলায়। ওর বাপ আজও রায়ের ঘর থেকে সুতো আনে আর গামছা বোনে। ব্যাপারিরা সেগুলো নিয়ে যায় হাটে—পয়সা পেলে আবার ছোটে রায়ের কাছারি—সুদসমেত সুতোর দাম মিটিয়ে আসতে। তারপর হিসাব কষলে দেখবে উদ্‌বৃত্ত একটি পয়সা থাকল না বিকিকিনিতে। ছিনিবাস হাসে—ঝাড়ু মারি অমন তাঁতির ব্যবসায়।

গ্রাম্য শিল্পের মধ্যে আর একটি শিল্প বাঁচিয়ে রেখেছে দক্ষিণতম অংশের পালেরা। ওরা পাঁচ ছয় ঘর কুম্ভকার শুধু কমলপুর নয়, এ তল্লাটের যাবতীয় মাটির পাত্রই সরবরাহ করে। আশেপাশের প্রত্যেকটি হাটে ওদের মাল যায়। কলসি, হাঁড়ি, সরা, খুরি, মাটির গেলাস, ফুলের টব, জালা, জাবনামাখার চাড়ি। এ ছাড়া শিল্পের মধ্যে পড়ে বেতের আর কঞ্চির কাজ। মোড়া বোনে, চাটাইয়ের আসন তৈরি হয়—সেটা যারা করে তারা কমলপুরের স্থায়ী বাসিন্দা নয়, ওরা নানা অঞ্চলের যাযাবর বায়েনরা। বৎসরের কিছুটা বর্ষণসিক্ত খণ্ডকাল যারা কাটিয়ে যায় গাঁয়ের ছাতিমতলায়।

দিবাকর এদের প্রত্যেকটি পরিবারের সমস্যা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করে দেখেছে। একমাত্র পালেরা ছাড়া সব কয়টি ব্যবসায়ীই অনিবার্য ধ্বংসের মুখে। কর্মকার চাষী হতে চলেছে, তাঁতশিল্পও হারিয়ে যাবে হাটতলার তেলেভাজার দোকানে। শুধু কমলপুরেই নয়, আশেপাশের প্রতিটি গ্রামে—লক্ষ্য করেছে পণ্ডিত, মানুষ বাপ-পিতামহের জাতব্যবসা ছেড়ে চাষ-নির্ভর হতে চাইছে। বায়নার ছিদাম সূত্রধর, বড়পলাসনের হাজারি কাঁসারী জাতব্যবসা ছেড়ে চাষে নেমেছে; সাতগাঁর মণিপতি স্বর্ণকার জাতব্যবসা ছেড়ে যুদ্ধের কাজে নাম লিখিয়ে চলে গেল;—মোল্লাহাটির রহিম, তোরাব, মনিরুদ্দি সকলেই সাতপুরুষের কাজ ছেড়ে চাষে নামতে চাইছে। কিন্তু কেন? চাষে কি বেশি রোজগার?

তা তো নয়। চাষীর অবস্থা তো চোখেই দেখা যায়—অধিকাংশেরই সারাবছর ভরপেট খাবার মেলে না। অথবা চাষে কি অল্প পরিশ্রম? তাও তো নয়। উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় ওদের চাষের মরশুমে। বাকি সময়ও একেবারে বসে থাকে না। ঝাড়া তুলে ফেল, গোবর সার দাও, মশ্‌নের চাষ করাও—কত হাঙ্গামা। তবে কেন সবাই চাষ-নির্ভর হতে চায়?

তার কারণ কুটির শিল্পের অবস্থা আরও শোচনীয়। মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে ওরা কাজ করে। ফলে শহরে তৈরি জিনিসের সঙ্গে যখন তাদের গ্রামজাত জিনিসের বিনিময় হয়—যখন তাঁতের কাপড়, হাতে গড়া খুন্তি, সাঁড়াশী বেচে ওরা কাগজ, কেরোসিন, পেনসিল কেনে, তখন শ্রম হিসাবে এই গ্রাম্যশিল্পীদের ভীষণরকম ঠকতে হয়. কারণ যন্ত্র-শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি আর সেকেলে হস্তশিল্পের উৎপাদিকা শক্তির কোন তুলনা করা চলে না। ফলে শহরের শ্রমিক এক ঘন্টায় যা উৎপাদন করে তার সঙ্গে হয়তো গ্রাম্যশিল্পীর আধবেলার মজুরির কাজের বিনিময় হয়। মনে আছে নিশীথদা বলেছিলেন অর্থশাস্ত্রে একে বলে কাঁচিশোষণ। এই কাঁচিকলের শোষণের ফলে গ্রাম্যশিল্প কেবলই মার খাচ্ছে—নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। চাষের উপরে ঠিক এ জাতীয় আঘাতটা তেমন পড়ছে না। শহরের কলে ধান তৈরি হয় না—তাই চাষী মরি মরি করেও টিকে থাকে। তাই গ্রাম্যশিল্পী চাষ-নির্ভর হতে চায়।

শিল্পীরা দলে দলে হচ্ছে চাষী,—চাষীরা মজুর—মজুরেরা শ্রমিক হয়ে চলে যাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে শহরের কারখানায়। ভিড় বাড়ছে সেখানকার ঘনবসতি শ্রমিক বস্তিতে। এই দীর্ঘ শোভাযাত্রার পথের দুধারে দাঁড়িয়ে আছেন এক শ্রেণীর দর্শক—ঐ চৌধুরী, নন্দদুলাল-খালেক ছাহেব—ওঁরা এ তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করছেন না। নদীর দুই তীরের গ্রামের লোক যেমন নদীস্রোতের সঙ্গে ছোটে না—খবর রাখে না কোন্ মহাসমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে নদী, শুধু ইচ্ছামত ঘড়া ঘড়া সঞ্চয় করে রাখে নদীর জল, এঁরাও তেমনি নিশ্চল দর্শকের ভূমিকায় ওদের দৌলতে স্ফীত হচ্ছেন ক্রমে ক্রমে।

দিবাকর স্থির করেছিল এই মৃত্যুপথযাত্রীদের সে রুখবে। বেশি বিস্তৃত ছিল না তার স্বপ্ন-রাজ্যের পরিসর। শুধু কমলপুর গ্রামটিকেই সে সঙঘবদ্ধ করতে চেয়েছিল। এই বঞ্চিত-ব্যর্থদের একজোট করতে চেয়েছিল ঐ সঞ্চিত-অর্থ মুষ্টিমেয়ের বিরুদ্ধে। তারপর যদি তার আদর্শে বায়না, মধ্যমগ্রাম, মোল্লাহাটি, বড়পলাসনের মানুষ মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়াতে পারে, আর তারও পরে যদি সেই বার্তা ছড়িয়ে পড়ে দূর থেকে দূরান্তরে—উদ্বুদ্ধ করে তোলে পঞ্চগ্রাম সপ্তগ্রামকে, ক্রমে নবগ্রাম, বিংশতি, পঞ্চবিংশতি সহস্র গ্রামে গাঁথা এই ভারতবর্ষ যদি একদিন জেগে ওঠে সে তো আশাতীত সৌভাগ্য।

জেলের মধ্যে নিশীথদা একদিন বলেছিলেন—বুঝলি দিবা, আর দুটি বছর, তার পরেই চাকা ঘুরবে। পিতা-পিতা ডাকতে ডাকতে ইংরাজ ও দেশ ছেড়ে পালাবে! এ রাজ্যে রাজত্ব করার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তার। গোটা এশিয়া এবার জাগবে। আমরাও ঢেলে সাজাব স্বাধীন ভারতবর্ষকে। প্রথমেই ধরব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঐ স্তম্ভগুলোকে—ঐ ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার আর প্রফিটিয়ারদের! যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে যারা রাতারাতি আমাদের মা লক্ষ্মীকে গ্রামের মাঠ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাইজি করে রেখেছে তাদের বাগানবাড়িতে। ওরাই

আমাদের ফার্স্ট টার্গেট! ওয়ান, টু, থ্রি! নিয়ারেস্ট ল্যাম্পপোস্ট। খতম! তারপর আসবেন মহানুভব পুঁজিপতিরা। মিলওনার্স আর মিলিওনেয়ার্স। ফরাসি বিপ্লব পড়েছিস তো?

তা পড়েছিল দিবাকর। শুধু ফরাসী বিপ্লবই নয়, অনেক বিপ্লবের ইতিহাসই জেলে বসে পড়েছে।

সে প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বরূপটা কী রকম হবে নিশীথদা? ইংরেজ যেদিন চলে যাবে, সেদিন আমাদের প্রাণশক্তির কিছুও কি অবশিষ্ট থাকবে?

নিশীথদা হেসে বলেছিলেন, মাত্র চার বছরেই ভুলে গেলি সভ্যতার সংকট?

দিবাকর বলে, বুঝলাম না।

—রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ জন্মদিনে উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণে আশ্রমবাসীদের ডেকে বলেছিলেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল...কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ-মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি!"

কারাগারের বদ্ধ আবহাওয়ায় দুটি বন্দীমানুষের মুক্তির বার্তা সম্বন্ধে এ আলাপ প্রহসন বলে মনে হয়নি সেদিন। দিবাকর বললে : এতখানি মুখস্থ করে রেখেছেন?

—জপের বীজমন্ত্র কি কেউ মুখস্থ করে রে? ও মুখস্থ হয়ে যায়।

—কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে শাসনতন্ত্রের রূপটা কেমন হবে? আমরা কি জার্মানি, ইটালির মতো একনায়কত্বের দিকে ঝুঁকব, না রাশিয়ানদের মতো সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকব?

নিশীথদা বলেছিলেন : ওই দুটো রাস্তা ছাড়া আর বুঝি কিছু দেখতে পাস না চোখে?

—আর কোন রাস্তা?

—বলছি, কিন্তু তার আগে বল তো দেখি স্বাধীন ভারতের কর্ণধার কে হবেন?

দিবাকর বলেছিল : মহাত্মাজী, পণ্ডিতজী, অথবা নেতাজী।

—তবেই দেখ, স্বাধীনতার পর ভারত ভাগ্যবিধাতা কে হবেন তাই যখন বলা যাচ্ছে না, তখন তিনি ফেডারেল স্টেট্সের প্রেসিডেন্ট হবেন, না পার্লামেন্টের প্রধানমন্ত্রী হবেন কিংবা একনায়ক রাষ্ট্রের ডিক্‌টেটর হবেন তা কেমন করে বলব?—তারপর একটু ভেবে বলেন : মহাত্মাজীর কথা বাদ দাও—তিনি আর কদিন? ভারতবর্ষের কর্ণধার হবেন, হয় পণ্ডিতজী, নয় নেতাজী। কে হবেন, তার উপর স্বাধীন

ভারতরাষ্ট্রের স্বরূপটা নির্ভর করবে। জানিস, উনিশশ তেত্রিশ সালে, মানে যুদ্ধ বাধার বছরছয়েক আগে, পণ্ডিতজী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন—'আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর সামনে আজ দুটিমাত্র পথ খোলা অছে—হয় ফ্যাসিজম্, নয় কম্যুনিজম্। আমি কম্যুনিজমের পক্ষপাতী—আমাকে নির্বাচনের ভার দিলে আমি তাকেই বরণ করে নেব। ফ্যাসিজম্ ও কম্যুনিজম ছাড়া নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। সুভাষচন্দ্র সে কথা শুনে লিখেছিলেন—'The view expressed here is, according to the author, fundamentally wrong. Unless we are at the end of evolution, or unless we deny evolution altogether, there is no reason to hold that our choice is restricted to two alternatives...Considering everything, one is inclined to hold that the next phase in world history will produce a synthesis between Fascism and Communism. And will it be a surprise if the syntehsis is produced in India ?' বুঝে দেখ দিবা, সুভাষচন্দ্র যখন একথা লিখেছিলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ লেখেননি 'আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।'

দিবাকর বলল : সবটা মিলিয়ে কী বলতে চাইছেন?

—আমি বলছি—এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে যদি সুভাষচন্দ্র মারা যান, তাহলে পণ্ডিতজী হবেন ভারতভাগ্য-বিধাতা। এবং সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হবে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র। আর যদি উল্টোটা হয়, যদি সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতকে গড়ে তোলেন তাহলে আমরা দেখব কামাল পাশা আর লেনিনের এক synthesis! সে যাই হোক, পুঁজিপতিদের ধ্বংস অনিবার্য।

সেই বিশ্বাসটুকুকে পুঁজি করে আজ দিন গুনছে দিবাকর। কবে স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ? কবে সাম্যের ধ্বজাধারী পণ্ডিত জওহরলাল পুঁজিপতিদের হাত থেকে কলকাঠি কেড়ে নিয়ে তার গ্রামের মানুষকে মানুষের মতো বাঁচাবার সুযোগ দেবেন! মনে যখনই নৈরাশ্য আসে, সে নিশীথদার দেখাদেখি জপ করে—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ!'

মাসতিনেক পরের কথা। পৌষমাস শেষ হতে চলল। এ সময়টা চাষী পল্লীতে একটা স্মরণীয় খণ্ডকাল। হৈমন্তী ধান মাঠ থেকে গোলায় এসে উঠেছে। মরাই ভরে উঠেছে। এখনও ধানবোঝাই গো-গাড়ি আসছে একটানা ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে গাঁয়ের পথ দিয়ে। ধান মাড়াইয়ের কাজ চলছে ঘরে-ঘরে। রবিশস্যের আয়োজনও চলছে। পৌষমাসটা নানা কারণে এ অঞ্চলে স্মরণীয়। শীতের বেলায় দিনটা যে কোথা দিয়ে কী করে পালিয়ে যায় তা টেরই পাওয়া যায় না। বাঁকা হয়ে পড়ে রোদ্দুর। গাছের ফাঁক দিয়ে চুরি করে-আসা একটুকরো রোদ্দুরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে

গাঁয়ের কুকুর। সকাল থেকেই রোদের আমেজটা ভাল লাগে। জটলা করে গ্রামবাসী রৌদ্রকে কেন্দ্র করে—কী আরাম! সারা মাসটাই নানান কাজে ওরা পাল্লা দিয়ে চলে সূর্যের সঙ্গে। মাসের শেষ দিকটা আরও চমকপ্রদ। পৌষ সংক্রান্তির দিন কয়টা। ঘরে ঘরে শোনা যায় মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে পল্লীসঙ্গীত। এ গান অন্যরকম। আকাশ ভরা শ্রাবণ মেঘের চাঁদোয়ার নিচে দরাজ গলায় জোয়ান চাষীর মরদ-বেটা যখন গান ধরে—'পরাণ বন্ধু রে—কালোবরণ ম্যাঘের রথে আমার ঘরে আইও' তখন মনটা উদাস হয়ে যায়। পুষ্কর মেঘকে ডাকে চাষী—গানে গানে ডাকে—উদোল গায়ে, টোকা মাথায়, সর্বাঙ্গে কাদা মেখে। এ গান সে গান নয়। এ গান টুসুর গান। এ গানে ডম্বরুর গুরুগুরু নেই—আছে কিঙ্কিনির ঝনৎকার।

টুসুর গান এ গ্রামের আদিম সম্পদ নয়। এ গানকে আমদানি করেছিলেন জমিদার লক্ষ্মীপতির মা বর্ধমান থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি। তাঁর মাধ্যমেই যে এটা এ অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছে তা গ্রামের অনেকেই ভুলে গেছে। ঘরে ঘরে টুসুর আয়োজন চলে। কুমারী কিশোরী মেয়েরা, বিবাহিতা বধূরা, ঘরণী গৃহিণীরা সকলেই ব্যস্ত। সাতসকালে উঠে ওরা যায় নদীতে। খ'ড়ে এখন শীর্ণা। অগভীর জলের একটা ধারা বালি-চিক্-চিক এ-পাড় ঘেঁষে। তার উপর লক্ষ পাখির লক্ষ্মী-পায়ের আল্‌পনা। গরুরগাড়ি অনায়াসে পারাপার করে বালির উপর দিয়ে। স্ফটিকস্বচ্ছ কাকচক্ষু জল নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এক মুঠো নীল আকাশের ছায়া। ক'বছর আগেও এ সময় নদীর জলে এসে নামতো ঝাঁকে ঝাঁকে যাযাবরধর্মী পাখি। কাদা-খোঁচা, বেলে হাঁস, মরাল, শর-হাঁস, চখাচখি। সারাদিন ওদের কলকণ্ঠে মুখর হয়ে থাকত নদীর তীর। সে একটা বিশেষ শীতের রূপ ছিল গাঁয়ের। আজকাল আর সে পাখির ঝাঁক আসে না। ধানকল হবার পর থেকে ওরা অন্য কোন অঞ্চলে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। ধানকলের ছোট তরফ আহ্‌মেদজীভাই একটা বন্দুক নিয়ে কয়েকবছর ধরে ওদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই বদলে গেছে শীতের নদীর পরিবেশ। খাল-কেটে কী কুমিরই এনেছেন চৌধুরী-কর্তা। ধানকল না জাঁতিকল!

ধানকল যখন ছিল না গাঁয়ে তখন ঘরে ঘরে ঢেঁকিতে ধান কোটা হত। এই পৌষ মাসেই। ওরা বলে সোনার-পোষ। প্রায়-প্রতি ঘরে ছিল ঢেঁকি। ভুক্কোতারা ডোবে-কি-ডোবে-না আওয়াজ উঠ্‌ত এ-ঘর থেকে ও-ঘর থেকে ঢকা ঢাঁই-ঢাঁই। সারা পৌষ-মাসটা ধরে মানুষের ঘুম ভাঙতো এ আওয়াজে। শীতকাতুরে মানুষগুলো কাঁথা মুড়ি দিয়েও শুনতে পেত ঢেঁকিশাল থেকে আলতা-রাঙা পায়ের মিঠে আওয়াজ আসছে ঢকা-ঢাঁই-ঢাঁই। সারা কার্তিক মাসটা যেমন ঘুম ভাঙে মধু বৈরাগীর রামকেলী শুনে—'রাই জাগো, রাই জাগো, নিশি হল অবসান'।

সব গৃহস্থেরই কিছু নিজস্ব ঢেঁকিশাল ছিল না। সে ক্ষেত্রে পাঁচবাড়ির মেয়ে পালা করে একবাড়িতে গিয়েই ধান কুটিয়ে আনে। মজা হত সেখানেই। ঘোষপল্লীতে ঢেঁকিশাল ছিল রত্নাকরের বাড়িতে। পাঁচবাড়ির মেয়ে এসে জোটে ঘোষের বাড়িতে। সারাটা দিন ঢেঁকিশালকে কেন্দ্র করে পাড়ার মেয়েদের জটলা। মেয়েরা হাসি-মশ্‌করা-হুল্লোড় করে।

এই কটা দিন ওদের উদ্দামতা এত বেড়ে যায় যে, ঘোষ-পাড়ার দুর্ধর্ষ মোড়ল রত্নাকর পর্যন্ত এ দিগড়ে ভেড়ে না। যগন্দের দাওয়ায় গিয়ে হুঁকা টানে বসে বসে। যগন্দের বউ, নাতনি টেঁপীও এসেছে রতনের বাড়ি। পৌষালী নিষ্কাজ বেলাটা তাই পুরুষদের জটলা হয় যগন্দের দাওয়ায়। গল্প, আড্ডা অথবা পাশা। যা কিছু কাজ এখন মেয়ে মহলে—ঢেঁকিশালে।

বউড়ি-ঝিউরি মেয়েরাই সেখানে আসর জমায়। ওদের হাসি-মশ্‌করা স্বতঃই আদিরস ঘেঁষে চলে এ কটা দিনের উদ্দামতায়। বয়স্ক যারা—গুলাব বউ, যগন্দের বউ, তাই বেশিক্ষণ বসে না এ আড্ডায়। জানে, ওদের আড্ডায় ব্যাঘাত হয় তাতে। কেউ হয়তো বলেই বসে, ও দিদিমা, তুমি আর কতক্ষণ পাহারা দিবে—ধান চুরি করবনি গো আমরা।

গুলাব বলে, মরণ! আমি কি ধান চুরি ঠেকাবার লেগে বসে আছি হেথায়?

যগন্দের মুখফোঁড় নাতনি টেঁপী বলে, তাইলে গা তোল কেনে—দেখ কেনে ফুলটুসী-বউ ঘোমটার আড়ালে ঘেমে নেয়ে গেল!

পোষমাসের গরমটা এমন কিছু নয় যে, গুলাবের পুত্রবধূ ফুলটুসী ঘোমটার তলায় ঘেমে নেয়ে যাবে; কিন্তু ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। ফুলটুসী একটা তীব্র কটাক্ষ হানে টেঁপীর দিকে। টেঁপী হটবার পাত্র নয়। বলে, অমন করে তাকাইছ কেনে গো? ঘেমে মরছ না তো পেট ফুলে মরছ তো?

সেটাই আসল কথা। গুলাব যগন্দের বউকেও ডেকে নেয়—চল দিদি, আমরা ওঘরে গে বসি।

বুড়িরা উঠে যেতেই ওঠে হাস্যরোল। ফুলটুসী টেঁপীর গালটা টিপে দিয়ে বলে, হতভাগী! কথা কইতে না পেরে আমার পেট ফুলবে কেনে? ফুলেছে তোর। আরসিতে গে দেখ কেনে?

টেঁপী বলে, ওলো হিংসে করিস কেনে? মনুয়ার বাপ ফিরে আসুক...ফুলটুসী তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দেয়।

হি হি করে হাসে সবাই।

হঠাৎ হয়তো নজরে পড়ে কোনায় ঘাপটি মেরে বসে আছে পদ্ম—প্রহ্লাদ বায়েনের মেয়েটা। ধমক দিয়ে ওঠে কেউ, তুই হেথায় কী করছিস? যা খেলগে যা!

প্রহ্লাদের এই মেয়েটা সর্বঘটে আছে—কিন্তু এরা তা সইবে কেন? বিবাহিত মেয়েদের আড্ডায় কুমারী মেয়ে কলকে পায় না। সতের বছর বয়সের নবাপালের মেয়ে এলে ওরা ডাক দেবে তাকে—এস এস মতি সুন্দরী, তোমার সেই নাদা-পেটা কর্তাটি কুথায়? অথচ পঁচিশ বছরের কোন অবিবাহিতা মেয়ে এলেও ওরা অস্বোয়াস্তি বোধ করবে। সীমন্তের ঐ ক্ষুদ্র সিন্দুরবিন্দুটি হচ্ছে এরাজ্যে প্রবেশের 'ভিসা'।

ঢেঁকিশালের এ প্রমীলারাজ্যে পৌষমাসে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই বটে—কিন্তু আনাচে-কানাচে কি কেউ আসে না? তা আসে। যগন্দের নাত-জামাই গোবিন্দ এসে বাইরে থেকে হাঁকাড় পাড়ে—কোন বস্তাটা আমার গো?

টেঁপী বস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে যায়। বাধা দেয় ফুলটুসী, গোবিন্দকে বলে, বড় যে বস্তা নিতে এয়েছ, আমাদের মজুরি কই?

গোবিন্দ বলে, মজুরি কিসের?

—ওমা আমি কনে যাব!—গালে হাত দেয় ফুলটুসী! ধান কুটল কি তোমার মাগ নাকি? আমরা পাঁচজনে কুটে দিইছি টেঁপীর ভাগ!

বোকার মত বেঁফাস প্রশ্ন করে বসে গোবিন্দ, কেন?

এরা হিহি করে হাসে!

—তা না তো কী? যা ধানের বস্তা চাপাইছ মাগের প্যাটে, এর পরেও ধান কোটাতে চাও?

ভুলটা বুঝতে পারে গোবিন্দ। তাড়াতাড়ি বস্তাটা পিঠে ফেলে সরে পড়তে চায়।

—বলি পালাইছ কুথা গো? ও জামাই? আমাদের মজুরি?

পৌষ মাসের শেষ দিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পৌষ সংক্রান্তি। সাতসকালে নদীতে ডুব দিয়ে মেয়েরা আসে ঢেঁকিশালে। এলো চুল খুলে দেয় পিঠে। চুলের নিচে একটা গেরো দেয়। ওদের কাজের কি আর অন্ত আছে, এই পোষমাসের শেষ দিনে? বাড়ির বড় বউকে আড়াই মুঠি ধান নিতে হবে নিজের হাতে মেপে। এক-কাপড়ে এলো-চুলে কুটতে হবে সেই ধান সূর্যোদয়ের আগে। যে বাড়িতে বউ নেই—সে বাড়িতে বাড়ির বড় মেয়ের অধিকার এ কাজে। যে বাড়িতে তাও নেই—সে বাড়ির কর্তার পক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় কী? সেই ধান কুটে তার চাল গুঁড়ো করতে হবে ধোয়া শিলে। নতুন চালের গুঁড়ায় দিতে হবে আল্‌পনা। উঠোনজোড়া পদ্ম, শঙ্খলতা আর হাতি। শেকল দিয়ে বাঁধা থাকবে পৌষ-লক্ষ্মীর হাতি। ফুটো-চাল ঘরের মেটে-দাওয়ায় পৌষমাসে দেখা যাবে 'দুয়ারে বাঁধা হাতি।' বাড়ির মেয়েরা বানাবে নানান মিষ্টান্ন। বাচ্চারা ঘুরঘুর করবে সারাদিন রান্নাঘরের আনাচে-কানাচে—যদি পাওয়া যায় একটু ছিঁটেফোঁটা। ঘরে ঘরে তৈরি হবে পুলিপিঠে, আসকে পিঠে, সরুচুকলি, অবস্থা বিশেষে দুধপুলি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরপুলি, গোকুলপিঠে। ঘরে ঘরে ঝংকাঠের উপর এঁকে দিতে হবে মা লক্ষ্মীর যুগল চরণ!

ধানকাটা থেকে শুরু করে সব কয়টি কাজের সাথে সাথে চলে টুসুর গান। সুরেলা মিষ্টি গলায় গাঁয়ের মেয়েরা দল বেঁধে গান গায়। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ওরা গান বাঁধে আর দল বাঁধে। একটু দূর থেকে গানের কথা বোঝা যায় না, কিন্তু সুরের বেশ মন টানে। কাছে গেলে বোঝা যায় ওগানের একটা মানে আছে। গাঁয়ের মেয়েরাই গান বাঁধে, সহজ ছন্দে, সরল সুরে—গ্রাম্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এ পাড়ার মেয়েরা গান শোনাতে যায় টুসুর ঘট মাথায় নিয়ে। ও পাড়ার লোকের নামে ছড়া কেটে গান গায় এপাড়ার মেয়েরা। টুসু এসেছে শুনে পাড়ার সব ছেলে মেয়ে জড়ো হয়! মেয়েরা ভিড় করে আসে। কৌতূহলী পুরুষেরাও বাতার আড়ালে, দেওয়ালের পাশে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চ হাস্যরোল ওঠে। পরদিন আবার ওপাড়ার মেয়েরা আসে কাটান দিতে—অর্থাৎ পাল্টা গানের জবাব দিতে। টুসুর গান কে বাঁধে তা জানবার উপায় নেই। সেটা গোপন করার রীতি আছে। থাকবেই, না হলে গাঁয়ে বাস করা মুশ্‌কিল। তবে প্রত্যেক পাড়াতেই থাকে দু'একজন কবিপ্রতিভাশালিনী মেয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে তারাই রচনা করে গান। সুরসংযোজনার ব্যাপারটা সরল—ছন্দ-বিন্যাসও। সব গানের

ভাষাই ছড়ার ভাষা, সব গানের সুরই অভিন্ন।

টুসু এসেছেন নবীন যুগীর দাওয়ায়। এমনিতেই মা ষষ্ঠীর কৃপায় নবীন যুগীর বাড়িতে নিত্য মচ্ছোব। তার উপর জুটেছে পাড়ার যতসব। হারিকেন হাতে এসে জুটেছে এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে। চার-পাঁচটা বাতি জ্বলছে উঠানে। টুসু এসেছেন দক্ষিণ-পাড়া থেকে—অর্থাৎ কুমোরপাড়া থেকে। নবা পালের বড় মেয়ে মতি-সুন্দরীর মাথায় টুসুর ঘট। সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে মতির। সবুজ রঙের একটা সস্তা ছাপা সিল্কের শাড়ি পরেছে সে গাছ-কোমর করে। কপালটা তেল চুকচুকে, মাঝখানে একটা কাঁচপোকার টিপ। সিঁথিটা লাল হয়ে আছে ব্রহ্মতালু-ইস্তক। আঁট করে বেঁধেছে বিঁড়ে-খোঁপা। গান গাইছে অনেকগুলি মেয়ে। সবচেয়ে সুরেলো মিষ্টি গলা হচ্ছে পদ্মর। প্রহ্লাদ বায়েনের টুকটুকে ফর্সা আদুরে মেয়েটার। কিন্তু ধুয়োটা ধরে রেখেছে মতি, পদ্ম নয়। পদ্ম পালপাড়ার মেয়ে নয়, বায়েনের মেয়ে, সুতরাং পালপাড়ার টুসুতে সে মূল-গায়েন হতে পারে না—যতই কেন মিষ্টি হোক না তার গলা। এরা সকলেই রাধার খেলার সাথী। মতি হচ্ছে আসলে নবীন যুগীর বড় মেয়ে, রাধার গঙ্গাজল।

সর্বপ্রথমেই মতি যে এ বাড়িতে গাইতে এসেছে এতে রাধার গর্ব আর ধরে না। সকলকে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দুই কোমরে হাত দিয়ে। যেন টুসুর গানের সমস্ত উপচারটি একমাত্র এই রানীর পায়ে উৎসর্গীত হয়ে ধন্য হবে। ওরা কী কী বলে তাকেই ঠিকমতো শুনে রাখতে হবে। এ পাড়ার কিশোরী বাহিনীর সেই হচ্ছে প্রতিনিধি। টুসুর সব কথা স্মরণে রেখে তবেই তো কাটান গাইতে হবে। আগন্তুক দলটিও বোধকরি সেইজন্য রাধাকে বিশেষ সম্মান দেখায়। ওরা রাধাকে এনে দাঁড় করালো সবার সামনে।

মতি গাইছিল :

দ্যাশের নতুন হাল হইল, দ্যাশের নতুন হাল।
যুদ্ধ থিকে ফিরে টুসুর ফিরেছে কপাল ॥
টুসু যাবেন ঠাকুর দেখতি সঙ্গে ছ'শো ঢোল
পথে শোনেন থ্যাটার হবে বিষম গণ্ডগোল ॥
থ্যাটার দেখতি এলেন টুসু—সত্যি বলছি ভাই।
বাবুদের মণ্ডপে দেখেন কেউ কুত্থাও নাই ॥

গত আশ্বিন মাসে জমিদারবাড়ি থিয়েটার হবে এ কথা ঘোষিত হবার পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়—সেটা সবাই জানে। এ বছর টুসুর গানে যে সে কথার উল্লেখ থাকবে তাতে আর বিচিত্র কী? পদ্ম মতিকে প্রশ্ন করে : কেনে? লোকজন গেল কুথা?

মতি তৎক্ষণাৎ গান ধরে :

লোকজন গেল কুথা, টুসু লোকজন গেল কুথা?
আসর ভোঁভাঁ দেখে টুসু মর্মে পালেন ব্যথা ॥
অবশেষে এলেন টুসু কলের উঠানেতে।
সিথায় থ্যাটার হচ্ছে দেখে বসেন মাদুর পেতে
ডাক্তারবাবুর আদেশ পায়ে ঘোষদা কাটে মাথা।

তাই না দেখে চিৎকার পাড়ে—কুথাকার এক গাধা ॥
পদ্ম বলে : কে চিৎকার পাড়ে? কুথাকার এক গাধা?
মতি তৎক্ষণাৎ ধরে : কুথাকার এ গাধা এটা? কুথাকার এ গাধা?
গাধা নয় রে, গাধা নয় এ, মোদের ছিরিরাধা ॥

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাজলের থুতনিতে নাড়া দেয় মতি। হোহো করে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। রাধা দুমদুম্ করে উঠে যায় উঠান থেকে। ঘরের মধ্যে ঢুকে সশব্দে বন্ধ করে দেয় আগড়। ফলে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে হাস্য কলরোল। সতীশ হেসে অনুরোধ করে আবার গাইতে। মতিরা উৎসাহের সঙ্গে আবার শোনায় গানটা। রুদ্ধকক্ষে ফুঁসতে থাকে রাধা। আচ্ছা সেও শোধ নেবে—দেখে নেবে ওদের! ঘটনাটা লজ্জাকর রাধার তরফে। পূজার সময় ধানকলের মাঠে জগবন্ধু ডাক্তারের পরিচালনায় চন্দ্রগুপ্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। সে রাত্রে একটি বীভৎস দৃশ্য—সেই যেখানে চাণক্যের আদেশে কাত্যায়ন মহারাজ নন্দকে বলি দিতে খড়্গ উঠিয়েছে—সেখানে রাধা আত্মবিস্মৃত হয়ে ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। রাধার বিশ্বাস, অধিকাংশ লোকেই জানে না অন্ধকারের মধ্যে চিৎকারটা আসলে কে করেছিল। মতি, শেফা, মায়ারা তার বান্ধবী হওয়া সত্ত্বেও এতবড় শত্রুতা করবে এ যেন ভাবাই যায় না। এখন ওরা ঘরে ঘরে গিয়ে ঐ গান গাইবে। জানতে আর কারও বাকি থাকবে না। অন্ধকার রাত্রের গোপন লজ্জার কথা আজ তিন মাস পরে প্রকাশ পাবে গ্রামের ঘরে ঘরে। এরপর রাধা মুখ দেখাবে কী করে? চোখ ফেটে জল আসে তার। আর সবচেয়ে বেশি রাগ হয়েছে ঐ সৎশের উপর। ও কেন ফিরে গাইতে বললে?

মেয়েকে সান্ত্বনা দেয় নবীন; বলে—তা তু কেনে গান বাঁধ না? পাল্টা জবাব দে। কেঁদে ভাসাইছিস কেনে? তুই তো ফি বারেই কাটান দিস।

রাধা সান্ত্বনা পায় না। কাটান দেবার উপায় নেই এবার। মতি, শেফা, মায়ার সম্বন্ধে এমন কোন গোপন ঘটনা জানা নেই যা দিয়ে উপযুক্ত কাটান দেওয়া যায়। তাছাড়া টুসুর গান সে বাঁধতে জানে না। কোনবারই সে নিজে রচনা করে না টুসুর গান। বিশেষ একজনকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়। কথাটা গোপন থাকে। এবার তার শরণাপন্ন হবার উপায় নেই। কেন যাবে? ও কেন ফিরে গাইতে বললে?

আচ্ছা, মাস্টারমশাইকে দিয়ে লিখিয়ে নিলে কেমন হয়? মাস্টারমশাই তো পণ্ডিত মানুষ—তিনি সবার চেয়ে ভাল লিখবেন নিশ্চয়। কিন্তু তাহলে তাঁকে সবকথা খুলে বলতে হয়। মায়, ঐ লজ্জার কথাটাও। পথ একটাই ছিল; কিন্তু নাঃ! সে অসম্ভব! অনুরোধ করা দূরে থাক—কথাই বলবে না তার সঙ্গে। ও কেন ফিরে গাইতে বলল?

সতীশ প্রতিবারই টুসুর গান লেখে। কিন্তু এই নীরব কবিটিকে কেউ চেনে না। গানগুলি সে গোপনে উপহার দেয় রাধাকে। কথাটা ওরা দুজনে ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। সকলে রাধারই সুখ্যাতি করে। তাতে সতীশের দুঃখ তো নেই—বরং গর্ববোধ আছে। রাধার প্রশংসাতেই সে খুশি। সকলের সুখ্যাতিতে স্ফীত হয়ে রাধা যখন লুকিয়ে এসে ওকে আদর করে—কোঁচড় থেকে লুকিয়ে-আনা শাঁকালুটা বার করে দেয়—তখন কৃতার্থ হয়ে যায় সতীশ! শাঁকালুতে এক কামড় মেরে আবার

আধখানা ফিরিয়ে দেয় রাধাকেই।

এবারও সতীশ টুসুর গান বেঁধেছিল। প্রতিবার তাকে কাটান বাঁধতে হয়—এবার তার ইচ্ছা ছিল রাধাই প্রথম গেয়ে আসবে। দিক ওরা কাটান—কেমন পারে। গাঁয়ের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ছিল সে গানে। চৌধুরীবাড়ির থিয়েটার পণ্ড হয়ে যাওয়ার কথা, ধানকলের উঠানে নতুন বারোয়ারী পূজা, থিয়েটারের রাত্রে কেষ্টপালের পটচুলো খুলে গিয়ে টাক বেরিয়ে যাওয়ার কথা—সবই ছিল সে-গানে। কিন্তু কিছুই কাজে লাগল না। ওরা আগে এসে গেয়ে গেল।

সতীশ নতুন করে কাটান-গান বাঁধবার জন্যে উসখুস করে; কিন্তু পরামর্শ করে কার সঙ্গে? রাধা তার সঙ্গে আড়ি দিয়েছে নিজ চিবুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তিনবার ঠেকিয়ে। দমে যায় সতীশ। সে বুজেছে ওসব মামুলি কথায় উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। যদিও কেষ্টপাল মতির কাকা, তার পটচুলো খুলে যাওয়ার কথাটা নির্মমভাবে বর্ণনা করতে পারলে খানিকটা আঘাত পাবে মতি; কিন্তু তাতে যেন ঠিক জুত হচ্ছে না। অভিমানিনী শ্রীরাধিকার মান কি এত সহজে ভাঙবে? কী লেখা যায়?

সংক্রান্তির আর মাত্র তিনদিন বাকি। এর মধ্যেই পাল্টা গান গেয়ে আসতে হবে। সংক্রান্তির দিন টুসুর ঘট ভাসিয়ে দেওয়ার পর আর গান গাওয়া চলবে না। ঘরে ঘরে চালকোটা, পিঠে গড়ার কাজ এগিয়ে চলে। সারারাত ধরে প্রায় গান শোনা যায়। পুরানো গান, গতবৎসরের গান, মামুলি গান।

হঠাৎ সতীশের বুদ্ধি খুলে যায়। মনে পড়ে যায় রসময়ের কথা। নবা পালের জামাই, রসময়। দ্বাদশবর্ষীয়া মতির সতের বছরের স্বামী। ভিন-গাঁয়ের ছেলে। ওদের বিয়ে হয়েছে গেল শ্রাবণে—অর্থাৎ মাসপাঁচেক। রসময় কিছু স্থূলকায়;—এটাই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র! তাছাড়া একটা ছোটখাটো ঘটনাও ঘটেছিল নতুন জামাইকে কেন্দ্র করে। ঘটনা সামান্যই, তাকে হাস্যকর রূপ দিতে হবে। অন্ধকারে রসময় পালেদের বাঘা কুকুরকে মাড়িয়ে দিয়েছিল আর আহত বাঘাও কামড়াতে গিয়েছিল নতুন জামাইকে। এটুকু সত্যকেই অবলম্বন করে গড়ে তুলতে হবে প্রতিশোধের গান।

শুধু গান লেখাই নয়—নানাদিকে মাথা খেলে সতীশের। কর্মকারের সন্তান। বাপ তার ছুতারের কাজও করে। যন্ত্রপাতি, কাঠ-কুঠো নিয়ে ভাঙাগড়া করার তার একটা স্বাভাবিক পারদর্শিতা ছিল। বস্তুত মাঝে মাঝে দ্বিজপদ দুঃখই করত—ছেলেটাকে কোন সুযোগ দিতে পারল না বলে। বড় হাপরটা থাকলে হয়তো গ্রাম ছেড়ে নতুন করে জংশনের বাজারেই গিয়ে বসত ছেলেটার হাত ধরে। এখানে কাজের অভাব—কিন্তু ছটুলালের কামারশালায়, জংশনের বাজারে ছয় ছয়টা বিহারী জোয়ান সারাদিন খেটেও কাজ শেষ করতে পারে না। ওরা বাপবেটায় যদি ওখানে একটা ছাপরা তুলে বসতে পারত তাহলে হয়তো এ দশা থাকত না! কিন্তু তা আর হবার নয়। জমি নিয়ে দ্বিজপদ জড়িয়ে পড়েছে।

আর তাছাড়া হাতটা সাফা হলেও ছেলেটার মাথায় একটা পোকা আছে—ভাবে দ্বিজপদ। কোন কিছুতে লেগে থাকতে পারে না। নতুন কিছু বানাবার জন্যেই সে পাগল। এক নমুনার কাজ সে একটার বেশি গড়বে না। প্রতি হাটে দ্বিজপদর গোটা

দশেক হাতা খুন্তি কাটে। ধান ওঠার পর হয়তো কিছুটা বাড়ে বিক্রি। সেই হিসাবেই দ্বিজপদ তার জিনিস বানায়। এ কাজে সতীশের সাহচর্য পাওয়া মুশকিল। সে একখানা কাটারি বানালে পরের খানা বানাবে বেড়ি। নমুনা বদল না হলে সতীশ কাজে মন বসাতে পারে না। ফলে অপ্রয়োজনীয় মাল জমে যায়। দ্বিজপদের কাঁচামাল, অর্থাৎ লোহা আটক পড়ে। ব্যবসার মূলধন চক্রাবর্তনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই দ্বিজপদ আজকাল আর সতীশকে হাপরে বসতেই দেয় না। সেও মহাখুশি। কখনও বানায় কাঠের খেলনা, কখনও মেরামত করে বাবুদের সাইকেল। আজ তার মাথায় জেগেছে অন্য চিন্তা। কঞ্চি, বাখাড়ি, খড়, ন্যাকড়া দিয়ে কী সব বানাচ্ছে বসে বসে।

বাপ বলে—কী করছিস ওটা?

ছেলে বলে—কিছু না!

—কিছু না কী রকম? দেখছি কী বানাইছিস, বলে কিছু না?

—খ্যালনা গড়ছি!

—ওরে আমার লবাবপুত্তুর! খ্যালনা গড়ছি! বাপের মাথার ঘাম পায়ে পড়িছে সিদিকে নজর নাই! মরণ হয় না তোমার!

গোয়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে মঙ্গলা—সতীশের মা। বুধির জাবনা মাখছিল সে। দু হাত খোলভূষিতে ভর্তি কনুই পর্যন্ত। সেই খোলপচা হাতখানা দ্বিজপদর নাকের কাছে নেড়ে বলে : পাঁচটা না, সাতটা না, একটা ছেলে তোমার—তাও বচ্ছরকার দিন তার মরণ ডাকতিছ? তুমি কী? ঘরে ঘরে সবাই পোষপাব্বন করছে—ওও না হয় আপন মনে খ্যালনা গড়ছে—তাতে কোন পাকা ধানে মই পড়িছে তোমার?

দ্বিজপদ চুপ করে যায়। স্ত্রীকে সে ভয় করে। লজ্জিতও হয়। বচ্ছরকার দিন কথাটা বলা উচিত হয়নি তার। গজগজ করতে করতে মঙ্গলা আবার প্রবেশ করে গোয়ালে। সতীশ ভ্রূক্ষেপও করে না। আপন মনে ছুরি দিয়ে কঞ্চি ছুলতে থাকে।

★ ★ ★

রাধা এসেছিল মাস্টারমশায়ের কাছে। এ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। তাছাড়া মতিরা তার সর্বনাশের চূড়ান্ত করেছে। প্রত্যেক বাড়িতেই গিয়ে শুনিয়ে এসেছে টুসুর গান। মাস্টারমশায়ের বাড়িতে ছেলেমেয়ে বা স্ত্রীলোক নেই—তবু তাঁকেও শুনিয়ে গেছে টুসুর গান। ওরা সকলেই একদিন পড়ত দিবাকরের পাঠশালায়। সেই সুবাদে মাস্টারমশায়ের বাড়িতেও গেছে গান শোনাতে। সুতরাং মাস্টারমশাই যখন ব্যাপারটা জানতেই পেরেছেন তখন উপায়ান্তরবিহীন হয়ে রাধা তাঁরই শরণাপন্ন হল।

আদ্যোপান্ত শুনে বিপদগ্রস্ত হল দিবাকর। টুসুর গান লিখবার ক্ষমতা তার নেই। তাছাড়া ঐ গানের প্রত্যুত্তর কীভাবে খাড়া করা যেতে পারে এ তার মাথাতেই আসে না। রাধাও নাছোড়বান্দা। শেষে বাধ্য হয়ে দিবাকর কাগজ- কলম টেনে নেয়। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে রাধা। দু মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়—দিবাকর ঘামতে থাকে। কাগজের বুকে কালির আঁচড় পড়ে না। ফরাসি নাটকের উপরে গ্রীক নাটকের প্রভাবের বিষয়ে কিছু লিখতে অনুরুদ্ধ হলেও সে আন্দাজে দু'চার লাইন লিখে

ফেলত। কিন্তু টুসুর গানের কাটান এক লাইনও বের হল না। রাধার আগ্রহ-উদ্বেল মুখখানির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে কথা প্রকাশ করতেও সাহস হয় না বেচারির।

শেষে মরিয়া হয়ে বলে : আমার লেখা আসছে না। তুই বরং লেখ, আমি শুধরে দেব এখন।

—আমার হয় না।

—হয় না কী রে? প্রতি বছরই তো টুসুর গান গাস তুই!

—গাইতে তো পারি—লেখা হয় না।

—তবে লেখে কে?

রাগ করে উঠে পড়ে রাধা—পারি না আপনার সাথে বক্‌বক্‌ করতি!

ঠিক এই সময়েই প্রবেশ করে সতীশ। তার হাতে দুটি অদ্ভুতদর্শন ন্যাকড়ার পুতুল। হাত দেড়েক লম্বা এক একটা। কঞ্চির গায়ে খড়-ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি একটা পুতুলের জামার নিচে আস্ত একটা চুবড়ি বসান আছে বোঝা যায়। অত্যন্ত স্থূলকায়। ধুতিপরা বর পুতুল। অপরটি কাকতাড়ুয়ার ঢঙে শুধু কঞ্চি দিয়ে গড়া—শাড়ি পরা, বউ পুতুল।

দিবাকর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে : এ সব কী রে?

—এ দুটো আমি তৈরি করেছি মাস্টারমশাই, আর রাধা টুসুর গান লিখেছে, শুনুন!

পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে। বউপুতুলটাকে মাটিতে শুইয়ে দেয়। স্থূলকায় বরপুতুলটা হাতে নিয়ে নাচতে থাকে :

টুসুর ইবার বিয়ে হল টুসুর হ'ল বিয়ে,
কমলপুরে আলেন টুসু টোপর মাথায় দিয়ে ॥
হাতির মতন গতরখানি নাদার মতন প্যাট।
দেখেই গাঁয়ের মেয়েরা সব করলে মাথা হেঁট ॥
এমন হাতি করবে বিয়ে কার সে বুকের পাটা?
এর চেয়ে যে হইত ভাল রায় জ্যাঠাদের পাঁঠা ॥
কন্যে কুথায় পাবে টুসু, কন্যে কুথায় পাবে?
হন্যে হয়ে শেষে কি ভাই একাই ফিরে যাবে?

হঠাৎ থেমে বলে, আপনি বলুন মাস্টারমশাই, কী বা হবে গতি?

দিবাকর ব্যাপারটা বুঝতে পারে না; বলে—কী বলব?

উৎসাহে আনন্দে রাধা আড়ির কথা ভুলে যায়। সে বুঝেছে টুসু এ ক্ষেত্রে আর কেউ নয়—মতির বর রসময়! সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ধুয়ো ধরে : কন্যা কুথায় পাবে টুসু? কী বা হবে গতি?

বরপুতুলকে মাটিয়ে শুইয়ে দিয়ে একলাফে সতীশ তুলে নেয় কৃশকায় কাকতাড়ুয়ার মত বউ পুতুলটা। অঙ্গভঙ্গি করে গেয়ে ওঠে :

কন্যে কুথায় পাবে টুসু—কী বা হবে গতি?
ঐ বানরের গলায় দেব—দুলিয়ে এ হার : 'মতি' ॥

প্রতিশোধ! চরম প্রতিশোধ নেওয়া যাবে এইবার। ইচ্ছা করে সতীশকে জড়িয়ে ধরে নাচতে। উঃ! কী কাণ্ডটাই না করছে সংশে! নাকে ঝামা ঘসে দিয়েছে একেবারে মতির। সতীশ গাইতে থাকে :

টুসু বলেন কন্যে কুথা, লাগছে আমার ভোম,
(এ যে) খ্যাংরাকাঠির মাথায় দেখি আস্ত আলুর দম॥
কন্যা বলে...এস টুসু বস আমার ঘরে
উৎসাহেতে গোদা শ্রীঠ্যাং বাঘার ঘাড়ে পড়ে।
কন্যা বলে...কানার মত হাঁটছ কেন স্বামি?
টুসু বলেন...সময় সময় অন্ধ বটি আমি
আশপাশেতে নজর চলে—বলেন টুসু কেঁদে—
(শুধু) পায়ের কাছে যায়না নজর—ভুঁড়িতে যায় বেধে॥

দিবাকর উচ্ছ্বসিতভাবে তারিফ করে সতীশের সৃজনীপ্রতিভাকে। সে বুঝেছে, যে পারে সে অনায়াসেই পারে টুসুর গান রচনা করতে, আর যে এ প্রতিভা নিয়ে জন্মায়নি সে কিছুতেই পারবে না এ গান লিখতে—তা সে যতবড় পণ্ডিতই হক। শিষ্যের হাতে পরাজয় গুরুর সবচেয়ে কাম্য। কথাটা প্রায়ই বলেন পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন। আজ সে কথাটার মর্মগ্রহণ করল দিবাকর।

রাধা এসব ভাবছে না। সে হেসে লুটিয়ে পড়ে। তারপর পুতুল দুটো আর কাগজখানা সতীশের কাছ থেকে নিয়ে তার হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

★ ★ ★

কমলাপতির নাকি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। লোকজনের সঙ্গে আজকাল দেখাই করেন না। বস্তুত বাড়ি থেকে বারই হননি গত তিন মাস। একবার মাত্র ক'লকাতা গিয়েছিলেন। পরদিনই ফিরে আসেন কমলপুরে। বাইরের লোকজনের সঙ্গে তো সাক্ষাতই করেন না—বাড়ির লোকের সংস্পর্শও যেন বরদাস্ত হয় না তাঁর। কমলাপতির নামে নানান গল্প মুখে মুখে ফিরছে, তার অর্ধেকও যদি সত্য হয় তবে বুঝতে হবে গুরুতর কিছু ঘটেছে।

গুরুতর সত্যিই ঘটেছে কিছু ইতিমধ্যে। প্রজাসাধারণের পৃথক দুর্গোৎসব করার প্রচেষ্টা, আব্বাসভাই কোম্পানির সঙ্গে নন্দদুলালের মিলিত দুঃসাহস তাঁর মাথায় দাবানল জ্বেলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার উপর ওরা যে কেউ পূজায় ঠাকুর দেখতে আসবে না এতটা ভাবতেই পারেননি। পাত-পেতে প্রসাদ খায়নি কোন ভদ্র প্রজা। বায়েন, ডোম প্রভৃতি কেউ কেউ গিয়েছিল বটে—কিন্তু আয়োজনের তুলনায় অতিথি সমাবেশ হয়েছিল অত্যন্ত অল্প। মায়ের প্রসাদ নষ্ট হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। ভদ্র প্রজার মধ্যে এসেছিলেন একমাত্র একজন—তারাপ্রসন্ন পণ্ডিত। কোনস্থানেই তিনি আহার্য গ্রহণ করেন না—ফলে সে প্রশ্নই ওঠেনি। আর কেউ আসেনি। আগেকার দিন হলে বিসর্জনের পরমুহূর্তেই কমলাপতির বজ্রনিনাদ ধ্বনিত হয়ে উঠত—পূজা পার করেই রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য, সেসব কিছুই হল না—সমস্ত অপমান তিনি নীরবে সয়ে গেলেন। কেন, কেউ জানে না।

সুচতুর নন্দদুলালের ধারণা—ভয় পেয়ে গেছেন কমলাপতি। এরকম ধারণা করার কারণ ছিল। বাঙলা তেরশ তিপান্ন সালের রাজনীতি কোন পথে চলেছে শ্যেনদৃষ্টি নন্দদুলাল সেটা নজরে রেখেছেন। গ্রামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা তাঁর নখাগ্রে—এবং তার বিচার-বিশ্লেষণেও ভুল হয় না তাঁর।

আব্বাসভাই হঠাৎ পুতুলপুজোয় মোটারকম চাঁদা দেওয়ায় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অপ্রিয়ভাজন হয়ে পড়েন। ধর্মের ভিত্তিতে গড়া এই রাজনৈতিক দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাঙলার মসনদে। আব্বাসভাই ব্যবসায়ী মানুষ—এই হিন্দুপ্রধান গ্রামের মানুষগুলিকে হাত করতে তিনি যে চাল চেলেছিলেন—তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল বটে, কিন্তু প্রতিবাদ এল গাঁয়ের বাইরে থেকে। আবার এক চাল চাললেন আব্বাসভাই। নিমন্ত্রণ করলেন কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে। কলকাতা থেকে এলেন তারা দলবেঁধে। ধানকলের প্রাঙ্গণেই প্যান্ডেল বেঁধে মিলাদ শরিফ করলেন তাঁরা। মোল্লাহাটি থেকে এলেন গণ্যমান্য অনেকেই। আব্বাসভাই একটি মক্তবের দ্বারোদঘাটন করালেন একজন উপমন্ত্রীকে দিয়ে। একটি মসজিদ স্থাপনের প্রস্তাবও হল—মোটারকম চাঁদা দিলেন আব্বাসভাই।... নন্দদুলালের ধারণা এইসব দেখেই ঘাবড়ে গেছেন কমলাপতি। রাজনীতির বাতাস কোনদিক থেকে বইছে, নন্দদুলালের ধারণা, সেটা ভালভাবেই জানা আছে কমলাপতির। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগানটা নিশ্চয়ই পৌঁছেছে ধানকল থেকে চৌধুরীবাড়িতে।

আসলে কিন্তু নন্দদুলালের ধারণাটা ভুল। কমলাপতির নীরবতার পিছনে আর যাই থাক ভয় পাওয়ার কোন লক্ষণ ছিল না।

প্রথা বলে, দেশে দুখানা পূজা হলে এ বাড়ির ঢুলি নবমীর দিন ও বাড়িতে গিয়ে বাজনা শুনিয়ে প্রসাদ পেয়ে আসবে; এবং পরিবর্তে ও বাড়ির ঢুলিরাও এ বাড়ির প্রতিমার সামনে বাজাতে আসবে। কমলপুরে অবশ্য আবহমানকাল ধরে একখানি মাত্রই পূজা হয়। তাই এ প্রথার কথা কারও খেয়াল থাকার কথা নয়—কিন্তু কমলাপতির ভুল হয়নি। নবমীর পূজা শেষ হলে নায়েব গাঙ্গুলিকে ডেকে বললেন : বাজনাদারদের বল, ধানকলের মণ্ডপে গিয়ে বাজনা শুনিয়ে আসবে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন হরিহর গাঙ্গুলি। মেজকর্তার কি মাথা খারাপ হল? ধানকলের বারোয়ারী পূজা-কমিটি চৌধুরীকর্তাকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেনি। জোর করে পাল্লা দিয়ে ওরা পুজো করছে। আব্বাসভাই কোম্পানির সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমাও চলছে জেলা আদালতে। গ্রামসুদ্ধু ইতর-ভদ্র জমিদারকে অপমান করবে বলেই পরিহার করেছে মায়ের সাবেক পূজা, আর মেজকর্তা বলছেন সেখানেই যাবে ব্যান্ড বাজিয়েরা অনিমন্ত্রিতভাবে?

—কর্তা...

—বুঝেছি হরিহর। কিন্তু গ্রামে এবার যখন দুখানা পূজা হচ্ছে তখন প্রথামতো নবমী করতে যাবে বইকি এরা।

—কিন্তু ওরা আমাদের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেনি, হুজুর।

—জানি, আমরাও ওদের নিমন্ত্রণ করিনি।

এর কী জবাব আছে? অর্থাৎ জবাব আছে; কিন্তু সেটা এতই স্পষ্ট যে, সে কথা মেজকর্তাকে মনে করিয়ে দিতে যাওয়া বাহুল্য। চৌধুরীবাড়ির পূজায় গ্রামস্থ কাউকেই

পৃথক নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হয় না। ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্র যায় কলকাতায়, সদরে, দূরবাসী আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুমহলে। গ্রামবাসীকে আলাদা নিমন্ত্রণ করার প্রথা নেই।

—কিন্তু আমাদের বাজনাদারেরাই আগে যাবে? ওরা যদি ঢুকতে না দেয়?

—হ্যাঁ, আমাদের বাজনাদারেই প্রথম যাবে। সেটাই নিয়ম। ওদের প্রতিমা নবাগতা—অভ্যর্থনা প্রথম করবে সাবেক প্রতিমার ঢুলিরাই। আর, হ্যাঁ—যদি ঢুকতে না দেয়, তবে এরা যেন গণ্ডগোল না করে। সরকারি সড়কে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনিয়ে চলে আসবে। মায়ের কাছে সন্তানের অপমান নেই।

হুকুম শুনে চুপ করে যায় গাঙ্গুলি। চৌধুরীকর্তা আর অপেক্ষা করেননি। উঠে গিয়েছিলেন নিজের খাসকামরায়। ব্যান্ড পার্টি রওনা হয়ে যায়।

নিজের খাসকামরায় এসেও শান্ত হতে পারেন না। এবারকার পুজোটাই অদ্ভুত। এমনভাবে পুজো কখনও হয়নি কমলপুরের চৌধুরীবাড়ি। কমলাপতি অবশ্য জানতেন না, কমলপুরের চৌধুরীবাড়িতে এইটাই দেড়শ বছরের দুর্গোৎসবের শেষ অনুষ্ঠানসূচী। জমিদারবাড়ি উৎসবের কোন লক্ষণ নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে পূজার কাজকর্ম হয়ে যাচ্ছে—গতানুগতিকভাবে। কলকাতা থেকে শেষ মুহূর্তে পূজারী ব্রাহ্মণ এসেছেন রসিকলাল অস্বীকার করায়। উমা, জাহ্নবী, দয়াময়ী—পারতপক্ষে কর্তার সম্মুখে আসছেন না কেউ। বাপের সঙ্গে কলহ করে শ্রীপতি বন্ধুবান্ধব-সহ ফিরে গেছে কলকাতায়, পূজার পূর্বেই। দুদিন পরে কমলাপতি নিজেই গিয়েছিলেন অবাধ্য সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে। ফিরে এসেছিলেন পরদিন। তারপর থেকে খাসকামরার সামনের প্রশস্ত বারান্দায় ক্রমাগত পদচারণা করে চলেছেন। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন না বিশেষ। সকলের ধারণা থিয়েটার দেখতে কেউ আসবে না, এটা বুঝতে পেরেই ওঁরা স্থগিত রেখেছেন অভিনয়-ব্যবস্থা। আসল ইতিহাসটা কিন্তু আরও গভীর, আরও বেদনাদায়ক। তার সম্পূর্ণ ইতিহাস একমাত্র কমলাপতিই জানেন।

যৌবনে তিনিও অনেক ফুর্তি করেছেন। তাঁর দাদা বাবাও করেছেন। কলকাতা, কাশী, লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী এসেছে—সারারাত ধরে চলেছে মাইফেল, রঙমহলের বাতি নিভেছে ভোর রাতে রামকেলি, ভৈঁরোয়। সেটা লক্ষ্মীপতির আমল। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মদ ও আর একটি ম-কারান্ত দ্রব্যের উপর অলিখিত অধিকার চৌধুরী পরিবারে স্বীকৃত। শুধু কর্তামহলে নয় গৃহিণীদের কাছেও। লক্ষ্মীপতি সব জানতেন—কখনও আপত্তি করেননি। শোনা যায়, তাঁর যৌবনেও তিনি এ নিয়ে কোন বাধা পাননি তাঁর পিতৃদেবের কাছে। লক্ষ্মীপতি আকৃষ্ট ছিলেন মোল্লাহাটির একটি সুন্দরী মুসলমান স্বৈরিণী-শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রতি—এরকম একটা জনরব আছে। কমলাপতিও আপত্তি করতেন না যদি শ্রীপতি বংশের ধারা মেনে চলত। কিন্তু সেই সীমারেখা অতিক্রম করে বসল শ্রীপতি। অন্দরমহলের বাইরে এসে যত ইচ্ছা কর্দম মাখতে পার, কিন্তু কাঁঠালকাঠের গুলবসানো দরজাটা অতিক্রম করার আগে ধুলা-পা ধুয়ে যাবার কথা। অন্দরমহলের শুচিতা সম্বন্ধে চৌধুরীবাড়ির নিয়ম কঠিন। শ্রীপতি সে শুচিতা নষ্ট করেছে। সে ঐ মেয়েমানুষগুলোকে এনে তুলেছে, ভদ্রঘরের মেয়ে বলে—তাঁর অন্দরমহলে। দয়াময়ীর সঙ্গে, উমার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে ওরা আহার করেছে,

একাসনে বসেছে! ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন কমলাপতি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা শ্রীপতি অপরাধ স্বীকার করেনি—তিরস্কৃত হয়ে সদম্ভে সদলবলে ফিরে গেছে কলকাতায়।

পরে অবশ্য কমলাপতি কিছুটা অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ঠিক অনুতাপ নয়, স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি স্থির থাকতে পারেননি। হোক অন্যায়, তবু সন্তান তো? পুজোর সময় বাড়ি থাকবে না? কমলাপতি হরিহরকে ডেকে আদেশ দিলেন ক'লকাতা গিয়ে শ্রীপতিকে ফিরিয়ে আনতে। তারপরেই মনে হল, যে অভিমানী ছেলে তাঁর। হরিহরের আহ্বানে ফিরবে তো? কী মনে করে নিজেই গিয়েছিলেন। ক'লকাতায় শ্রীপতি ছাত্রাবাসে থেকে পড়ত—কলকাতায় তিনি বাড়ি করেননি। ছাত্রাবাস পূজার ছুটিতে বন্ধ। অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ি গেছে। যে কয়েকজন পড়ুয়া ছেলে রয়ে গেছে তাদের কাছেই সংবাদটা পেলেন অবশেষে। কলেজ থেকে শ্রীপতির নাম কাটা গেছে পাঁচ-ছয় মাস পূর্বে—ছাত্রাবাসেও সে থাকে না!

ফিরে এসে হিসাবের পাকা খাতাটা আনতে বলেছিলেন হরিহরকে। প্রতি মাসেই শ্রীপতির হস্টেল কলেজের মাহিনার খরচ উঠেছে পাকা খাতায়। স্ত্রী দয়াময়ীর কাছেও সংবাদটা গোপন রেখেছিলেন। ছেলে এল না এটুকুই তিনি জানতেন।

উমা পাথরের গেলাসে করে সরবৎ নিয়ে এসে দাঁড়ায়। নবমীর উপবাস চলছিল তাঁর। পূজা সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত প্রায়। হঠাৎ কমলাপতি সোজা হয়ে উঠে বসেন। তাঁকে যেতে হবে বারোয়ারী পূজামণ্ডপে। নাইবা থাকল তাঁর নিমন্ত্রণ—প্রজারা অপমান করেছে তাঁকে, সে বোঝাপড়া প্রজাদের সঙ্গে হবে। কিন্তু মা এসেছেন গ্রামে—নতুন প্রতিমায়। তাঁকে গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির প্রণাম না করলে চলে? কমলাপতির আভিজাত্য তাঁর জাত্যভিমানকে অতিক্রম করে গেল। তিনি স্থির করলেন একাই যাবেন তিনি বারোয়ারী পূজা-তলায়। কারও সঙ্গে কোন বাক্যালাপ করবেন না—নীরবে এগিয়ে যাবেন প্রতিমার দিকে। স্পষ্ট দেখতে পান কমলাপতি দৃশ্যটা। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জনতা—দুপাশে সার দিয়ে। কেউ কোন কথা বলবার সাহস পায় না। শুঁড়তোলা চটি পায়ে, গিলেকরা পাঞ্জাবির উপরে কোঁচান চাদরটি চড়িয়ে তিনি সোজা গিয়ে পৌঁছাবেন পূজামণ্ডপে। চটি জোড়া খুলে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবেন মাকে। ঢাকিয়া ঢাক বাজতে ভুলে যাবে, তাকিয়ে থাকবে বোকার মত। রসিকলালের মন্ত্রোচ্চারণ ক্ষান্ত হয়ে যাবে মুহূর্তের জন্যে। চরণামৃত দেবার কথাও মনে থাকবে না! অভ্যাসমতো ঝুঁকে নমস্কারই করে বসবে হয়তো কেউ। ভ্রূক্ষেপও করবেন না। যেন পূজা-মণ্ডপে জনতা নেই—শুধু তিনি আর মৃন্ময়ী মা! প্রণামীর পরাতটা লক্ষ্য করে ছুড়ে দেবেন একটা গিনি! হ্যাঁ, একটা আস্ত গিনি দিয়েই তিনি প্রণাম করবেন নবাগতা মাকে। তারপর মাথা সোজা রেখেই আবার ফিরে আসবেন। হয়তো পিছন থেকে সম্বিত ফিরে-পাওয়া কেউ কাঁপা গলায় ডেকে বসবে—হুজুর! শুনতে পাবে না তিনি। মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে অস্ফুটে উচ্চারণ করতে করতে ফিরে আসবেন : যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি।

ওদের তিনি বুঝিয়ে দিতে চান যে, এদের নিক্ষিপ্ত কর্দমপিণ্ড তাঁকে স্পর্শ করে না—তাঁর আসন অনেক উচ্চে! রাজনীতির খেলায় পরধর্মকে চাঁদা দিয়ে সাহায্য

করতে যে বেনিয়াবৃত্তি কুণ্ঠিত হয় না তার সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির বনেদী আভিজাত্যের কোন তুলনাই হয় না। যারা সাবেক পূজাবাড়িতে মাকে প্রণাম করতে আসেনি—তারা বুঝে নিক, অপমান তারা চৌধুরীকে করেনি, করেছে আনন্দময়ী মাকে। তারা জাগতিক লাভক্ষতি দলাদলির তুলাদণ্ডে মাকে ওজন করে পাপাচরণ করেছে। অযাচিতভাবে বারোয়ারীতলায় প্রণাম করে ওদের তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন যে, ছোটরাই ছোট হয়েছে আরও—তিনিই মহৎই আছেন!

গরদের চাদরটা কাঁধে ফেলে নীরবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি! সরবৎটা পড়েই থাকে। বারোয়ারীতলায় প্রণাম করে ফিরে এসেই জলগ্রহণ করবেন বরং। দয়াময়ী বলেন, কোথায় চলেছ এমন করে?

—আসছি এখনি।

বেরিয়ে আসেন তিনি অন্দরমহল ছেড়ে। সদর দরজার কাছেই কিন্তু তাঁকে থেমে পড়তে হয়। কারা যেন কথা বলছে। ব্যান্ড বাজিয়েরা ফিরে এসেছিল—তাদের সঙ্গে কথা বলছিল হরিহর। যে লোকটা ব্যাগপাইপ ব্যাজায় সে বলছিল—কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা মশাই! বলে, তোমরা এসেছ নবমী করতে ভালো কথা; কিন্তু আমরা তো ভাই কেউ বাজাতে যাব না ও বাড়ি। চৌধুরীবাড়ির দেউড়িতে আমরা কেউ মাথা গলাব না। তোমাদের ঠাকুর কাল যখন পথে বেরুবে তখন বাজনা বাজিয়ে শোনাব।

—কে বললে রে একথা?—প্রশ্ন করে নায়েব।

—নাম তো জানি না বাবু। ওদের ঢুলিটা—কী চেহারা মশাই লোকটার—ঠিক যেন মহিষাসুর।

শুধু হরিহর নয়, কমলাপতিও বুঝতে পারেন—লোকটা প্রহ্লাদ বায়েন।

—তোদের প্রসাদ দেয়নি? বক্‌শিস?

—দিইছিল বাবু, আমরা নিইনি। ওদের বড়বাবু, রায়বাবু বললে—বাড়তি মুনাফা করতে এয়েছে এখানে—দে রে, ওদের একটা করে টাকা দে। পদ্মপাতায় করে প্রসাদও এনে দিল। কে একজন বললে—কী রে, তোদের খেতে-টেতে দেয় তো? জবাব দিলাম না। একটা বাতাসা তুলে মুখে দিলাম শুধু।

রাগে অপমানে হরিহরের কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। মুখটা বিকৃত করে বললে—কেন, বক্‌শিস নিলেই পারতিস? কে বারণ করেছিল? নগদ টাকাটা ট্যাকে গুঁজে একপেট খেয়ে এলেই পারতিস। এসে ঢেকুর তুলতে তুলতে বললেই হত—'মায়ের কাছে সন্তানের অপমান নেই।'

কমলাপতি দেওয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেন। ওঁর উপস্থিতিটা যেন না জানতে পারে। মর্মান্তিক লজ্জা পাবে তাহলে।

লোকটা হাসে। বলে—বড়কর্তার না হয় মাথা খারাপ হয়েছে, তা'বলে আমরাও তো আর পাগল হইনি বাবু। কী করব বলুন? মালিক হুকুম দিলেন—বাজিয়ে এলাম। হিঁদুর ছেলে, মায়ের প্রসাদ এনে দিল—বাতাসাটুকু মুখে দিলাম। তাবলে বক্‌শিস্? গরিব হ'তে পারি, তাবলে মান-ইজ্জত তো আমাদেরও আছে বাবু?

পা টিপে টিপে কমলাপতি ফিরে আসেন। নিজের খাসকামরায় এসে বসে থাকেন

দুহাতে মাথাটাকে ধরে। তারপর হরিহরকে ডেকে বলেন, আজকের বাজানোর জন্য বাজনদারদের পাঁচটাকা করে বক্‌শিস্‌ বরাদ্দ করতে।

এসব ঘটনা তিনমাস আগেকার। তবু এর প্রত্যেকটি দৃশ্য স্পষ্ট মনে আছে চৌধুরীমশায়ের। তিনমাস হয়ে গেল শ্রীপতির কোন সংবাদ নেই। অর্থাৎ কমলাপতি তার সন্ধান রাখেন না। তার ঠিকানা যে গোপন নেই, তা বুঝতে পারেন হিসাবের খাতা দেখে। হরিহর হিসাব অনুযায়ী পড়ার খরচ জুগিয়ে যাচ্ছে ছোটবাবুর। ছোটবাবু পড়ছেন! পড়তে পড়তে কোন অতল গহ্বরে গিয়ে এ পতন শেষ হবে জানা নেই। দয়াময়ীও কেমন যেন শান্ত হয়ে গেছেন। ছেলের নাম উচ্চারণ করেন না ভুলেও। কমলাপতির হাসি আসে। তিনি বুঝেছেন স্নেহাতুরা জননী কেন এত নীরব। দয়াময়ী বোধহয় ভয় পান—যদি প্রসঙ্গটা তুলতে গিয়ে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যায়—যদি নতুন করে উত্তেজিত হয়ে কমলাপতি ভীষণ কিছু করে বসেন।

মাঝে মাঝে যেন আগুন জ্বলে ওঠে কমলাপতির মাথায়। একটা খুন-জখম-মারামারির জন্য তীব্র লালসা জাগে। আজকাল তিনি বড় নীরব হয়ে পড়েছেন। শুধু নীরবই নয়—শান্তও। প্রজাপীড়নের প্রসঙ্গেও উত্তেজিত হতে পারেন না ঠিক—এটা চৌধুরীবংশের মানুষের পক্ষে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা নয়। কমলাপতি যেন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসেছেন—লাঠির জোরে, বন্দুকের গুলিতে সব কিছুকেই ঠেকিয়ে রাখা যায়, একমাত্র দুর্ভাগ্যকে ছাড়া। না হলে এতবড় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী তাঁর চেখের সম্মুখেই এভাবে অধঃপাতে যেতে বসবে কেন? কার জন্য সম্পত্তি রক্ষা করবেন তিনি! কেন প্রশস্ততর করবেন তার অর্থাগমের পথ? দয়াময়ীর ভরণপোষণের সুব্যবস্থা আছে, উমার সুপাত্রে বিবাহ দিয়েছেন। জাহ্নবীর জন্যেও—না সারদাপতির বিধবার প্রতি তাঁর কোন দায়িত্ব নেই। তিনি কিছুই গ্রহণ করবেন না দেবরের কাছ থেকে। যে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে মনের দুঃখে তিল তিল করে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন সারদাপতি—সেই সম্পত্তির কোন ভগ্নাংশও হাত পেতে গ্রহণ করবেন না তাঁর বিধবা। কেন যে লক্ষ্মীপতি জ্যেষ্ঠপুত্রকে বঞ্চিত করেছিলেন সম্পত্তি থেকে তা অবশ্য জানার কথা নয় জাহ্নবীর—কিন্তু তবু ঐ বঞ্চনাই যে তাঁর অকালবৈধব্যের একমাত্র কারণ এটা তো তিনি জানেন। সুতরাং কমলাপতির সম্পত্তিবৃদ্ধির সঙ্গে জাহ্নবীর সম্পর্ক শ্রীফল আর বায়সের।

আর শ্রীপতি? তার মুখ চেয়ে বিষয়বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেবেন কমলাপতি? সম্পত্তি শ্রীপতির কাছে আশীর্বাদ নয়—অভিশাপ! অধঃপাতে যাবার পাথেয়। মাঝে মাঝে কমলাপতির মনে হয় হয়তো সত্যিই মঙ্গল হত যদি তিনি শ্রীপতিকে বঞ্চিত করতে পারতেন তাঁর বিষয় থেকে। তা কি সম্ভব? উইলটা পালটানো যায় না? একটা ট্রাস্টির হাতে যদি তুলে দেওয়া যায় সম্পত্তিটা? শ্রীপতি যদি কোনদিন উপযুক্ত হয়, মানুষ হয়—তবেই সে পাবে তাঁর জমিদারী; পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে নয়—ট্রাস্টির হাত থেকে নিজ উপার্জনে। তার পূর্বে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার কঠোর দায়িত্বটা দিলে কেমন হয়? দারিদ্র্যের কঠিন কষাঘাত ছাড়া শ্রীপতি যে শোধরাবে না—এটা বুঝতে পেরেছেন। তিনি শুধু ইতস্তত করছিলেন দয়াময়ীর কথা

ভেবে। এতটা কি দয়াময়ী সহ্য করতে পারবেন? দয়াময়ীও ভাবেন স্বামীর অদ্ভুত পরিবর্তনের কথা। রাগী, খামখেয়ালী দুর্দান্ত জমিদারটিকে তিনি ভালো করেই চেনেন—ঐ দুর্ধর্ষ লোকটির মনের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত তাঁর কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ কাচখণ্ডের মতোই পরিষ্কার। তাঁকে আজ ত্রিশ বছর ধরে দেখে এসেছেন দয়াময়ী। তিনি জানতেন, এই দুর্দান্ত জমিদারটি সময়-বিশেষে শিশুর মতো সরল। সামান্যতম কারণে নিভৃত রাত্রে তিনি কমলাপতির চোখে জল দেখেছেন—হয়তো সে অশ্রুবিন্দুর মূল-উৎস একখানি ইংরেজি উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার দুঃখ। বুঝেছিলেন, তাঁর স্বামীর মধ্যে বয়ে চলেছে দুটি ভিন্নমুখী বিপরীতধর্মী ধারা। তিনি আভিজাত্যের অভিমানে উন্নতশির! নীচ কাজকে ঘৃণার সঙ্গে পরিহার করে এসেছেন। নজর কখনও ছোট করেননি। তাঁর সব কাজই ছিল রাজসিক। রাজসিক গুণ এবং দোষ। খেয়ালখুশিতে অযাচিত দান করেছেন অকৃপণহস্তে। আঘাত যখন এসেছে বুক পেতে গ্রহণ করেছেন পাষাণের মতো। যন্ত্রণায় শিথিল হতে দেখেননি মুখের একটি পেশী। একরাত্রে, মনে আছে দয়াময়ীর, তাঁর স্বামীকে কাঁকড়াবিছে কামড়েছিল। বাথরুমেই কামড়েছিল। কমলাপতি কাউকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেননি। চাদরটা কাঁধে ফেলে টর্চ হাতে সদর খুলে একা চলে গিয়েছিলেন কৃষ্ণসখা কবিরাজের কাছে। রাত তখন দুটো।

পরদিন যখন হৈ চৈ পড়ে গেল—সকলে বারবার এসে অনুযোগ করল কেন কাউকে জাগাননি। কমলাপতি বলেছিলেন, ওরা সারাদিন আমারই কাজে ক্লান্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল—ডাকব কী করে? দিনের বেলা ওরা আমার সেবা করে—রাত্রে ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন, ঘুম ভাঙাবো কোন অধিকারে? তাছাড়া ঘুমের মধ্যে মানুষের শরীরে নারায়ণ আসেন।

জনান্তিকে অভিমান করেছিলেন দয়াময়ী। কৈফিয়ত নেবার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিলেন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে : আমাকে অন্তত ডাকলে না কেন?

কমলাপতি হেসেছিলেন। সে বিচিত্র হাসিটুকু আজও স্পষ্ট মনে আছে দয়াময়ীর। কমলাপতি বলেছিলেন—ওটা আমার হিসাবে ভুল হয়ে গিয়েছিল গিন্নি। তোমার যে চব্বিশ ঘন্টার ডিউটি! আর তাছাড়া জীবনে কখনও তোমাকে কোন প্রয়োজনে রাতে ডেকে তুলিনি এ কথা তো হলপ করে বলতে পারব না! অন্তত তোমার কাছে—

প্রৌঢ়া দয়াময়ী লজ্জায় লাল হয়ে বলেছিলেন—চুপ কর!

বৃশ্চিক দংশনের এত তীব্র যন্ত্রণাটা ভ্রূক্ষেপই করেননি তিনি। শুধু চাকরি গিয়েছিল নতুন বিহারি দারোয়ানটার। কর্তা সদর খুলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে খেয়াল করেনি। সে দিনের সেবক নয়, রাতের।

শুধু দৈহিক সহ্যশক্তিই নয়—মানসিক একটা অসীম উদারতা আছে তাঁর স্বামীর। এ কথা মর্মে মর্মে জানা আছে তাঁর। ভীমা ঘোষের উচ্ছেদের মামলার ব্যাপারটা ভুলতে পারেননি আজও। রতন ঘোষের খুড়ো ভীমা ঘোষ জাঁদরেল প্রজা। তার খাজনা বাকি পড়েছিল তিন বছরের—কিছুতেই আদায় হয়নি। প্রতি বছর তাগাদায় গিয়ে অস্থির হয়ে গেছে গোমস্তা পেয়াদা। দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ভীমা আর রতনের কাছ থেকে খাজনা আদায় হয়নি একটি কানাকড়ি। বলে,—অনাবাদী বচ্ছর যাচ্ছে পরপর

দুবার—ইবার তো বন্যায় ভাসি গেল দেশ—খাজনা দুব কুথা থিকে? তামাদি হবার মাথায় মামলা দায়ের করল নায়েব হরিহর। ভীমা এল একবছরের খাজনা জমা দিতে। নায়েব তা নিতে অস্বীকার করল। তিন বছরের খাজনা সুদ সমেত, মায় মামলার স্ট্যাম্প খরচা মিটিয়ে না দিলে সে খাজনা নেবে না। নায়েবও এইবার দেখে নেবে ভীমা ঘোষের প্রতাপ। আদালতের পেয়াদা এসে যখন নিলাম করবে স্থাবর-অস্থাবর—তখন ভীমা-রতনের লাঠিবাজির তেজটা কোথায় থাকে নায়েব তা একবার যাচাই করে দেখতে চায়!

ভীমা কেঁদে গিয়ে পড়েছিল জমিদারের কাছে। কঠোর কণ্ঠে কমলাপতি বলেছিলেন, এখন কেন? বারবার আমার পেয়াদা ফিরিয়ে দিয়েছিস তুই! পাই-পয়সা মিটিয়ে না দিলে তোকে দাখ্‌লে দেওয়া হবে না।

ভীমা অনুনয় করেছিল—হাত জোড় করেছিল—অজন্মা-বন্যার দোহাই পেড়েছিল। ধমকে উঠেছিলেন নতুন-গদি-পাওয়া তরুণ জমিদার—অজন্মা আর বন্যা তোর ঠেই শুধু হয়েছে, নারে? আর সবাই খাজনা দিয়ে যায় কী করে?

—কী করে অ্যারা খাজনা দেয় তা সিংহাসনে বসি আপনে কী জানবেন হুজুর? দেয় আধপেটার বদলে উপোস দিয়ে...দেয় মাগ-বেটির পরনের কাপড় খুলে বেচে!

গর্জন করে ওঠেন কমলাপতি, চোপরাও হারামজাদা! মুখে মুখে কথা। চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেব হারামির বাচ্চার!

রতন ঘোষের তখন নবীন যৌবন, বসে ছিল পাশেই—চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল তার। উঠে দাঁড়াতে চায়। খপ করে তার হাতখানা ধরে আবার বসিয়ে দেয় ভীমা। শান্তকণ্ঠে বলে, তাই নেন কেনে কর্তা! পিঠের ছালটা তুলি নে জুতা বানান—আপত্তি করবনি। শুধু এখন একবছরের খাজনা নে রেহাই দিতি বলুন নায়েবমশায়কে।

কাছারিসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল লোকটার দুঃসাহস দেখে। হরিহর থেকে চাপরাশী পর্যন্ত সকলেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল আসন্ন বজ্রপাতের আশঙ্কায়! কমলাপতি ডেকেছিলেন, জনাবালি!

একহারা লিকলিকে চাবুকের মতো একজন তরুণ লাঠিয়াল পাশ থেকে সেলাম করে। রতন ঘোষ খুড়োর হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাগিয়ে ধরে লাঠিটা! ভীমা স্থির হয়ে বসেই থাকে—একচুল নড়ে না!

কমলাপতি কী ভেবে স্থিরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন ঐ উবু হয়ে বসে থাকা ভীমা গয়লাকেই—আর যদি রেহাই না দিই তোকে?

—তাহলে আপনের সামনে মাথা খুঁড়ি মরব আমি। তারপরে ঘরের মেয়েছেলেদের পথে বের করি খাজনা আদায় করবেন আপনে!

দুঃসহ ক্রোধ সংবরণ করে কমলাপতি বলেছিলেন, তবে তাই মর! আমার সামনে আগে তুই মাথা খুঁড়ে মর—তারপর তোর খাজনা মাপ দেব!

—কথা দিলেন কিন্তু দ্যাবতা!—বলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লোকটা সামনের দিকে। হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছিল সবাই। প্রচণ্ড আঘাতে মাথা ঠুকেছিল ভীমা। কমলাপতির শ্বেত পাথরের জলচৌকির কোনায় লেগে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। যেন পিচকারি

ছুঁড়েছে কেউ। লালে-লাল হয়ে গিয়েছিল কমলাপতির গিলে করা পাঞ্জাবি। ভীমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। উদ্যত রক্তাক্ত মাথাটা আবার আনত করে ভীমবেগে। এবার কমলাপতিই সেটা ধরে ফেলেন!

মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হল সংজ্ঞাহীন লোকটার। কমলাপতি রক্তাক্ত হাতটা ধুয়ে, জামাটা পাল্টে আসেন। পাঁজাকোলা করে খুড়োকে তুলে নিয়ে গেল রতন। কমলাপতি আদেশ দিলেন, ভীমার তিনবছরের খাজনা একসঙ্গে মাপ করে দিতে। হরিহর সবিস্ময়ে নিবেদন করে—অনেক টাকা যে লোকসান হয়ে যাবে হুজুর?

—যাক্! ওকে কথা দিয়েছিলাম আমি। বাধা না দিলে ও বেটা অসুর হয়ত সত্যি সত্যিই মাথা খুঁড়ে মরত আমার সামনে।

—কিন্তু ও তো একবছরের খাজনা দিতেই এসেছিল! বাকিটাও দেবার সময় চেয়েছিল। খাজনা না দেওয়ার কথা তো ও একবারও বলেনি।

কমলাপতি হেসে বলেছিলেন, তুমি পড়নি, ও বেটা বোধহয় কালিদাসের মেঘদূত পড়ে এসেছে। তাই তোমার কাছে না-চেয়ে আমার কাছেই চেয়েছে—'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামাঃ'! অধিগুণের কাছে অল্প করেই চাইতে হয়—যা দেবার সে নিজে থেকেই দেয়। তোমার হাত দিয়ে একসঙ্গে তিনবছরের খাজনা মাপ করার দাখলে আশা করেনি বেটা—সেটা ওর দোষ নয়। এতকাণ্ডের পর আমি কিন্তু ওর কাছ থেকে একটা আধলাও নিতে পারব না!

সে সব ইতিকথা গাঁথা হয়ে আছে দয়াময়ীর অন্তরে। এ বাড়িতে যখন প্রথম আসেন তিনি—তখনও তাঁর কৈশোর পেরয়নি। শতাব্দীর একপাদকাল ধরে অনেক কিছুই দেখেছেন। স্বামীর অন্তরের সব অলিগলিই তাঁর পরিচিত! এককথায় যেমন তিনি অযাচিত দান করতে পারেন—একমুহূর্তে চরমতম দণ্ডও দিতে দেখেছেন তাঁকে। মোল্লাহাটির ফজলু মিঞার চাচা রহিমের কথাটা মনে পড়ে!

...কাছারিবাড়ির থামের সঙ্গে বাঁধা আছে রহিম। ঠা ঠা-করা রৌদ্রে এক ফোঁটা জল দেয়নি কেউ তার মুখে। দিলেও সে জল স্পর্শ করত না রহিম। সেটা তার রমজানের মাস চলছিল। সন্ধ্যাবেলায় সাজগোজ করে আতর মেখে ছড়ি হাতে কমলাপতি বেড়াতে যাবার সময় দেখলেন বন্দী বিদ্রোহীর মাথাটা হেলে পড়েছে ক্লান্তিতে। বলেছিলেন, কী রে ব্যাটা হারামির বাচ্চা! এখন স্বীকার হলি? না কি এবার তোর বউ-বেটিকে ধরে আনতে লোক পাঠাব?

আহত কালসর্পের মতো মাথাটা সোজা করেছিল রহিম। চোখ দিয়ে আগুন ছুটছিল তার। রমজানের মাসে অভুক্ত মুসলমানকে চরমতম গালি দেওয়ায় মাথার ঠিক ছিল না তার। উচ্চকণ্ঠে বলেছিল—সে আর আপনের পক্ষে বিচিত্তির কি? মোছলমানের হাতে জল খান না আপনে, শুনেছি মোছলমান-মেয়ের পায়ের তলায় রাত কাটতো আপনার বাপের! আমার বউ-বেটিকে আপনে...

কথাটা তার শেষ হয়নি। মেজকর্তার পাম্প-সুর প্রচণ্ড আঘাতে ঠোঁটের রক্তে চাপা পড়ে গিয়েছিল বাকি ক'টা শব্দ।

—শুয়ার কি বাচ্চা! তুই এতবড় কথা বলিস?

—ক্যান বলব না! তুমি আমার বাপকে রমজানের মাসে হারামি বলবার কে? তোমার বাপের কীর্তি তুমি জান না?

দুরন্ত ক্রোধে স্থানত্যাগ করেছিলেন কমলাপতি। লক্ষ্মীপতি একটি মুসলমান স্বৈরিণীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এ জনশ্রুতি অজানা ছিল না তাঁর।

রহিম কাছারি-বাড়ি থেকে আর গাঁয়ে ফিরে যায়নি।

মোল্লাহাটির প্রজারা বিদ্রোহ করেছিল। একদল গিয়েছিল থানায়, আর এক দল এস. ডি. ও-সাহেবের এজলাসে। লিগ মন্ত্রিত্বের আমল। এস. ডি. ও. আলিসাহেব নিজে এসেছিলেন তদন্তে। রহিমের লাশ কোথায়ও পাওয়া যায়নি—কোনও প্রমাণ নেই, সাক্ষী নেই। কিছুই হয়নি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু দয়াময়ী জানেন সে কোথায়। জীবন্ত-অবস্থায় রহিমের চতুর্দিকে পাকা-দেওয়াল গেঁথে তোলা হয়েছিল! আর্ত চিৎকার ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ইঁটের পরে ইঁটের গাঁথনিতে। এখনও মধ্যরাত্রে দয়াময়ীর মনে হয় গোয়ালঘর আর আস্তাবলের মাঝের দেয়ালটা আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠছে : জান বাঁচাও! জান বাঁচাও!

কমলাপতির গোয়ালে পর পর দুটো বিয়ান গাই মারা গেল। গাঁয়ের গোবদ্যি প্রহ্লাদ বায়েন মৃত্যুর কোন কারণ খুঁজে পায়নি—পেয়েছিলেন দয়াময়ী। নীরবে সব সয়েছেন তিনি। শুধু কি গোমাতার মৃত্যু? তার চেয়ে অনেক বেশি! গোপনে তিনি কিছু অর্থ পাঠিয়েছিলেন ফতিমার কাছে। রহিমের বিধবার কাছ থেকে সে টাকা ফেরত এসেছিল!

স্বামীর নাড়ি-নক্ষত্র ভালভাবেই জানা আছে তাঁর; কিন্তু আজকাল যেন তাঁকেও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছেন না দয়াময়ী। কারও সঙ্গে কথা বলেন না কমলাপতি। মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে আর্তকণ্ঠে যখন 'তারা ব্রহ্মময়ী, মা' বলে ডাক দেন তখন দয়াময়ী বুঝতে পারেন মানুষটা কত ক্লান্ত।

বলেন, তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব?

—দাও।

প্রসঙ্গটা উত্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন দয়াময়ী। এড়িয়ে যাওয়া আর উচিত হবে না। বলেন—ছেড়ে দিলে তো চলবে না। ডেকে আন ওকে। কড়া করে বাঁধতে হবে এবার।

কার কথা বলছেন বুঝতে অসুবিধা হয় না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দুজনের মন জানিতেন। হেসে কমলাপতি বলেন—মাথায় সর্পাঘাত হলে কোথায় তাগা বাঁধবে পিউ?

অনেক, অনেকদিন পরে এ সম্বোধনটায় স্থির হয়ে থাকেন দয়াময়ী, বুঝতে পারেন সহ্যের শেষ সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন আজ তাঁর স্বামী। তবু বলেন—তাই বলে ছেড়ে দিলে তো চলবে না; অন্যায় মানুষ মাত্রেই করে, খোকাও করেছে। তাকে ডেকে আন, শাসন কর, শোধরাবার সুযোগ দাও। তোমরা বাপবেটায় এমন করলে আমি কোথায় দাঁড়াই বলত? উমাও আজকাল ভাল করে কথা বলে না—গুমরে গুমরে কেঁদে বেড়ায়; দিদি তো চিরদিনই পাষাণ! তুমিও যদি এমন মুখ বুজে চুপ করে থাক, তাহলে আমি যে পাগল হয়ে যাব! মাথায় সর্পাঘাত হয়েছে মনে করে তুমি চিকিৎসা করাবে না?

উঠে বসেন চৌধুরী। একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন দয়াময়ীর দিকে, বলেন—কথাটা যখন

তুললেই গিন্নি তখন তোমাকে খুলে বলি। হ্যাঁ, চিকিৎসা এর আছে; তবে বড় কঠিন চিকিৎসা। তুমি সহ্য করতে পারবে তো?

দয়াময়ীর বাক্যস্ফূর্তি হয় না। ভয়ে দুরুদুরু করে বুক। কমলাপতি বলে চলেন, আমি উইলটা পালটাতে চাই। তোমাকে সাক্ষী থাকতে হবে।

—খোকাকে বঞ্চিত করবে সম্পত্তি থেকে?

—না, একেবারে বঞ্চিত করব না। তোমার আর বৌঠানের অংশ পৃথক করে দিয়ে বাকি জমিদারীটা আমি দিয়ে যাব একটা ট্রাস্ট্রির হাতে। গুরুদেব, আমার অ্যাটর্নি আর তুমি থাকবে তার এক্সিকিউটার। আমার মৃত্যুর পর শ্রীপতি এক কপর্দকও পাবে না। যদি সে কোনদিন নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পাবে—যদি মানুষের মতো হয়েছে বলে তোমরা তিনজনে বোঝ, তখনই দেবে তাকে এ জমিদারী ভোগ করার অধিকার। কেমন রাজি আছে?

দয়াময়ী জবাব দিতে পারেন না।

—থাক, এখনই বলতে হবে না তোমাকে, ভেবে পরে বল।

আপ্রাণ চেষ্টায় উদগত অশ্রুকে ঠেকিয়ে রাখেন দয়াময়ী। স্বামী নেই, সমস্ত সম্পত্তির অধিকার তাঁর হাতে—সুখ ভোগ, ঐশ্বর্যের মাঝখানে তাঁর দিন কাটছে—সামাজিকতা করতে হচ্ছে, লৌকিকতা বজায় রাখতে হচ্ছে—দামী পোশাক, ভালো আহার্য, সমস্ত অয়োজন চলেছে জমিদারীর ঠাটে! আর তাঁর খোকন? সে হয়তো জীবন-সংগ্রাম করছে কোন খোলার বস্তিতে—হয়তো ছিন্নবসনে তাঁর অভুক্ত খোকন রোগশয্যায় ছটফট করছে—ওষুধ কিনবার পয়সা নেই, ডাক্তার ডাকার সঙ্গতি নেই—যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করছে খোকন! হয়তো বড়ঠাকুরের মতো রুদ্ধদ্বারকক্ষে সারারাত মদ্যপান করছে তাঁর বঞ্চিত-আত্মজ—লিভারের ব্যথায় ককিয়ে কেঁদে উঠছে। স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি সে আর্তস্বর—যেমন শুনেছেন বড়ঠাকুরের লাইব্রেরি ঘরে! অনাগত জীবনের একটা দুঃস্বপ্ন যেন ফুটে উঠল মনের পর্দায় নিখুঁতভাবে।

আর্তনাদ করে ওঠেন দয়াময়ী, ওগো! তুমি আমায় মাপ কর! সে আমি পারব না।

—পারবে না? তাই তো! আমি ভেবেছিলাম...আচ্ছা থাক...সে পারবে না তুমি। মায়ের প্রাণ!

দয়াময়ী স্বামীর পায়ের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকেন। না, পারবেন না তিনি। এ অক্ষমতা যেন ক্ষমা করেন তাঁর স্বামী। অশ্রুআর্দ্র কণ্ঠে বলেন—আমাকে তুমি ক্ষমা কর; এ আমারই পাপের ফল।

এত দুঃখেও কমলাপতির হাসি আসে। কৃষ্ণপক্ষের অস্তগামী চাঁদের মতো ম্লান হেসে কমলাপতি প্রশ্ন করেন—তোমার পাপের ফল? এ কথা হঠাৎ বলছ কেন?

—গরিব ঘরের মেয়ে ছিলাম। রূপের জোরে তোমাদের ঘরে এসে আমার মাথা ঘুরে গেল। খোকা এল আমার কোলে। তোমাদের এ জমিদারীর ঐশ্বর্যটাকেই গ্রহণ করেছিলাম—আর সব কিছুকেই ভয় করে চলতাম। তোমাকেও ভয় করতাম তখন। তাই চিরকাল খোকাকে আড়াল করে রেখেছিলাম তোমার কাছ থেকে। ওর দোষ-ত্রুটি-অপরাধ তোমাকে জানতে দিতাম না—পাছে তুমি ওকে কঠিন শাস্তি দাও।

তোমার শাসনকে আমি ভয় পেতাম—রহিমের কথাটা আমি ভুলতে পারিনি। ছেলেবেলা থেকে যদি এভাবে আড়াল করে না রাখতাম তাহলে আজ বোধহয় খোকা এমন হয়ে যেত না। ওগো, আর তোমার শাসনকে ভয় করি না আমি ;—আমারই অপরাধ...তুমি শাস্তি দাও আমাকে!

কমলাপতি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন দেওয়ালে টাঙানো লক্ষ্মীপতির বড় অয়েল-পেন্টিংটার দিকে। ধীরে ধীরে বলেন, না! ভুল বলছ তুমি। এ তোমার পাপে হয়নি। এ হয়েছে আমার পাপে। সে কথা তোমরা কেউ জান না! শুনবে? শুনবে আমার সে পাপের কথা?

হঠাৎ ভয়ে যেন কুঁকড়ে যান দয়াময়ী। কী এমন কথা বলতে চাইছেন তাঁর স্বামী? তাঁর জীবনের এমন কোন পাপাচরণ আছে—যা তাঁর জীবনসঙ্গিনী পর্যন্ত জানতে পারেননি? অকস্মাৎ দুঃসহ ভয়ের যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহে যায় তাঁর সর্বাঙ্গে। স্বামীর মুখ চাপা দিয়ে বলেন, না! বোলো না!

দুজনেই কিছুটা চুপচাপ।

দয়াময়ীই আবার বলেন, জানি না কী বলতে চাইছিলে তুমি। তবে সে যদি রহিমের মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর কোন কথা হয়—তবে থাক, আমি তা শুনতে চাই না।

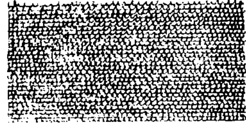
—তবে থাক!

আরও দুটি সন্তান হয়েছিল দয়াময়ীর। বাঁচেনি। অকালে চলে গেছে মায়ের কোল খালি করে। ছোটটি ছিল বাপের খুব প্রিয়। মায়ের চেয়ে বাপেরই বেশি ন্যাওটা ছিল। প্রথমটি যায় টাইফয়েডে—চাঁপাডাঙার মাঠ থেকে বায়েনদের উচ্ছেদ করার পর। দ্বিতীয়টি যায় ডবল নিমুনিয়ায়—রহিমের অপমৃত্যুর বছর ঘোরার আগেই। দয়াময়ীর অবচেতন মনে কে যেন গোপনে লিখে দিয়ে গেছে—ওদের অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী এই অভিশপ্ত জমিদারীর ভোগলিপ্সা। সে কথা কোনদিন প্রকাশ করেননি তিনি কারও কাছে। স্বামীর কাছেও নয়; শ্রীপতিকে তাই আঁচল দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন আশৈশব। স্বামীর সান্নিধ্যে যেতে দেননি। দুটি সন্তানের অকালমৃত্যুর পর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন খোকনকে—তার অন্যায় আবদারকে মেনে নিয়েছেন বারে বারে—স্বামীকে লুকিয়ে। আজ যখন কমলাপতি তৃতীয় কোন পাপাচরণের কথা বলতে গেলেন তখন ছ্যাঁৎ করে উঠল তাঁর বুকের মধ্যে। না, শুনবেন না তিনি। কিছুতেই শুনবেন না স্বামীর নূতন কোন পাপের ইতিহাস। স্বামীর দুটি পাপাচরণের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন তিনি—আর পারবেন না!

খোকনই তাঁর শেষ অবলম্বন!



অযোদ্ধাকাণ্ড 3



আলপথ দিয়ে হন্‌হন্ করে হেঁটে আসছিল প্রহ্লাদ বায়েন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মানার গোচরভূমি ছেড়ে গরুগুলো উঠে এসেছে নদীর বাঁধের উপর। গোখুর ধূলিতে ধূসর হয়ে গেছে পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্তের বর্ণসম্ভার। মাঘের প্রথম—সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই হিম্ হিম্ লাগছে হাওয়া। প্রহ্লাদ মাথার পাগড়িটা খুলে ফেলে, ভাল করে কানমাথা ঢেকে একটা গালপাট্টাই বেঁধে নেয়। পাগড়ি নয়, একটা গামছা বাঁধা ছিল ওর মাথায়।

—পেহ্লাদ নাকি হে? কুথা চলেছ হে এমন হুড়মুড়িয়ে?

অন্যমনস্ক প্রহ্লাদ মুখ তুলে দেখে রত্নাকর ঘোষ। বলে, আসছি দখিন্‌পাড়া থিকে। নবাপালের মুংলিটা আজ মরে গেলেন দাদা!

—সেকি রে? কুনটা? সেই ভাগলপুরীটা নাকি রে?

—হঁ! কী যে হলেন তা বুঝতে লারলাম। সারাটা দিন প্যাট ফুলে রইলেন—প্যাটে যে কী ঢুকিছে তা ভগমানই জানে।

—কখন মরল?

—অ্যাই তো। আমি যাই লোক ডাকতি। ভগবতীর গতরখান তো কম নয়। অ্যানেক লোক লাগবি।

তা লাগবে। মুংলিকে চেনে রতন। চুপ করে যায় সে। নবাপালের অবস্থা বেশ সচ্ছল। যন্ত্রযুগের বিবর্তনে তিলতিল করে উৎসন্নের পথে চলেছে যাবতীয় কুটির শিল্প। কলে তৈরি ধুতি শাড়ি, কারখানায় গড়া কাস্তে-কোদাল পেতল-কাঁসা এসে গাঁয়ের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। তাঁতি-কামার-কাঁসারি-ছুতার জাতব্যবসা ছেড়ে চাষনির্ভর হতে চাইছে। একমাত্র ব্যতিক্রম এই পালেরা। ওদের ব্যবসায় থাব্‌লা মারতে পারেনি যন্ত্রদানব। ওদের তৈরি মাটির হাঁড়ি-গেলাস-খুরি এখনও কাটছে হাটে। যন্ত্রদৈত্য ওদের মাটির বাজার মাটি করতে শেখেনি আজও। লাভ অবশ্য অত্যন্ত অল্প। খাটুনিও কম নয়। তবু আশেপাশের আর কখানা গ্রামে কুম্ভকার না থাকায় মালের চাহিদাও প্রচুর। শুধু কমলপুরের মঙ্গলবারের হাটেই নয়—কুমিরমারির হাটে—এমনকি জংশনের বাজার পর্যন্ত পালেদের এক্তিয়ার। খাটতে হয় অক্লান্ত—কিন্তু রোজগারও মন্দ নয়। নবাপালের চাষের জমি নেই। বাড়ির সংলগ্ন ছোট খেতে সব্জি লাগায়। ছোলা, আলু, পেঁয়াজ, মুলো, বেগুন। বিক্রি করার জন্য নয়—সংসারের প্রয়োজন অনুপাতে।

রতন ঘোষের সঙ্গে নবাপালের ব্যবসায় সংক্রান্ত একটু খাতির আছে। নবাপালের একজোড়া ভালজাতের গাই গরু ছিল। এক একটাই দিনে আট-দশ সের দুধ দেয়। একসঙ্গে যখন দুটি গাই বিয়ান হয়, তখন নবাপাল রতন ঘোষের শরণাপন্ন হয়। পালের বাড়ি থেকে দৈনিক দুধ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে দেয় রতন। ঘোষপল্লীর যে মেয়েগুলি ঘরে-করা সর, ছানা, দুধ বেচে আসে জংশনের বাজারে তারাই নবার উদবৃত্ত দুধটুকু সংগ্রহ করে। রতনই হিসাব রাখে। গোয়ালিনীর কমিশন কেটে রেখে নবাপালের প্রাপ্য

মিটিয়ে দেয়। এ ছাড়া দুধ বিক্রির আর কোনও ব্যবস্থা নেই নবার। ঘোষপল্লীর আর কাউকে সে বিশ্বাস করে না। বিশেষ টাকাকড়ির ব্যাপারে। এ লেনদেনে রতনের অবশ্য আর্থিক সুবিধা কিছু হয় না—সে কমিশন নেয় না নিজে। তবু সে মধ্যস্থ হলে যদি পালমশায়ের দুধটার একটা হিল্লে হয়—তাহলে এটুকু বাড়তি পরিশ্রম সে করতে রাজি। আসলে কিন্তু রতনের গরজটা অন্যত্র। তার আসল সহানুভূতি ঐ স্বামীসুখবঞ্চিতা ঘোষপল্লীর কালোকালো মেয়েকয়টির জন্যই। ওদের মরদগুলো যে কবে ছাড়া পাবে জেল থেকে!

রতন চলেছিল রসিকলাল শিরোমণি মশায়ের কাছে। মাঘমাস পড়ে গেছে। লগনসার বাজার আসন্ন। বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি কোন কোন তারিখে হতে পারে সেটা জানা থাকা দরকার ঘোষের। শিরোমণি পঞ্জিকা দেখে সেটা ওকে বলে দেন। সেই অনুসারে আগে থেকেই হিসাবমতো সঞ্চয় করতে হবে দুগ্ধজাত সম্পদ। ছানার দরটা কোন তারিখে কতটা উঠতে পারে ঘোষের তা জানা থাকার দরকার। নবাপালের বিপদের কথা শুনে ঘোষ একবার থমকে দাঁড়ায়। কথায় বলে—'জরু, গরু, ধান'। এই তিন-সম্পদ নিয়েই গ্রামবাসীর জীবন। এমন বিপদে প্রতিবেশীর দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। শেষপর্যন্ত স্থির করে শিরোমণি মশায়ের কাছে গিয়ে কাজটা সারবে—তারপর ফেরার পথে সে পালমশায়ের বাড়ি ঘুরে যাবে।

প্রহ্লাদ যখন বাঁধ ডিঙিয়ে মানায় নামল তখন শাঁখে-ফুঁ-পড়া সন্ধ্যা। বায়েনপল্লীতে মরদগুলো ফিরে আসছে সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি সেরে। বায়েনপল্লীর সব কয়টি মরদই জাতব্যবসা ছাড়া জনমজুর খাটে। প্রথম বর্ষণের পরে যখন কর্ষণ শুরু হয় তখন থেকেই ডাক পড়ে ওদের—ছুটি হয় ধান মালিকের মরাইয়ে উঠলে। তখন চাষ বন্ধ থাকে কয়েকমাসের জন্য। সেটা ভাগচাষীর পৌষমাস, দিনমজুরের সর্বনাশ!

প্রহ্লাদ এসে শোরগোল তোলে। ডাক-হাঁক করে। লোক জড়ো করে, দড়ি, বাঁশ, মশালের ব্যবস্থা দেখে। গ্রামে কোনও গরু মরলে সেটা বায়েনদের সম্পত্তি। শুধু এ গ্রামেই নয়,—মধ্যমগ্রাম ও রায়নার ভাগাড়ও জমা দেওয়া আছে এই বায়েনদের, জমিদারী সরকার থেকে। এই তিন গাঁয়ে কোন গরু—শুধু গরু কেন, কোন জন্তু মরলেই ডাক আসে বায়েনদের। মৃতপশুটি বায়েনপল্লীর সাধারণ সম্পত্তি। তার চামড়া, মাংস, ক্ষুর, সিং—কিছুই ফেলা যায় না। এ কাজে বায়েনপল্লীর সকলেরই যৌথ দায়িত্ব আছে। লাভও যৌথ—এ যেন সংবিধান-বিহীন এক যৌথ কোয়াপারেটিভ প্রতিষ্ঠান। প্রহ্লাদ এ পাড়ার মাতব্বর। ভাগের হিসাবে মতানৈক্য ঘটলে তাকে মধ্যস্থ হতে হয়। তিনখানা গ্রামের হয়ে জমিদার সরকারে আওট্-জুতি জোগান দেবার দায়িত্বও বায়েনপল্লীর মুখপাত্র হিসাবে প্রহ্লাদেরই। রসিদও তার নামেই দেওয়া হয়। জমিদারী সরকারে পাকাব্যবস্থা আছে এ সব বিষয়ে। মোল্লাহাটির চামড়া অবশ্য এ গ্রামে আসে না। রহিম শেখের ভাইপো ফজলু মিঞাই হচ্ছে প্রহ্লাদ বায়েনের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য এলাকা সুনির্দিষ্ট থাকায় কোন গোলমাল কখনও হয়নি। মোল্লাহাটি আর মধ্যমগ্রামের সীমানায় ভুল হবার উপায় নেই—ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা সড়ক হচ্ছে দুই গ্রামের সীমানা। আর মোল্লাহারটি-কমলপুরের সীমানা হচ্ছে জলাঙ্গী নদী।

বাঁশ, দড়ি নিয়ে সদলবলে রওনা দেবার আয়োজন করে প্রহ্লাদ।

সরি পিছু ডাকে, সারারদিন মুখে কুটোটি কাটো নাই, এক্কুরে খেয়ে যাও সে।

ফোঁস করে ওঠে প্রহ্লাদ, যাই একটা শুভকাজে, অমনি পিছে ডাকলি তো? মাগীর মরণ হয় না কেনে?

সরি ম্লান হয়ে যায়। রোগজীর্ণ দেহে আর কিছু বলতে সাহস পায় না। যা চণ্ডালের রাগ পেল্লাদের, হয়তো মেরেই বসবে ফস্ করে। অথচ কী এমন অন্যায় কথাটা সে বলেছে? সমস্ত দিন মানুষটা অনাহারে আছে, জানে তো সরি, পালমশায়ের গরুর মুখ বাঁশ দিয়ে ফাঁক করিয়ে প্রহরে প্রহরে ঔষধ দিয়েছে গাছ-গাছারি বেটে। আর লক্ষ্য করেছে ওষুধের প্রতিক্রিয়া। মন্ত্রপূত চাল ছিটিয়েছে গোয়ালে আর বিড়বিড় করে মন্তর পড়েছে—ডেকেছে সুরভিমাতাকে, ভোগবতীকে। এ সময়ে প্রহ্লাদের নাওয়া খাওয়া জ্ঞান থাকে না। আর পাঁচটা ভারতীয় বিদ্যার মতো এ বিদ্যাও বায়েনদের বংশানুক্রমিক গুরুমুখী বিদ্যা। প্রহ্লাদকে শিখিয়েছিল তার বাপ জনার্দন; বিখ্যাত গো-বদ্যি ছিল সে। ওর বাপ জনার্দন বায়েন বল্‌ত—"মা যখন উঠ্‌বিন তখন উঠ্‌বি, লইলে উঠ্‌বি যখন আর মা উঠ্‌বিন না।" অর্থাৎ ভগবতী হয় সুস্থ হয়ে চার পায়ে উঠে দাঁড়াবে, অথবা অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলে একেবারে শান্ত হয়ে যাবে—এ দুইয়ের এক না দেখে গোবদ্যি রোগীবাড়ি ত্যাগ করবে না। এ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে প্রহ্লাদ গো-বদ্যি। তাই প্রথম খবর পেয়ে সেই কাক-ডাকা ভোরে গিয়েছিল পালমশায়ের গোয়ালে, আর ফিরে এল এই শাঁখবাজা সন্ধ্যায়। এত পরিশ্রমের পর যদি তার ধর্মপত্নী তাকে দুটি খেয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করে, অমনি তার মরণ ডাকতে হবে? সরি অভিমানে চুপ করে যায়।

ওর ছোটবোন পরী বলে, ই বাবারে! জামাইয়ের জিব লয়তো যেন আলানের জিব। তা অ্যান্যায়টা কী বুললে উ? দুটি খেয়ে যাও কেনে?

—তো দে।—বসে পড়ে প্রহ্লাদ।

উপীন বায়েন প্রায় প্রহ্লাদের সমবয়সী, বয়স্যস্থানীয়। এই সুযোগে সে একটু রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারে না; বলে—এরেই বলে 'আসল চেয়ে সুদ মিষ্টি, মাগের চেয়ে শালী!' বউ যখন বুল্‌লে তখন মারতি এলি তুই—আর যেই পরী বুল্‌লে অমনি বসে পড়লি থাপন জুড়ে—'তো দে'।

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। রসিকতাটা উপভোগ করে। অল্পবয়সী জোয়ানগুলো মুখ লুকিয়ে হাসে—যত যাই হোক প্রহ্লাদ ওদের মোড়ল! প্রহ্লাদ হেসে ফেলে। পরী সমস্ত দেহে বিজয়িনীর মতো একটা লীলায়িত ছন্দ তুলে চলে যায় ভিতরে—সম্ভবত খাবার আনতে। পরীর যৌবন এখনও কানায় কানায়; আর সহ্য করতে পারে না সরি, বলে—হবেক নাই? মাগের যে বয়েস গেইছে! আর শালীটো যে রসে টুবুটুবু! কী আলানই আমি ঘরে আনছি গো!

রসিকতার বাষ্পটুকু পর্যন্ত উপে যায় সে কথার উত্তাপে। খপ করে উঠে পড়ে প্রহ্লাদ সরির চুলের মুঠি ধরে মারে এক হ্যাঁচকা টান। উবুড় হয়ে-পড়া দুর্বল মেয়েটার পিঠে বসিয়ে দেয় ঘা-কতক। বাধা দেয় উপীন, আরও কয়েকজন। প্রহ্লাদ ওকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় : একদিন খুনই করি ফেলাব মাগিটারে! মাইরি বলছি উপীনভাই!

হন্ হন্ করে হাঁটা ধরে সে আলপথে। সমস্ত দলটি অনুসরণ করে তাকে। ততক্ষণ

পরী এসে দাঁড়িয়েছে আঙ্গিনায়। তার হাতে কলাইয়ের একখানা সান্‌কি—তাতে জল-দেওয়া এক থালা পান্তাভাত, একটা কাঁচা লঙ্কা আর গোটা একটা পেঁয়াজ। বলে—তোর ভাতার না খেয়ে মরলি আমার কী রে ভাতারখাকি?

সরি প্রত্যুত্তর করে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে থাকে। কান্নাই সম্বল তার। বাপ-মা নেই সরি-পরীর। স্বামী নেয় না পরীকে—তাই তাকে এনে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল সরি দয়া করে। ঠিক দয়া করে অবশ্য নয়, উপর্যুপরি কয়েকটি সন্তান হওয়ায় তার শরীরও ভেঙে পড়েছিল তখন। সেই অনুকম্পার ভিখারিণী পরী তার চোখের সম্মুখেই তিলতিল করে কেড়ে নিচ্ছে তার মরদকে। নিষ্ফল আক্রোশে সরি গুম্‌রে গুম্‌রে মরে। পাঁচটি সন্তানের রোগজীর্ণ জননী কেমন করে পাল্লা দেবে ঐ উদ্‌ভিন্ন-যৌবনার সঙ্গে? কখনও বা তীব্র আর্তনাদ, অশ্লীল মরণান্তিক গালি-গালাজে জর্জরিত করে তোলে সহোদরাকে। আজ এই মুহূর্তে কিন্তু সে কিছুই বলে না। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতেই থাকে। অভুক্ত প্রহ্লাদ মুখের গ্রাস ফেলে রেখে রাগ করে চলে গেল—এটাই এখন তার কাছে সবচেয়ে বড় বেদনা। চরিত্রহীন, ব্যভিচারী, মদ্যাসক্ত স্বামীটির বিরুদ্ধে তার নালিশের সীমা-পরিসীমা নেই; কিন্তু তবু ঐ দশাসই চেহারার মরদটাকে আজও ভালবাসে সরি। লোকটা খেয়ে গেল না!

নবাপালের বাড়িতে পৌঁছেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল প্রহ্লাদের। এরা কেন এখানে? হরকিষণ, জনাবালি আর নন্দ-চৌকিদার? উঠানের ওপাশে মাথায় হাত দিয়ে নবাপাল বসে আছে উবু হয়ে। সামনে জ্বলছে একটা টেমি। বিয়ান গাইটার মৃত্যুশোকও বোধহয় ভুলে গেছে সে এখন। ও শুধু ভাবছে একটা দুর্ঘটনা না ঘটে যায় ওর বাড়ির ভিতরেই। তাছাড়া প্রহ্লাদ সারাদিন অস্নাত অভুক্ত থেকে তার মুংলিকে সেবাযত্ন করেছে—তাকে বাঁচাবার চেষ্টায় আপ্রাণ পরিশ্রম করেছে। বিনিময়ে সে বায়েনকে কিছুই দিতে পারবে না। প্রহ্লাদ গোবদ্যি; পশুচিকিৎসার অনেক ঝাড়ফুঁক, শিকড়-ওষুধ জানে সে। কিন্তু এ জন্য কোন পারিশ্রমিক নেওয়া তার বারণ। প্রহ্লাদের বাপ যত্ন করে ছেলেকে সব শিখিয়েছিল, কিন্তু নিষেধ করে যায় কোন পারিশ্রমিক নিতে। ওর বাপ বলত ঃ মায়ের খাল ছাড়াস্‌, চাম শুখাস্‌, হাড় বেচিস্‌—ই'তে পাপ নাই? কী করবি? জাত-ব্যবসা। ছাড়লি ধম্মে পতিত হবি। তাই এ বিদ্যে দিয়ে গেইছে বাপ-পিতেমো। জীয়ন্তে মায়ের সেবা করবি—পয়সা লিবি না। তারপর ভগবতী যদি সগ্‌গে যান তখন জাত-ব্যবসা করবি।

প্রহ্লাদের স্বর্গগত বাপ বিখ্যাত গোবদ্যি বায়েন এ আদেশ মেনে চলত, প্রহ্লাদও মানে। সম্ভবত কোন বিচক্ষণ গো-চিকিৎসক বায়েনদের এ বিদ্যা দান করার সময় বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে এ হচ্ছে তাদের পাপস্খলনের ব্যবস্থা। ধর্মের কথা না থাকলে ভবিষ্যতে কোন লোভী বায়েন গো-চিকিৎসার নামে যেন না গো-হত্যা করে বসে তাই এ সাবধানতা। সে যাই হোক, পালমশাই ভাবছিল এখন সে কী বলবে প্রহ্লাদকে?

বলতে কিছুই হল না। বায়েন আন্দাজ করে নিল ব্যাপারটা নিজে থেকেই। মুংলির চার পা শক্ত করে দড়ি বাঁধা। মোটা মোটা খান দুই বাঁশের গাঁট ছুলছে মোল্লাহাটির ফজলু মিঞার জোয়ান ব্যাটা—মনিরুদ্দি। ফজলু, হবিব, তোরাব, মজিবুর প্রভৃতি

আরও কয়েকজন অপেক্ষা করছে অদূরে।

সমস্ত দৃশ্যটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নবাকেই প্রশ্ন করল প্রহ্লাদ, ব্যাপারটো কী পালমশাই?

নবাপাল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে, আমি জানি না, আমি কিছুই জানি না। শুধাও ও-দিগে।—হাত তুলে সে দেখিয়ে দেয় জনাবালি আর হরকিষণকে।

প্রহ্লাদ কিন্তু ওদের দুজনকে কোন প্রশ্ন করে না—সে জিজ্ঞাসা করে ফজলু মিঞাকেই—তোমরা কমলিপুরের ভাগাড়ে আইছ কেনে ফজলু মিঞা?

ফজলু গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দেয়—মালিক আমাদের সাথে লতুন বন্দোবস্ত করেছেন। শুধু কমলপুর লয় বায়েনের পো, রায়না, মধ্যমগেরাম—তামাম তল্লাটটার ভাগাড় আমরা লিব।

একটা অশ্লীল রসিকতা করে হেসে ওঠে প্রহ্লাদ। মতি উঠান ছেড়ে ঘরে উঠে যায়। প্রহ্লাদ বলে : মাইরি! আঙট্‌জুতি জোগাবে শালা পেল্লাদ বায়েন, আর ভাগাড়ের দখল মিলবে মিঞাভাইদের। তোদের ফাঁকিস্তান হয়ে গেইছে ভাবিস্ নাকি রে? সরি ডাঁড়া ফজলু মিঞা—খুনোখুনি হয়ে যাবে কিন্তুক্!

উঠে দাঁড়ায় মানুষগুলো। তুলে নেয় কাত করে রাখা বাঁশের লাঠি। সশস্ত্রই এসেছে ওরা—এ রকম একটা পরিস্থিতি যে হতে পারে তা ওদের আশঙ্কা ছিলই। নবাপাল দু-হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ায়—তার কাকতাড়ুয়ার মতো দেহখানি নিয়ে : এখানে নয় বাবাসকল! যা ফয়সালা করবার সড়কে নেমে কর। এখানে মেয়েছেলেরা রয়েছেন।

এগিয়ে আসে হরকিষণ তার জাঁদরেল চেহারাটি নিয়ে। লোকটা কথা বলে বেশি। এমন ভারী গলাপাট্টা আর গোঁফ থাকা সত্ত্বেও জমিদার তার চেয়ে জনাবালির উপরেই নির্ভর করেন বেশি। জনাবালি যে তার তুলনায় অনেক উঁচুদরের লাঠিয়াল এটা অবশ্য সে মনে মনে ভাল করেই জানে; কিন্তু তার বিশ্বাস আর কেউ জানে না সে খবর। তাই তার বাহ্যাড়ম্বরটা স্বভাবতই বেশি! জনাবালি আবার নীরব কর্মী। যেমনি একহারা চাবুকের মত লিকলিকে চেহারা তেমনি ঘরকুনো। হরকিষণের মোম দিয়ে পাকনো গোঁফ আর গালপাট্টা দেখে সে মুচকে হাসে শুধু। এ ক্ষেত্রেও দূরে সরে রইল জনাবালি। হরকিষণ বলে—আরে তুমি ডরছ কেন পালমোশাই? ফয়সালা ফিন লোতুন করে কী হোবে আবার? ওতো হুইয়ে গেলো। হুজুর লোতুন বন্দোবস্ত দিলেন—খবর ভেজলম মিঞাভাইকে—অব উ উঠিয়ে লিয়ে যাবে লাশ। রুখবে কৌন? উঠা ভাইসব, তোদের রওনা করে দিয়ে ঘর যাবার হুকুম আছে।

এতক্ষণে আয়োজনটার সম্পূর্ণ মর্মগ্রহণ হয়—তাই এ সময়ে লাঠি হাতে এসে দাঁড়িয়েছে জমিদারের দুই বিখ্যাত লাঠিয়াল—হরকিষণ আর জনাবালি। ফজলুকে জোর করে ভাগাড়ের দখল দিতে হবে বলে হরিহর গাঙ্গুলি পাঠিয়েছে এদের দুজনকে। নন্দ-চৌকিদারকেও সাক্ষী রাখা হয়েছে—ভবিষ্যতের আইন-আদালতের কথা বিবেচনা করে। জমিদার সরকারে গত চৈত্রে ভাগাড়-জমার বাৎসরিক টাকাটা সে দিয়ে উঠতে পারেনি—হয়তো সেই অপরাধে তার নামে 'লুটিশ' লিখে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। তারপর ওকে বস্তুত কিছু না জানিয়েই জমিদার নতুন বন্দোবস্ত করেছেন ফজলু-মিঞার

সঙ্গে। মোল্লাহাটি থেকে এখানে আসতে আধবেলা লাগে—নিশ্চয়ই সকালে মুংলির মৃত্যুর পূর্বেই খবর পাঠান হয়েছে তাদের—তাই সন্ধ্যার পূর্বেই এসে গেছে ওরা। ফজলু মিঞাও দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা প্রকৃতির লোক—ওদের বংশটাই কেমন যেন বাঁধন-ছেঁড়া। ওর খুড়ো রহিমচাচা বিদ্রোহ করেছিল জমিদারের বিরুদ্ধে—কাছারি বাড়িতে বন্দী করে আনা হয়েছিল বিদ্রোহী প্রজাকে। শোনা যায় রহিম নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তারপর। সেই বংশেরই সন্তান ফজলু আর মনিরুদ্দি। এতগুলি দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা ছাড়াও আছে হরকিষণ—দুর্দান্ত দশাসই ভোজপুরী। কিন্তু প্রহ্লাদ জানে সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে ঐ লিকলিকে কেউটের মতো জনাবালি শেখ! রণভূমির একান্তে উদাসীনের মতো বসে একটা পাখির পালক দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে বটে—কিন্তু প্রথম লাঠি পড়লেই সে যে ক্ষিপ্র শার্দুলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর চোখের পলক পড়বার আগেই সব ক'টা মাথা ফাঁক করে দিয়ে ফিরে যাবে এ একেবারে নিশ্চিত। প্রহ্লাদও অসীম বলশালী—সে দৈহিক ক্ষমতায়—লাঠির কৌশলে নয়। তবু আজকের হার মানে তার নিশ্চিত মৃত্যু। তিনখানা গ্রামের উপর থেকে অধিকার হারানোও মৃত্যুরই শামিল। নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে প্রহ্লাদ।

এগিয়ে আসে ফজলু মিঞা। প্রহ্লাদ বলে : দাঁড়াও! এ কি জমিদারের গরু? এ গরু তো পালমশায়ের।

ফজলু হেসে বলে—তুমিও হেই কথাড়া কইলে বায়েন? গরু যতক্ষণ জীয়ন্ত ততক্ষণই পালমোশায়ের—মরলে আর তার লয়।

যুক্তিটা অকাট্য। তবু প্রহ্লাদ একবার শেষ চেষ্টা করে—বেশ, তবে আমি শুদিয়ে আসি বাবুদিগে। ততক্ষণ কেউ ছোঁবে না ওকে। তাহলে কিন্তুক্ রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে মিঞার পো।

ফজলু পিছিয়ে যায়—বেশ, সে অপেক্ষা করতে রাজি। কিন্তু তর সইছিল না হরকিষণ পাঁড়ের। বলে—উঠাও উঠাও। রক্তগঙ্গা বইয়ে যাবে তো হামি আছে কেন? উঠাও লাশ! তারপর প্রহ্লাদের দিকে ফিরে বলে : তুমি শালা বাজনা বাজাবে ধানকলে আর ভাগাড় মিলবে গাঁয়ের?

প্রহ্লাদ রুখে ওঠে, শালা বলবে না কিন্তুক্! ধানকলে কি আর সাধ করে বাজাতে গেছি? তোমাদের পূজায় যে ব্যান্ডো এসেছিল!

—চুপ রহ্ শালে শয়তান! এ ফজলু উঠাও লাশ!

প্রহ্লাদ আর স্থির থাকতে পারে না। গর্জন করে ওঠে—অ্যাইও!

সঙ্গে সঙ্গে হরকিষণ মারে তার গালে একটা প্রচণ্ড চড়।

মাথাটা ঘুরে ওঠে প্রহ্লাদের। অন্য কেউ হলে সেই ভোজপুরী চড়ে ধরাশায়ী হত নিশ্চয়ই প্রহ্লাদটা প্রায় অসুর। একটা টাল খেয়ে ফের সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিল লাঠিখানা মরিয়া হয়ে। তার চেয়েও ক্ষিপ্রতর গতিতে এগিয়ে আসে জনাবালি। হরকিষণকে আড়াল করে দাঁড়ায় মূর্তিমান শয়তানের মতো। দীর্ঘ একহারা চেহারার মানুষ—প্রহ্লাদের সঙ্গে পাঞ্জা কষলে বায়েন বোধহয় গুঁড়িয়ে দিতে পারে ওর কব্জিটা; কিন্তু ক্ষমতা তার দেহে নয়—ক্ষমতা তার শিক্ষায়! বিখ্যাত লাঠিয়াল জনাবালি শেখ! লাঠি ঘোরালে তাকে ইঁট মারা যায় না—ছিটকে বেরিয়ে আসে ঢিল

ঘূর্ণ্যমান লাঠির বর্মে লেগে। বলে—পেল্লাদ! অনেক বাজে বকেছিস। সহ্য করেছি। খাম্‌খা কেন রক্ত মেখে বাড়ি যাবি? পথ ছাড়! ওঠা ফজলু!

ফজলুরা লাশ ফেলে লাঠি তুলে নিয়েছিল। আবার লাঠি ফেলে লাশের দিকে এগিয়ে গেল। নিষ্ফল ক্রোধে মাটিতে বসে পড়ে বায়েন। ওরা জোর করে দখল ছিনিয়ে নেবে। ওরা ক্ষমতাশালী, সে নিরুপায়। জনাবালির লাঠির সামনে ওদের দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই! বায়েনপল্লীর মরদগুলো এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। দলপতির নির্দেশের অপেক্ষা করছিল উপীনরা। এখন দলপতিকেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বসে পড়তে দেখে ওরাও পথ ছেড়ে দিল। জনাবালি আবার গিয়ে বসে তার একান্ত আশ্রয়ে। মনিরুদ্দি লাশের দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ নবাপালের সদরের কাছে কে যেন বজ্র-নির্ঘোষে হাঁকাড় দিল—খবর্দার!

সমস্ত লোকগুলোর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দ্বারের কাছে। রত্নাকর ঘোষ। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় প্রহ্লাদের পাশে। এসেছে সে অনেকক্ষণ, ঘটনার গতি লক্ষ্য করছিল নীরবে—ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে। প্রহ্লাদ উৎসাহে ফের উঠে দাঁড়ায়। রতন আর সবাইকে ডিঙিয়ে জনাবালিকে উদ্দেশ করে বলে, একটু সবুর করতে হবে শেখের পো। কোন অপরাধে জমিদার পেল্লাদের ভাগাড় কেড়ে নিলে একবার শুধিয়ে আসতে দাও উকে।

কথাটা সে বললে অত্যন্ত সংযত শান্ত কণ্ঠে। কে বল্‌বে, এর আগেই সে উচ্চারণ করেছিল গগন-বিদীর্ণ-করা যুদ্ধনিনাদ।

জনাবালির এতে আপত্তি নেই। সে সবুর করতে রাজি আছে। অন্য কোনও কারণে নয়, নেহাত লাঠালাঠির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য। আশ্চর্য অনীহা এই দুর্দান্ত লাঠিয়ালের—লাঠি ধরা বিষয়ে। প্রশ্ন করলে বলে, সব প্যাঁচ শিখিয়ে ওস্তাদজী বলেছিলেন—আর এই শেষ কথা বলব, যতক্ষণ পারবে লাঠি ধরবে না। সব মরদের দেহেই পয়গম্বর আছেন। ভালোকথায় আপোষে যদি মিটে যায় তবে খামোখা মানুষের খুন নিক্‌লো না।

বর্ণে বর্ণে সে আদেশ মেনে চলে জনাবালি। সে সরে দাঁড়ায়। হরকিষণের কিন্তু এ বেয়াদপি সহ্য হয় না। ওরা নিঃসন্দেহে সংখ্যগরিষ্ঠ। একা রতন ঘোষ কী করতে পারে? সে রুখে ওঠে : কাজ হাঁসিল করব লাঠির জোরে, ইর ভিতর সবুর করাকরি কেন বাপু? লাশ উঠাও ফজলু!

যেন হাইকোর্টের রায়! লাঠিখানা সজোরে মাটিতে ঠোকে একবার।

ভীমা ঘোষের ভাইপোর চোখ দুটো ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে। হাত বাড়িয়ে প্রহ্লাদের হাত থেকে চার হাত লাঠিখানা তুলে নেয় সে। শান্ত অবিচলিত স্বরে বলে : সরি ডাঁড়া পেল্লাদ! পালমশাই, দাওয়ায় উঠি দাঁড়ান—মায়েদের ঘরের ভিতর যাতি বলুন। ফজলু মিঞা, তুমি কেন ভাই রক্ত মাখবা মিছামিছি—সরি ডাঁড়াও একটু!

এতগুলি লোক নির্বাক, নিষ্কম্প! কারও বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না। জনাবালিও উঠে দাঁড়িয়েছে—একদৃষ্টে চেয়ে আছে রতনের দিকে। ডান হাতের পাঁচটা আঙুল হিলহিলে লাউডগা সাপের মতো জড়িয়ে ধরেছে তার লাঠির একপ্রান্ত। রতনই আবার কথা বলে—তেমনি অনাসক্ত সুরে—এতগুলো লোককে নাহক জখম করি কী লাভ জনাবালি? লাঠির জোরে জমিদার বায়েনদের ল্যায্য অধিকার কেড়ে লিবে—বিত্তান্তটা

তো এই? তা লাঠির জোর তো তোমাদের দুজনার আর আমার একার, কেমন? তা বল, তোমরা দুজনে কি একসাথে লড়বে, না একের পর এক?

জনাবালিও নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয় : এটা কি ছেলেমানুষের মতো কথা বললে হে ঘোষের পো? দুজন মরদ কখনও লড়ে নাকি একা লাঠিয়ালের সঙ্গে?

হেসে হেসেই বললে কথা ক'টা, যেন লাঠালাঠির প্রসঙ্গই নয়—যেন পরস্পরকে আহারে নিমন্ত্রণ করছে ওরা।

রতনও হেসে বলে, সে তো ঠিক কথাই। তবে তুমিও সরি ডাঁড়াও জনাবালি ভাই! হরকিষণ পাঁড়েজির লাঠি ঠুকাটাই বেশি দ্যাখতেছি। উডারে আগে শুইয়ে দিই—তারপর না হয় তোমার সাথেও একবাজি হবে এখন। কই হে কাজ-হাঁসিল-করনেবালা, এক কদম এগুয়ে এসতো বাছাধন!

হরকিষণ কিন্তু এগিয়ে আসে না। মাটির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

—কীরে ছাতুখোর! বিক্রম ফুইরে গেল?

এবার রতনই এগিয়ে আসে একপা। হরকিষণের মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়। তবু মাথাটা তুলতে পারে না সে।

—ধর লাঠি। আর ডর লাগি থাকে তো ঐ মেয়েদের ঘরে উঠি যা ইন্দুরের বাচ্চা!

হরকিষণ দুটোর একটাও করে না—না ধরে লাঠি—না ওঠে দাওয়ায়।

রতনই লাঠিটা মাথার উপর তুলে হাঁক দেয়—শির সামাল্‌কে!

হঠাৎ কর্তব্যজ্ঞান মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নন্দ-চৌকিদারের। আরে তাই তো। সেই তো এখানে আইন-আদালত-সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি! ছুটে এসে বলে, আরে মারামারির দরকার কী বাপু? তা যাক না পেল্লাদ, শুধিয়ে আসুক বাবুদিগে।

রতন বলে—সি কথা তো পেল্লাদ অনেক আগেই বলিছে নন্দ। তোমাদের পাঁড়েজি যে লাঠির জোরে সবুর করতি গররাজি!

—না, না, তুই শুধিয়ে আয় পেল্লাদ।

হাইকোর্টের উপরে প্রিভিকাউন্সিলের রায় যেন।

ফজলু এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে, ঘোষমশাইও কি বায়েনদের সাথে গরুর খালের কারবারে নামেছেন নাকি?

হাসে রতন। বলে—না মিঞার পো, গরুর চামড়ার কারবার তোমাদেরই থাক। আমি মানুষের চামড়ার কারবার করি। কিন্তুক্ মানুষ কুথা? সবই যে গরু আর ভেড়া। জনাবালি রাগ করলে নাকি ভাই? তোমারে কিন্তুক বাদ দে' কয়েছি আমি।

জনাবালিও হাসে। অকৃত্রিম হাসি। সে জানে রতনের সবটাই ব্যঙ্গ—তবে শেষ কথাটা একেবারে নির্জলা পরানের কথা। ভাগ্যক্রমে এ অঞ্চলের সবচেয়ে সেরা দুজন লাঠিয়াল আজ বিপক্ষ-শিবিরে নাম লিখিয়েছে বটে—তবু দুজনেই দুজনকে শ্রদ্ধা করে মনে মনে।

ফজলু বলে, আমাদের সবার খালই তবে গরু ভেড়ার?

—তাই তো মনে লাগে!

—তবু তো আমরা চুরি-ডাকাতি করি না—খাটে খাই।

আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে জানে বটে ফজলু। রতন যে দাঙ্গাবাজ ডাকাত এটা না জানে কে? নন্দ-চৌকিদার মুখ লুকিয়ে হাসে। রতন ফিরিয়ে দেয় জবাব, তুর কাজ তো চুরি-ডাকাতির বেহদ্দ রে! যে তুর চাচারে জীয়ন্তে কবর দিল—তারই কাছে হাত পাতিস্ তু—লজ্জা করে না!

স্বল্পভাষী জনাবালি বলে, ব্যস্ খুব! আর ফালতু বাত লয়।

—কেন? এতেও কি আঁতে ঘা লাগছে নাকি জনাবালি?—শুধায় ঘোষ।

—তা লাগছে বই কি ঘোষ। যার নুন খাই—তার ইজ্জৎ দেখতে হবে বইকি আমার!

রতন একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, এ নুন না খালিই লয়?

জনাবালি জবাব দেয় না। এ কথার বোধকরি জবাব নেই!

প্রহ্লাদ অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে জমিদারের কাছারিবাড়ি।

প্রহ্লাদের ফিরতে যেন বড্ড দেরি হচ্ছে! আড়াই পো রাস্তা, যাবি আসবি পনের মিনিট, কথা বলবি পনের মিনিট—ব্যস্, আধঘন্টা! মনে লাগে, অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। ফেরে না কেন লোকটা?

ফজলু বলে—বেশি চেল্লাচেল্লি করে শেষবেশ আটক পড়ল নাতো বায়েন? ফেরে না কেন এখনও?

প্রশ্নটা রতনের মনেও জেগেছে। বিচিত্র নয়। তিন তিনখানা গাঁয়ের উপর থেকে অধিকার হারানোর সম্ভাবনায় মরিয়া হয়ে উঠেছে প্রহ্লাদ। বেফাঁস কিছু তার মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই থাকে তাহলে কাছারিবাড়ির থামের সঙ্গে পিছমোড়া হয়ে বাঁধা পড়েছে এতক্ষণ।

উপীন বলে, আগ্ বাড়ায়ে দেখব নাকি ঘোষমশায়?

আগ্ বাড়িয়ে দেখবার আর প্রয়োজন হল না। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রহ্লাদ এসে হাজির হয় এবং সর্বপ্রথম যে সংবাদটি পরিবেশন করে তার সঙ্গে গরু-ভাগাড় অধিকারের কোন সম্পর্ক নেই। লোকগুলোও এসব কথা ভুলে শুনতে থাকে প্রহ্লাদের কথা। চৌধুরীবাড়ির প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার কমলাপতি চৌধুরী মৃত্যুশয্যায়। গাড়ি বেরিয়ে গেছে শহর থেকে বড় ডাক্তার আনতে।

খবরটা এতই অতর্কিত আর আকস্মিক যে সকলেই বেরিয়ে আসে পথে। পায়ে পায়ে চলতে থাকে জমিদারবাড়ির দিকে। নবাপাল পিছন থেকে ডাকে, আরে, ইয়ার কী করবে?

জবাব দেয় প্রহ্লাদ বায়েন, তুমিই ওটা নিয়ে যাও কেনে ফজলু। তা বলি দখল আমি ছাড়তেছি না কিন্তুক্। এ সময়ে ও নিয়ে তবু ঝামেলা করতি পারবনি।

যে সুরে প্রহ্লাদ কথা কটা বললে সেটা মোটেই আশা করা যায় না তার কাছ থেকে। জমিদার কমলাপতিই মৃত্যুশয্যায়, অন্য কেউ নয়। এই সামন্ততন্ত্রের শেষ ধ্বজাধারী প্রহ্লাদকে শুধু অত্যাচারই করেছে, ভালো করেনি কোনদিন। তাই বায়েনের কথাটায় যে বৈরাগ্যের সুর বেজে উঠল সেটা অপ্রত্যাশিত; কিন্তু আশ্চর্য! একথা

কারও মনে হল না—যেন খুব স্বাভাবিক একটা কথাই বলেছে বায়েন।

বাড়িমুখো মোড় ফিরতেই উপীন বললে, কর্তারে দেখতি যাবা না?

প্রহ্লাদ বলে, তোমরা যাও ভাই! বড় ক্ষুধা লাগিছে।

পায়ে পায়ে ওরা এগিয়ে চলে চৌধুরীবাড়ি—উপীন বায়েন, নন্দ, জনাবালি, হরকিষণ আর রতন ঘোষ—যেন একদলের লোক তারা।

প্রহ্লাদ ফিরে চলল বাড়িমুখো। প্রচণ্ড ক্ষুধাও পেয়েছে এতক্ষণে। মনটাও গেছে উদাস হয়ে। ভাগাড়ের অধিকার হারানোর কথা আর সে ভাবছে না। আশ্চর্য, এখন সে ভাবছে শুধু পদ্মর কথা? চৌধুরীমশায়ের আকস্মিক সন্ন্যাস রোগের আক্রমণের সংবাদটা তাকে সহসা সচেতন করে তুলেছে মানবজীবনের অনিত্যতার বিষয়ে। অতবড় সর্বশক্তিমান জমিদারকে যদি মহাকাল বিনা নোটিসে ধরাশায়ী করতে পারেন তবে প্রহ্লাদ বায়েন ভরসা করবে কিসের জোরে! সেও তো যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। তখন পদ্মর কী হবে? কে তাকে রক্ষা করবে নারীমাংসলোলুপ মানুষগুলোর কাছ থেকে, যারা ওর আচ্ছাদন বস্ত্রের স্বল্পতার জন্য বাঁকা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় ফিরেফিরে। মেয়ের কথা মনে পড়লে বেচারী বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ে—বারমুখো মানুষটা ঘরমুখো চলতে শুরু করে। সরি শয্যাশায়ী, মেয়েকে আগলে রাখার ক্ষমতা নেই তার। পরীর মতিগতি বোঝা ভার। তলেতলে সে পদ্মকে তার নিজের পথে টানবার চেষ্টা করছে কি না কে জানে। তাই বাড়ি ছেড়ে বায়েন বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। কচি মেয়েটার মুখটা মনে পড়ে—তাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বাড়ি ফিরে এসে বসতেই পদ্ম এগিয়ে আসে। মুখ-হাত ধোবার জল দেয়। পান্তাভাতের থালাটা নিয়ে আসে আবার। আহারান্তে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে জুত করে বসে বায়েন। পদ্ম তামাক ধরিয়ে আনতে যায়।

মনটা সত্যই আজ বড় উদাস হয়ে গেছে বায়েনের। মানুষে মানুষে বোধহয় একটা গোপন আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে—যা দেখা যায় না, প্রমাণ করা যায় না, যা শুধু অনুভব করা যায়। না হলে চৌধুরীকর্তার অসুস্থতার সংবাদটা জমিদারবাড়ির পক্ষে যতই মর্মান্তিক হক—কিন্তু এই মানুষগুলো, এই রতন ঘোষ, উপীন, হরু এদের কাছে তো দুঃসংবাদ নয়। কমলাপতি তো এদের শত্রুমাত্র। তবু কই এরা তো উল্লসিত হয়ে উঠতে পারল না। প্রহ্লাদ বায়েনের মনেও কোন অজানা তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে একটা বেদনার সুর। গেল সনের আশ্বিনের ঝড়ে চাঁপাডাঙার প্রকাণ্ড বড় শিশুগাছটা যখন শেকড় সমেত উপড়ে পড়েছিল তখন যেমন একটা বেদনা বোধ করেছিল, আজকের অনুভূতিটাও অনেকটা সেইরকম। গাছটা বায়েনের সম্পত্তি নয়—সেটা উপড়ে পড়ায় তার কোন ক্ষতি হয়নি। তবু বিশাল বনস্পতির সেই আকস্মিক মৃত্যুটা ওর মনকে উদাস করে দিয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল এমন মহান বনস্পতির এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ার কথা নয়।

পদ্ম হুঁকার মাথায় কলকেটা বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে আসে। প্রহ্লাদ ছেঁড়া চাটাইয়ের একটা পাশে সরে গিয়ে বলে : আয়, বোস কেনে টুক। সেই গানটো আজ শুনা দিকিন?

—কুন্‌টো?—প্রশ্ন করে বাপ-সোহাগী মেয়েটা, বাপের কোল ঘেঁসে বসে।

—সেই 'গোমাতা সুরধুনী পতিত পাবনি—'

বাধা দিয়ে পদ্ম বলে—কালই তো সেই গানটো শুনাইছি!

—আচ্ছা আচ্ছা, তবে গা—'শ্যামা মায়ের পায়ের তলায়...'

পদ্ম ঠোঁট উল্টে বলে, তুমার মন শুধু শ্যামা মায়ের লেগেই কাঁদে, তুমার এই কটা মায়ের দিকি একটুও নজর নাই!

হা হা করে হাসে বায়েন। মনটা হালকা হয়ে যায়। এই জন্যেই তো মনটা উদাস হলে ও ফিরে আসে পদ্মমায়ের কাছে। বায়েনের ঘরে পদ্ম এক বিস্ময় ; তার রঙ কালো নয়, কটা। পরীর মত যৌবনে প্রহ্লাদের স্ত্রী সরিরও চঞ্চলতা ছিল। কেউ কেউ তাই পদ্মের জন্মরহস্য নিয়ে আড়ালে ইঙ্গিত করে। প্রকাশ্যে একথা বলার সাহস কারও নাই। প্রহ্লাদ তাহলে তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। হাসি থামিয়ে প্রহ্লাদ বলে, কী পাগলি মেয়ে রে তু। জগজ্জননীরে তু হিংসে করিস?

পদ্ম বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, হঁ! তু আমার বেটা—শ্যামা মায়ের লেগে তু কেনে অমন করবি!—বাপের মাথা থেকে গামছার পাগড়িটা সে খুলে নেয়; কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যে বিলি করে তার কাচের চুড়িপরা মিষ্টি হাত!

সমস্ত দিনের ক্লান্তি ভুলে যায় বায়েন। নবাপালের ভাগলপুরী গাইয়ের মৃত্যু, ভাগাড়ের অধিকার হারানো, কিংবা কমলাপতি দুঃসংবাদটা ভুলে যায়। মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে চোখের জল মোছে।

* * *

জগবন্ধু ডাক্তার শেষ রোগীটিকে বিদায় দিয়ে উঠবার উপক্রম করছিল। ডাক্তারের কোন কম্পাউন্ডার নেই। ডিসপেনসারির মাঝামাঝি একটা পর্দা টাঙানো। বাইরের অংশটায় একখানা ছোট টেবিল, চেয়ার আর বেঞ্চি। পর্দার ওপাশে ডাক্তারের রুগী দেখার ঘর তথা ডিস্পেন্সিং-রুম। খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া একটা বড় প্যাকিং বাক্স। উপরে লাল একটি অয়েলক্লথ বিছানো। দেওয়ালের গায়ে আমকাঠের তক্তার উপর হরেক রকমের শিশি-বোতল। টেবিলের উপরে সারি সারি ছোট-বড় শিশি। একটি ওজন-দাঁড়ি পোর্সেলিনের খল-নুড়ি। চামচে, স্প্যাচুলা, আঠার শিশি, কাঁচি ইত্যাদি ছড়ানো। ডাক্তার নিজে হাতেই সেগুলি ধুয়ে-মুছে সাজিয়ে রাখছিল। হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল দিবাকর।

—ডাক্তার, একবার শিগ্‌গির এস—চৌধুরীমশাই হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—বোধহয় বাঁচবেন না আর।

ডাক্তার চকিতে ঘুরে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করে দিবাকর একা আসেনি; তার পিছনে দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন হরিহর গাঙ্গুলি এবং তাঁর পিছনে লণ্ঠন হাতে জমিদারের একজন পাইক—কী যেন নাম লোকটার—কাদের! সংবাদটা ইতিপূর্বেই শুনেছে ডাক্তার। ওর ডাক্তারখানাতেই বসেছিলেন রায়মশাই, ননীমাধব প্রভৃতি। এমন সময় একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবরটা দিয়েছিল একটু আগে। খবর শুনেই

ওঁরা চৌধুরীবাড়ি রওনা হয়ে গেছেন। ননীমাধব একবার বলেও ছিলেন—তুমিও চল না জগবন্ধু।

বাধা দিয়েছিলেন রায়—কেন ওকে ডাকছ মোদক। একটু পরেই ওকে ডাকতে আসবে—তখন যাবে ও। না ডাকতে আসে পড়শী, ডাকলে আসে যে তাকেই বলে 'ডাক্তার'।

জগবন্ধু মুচকি হেসেছিল শুধু, জবাব দেয়নি।

প্রতিমুহূর্তেই সে আশা করছিল তার ডাক আসবে। গ্রামে আর দ্বিতীয় ডাক্তার নেই। কৃষ্ণসখা কবিরাজ অবশ্য আছেন—কিন্তু তিনি অথর্ব বৃদ্ধ—রাত্রে বের হতে পারেন না। সুতরাং ওদের আসতেই হবে তার কাছে। সে কিন্তু হরিহরকেই আশা করেছিল শুধু—দিবাকরকে নয়। এখন বুঝতে পারে—দুর্গাপূজার থিয়েটার উপলক্ষে যে কাণ্ডটা ঘটে গেছে সেটা ওঁরাও ভুলতে পারেননি। ওঁদেরও তাহলে সন্দেহ আছে—ডাকলে ডাক্তার নাও আসতে পারে। তাই দিবাকরকেও ধরে এনেছে।

দিবাকর তাগাদা দেয়—একবার তাড়াতাড়ি আসতে হবে ভাই।

জগবন্ধু নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করে—কে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বললে?

—জমিদার, আমাদের চৌধুরীমশাই।

—তোমাদের চৌধুরীমশাই? জমিদার! ঠিক চিনতে পারছি না তো?

—চিনতে পারছ না! কী আশ্চর্য! কমলাপতি চৌধুরী।

—ও! কমলাপতিবাবু!—'বাবু' কথাটার উপর জোর দিয়ে বলে ডাক্তার।—তাই বল, তা সদরে খবর পাঠাও বরং। সিবিল সার্জেনকে কল দাও!

এবার হরিহর সাহসে ভর করে যোগদান করেন কথোপকথনে—সদরে খবর পাঠানো হয়েছে। আপনি ততক্ষণ একবার গিয়ে দেখুন ডাক্তারবাবু। হুজুর এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, একেবারে হুঁশ নেই।

—হুঁশ তো আপনাদের হুজুরের কোনকালেই ছিল না গাঙ্গুলিমশাই, যে আজ নতুন ক'রে হুঁস্ হবে! আমি গাঁইয়া ডাক্তার—গাঁইয়াদের চিকিৎসা করতে পারি—ওসব হুজুর-টুজুরের হুঁশ কি আমি ফেরাতে পারি?

গাঙ্গুলি সম্ভবত এই জাতীয় বক্রোক্তিই আশঙ্কা করছিল—সে চুপ করে থাকে। দিবাকরই জবাব দেয়—তোমার রাগ করার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু একটা মানুষ মর মর—এ অবস্থায় সে শোধ তোলা কি তোমার উচিত হচ্ছে ডাক্তার?

—মানুষ মর মর হলে আমায় ডাকতে হত না পণ্ডিত। আমি নিজেই ছুটে যেতাম। কিন্তু ইনি হচ্ছেন হুজুর! 'কমলাপতিবাবু' বল্লে এঁর ছেলে যে চিনতে পারে না কার কথা বলা হচ্ছে। গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে এঁদের অভিনয় করতে যে মর্যাদায় বাধে! এঁরা তো মানুষ নয়—অতি-মানুষ! গরুর চিকিৎসাও যেমন জানি না আমি, তেমনি হুজুরদের চিকিৎসাও জানি না।

দিবাকর কঠিন স্বরে বলে, কিন্তু আমি যাঁর জন্যে তোমাকে আজ ডাকতে এসেছি তাঁর পরিচয় তো এখন হুজুরও নয়, চৌধুরীমশাইও নয়, কমলাপতিবাবুও নয়—

—তাই নাকি? তবে তাঁর পরিচয়টা কী শুনি? —ডাক্তারের কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

—তোমার কাছে এই মুহূর্তে তাঁর একটি মাত্র পরিচয়—একজন আর্ত রুগী। কিন্তু এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আজ আমার সত্যিই লজ্জা হচ্ছে ডাক্তার। প্রফেশনাল এথিক্স-এর চেয়েও তোমার অভিমানটা বড় হল?

ডাক্তার এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। স্থির দৃষ্টিটা পড়ে সামনের একটা গ্রুপ ফটোর উপর। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের একটা গ্রুপ ফটো। কোন অধ্যাপকের বিদায় অনুষ্ঠান বোধহয়। জগবন্ধু ডাক্তারেরও ছবি আছে ওতে—পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে বক্ষবদ্ধকর তরুণ ছাত্র একজন। কী যেন ভাবল ডাক্তার ছবিটির দিকে তাকিয়ে। তারপর হঠাৎ হাতব্যাগটা নিয়ে বলে : চল।

কমলাপতির পক্ষাঘাতের এ আক্রমণটা আকস্মিক হলেও ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি অনেক দিনই। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় যেন আরও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত উইলটা তিনি পালটে ফেলবেন বলেই স্থির করেছিলেন। কলকাতার সলিসিটারকে এখানে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। খবরটা জানতেন শুধু দয়াময়ী এবং জাহ্নবী। ওঁদের দুজনকে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি উইল পালটাতে চান। কী ব্যবস্থা করতে চান তা অবশ্য বলেননি কাউকে। কিন্তু কলকাতায় সলিসিটারকে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যটা আঁচ করেছিল অনেকেই। হরিহরও। খবরটা খুব গোপন থাকেনি। এর পরেই এসেছিল শ্রীপতির একটি ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্ণ পত্র। বিষয়বস্তু সামান্যই—শ্রীপতি জানিয়েছিল সে বিবাহ করছে আগামী কী একটা তারিখে। কমলাপতিকে সে জানিয়েছে তাঁর ভাবী পুত্রবধূর নাম মিসেস অ্যারিয়্যাডনি ডিক্রুজা। বিবাহটা কলকাতাতেই হবে। পূর্ব বিবাহের বিচ্ছেদ আবেদন মঞ্জুর হলেই শ্রীপতি তার পাণিগ্রহণ করবে। আর কোন খবর নেই। চিঠিখানা পড়ে দয়াময়ীর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল—এর অনিবার্য পরিণাম বুঝতে বিলম্ব হয়নি তাঁর। কমলাপতি কিন্তু মৃদু হেসেছিলেন, বলেছিলেন—কী? অত ঘাবড়ে গেলে কেন? ক্রিশ্চিয়ান পুত্রবধূ ঘরে তুলতে লজ্জা হচ্ছে?

দয়াময়ী বুঝতে পারেন না এ ব্যঙ্গ না সহানুভূতি।

—দুঃখ আমিও পেয়েছি পিউ—তবে অতি সামান্যই। এ জাতীয় ঘটনা যে ঘটবে তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ গিন্নি যে, এতবড় ছেলে আজও তার বাপকে চিনল না। না হলে এই ছেলে-ভোলানো হুমকি দেয়?

দয়াময়ী কোনও উত্তর দিতে পারেননি; চোখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে চলে গিয়েছিলেন। কিছুতেই তিনি নিজেকে মনে মনে ক্ষমা করতে পারছিলেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল আবাল্য অত্যধিক স্নেহ দিয়ে শ্রীপতিকে তিনিই নষ্ট করেছেন। বাপের শাসন থেকে প্রতিনিয়ত আড়াল ক'রে রেখেছেন তাকে—তার অন্যায় আবদারে প্রশ্রয় জুগিয়েছেন গোপনে। তার ফলই বুঝি ফলছে আজ।

কমলাপতি ডেকে পাঠিয়েছিলেন জাহ্নবীকে। বলেছিলেন—পরামর্শটা আপনার সঙ্গেই করতে হবে বৌঠান—আপনার বোন তো একেবারে ভেঙে পড়েছে।

চিঠিখানা বাড়িয়ে দেন তিনি। পড়ে ফেরত দেন জাহ্নবী।

—আপনি কী পরামর্শ দেন বৌঠান?

—আমার পরামর্শ তো আপনি শুনবেন না ঠাকুরপো। আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন—শুধু শুধু আমার মত জেনে কী হবে?

—কেন? আপনার কথা শুনব না কেন মনে করছেন?

—কারণ, কখনও আপনি কারও উপদেশ শোনেন না। না হ'লে উমার আজ ও দশা হ'ত না। আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আপনি খোকার বন্ধুর সাথে তার বিয়ে দিলেন—ফলে—

কথাটা আর শেষ করতে পারেননি জাহ্নবী।

কমলাপতি জানলা দিয়ে শূন্য আকাশের দিয়ে নির্বাক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন। দ্বিতলের ঘর থেকে গ্রামের অনেক কিছু নজরে আসে। আনন্দময়ী মায়ের মন্দির কলসে দুটি পায়রা বসে পরস্পরকে সোহাগ জানাচ্ছে—দূর আকাশে উড়ছে কয়েকটি চিল। অলস আবেশে বাতাসে ভেসে চক্রাকারে ঘুরছে ওরা। নদীর বাঁধের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কয়েকজন পথচলতি মানুষ—ছোট বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে ওদের। দেখলে—কমলাপতি এই দৃশ্যগুলিই দেখতে পেতেন। কিন্তু চোখ তাঁর বর্তমানকে দেখছিল না—তিনি ডুবেছিলেন অতীতে। জাহ্নবী ঠিকই বলেছেন। এই ছেলেটির সঙ্গে উমার বিবাহ দিতে প্রবল আপত্তি ছিল জাহ্নবী দেবীর। সে আপত্তি গ্রাহ্য করেননি তিনি! করেননি অন্য একটা কারণে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওকে জামাই না করলে একটা অঘটন ঘটে যাবার আশঙ্কা আছে। হয়তো তাহলে তাঁর আভিজাত্যের নীলরক্তের অভিমান হয়ে যেত দ্রব। অমল বিলাত যাচ্ছে ব্যারিস্টারি পড়তে। ওর বাপ নামকরা উকিল! ঠাকুর্দা ছিল জমিদার। জমিদারী অবশ্য নেই—ঘোড়ার খুরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু হাজার হলেও সে অভিজাত বংশের ছেলে নিজেও উচ্চশিক্ষিত। বাপের মতো সে রেস খেলে না। এলেম আছে ছোকরার, আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে সে। কমলাপতি জানতেন তাড়াহুড়া করে বিবাহটা না দিয়ে ফেললে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটত! অমলের পাশাপাশি সেই বোষ্টমদের কণ্ঠিধারী ছেলেটাকে মনে মনে তুলনা ক'রে হেসেছিলেন তিনি সেদিন। বলেন—উমার জন্য ব্যস্ত হবেন না আপনি। এসব হচ্ছে প্রভাবে মেঘডম্বরু। অমলকে নিমন্ত্রণ করুন। মেয়ের কথায় কান দেবেন না। মান-অভিমান ভালো জিনিস—কিন্তু সেটা মাত্রা ছাড়ানো উচিত নয়।

জাহ্নবী কোন জবাব দেন না। দুজনেই কিছুটা নীরব। কমলাপতিই আবার বলেন—আমি উইলটা পালটাতে চাই।

এবারও কোন কথা বলেন না জাহ্নবী, কোন কৌতূহল প্রকাশ করেন না। সেটা কমলাপতির দৃষ্টি এড়ায় না—তবু বলেন—খোকাকে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে আপনার জা। আমার অবর্তমানে এতবড় সম্পত্তিটা হঠাৎ হাতে এলে ও রাখতে পারবে না। সে শিক্ষা তার হয়নি। তাই আমি, মানে, তাকে সরাসরি ওয়ারিশ করতে চাই না। কিছু আপনার নামে দিয়ে যেতে চাই—আমার অবর্তমানেও শ্রীপতির অনুগ্রহ-ভিখারি না হতে হয় আপনাকে। দ্বিতীয়ত, বাকি সম্পত্তিটা আমি একটা ট্রাস্টির হাতে দিয়ে যেতে চাই—আপনাকেও হতে হবে একজন এক্সিকিউটার!

বাধা দিয়ে জাহ্নবী বলেন—আমাকে মাপ করতে হবে ঠাকুরপো। আপনার ও

জমিদারীর কোন অংশ আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব—অছি হয়েও থাকতে পারব না আমি।

কমলাপতি একটু বিচলিত হয়ে পড়েন—হঠাৎ আবেগ-উদ্বেল স্বরে বলেন—আমি মিনতি করছি বৌঠান—

ধমক দিয়ে ওঠেন জাহ্নবী—কী ক'রে করছেন তাই তো ভেবে অবাক হচ্ছি আমি। আর কেউ না জানুক আপনি তো জানেন সমস্ত কথা। আপনি কি সত্যিই ভুলে গেছেন সব? ঐ জমিদারীই একটা লোককে তিলতিল করে শেষ করেছে এই দেওয়াল-ঘেরা বাড়ির মধ্যে—এ কথা একবারও মনে পড়ল না আপনার! কী করে আশা করেন আপনি—সেই ন্যায্য অধিকার আজ আপনার কাছে হাত পেতে গ্রহণ করব আমি! ছিঃ।

কমলাপতি একটা কথাও বলতে পারেন না।

নিজেই স্থির করেন পরবর্তী কর্মসূচী। সলিসিটারকে আসতে তার করে দেন। শ্রীপতির চিঠির জবাবও চলে যায়। সংক্ষিপ্ত পত্র। লিখেছেন—তোমরা দুজনে আমার আশীর্বাদ নাও। তবে একটা কাজ না করলে বড় অধর্ম হবে। মিসেস ডিক্রুজাকে বিবাহের পূর্বেই জানিয়ে দিও কমলাপতি তাঁর একমাত্র পুত্রকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেছেন। বিদেশী মহিলা—শেষে ভুল বুঝে না কষ্ট পান।

এ আজ মাত্র ক'দিন আগেকার ঘটনা। এ কয়দিন তিনি বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই ছিলেন। উইল পালটাবার কথা জানিয়ে অ্যাটর্নিকে আসতে লিখেছেন—অথচ নিজেই মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারেননি। বুঝতে পারেন না যে, ছেলের এই ব্যবহার, এইসব ছেলে-ভুলানো হুমকি কি শুধুই ছেলেমানুষি—নাকি বুদ্ধির গোড়ায় সত্যিই পচনক্রিয়া শুরু হয়েছে শ্রীপতির। নিজে যে তিনি সন্ন্যাস রোগের রুগী তা জানা ছিল। যশোরে থাকতেই প্রথম আক্রমণ হয়—আজ বছর আষ্টেক আগে। তখনই ডাক্তারে সাবধান ক'রে দিয়েছিল—যে কোন সময়ে হঠাৎ দ্বিতীয় আক্রমণ এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হতে পারে। তাই প্রথম আক্রমণের ফলেই কমলাপতি উইল করিয়েছিলেন। সেবারকার মতো এবারও উইলটা পালটাবার প্রয়োজন বোধ করায় তাড়াতাড়ি করছেন তিনি। শ্রীপতি যদি উৎসন্নেই যেতে বসে থাকে তবে তার উপর কিছুই নির্ভর করা চলে না। দয়াময়ী এবং জাহ্নবী, অর্থাৎ উমার অংশটা পৃথক ক'রে রেখে বাকি অংশ হয় দান ক'রে যেতে হয়, অথবা ভবিষ্যতে শ্রীপতি একদিন মানুষ হবে এই ভরসায় দিয়ে যেতে হয় কোন ট্রাস্টির হাতে।

আজ কদিন হল আবার তাঁর মনে জেগেছে সম্পূর্ণ নূতন একটা চিন্তাধারা। বিরাট একটা কিছু করবার জন্য ভিতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করছেন। মস্ত একটা দানপত্র করে যাওয়ার। বস্তুত জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে তাঁর আজ অনুশোচনা হয়েছে। গ্রামের জন্য কী করে গেলেন তিনি? এদের রক্ত জল করা টাকা উঠেছে তাঁর সিন্দুকে। সে টাকা নিয়ে গিয়ে ঢেলেছেন তিনি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিতে। যশোরের বাস-কোম্পানির কারবারে। গ্রামের জন্য তো কিছুই করেননি। এতদিন এ কথা মনে হয়নি। এদের শোষণ করা ছিল যেন তাঁর পুরুষানুক্রমিক বংশগত অধিকার। বাপ-পিতামহের আমল থেকে যা হয়ে এসেছে তার বাইরে যাননি তিনি। মাঝে মাঝে কোন প্রজার খাজনা মাপ করা ছাড়া—ভালো কাজ কোন কিছু করেছেন বলে তো কই মনে পড়ে

না। গ্রামের জমিদার বলে অযাচিত সম্মান পেয়ে এসেছেন আবাল্য। শিশুকালে জরির টুপি পরে বাবার সঙ্গে মহাল দেখতে যেতেন। কী খাতির করত মহালের বর্ধিষ্ণু প্রজারা! ক্রমে বয়স বেড়েছে। এখনও তাঁকে পায়ে হেঁটে গ্রামে বেড়াতে দেখলে মুগ্ধ হয়ে যায় গ্রামবাসী। পথ দিয়ে তিনি হেঁটে যান—দুধারের মাঠে চাষী কাস্তে মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়ায়, যুক্তকরে প্রণাম জানায় তাঁকে। কোথাও কোন সভাসমিতি হ'লে ওরা খোঁজ করতে আসে কবে চৌধুরীমশাই গ্রামে আসবেন। সেই দিনটিতেই ওরা অনুষ্ঠান করে। সর্বাগ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি সংরক্ষিত থাকে তাঁর জন্য। কোন চাঁদার তালিকায় তাঁর নামটি লিখিত হয় সর্বপ্রথমে। গ্রামের তরফ থেকে উপরে কোন দরখাস্ত পাঠানো হলে প্রথম নামটি ফাঁক রেখে সই সংগ্রহ করা হয়। সুযোগমতো ওরা প্রথম স্বাক্ষরকারী হিসাবে একদিন লিখিয়ে নিয়ে যায় তাঁর নাম। আড়ালে যে অনেকেই তাঁর মৃত্যুকামনা করে একথা মেনে নিলেও মনে নিতেন না তিনি! আজীবন এই সম্মানটা পেয়ে পেয়ে সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভালোবাসায় না হয় শ্রদ্ধায়, তাতেও না কুলায় তো ভয়েও যেন সকলে স্বীকার ক'রে নেয় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। তা লোকগুলো আজীবন স্বীকার করে এসেছে। এ স্বীকৃতির মূল উৎস ভয় না শ্রদ্ধা তা যাচাই করে দেখবার প্রশ্ন কখনও জাগেনি কমলাপতির মনে।

তারপর কালযুদ্ধ একদিন থামল। অনেক আশা নিয়ে কমলাপতি দেশে এসেছিলেন। অনেক কল্পনা ছিল তাঁর। এবার গ্রামোন্নয়নে মন দেবেন তিনি। হাজার হোক তিনি জমিদার—তাঁর উপরেই নির্ভর করছে গ্রামের এতগুলো ভাগ্যহীন নরনারী। এদের তিনি গড়ে তুলবেন। সেই নব-জাগরণের অবতরণিকা ছিল মাতৃপূজার ব্যবস্থায় নূতন আয়োজন। বৈচিত্র্য চাই, লোকে যাতে বুঝতে পারে যুদ্ধোত্তর দেশটা মরেনি। স্বাধীনতা আসন্ন! এবার এগিয়ে যাবার দিন এসেছে। নবোদ্যমে লেগে পড়লেন তিনি। গড়ের বাদ্যি, থিয়েটার আর ডাকের সাজ—সব জমকালো ব্যাপার! রাজসিক আয়োজন! তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। হঠাৎ এক সময় কমলাপতি আবিষ্কার করলেন নিজ আসন থেকে কখন অলক্ষ্যে চ্যুত হয়েছেন তিনি। কমলাপতি চৌধুরী আর গ্রামের শ্রেষ্ঠ মানুষ নন! সবার বড় যে আসন, সবার সম্মুখে যে স্থান—যেটাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভোগ দখল করে এসেছেন এতকাল—সেই আসনটাতে কে যে হঠাৎ চড়ে বসেছে তা আজও বুঝতে পারেননি তিনি। তা যদি পারতেন তবে তার সঙ্গে দ্বৈরথ-সমরে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত ছিলেন কমলাপতি;—কিন্তু তাঁর ত্যক্ত আসনে, আশ্চর্য, বোধহয় কেউই উঠে বসেনি। পাঞ্জাটা কার সঙ্গে কষবেন তা বুঝতে পারেন না। ঐ আব্বাসভাই কোম্পানির বেনিয়াটা? অনেক পয়সার মালিক লোকটা, অনেক খরচ ক'রে সার্বজনীন পূজা করল বটে—কিন্তু আপামর জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আহরণ করার ক্ষমতাই নেই ওর। ঐ নন্দদুলাল রায়? গ্রামের অধিকাংশ লোকের ভিটে মাটি-জমি-জায়গা ওর মোটা মোটা লাল খেরো খাতার পাকে বন্দী হয়ে আছে বটে—কিন্তু তাকেও কেউ শ্রদ্ধা করে না। সেও আজ গ্রামের অবিসংবাদিত নেতা নয়। তা হলে কে? ঐ কী-যেন গোঁসাই? যে ছেলেটা উমাকে পড়াতে আসতো? জেল ফেরত অর্বাচীন বালকটা? কী যেন ওর নাম? হ্যাঁ দিবাকর গোঁসাই।

কিন্তু!

হ্যাঁ, প্রতিমা বির্জনের দিন ঐ ছেলেটাই নেতৃত্ব দিয়েছিল বটে। ক'মাস আগেকার ঘটনা—তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি দৃশ্যটা।

হাটতলায় যখন জমিদারবাড়ির প্রতিমা গিয়ে পৌঁছালো তার কিছু পূর্বেই আব্বাসভাই কোম্পানির অর্থে আয়োজিত সার্বজনীন প্রতিমা এসে পৌঁছেছিল সেখানে। হাটতলায় ঠাকুর নামিয়ে ওরা জিরিয়ে নিচ্ছিল। জমিদারের প্রতিমা হাটতলায় এসে নামাতেই ছুটে এল প্রহ্লাদ বায়েন। কমলাপতির প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে মদির চোখ দুটো মেলে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ হাউমাউ ক'রে কেঁদে ফেললে মাতালটা, বললে—আমার দোষ নাই মা, শুধাও উদিকে। আমারে যাতি দ্যায় নাই। তিন দিন বাজাই নাই মা, অখন বিসজ্জনের বাজনটা টুক শুন্যা যাও!

কেউ বাধা দেয় না। তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছিল প্রহ্লাদ। ছুটে এসেছিল উপীন বায়েন আর তার সাঙ্গপাঙ্গ। সব কটাই মাতাল। ঘুরে ঘুরে প্রায় আধঘন্টা নেচে নেচে বাজিয়েছিল ওরা। আশ মিটিয়ে। আলোর খাশগেলাসে, মশাল, পেট্রোম্যাক্স আর ডে-লাইটে এমনিতেই হাটতলাটা পূজার সময় দিনের মতো দীপ্যমান—তার উপর চৌধুরীবাড়ির ঠাকুরের তেইশমুখো সাবেকি কারবাইডের গ্যাস-ঝাড়। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে উদ্দাম বাজিয়ে ক্ষান্ত দিল বায়েনরা। দুটি প্রতিমাই উঠলো একসাথে। সামনেই জগবন্ধু ডাক্তারের ডিসপেনসারি। তার পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ গলিটা হচ্ছে ফাঁকা মাঠে পড়ার একমাত্র পথ। এই অপরিসর গলিটুকুতে এক সঙ্গে দুখানা ঠাকুর পাশাপাশি যেতে পারে না। দুটি প্রতিমাই আগে যেতে গিয়ে সঙ্কীর্ণ গলির মুখে বেধে গেল দুটি ভিন্ন ধারার জনপ্রবাহ। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে। দু পক্ষই দাবি করল আগে যাবে। একটা হৈচৈ উঠলো—উষ্ণ বাক্যের আদান-প্রদান। অধিকাংশ শোভাযাত্রীই মাদকরসে বেসামাল। বোঝা গেল দু'তিন মিনিটের মধ্যেই বচসা আর মৌখিক থাকবে না। একটা শোরগোল চেঁচামেচি। স্ত্রীলোক আর শিশুর সংখ্যাও কম নয়—একটা আর্ত হাহাকার—ডাকাডাকি ভীত চকিত সাবধানবাণী শোনা যায় হাটতলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। ছুটাছুটি করে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে অসহায় মানুষ। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? অধিকাংশ দোকানপাটই আজ বন্ধ। বিজয়া দশমী। হুঙ্কার দিয়ে চৌধুরীবাড়ির প্রতিমার সামনে মহড়া নিয়ে লাঠি হাতে দাঁড়ালো কাদের আর হরকিষণ—কাহারগুলোও ঘিরে দাঁড়ালো প্রতিমাকে। একটা বিদ্যুৎ চমকের মতো ভিড় ভেদ ক'রে জমিদারের দেহরক্ষী জনাবালি ছুটে গেল এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। দাঁড়ালো একেবারে কমলাপতির কাঁধ ঘেঁষে। পায়ে হেঁটে বেরিয়েছেন তিনি। জনাবালি জানে, এই সুযোগে মালিকের মাথাটাকেই আক্রমণের উপযুক্ত স্থান মনে করবে প্রতিপক্ষ। জনতার শতকরা আশিভাগ হিন্দু। সুতরাং মারামারি যদি সত্যি বাধেও তবু ইচ্ছা ক'রে কেউ প্রতিমাকে আঘাত করবে না—লক্ষ্য হবে কমলাপতির মাথাটাই। জনাবালি লাঠি হাতে দাঁড়ায় তাঁর পাঁজর ঘেঁষে।

এ তরফ থেকেও জনকতক এগিয়ে আসে লাঠি হাতে। নন্দদুলাল শিরোমণি, ননীমাধব অথবা রত্নেশ্বর—অর্থাৎ এ পক্ষের যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁরা তাড়াতাড়ি উঠে

পড়েন ডাক্তারের দাওয়ায়। ভিড় ঠেলে আসে রতন ঘোষ। চোখ দুটো তার ডগ্‌ডগে লাল—বোঝা যায় অত্যধিক মদ্যপান করেছে সে। পূর্বমুহূর্তেই মাজায় হাত দিয়ে মাধাইয়ের সঙ্গে সে খ্যামটা নাচছিল—সিল্কের একখানা রুমাল হাতে। লাঠিখানা ধরেই অদ্ভুতভাবে স্থির হয়ে দাঁড়ায় রতন! কে বলবে এ লোক মাতাল! চিৎকার করে বলে ওঠে—আমার ঠাকুর আগে যাবে! কোন শালা রুখতি চাস্, এগুয়ে আয়!

হরকিষণ দূর থেকেই চেঁচিয়ে ওঠে—খবর্দার!

এগিয়ে আসে না কিন্তু সে।

হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় রত্নাকর। আশেপাশের লোকেরা ঠেলাঠেলি করে মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা ক'রে দেয়। একদিকে হরকিষণ আর কাদের, অন্যদিকে রত্নাকর—মাঝের স্থান ফাঁকা হয়ে যায়!

মুহূর্তের স্তব্ধতা। আসন্ন কালবৈশাখীর পূর্বাভাস।

হঠাৎ ভিড় সরিয়ে দুই দল লাঠিয়ালের মধ্যে লাফ দিয়ে এসে দাঁড়ায় দিবাকর। নিরস্ত্র একহারা একটা মানুষ। রতনের হাতখানা চেপে ধরে। প্রচণ্ড ধাক্কা মারে তাকে রতন। দিবাকর ছিটকে পড়ে মাটিতে—বোঝে উন্মত্ত রতন তাকে চিনতে পারেনি। বলে—রতন, আমি মাস্টারমশাই, কথা শোন!

রতনের একটু হুঁশ হয় বোধহয়। সে কিন্তু ফিরেও তাকায় না দিবাকরের দিকে। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়েছিল হরকিষণ আর কাদের শেখের দিকে!

—রতন! পাগলামি করিস না—বিসর্জনের সময় রক্তারক্তি করিস না—কথা শোন।

ডাক্তারখানার দাওয়া থেকে হাঁক পাড়েন নন্দদুলাল—তুমি কেন মাঝখান থেকে মোড়লি করতে এলে দিবাকর—বোঝাপড়া ওরা করছে, তোমার কী?

দিবাকর ঘুরে দাঁড়ায়! সেখান থেকে চিৎকার ক'রে বলে—বোঝাপড়া যদি সত্যিই করতে চান রায়জ্যেঠা—তা হলে আমাদের সমতলে নেমে আসুন! ওখানে দাঁড়িয়ে বিনি পয়সার সার্কাস আপনাদের আমি দেখতে দেব না।

রতনের দিকে ফিরে বলে, অপমান আমাদের করেছিল ঐ জমিদার। আমরা তার বদলা নিয়েছি; কিন্তু তুই হতভাগা আমাদের সাবেকী মাকে রুখিস কোন আস্পর্ধায়?

কমলাপতি বুঝতে পারেন—দিবাকর অন্তর থেকে কথা বলছে না। ছেলেটা মানবচরিত্র বুঝেছে ঠিকই। রক্তপাত বন্ধ করাই তার উদ্দেশ্য; দশমীর শুভদিনে গ্রামের বারোয়ারী হাটতলায় ভাই-ভাই লাঠালাঠি ক'রে মরবে—এতবড় অঘটন সে কিছুতেই ঘটতে দেবে না। এই তার পণ। কিন্তু যুক্তিটা সে প্রয়োগ করল অন্যরকম। সে জানে ঐ দৈত্যের মতো মাতালটার এখন কোনও সামাজিক শুভেচ্ছাবোধ নেই। বিজয়ং শুভদিনে যে লাঠালাঠি করতে নেই—এই ভালোকথা এখন শুনবে না সে। আর ভয়? স্বাভাবিক অবস্থাতেই রতন গোয়ালা ভয় বস্তুটিকে চিনতে পারে না, এ মত্তাবস্থায় তো কথাই নেই। 'মরার বাড়া গাল নেই'—তা সেই মৃত্যুভয়কেও জয় করেছে ঐ ডাকাতবেটা। তবু দিবাকর জানে মৃত্যুভয় জয় করলেও এই সব নিরক্ষর হতভাগ্য গ্রাম্য মানুষগুলোর একটা ভয় আজও আছে। সেটা ওদের জন্মগত সহজবৃত্তি—অবচেতন মনের গভীর মহলে তার বনিয়াদ। মত্তাবস্থাতেও সে ভয় ঘোচে না—সেটা

ধর্মভয়! নইলে এতবড় পঞ্চাশের মন্বন্তরের মধ্যে একটা ধানের গোলাও লুট হল না কেন? জোয়ান মরদগুলো দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে কুঁকড়ে মরে গেল—ঘরবাড়ি বেচল—বউ-বেটিকে ত্যাগ করে পালালো—কিন্তু কই দল বেঁধে আব্বাসভাইয়ের ধানের গুদাম তো লুটতে এল না? ধর্মের দোহাই এদের সবচেয়ে বড় দোহাই।

রতন চোখ বড় বড় ক'রে বললে : চৌধুরী কর্তার ঠাকুর মা, আর আমাদের ঠাকুর কি মা লয়? দিদিমণি? উ কেনে আগে যাবে?

দিবাকর জোর দিয়ে বলে : না, আমাদের ঠাকুরও মা, তবে ছোট মা। ঐ মায়েরই ছোট বোন তো? ও কত আগে এসেছে গাঁয়ে—আর আমাদের ছোট মা তো এই বছর প্রথম এলো গাঁয়ে—না কি বল তোরা?

রতন যেন একটু ভাবনায় পড়েছে। পচাইয়ের নেশা ভেদ ক'রে যুক্তিটা ঠিক মগজে প্রবেশ করছে না যেন। প্রহ্লাদ বায়েন কিন্তু বুঝে ফেলেছে কথাটা, ঝাঁকড়া চুলগুলো নেড়ে বলে, ঠিক কথা !

কর্মকার বলে, লেজ্য কথা !

দিবাকর সাহস পায়। ওদের সমর্থনটাকেই কুড়িয়ে নিয়ে বলে—ঠিক কথা নয়? ন্যায্য কথা নয়? আচ্ছা তুইই বল না রতনা! তুই তো শুনি লাঠি হাতে ধরলে কারও কাছে মাথা নোয়াস না, কেমন? কিন্তু আজ যদি স্বর্গ থেকে তোর খুড়ো ভীমা ঘোষ এখানে এসে দাঁড়ায়—তবে লাঠি রেখে তাকে পেন্নাম করবি না?

একগাল হাসে রতন—এই দ্যাখ। ইটা কি বল্লে গো মাস্টের! তা আর করবনি?

—তবে? আমাদের সাবেকী বড়মাকে দেখে ছোট বোন আগে পথ দেবে না? তুই বলিস কী রে?

এবার জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় ব্যাপারটা। শুধু রতনের কাছে নয়—সবকটা মাতালের কাছেই। প্রহ্লাদ ঢাকটা তুলে নেয় আবার। কাঠি পড়ে ঢাকে—ঢ্যাম্ কুড়াকুড় কুড়! কাঁসিটাও ও পাশ থেকে বেজে ওঠে—ঠ্যাঙা ঠ্যাঙ, ঠ্যাঙ!

রতন বলে—সি কথা আগে বুললেই হ'ত। যান গো বড়মা, আগে বাড়ায়ে যান। লে, লে, পথ দে তোরা। ভিড় করি আছিস কেনে মাতালবেটারা?

অনিবার্য রক্তপাতটা বন্ধ হল।

ডাক্তার বলে, লেগেছে নাকি পণ্ডিত?

—লাগবে না! বেটা মহিষাসুর ! হাতে ধরতে গেলাম তো খোলামকুচির মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল।

* * *

সে দৃশ্যটা আজও ভুলতে পারেননি কমলাপতি। সেটা ভোলবার নয়। সেদিন গ্রামের ইতর-ভদ্র সমস্ত লোক উপস্থিত ছিল হাটতলায়। গ্রামকে আসন্ন রক্তপাত থেকে রক্ষা করতে যে এসে নেতৃত্ব দিল সে আর কেউ নয়—সেদিনের ছোকরা, ঐ একফোঁটা দিবাকর পণ্ডিত। নন্দদুলাল যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন অপমানে, কমলাপতি কিন্তু অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিলেন দিবাকরের অভূতপূর্ব সাফল্যে। রক্তপাতটা বন্ধ

করবার জন্যে তিনিও উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন—কিন্তু কীভাবে সেটা কার্যকরী করা যায় তা বুঝে উঠতে পারেননি।

সে যাই হোক, কমলাপতি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলেন মানুষগুলো তাঁকে আর সেই আগেকার মর্যাদা দিচ্ছে না। ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে, শাসন দণ্ডের আঘাতে তিনি রুখতে চেয়েছিলেন এই অবহেলার প্লাবনকে। পারেননি। জোর-ক'রে কাটা বাঁশে সাঙের কাজ হয়নি—পড়ে আছে সেটা কাছারি-বাড়িতেই। কাছারি-বাড়ির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড অবয়ব বিস্তার ক'রে পড়ে আছে রতন গোয়ালার ঝাড়ের সব চেয়ে বড় বাঁশ। অত মোটা ও ঋজু বাঁশ ক্বচিৎ নজরে পড়ে। সেটাকে দেখলেই দুটি উপমা মনে পড়ে কমলাপতির। ছাত্র বয়সে প্যারাডাইস লস্ট পড়েছিলেন —মনে হয় বাঁশগাছটা যেন বি-এল-জিবাব! ক্লান্ত দেহ মেলে পড়ে আছে সেটা শেষ প্রণামের ভঙ্গিতে। আর মনে পড়ে নিজেকে। দর্পণের মত ঐ বাঁশের ভিতর দেখতে পান নিজের প্রতিবিম্ব। আপাতদৃষ্টিতে বাঁশগাছটায় কোন খুঁত নেই—নিখুঁত নিটোল দৃঢ় আকৃতি তার। কিন্তু কমলাপতি জানেন রাত্রির অন্ধকারে কে এসে গোপনে ওর বুকে হেনেছে কঠিন আঘাত। প্রতিমা বহনের কাজে আর তাকে ব্যবহার করা যাবে না। বাহ্যাড়ম্বর যতই থাক ওর, অন্তরের নিভৃতে আছে গোপন আঘাতের ক্ষত! তাঁর মতো।

অপমান করেছিলেন নন্দদুলাল আর জগবন্ধুকে। দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তাদের, সেখানেও ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

কিন্তু সেই সম্মানের আসনটি তাঁকে ফিরে পেতেই হবে। সমস্ত জীবন একচ্ছত্র সম্রাট সেজে তিনি রাজত্ব করে গেলেন কমলপুরের সিংহাসনে—শেষের এ'কটা দিন কেউ তাঁকে হটাতে পারবে না সেখান থেকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যারাই করতে এসেছে সংসারের দাবার ছকে তাদেরই নির্মূল করেছেন এতদিন। এমনি ভাবে কাটতে কাটতে উঁচু মাথা আর অবশিষ্ট রাখেননি হাতের কাছে-পিঠে। আর আজ খেলার শেষাশেষি তিনি লক্ষ্য করছেন খুদে খুদে ব'ড়েগুলো এগিয়ে চলেছে পিঁপড়ের সারের মত। ক্ষুদ্র ব'ড়ে বলে যাদের কোন মূল্যই দেননি এতদিন—উপেক্ষা করেছেন অবজ্ঞাভরে—আজ খেলার শেষপ্রহরে কয়েকঘর এগিয়ে গিয়ে গজ-নৌকা-দাবা হ'য়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তারা তাঁর চারদিকে। কোন দিকে পা ফেলার আর পথ রাখেনি। কিন্তু মাৎ তিনি হবেন না—জীবনের শেষ লগ্নে যাবার আগে প্রমাণ রেখে যাবেন কমলাপতি, তাঁর আভিজাত্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব! প্রয়োজন হলে সমস্ত সম্পত্তিটা দান করে যাবেন জনহিতার্থে!

কিন্তু তাঁর সে সাধ বুঝি পূর্ণ হল না। তার আগেই এল কঠিন পক্ষাঘাতের দ্বিতীয় আক্রমণ। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

★ ★ ★

দিবাকর, হরিহর আর ডাক্তার যখন এসে পৌঁছালো তখনও কমলাপতির জ্ঞান ফেরেনি। খাস কামরার খাটে শুয়ে আছেন তিনি। ঘরে তিল ধারণের স্থান নেই। এমনকি বারান্দাটায় পর্যন্ত লোকের ভিড়। এ রকম একটা খবর রটতে দেরি হয় না। শুধু জমিদারবাড়িই নয়—সারা গ্রামের শুভার্থীরা এসে জুটেছেন। দুর্ঘটনাটায় সকলে কতদূর

বিচলিত হয়ে পড়েছেন বোঝা যায় ভিড়টা লক্ষ্য করলে। কমলাপতির খাস কামরায় যাঁরা ইতিপূর্বে জীবনে একবারও আসেননি, এত্তেলা দিয়ে যাঁদের অপেক্ষা করতে হত বাইরের মহলে, তারা অম্লানবদনে উঠে এসেছেন দ্বিতলে। কেউ বাধা দেয়নি, আশ্চর্য!

জগবন্ধু ঘুরে ঢুকেই ধমকের সুরে বলে—একি ! এত লোক কেন রুগীর ঘরে? ওঁকে কি নিঃশ্বাস নেবার বাতাসটুকুও দেবেন না আপনারা? যান, আপনারা বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন—উনি কেমন আছেন এখুনি খবর পাবেন।

অনেকেই ভিড়টা পাতলা করে দিয়ে বেরিয়ে আসে। নন্দদুলাল সায় দেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতো লোক এখানে ভিড় করার কী প্রয়োজন?

তিনি চেপে বসেছিলেন একখানা চেয়ারে। ডাক্তার বলে, আপনিও বাইরে গিয়ে বসুন রায়জ্যেঠা,—একটু দেখুন এঁদের। আমি ততক্ষণ রুগীকে দেখি।

দিবাকর অবশ্য ঘরে প্রবেশ করেনি। বারান্দায় দাঁড়িয়েই লক্ষ্য করছিল ঘটনাটা। রায়মশায় আর প্রতিবাদ করেন না। এবার ভিড়টা একেবারে পাতলা হয়ে যায়।

ডাক্তার রায়-মশায়ের পরিত্যক্ত চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে। রুগীকে পরীক্ষা করে। নাড়ী দেখে, নানাবিধ প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্য চালায়। শেষে দয়াময়ীকে প্রশ্ন করে—এর আগে কখনও এমন হয়েছিল?

—হ্যাঁ, বছর আষ্টেক আগে, যশোরে।

—তার আগে কখনও?

—না।

—এটা তাহ'লে দ্বিতীয় আক্রমণ?

দয়াময়ী ঘাড় নেড়ে সায় দেন। ডাক্তার দিবাকরকে বলে—আলোটা তুলে ধরত পণ্ডিত।

দিবাকর লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে। ডাক্তার তার ব্যাগ খুলে কিছু ওষুধ বার ক'রে। জোর করে খাইয়ে দেওয়া হয় ওষুধ। অর্ধেকের বেশিই পড়ে যায় কষ বেয়ে। ডাক্তার উঠে পড়ে, বলে, আমাকে একবার ডাক্তারখানায় যেতে হবে। ইন্‌জেকসন দেওয়া দরকার।

ডাক্তার দেখে দয়াময়ী-জাহ্নবীর একটু ভরসা এসেছিল। হঠাৎ চলে যাবে শুনে একটু অস্থির হয়ে পড়েন। ডাক্তারকে যে কমলাপতি অপমান করেছিলেন এটা তাঁরাও জানতেন। উমা গাঙ্গুলিমশায়ের দিকে ফিরে ফিরে বলে, অন্য কেউ গেলে হত না? উনি যদি ওষুধের নামটা লিখে দিতেন তো নিয়ে আসতো।

হরিহর তৎক্ষণাৎ বলেন, সেই ভালো। এ সময় রুগীকে ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

জগবন্ধু ধমক দেয়—পাগলামি করবেন না। রুগীকে কোন সময় ছেড়ে যাওয়া উচিত তা ডাক্তারকেই স্থির করতে দিন। আমার ডাক্তারখানায় কি পাঁচটা কম্পাউন্ডার বসে আছে যে লিখে দিলে ওষুধ পাঠিয়ে দেবে?

আর কেউ কিছু বলে না। ডাক্তার বেরিয়ে যায়। মিনিট পনের পরে ফিরে আসে। নূতন ঔষধ প্রয়োগ করে।

ঘণ্টাখানেক পরে কমলাপতি চোখ মেলে তাকান।

ডাক্তার প্রশ্ন করে : কষ্ট হচ্ছে?

কমলাপতি না-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়েন।

আশ্বস্ত হয় ডাক্তার। মস্তিষ্ক আহত হয়নি তাহলে।

—আমাকে চিনতে পারেন?

কমলাপতি ম্লান হাসেন—অস্ফুটে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন—ডাক্তার!

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে জগবন্ধুর। শুধু ব্রেন নয়, বাকযন্ত্রও অনাহত আছে। প্রশ্ন করে, কষ্ট হচ্ছে? আবার না-এর ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন।

জগবন্ধু উঠে পড়ে। ভয়াবহ কিছু নয় তা হলে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবেন উনি। সেই কথাই বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় চমকে ওঠে সে। কমলাপতির পায়ের দিকে পালঙ্কের উপরেই যে লণ্ঠনটা রাখা আছে তার চিমনির গায়ে তাঁর বাঁ পায়ের একটা আঙুল স্পর্শ করে আছে। আবার বসে পড়ে ডাক্তার। বাঁ হাঁটুর কাছে একটা চিমটি কেটে বলে : লাগে?

মনে হল কমলাপতি বিরক্ত হয়েছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ওঁর। না-এর ভঙ্গিতে আবার ঘাড় নাড়েন। উরুর কাছে চিমটি কাটে ডাক্তার—কোন সাড়া নেই। বাম অঙ্গ পড়ে গেছে ওঁর—পক্ষাঘাতগ্রস্ত। রোগী নিজেই তা জানে না। শুধু রোগী নয়, ঘরের আর কেউ তা জানে না এখনও। সংবাদটা প্রকাশ করতে ইতস্তত করছিল জগবন্ধু। ঠিক সেই সময়ে নিচে একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ পাওয়া গেল। অল্প পরেই ঘরে এসে ঢোকে শ্রীপতি, শহরের একজন ডাক্তারকে নিয়ে। শ্রীপতি এই ট্রেনেই আসছিল—স্টেশনে নেমে খবর পায়—গাড়ি শহরে গিয়েছিল সিবিল-সার্জেনকে আনতে। ডাক্তারসাহেবকে অবশ্য পাওয়া যায়নি—শ্রীপতির পরিচিত বন্ধুস্থানীয় একজন বড় ডাক্তারকে নিয়ে গাড়ি করেই ফিরে এসেছে ওরা। শ্রীপতির পিছন পিছন নন্দদুলাল, ননীমাধব প্রভৃতি ফিরে আসেন। পিতা-পুত্রের মিলন দৃশ্যটা থেকে বঞ্চিত হতে চান না বোধ হয়। কমলাপতি চোখ বুজে পড়ে থাকেন। শ্রীপতি উপস্থিত কাউকেই কিছু সম্বোধন করে না—সকলের উপর একবার দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সোজা এসে বসে বাপের পালঙ্কে। আগন্তুক ডাক্তারকে দেখিয়ে যে ভঙ্গি করে তার অর্থ—ইনিই রুগী।

নবাগত ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করেন জগবন্ধু ডাক্তারি ব্যাগটা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রোগীর পাশে। তাই তিনি শ্রীপতিকেই প্রশ্নটা করেন—আর উনি?

মুখ না তুলেই শ্রীপতি জবাব দেয়, গাঁয়ের ডাক্তার।

—গাঁইয়া ডাক্তার বলুন। —শুধরে দেয় জগবন্ধু; সরে দাঁড়ায় সে। পথ করে দেয় নবাগত ডাক্তারবাবুর। তিনি কিন্তু এগিয়ে আসেন না, জগবন্ধুকেই প্রশ্ন করেন—কী রকম বুঝলেন?

জগবন্ধুকে জবাব দিতে হয় না। তার আগেই শ্রীপতি অস্থির ভাবে বলে ওঠে—প্লিজ্ ডক্টর সেন, যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে—আপনি নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। বাজে গল্প পরেও করা যাবে।

হঠাৎ এই রূঢ় কণ্ঠস্বরে আহত হলেন শহরের ডাক্তার সেন। বিনা বাক্যব্যয়ে রোগীর কাছে এগিয়ে যান উনি। জগবন্ধু হরিহরের দিকে ফিরে বলে এবার তাহলে

গাঁইয়া ডাক্তারের এক্স্হন্ট?—নাটুকে জগবন্ধু একেবারে শেক্সপিরিয়ান নাটকের ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছে! দিবাকর বুঝলো ওর মর্মবেদনা।

গাঙ্গুলি মাথাটা আর তুলতে পারে না। নন্দগোপাল এ সুযোগটা হাতছাড়া করেন না, কিছু আগে তাঁকে এক রকম ঘর থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিল ছোকরা; বলেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক কষ্ট করেছ তুমি জগবন্ধু! উনি আসা পর্যন্ত যে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছ এই যথেষ্ট!

জগবন্ধু হাত-ব্যাগটা তুলে নেয়। দ্বারের দিকে চলতে থাকে। হঠাৎ ডাক্তার সেন বাধা দেন মাঝপথে, ওঁদের প্রয়োজন না থাকলেও আমার প্রয়োজন আছে আপনাকে ডক্টর—

—চৌধুরী।—পাদপূরণ করে জগবন্ধু। অপেক্ষা করে সে।

ডাক্তার সেন রোগীকে পরীক্ষা করে বলেন—হার্টের কন্ডিশন ভালো। ভয় নেই। প্রেশারটা দেখেছিলেন আপনি?

জগবন্ধু অম্লানবদনে বলে, ব্লাড-প্রেশার পরীক্ষা করার যন্ত্র আমার কাছে নেই!

—আই সি। সে যাক, আপনি আসার আগে বা পরে ওঁর জ্ঞান হয়েছিল?

নির্বিকারভাবে জগবন্ধু বলে—জ্ঞান ওঁর এখনও আছে। চোখ বুজে শুয়ে আছেন মাত্র। আপনারা আসার সঙ্গে সঙ্গে উনি চোখ বন্ধ করেছেন। আর ভয় নেই বটে—তবে ওঁর বাম অঙ্গ পড়ে গেছে। বাঁ হাত এবং বাঁ পা। এর বেশি আর আমি কিছু বুঝতে পারিনি ডক্টর সেন। আশা করি এ কথার পর আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। কিন্তু মাপ করবেন ডক্টর সেন, আমি গ্রাম্য ডাক্তার, এঁরা রাজকীয় চিকিৎসা করতে চান। এখানে আমার উপস্থিতিটা এঁরা ঠিক পছন্দ করছেন না। আমার সঙ্গে এঁদের পরিবারের সম্পর্কটাও খুব মধুর নয়! মুমূর্ষু রোগীর প্রশ্ন না থাকলে আমি এখানে আসতামও না। আমি চলি, নমস্কার!—আর ও হ্যাঁ, একটা কথা—এটা ওঁর সেকেন্ড অ্যাটাক্। তা কেস হিস্ট্রিটা আপনি নিজেই শুনে নেবেন।

কোনদিকে না তাকিয়ে মাথা সোজা রেখে বেরিয়ে আসে জগবন্ধু। দিবাকরও চলে আসে সেই সঙ্গে। সিঁড়ির মুখে একটু জনান্তিকে হরিহর ছুটে এসে হাত দুটি চেপে ধরেন জগবন্ধুর, আমায় মাপ করবেন ডাক্তারবাবু। সমস্ত দায়িত্বটা আমার।

ডাক্তার নির্বিকারভাবে বলে—করলাম। দায়িত্বটা আপনারই বটে, কিছুটা দিবাকরেরও।

—আর এইটা—

খানকয় নোট তিনি গুঁজে দেন জগবন্ধুর পকেটে। ডাক্তার দৃঢ়মুষ্টিতে হাতখানা চেপে ধরে—ওইটে পারব না। এতকাণ্ডের পর..

—না হ'লে অত্যন্ত দুঃখ পাব আমি...

—সেটা হবে আপনার প্রায়শ্চিত্ত—

—কিন্তু রুগী দেখতে এলে ভিজিটটা তো চিকিৎসকের প্রাপ্যই ডাক্তারবাবু—

—চিকিৎসকের তো অনেক কিছুই প্রাপ্য গাঙ্গুলিমশাই। মিষ্টি কথা, ভদ্র ব্যবহার—সেগুলো না পেয়েও যখন চলেছে তখন এ প্রাপ্যটাও না হয় নাই নিলাম।

হঠাৎ জগবন্ধুর নজরে পড়ে সিঁড়ির নিচে উমা দাঁড়িয়ে আধা-অন্ধকারে। সংযত হয়

ডাক্তার। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হঠাৎ থেমে পড়ে। হাত দুটি তুলে নমস্কার ক'রে বলে, মাপ করবেন, আপনাকে দেখতে পাইনি,—পেলে এ অপ্রিয় সত্যটা এ ভাবে বলতাম না।

উমা বলে, আপনি কি ডাকলেও আর আসবেন না ডাক্তারবাবু?

—আমাকে আর প্রয়োজন হবে না।

—হবে। দাদার প্রয়োজন না হতে পারে, আমাদের হবে।

—হলেও আমার পক্ষে আর আসা সম্ভব হবে না।

উমা একটু ইতস্তত করে। কী-যেন একটা কথা বলিবলি করেও বলতে পারে না। কথাটা অত্যন্ত গোপন। কমলাপতির সঙ্গে শ্রীপতির মনোমালিন্যের কথা। কমলাপতি একমাত্র পুত্রকে হয়তো সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চান—কলকাতা থেকে সলিসিটারকে আসতে 'তার' করেছেন। উইল এখনও পালটানো হয়নি। এক্ষেত্রে শ্রীপতি এবং তার বন্ধু ডাক্তারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছে না উমা। সে জানে না, দয়াময়ী অথবা জাহ্নবী এটা বুঝতে পারছেন কি না। এতকথা বলা যায় না। ডাক্তারকে ছেড়ে এবার সে দিবাকরকেই বলে—আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন ওঁকে, মাস্টারমশাই।

দিবাকর আর সহ্য করতে পারে না। সেদিনের কথাটা তার মনে পড়ে যায়। সেই মন্দির চত্বরের আধো-অন্ধকারে উমা যে অপমানকর কথাগুলি বলেছিল তাকে। কঠিন স্বরে দিবাকর বলে, বুঝিয়ে বলার তো কিছু নেই উমা দেবী। আপনারা বড়লোক, কখনও খেয়াল হলে কাউকে শ্রদ্ধা করেন, সম্মান দেখান, আবার খেয়াল না হলে তাকে টেনে নামিয়ে ফেলেন ধুলোতে। আমরা সাধারণ মানুষ—ও জমিদারী ক্রীড়াপদ্ধতিটা আমরা সব সময়ে বরদাস্ত করতে পারি না। আমাদের দূরে দূরে থাকাটাই তো ভালো। এস ডাক্তার।

ওরা দুজনে অন্ধকারের ভিতর বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির শেষ সোপানে ম্লান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উমা।

★ ★ ★

হাট বসে প্রতি মঙ্গলবার। ভোর রাত থেকে আসতে থাকে গরুর গাড়ির সারি। সূর্যোদয়ের পর থেকেই হাট লাগে। শূন্য জায়গাটা মৌমাছির চাকে পরিণত হয়। পাঁচগাঁয়ের লোক এসে জড়ো হয়—ঠেশাঠেশি, ঠেলাঠেলি—কতক্ষণই বা? বেলা দশটার মধ্যেই সব আবার ভোঁ ভোঁ। তখন আবার সার দিয়ে চলে গরুর গাড়িগুলো, মধ্যমগ্রাম পার হয়ে সেই কুমিরমারির হাটে। ওখানে হাট বসে ঐ একই বারে, বৈকালে। মাঝে ওরা কোথাও থামে। দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেয়। বছরের এ সময়টা হাটে জোর খুব। নানা রকম তরিতরকারি শাক-সবজিতে হাট ভর্তি হয়ে থাকে। শীতের ফসল, কপি, টমাটো, পালং, কড়াইশুটি, শাঁকালু। হাটে খুচরা বিক্রি আর কতটুকু হয়? যা কেনা-বেচা হয় তার বিক্রেতা যতজনই হ'ক ক্রেতা মাত্র দুজন। পিয়ারিলাল আর ইদরিস্। ওরা পাইকার। ওদের লরি দাঁড়িয়ে থাকে পিচমোড়া বড় সড়কের উপর। শীতকালে ধুলো উড়িয়ে আসে ভাঙা সাঁকোর ধার পর্যন্ত। হাটতলা

পর্যন্ত আসে না। সাঁকোর পাশ কাটিয়ে চষাভুঁইয়ের উপর দিয়ে যে পথটা আছে—সেটার উপর বোঝাই মাল নিয়ে লরি ফিরে যেতে পারে না। চৌধুরীবাড়ির জিপ ছাড়া বস্তুত অন্য কোনও হাওয়া গাড়িই আসে না গ্রামে। বর্ষাকালে সাঁকো পর্যন্তও লরি আসে না। তখন বিক্রেতাকেই গো-গাড়ি বোঝাই দিয়ে যেতে হয় বাঁধা সড়ক পর্যন্ত। সার দিয়ে যখন গো-গাড়ি চলতে থাকে তখন দিগন্ত পর্যন্ত ধুলায়-ধূসর হয়ে ওঠে। পথের দু'ধারে কালকাশুন্দি, বনতুলসী আর আশ-শাওড়ার গাছের পাতাগুলো ধূসর হয়ে যায়। কে বলবে ওদের পাতা সবুজ ছিল কোনকালে। পাতার উপর ধুলার একটা পলেস্তারা পড়ে যায় যেন।

হাটের কেনাবেচা শেষ হয়ে এসেছে। যে যার মালপত্র গুছাচ্ছে। বাঁকে মাল তুলে কুব্জপৃষ্ঠ ব্যাপারী জংশনের দিকে রওনা দিচ্ছে নদীর বাঁধ ধরে। গো-গাড়িগুলির বাঁধে ওঠার অধিকার নেই—তারা চলে সড়ক ধরে, চষাভুঁয়ের মাঝখান দিয়ে নাচতে নাচতে, সাঁকোটা পার হয়ে আবার ধরে ধুলোয় ভর্তি বাঁধা সড়ক। গরুর গাড়ি ছাড়া আর একটি যান আসে হাটে—সেটা দ্বিচক্রযান—সাইকেল। পাল্কির রেওয়াজ গেছে। নন্দদুলালের বাড়িতে আছে পাল্কি, আছে চৌধুরীবাড়িতেও। কিন্তু পাল্কি চড়ে আজকাল আর কেউ যাতায়াত করে না। পাল্কি অকেজো হয়ে পড়ে আছে! মেরামত অবশ্য করিয়ে নেওয়া যায়—কিন্তু পাল্কি বইবে কে? বেহারা নেই। গ্রাম থেকে অনভ্যস্ত মজুর সংগ্রহ করেও হয়তো কাজ চালানো যেত—কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা চড়বে কে? উমা, দয়াময়ী, জাহ্নবী কেউই পাল্কিতে উঠবেন না। তাঁরা জিপে চড়েন। বিশ্বযুদ্ধ এই একটি অবদান রেখে গেছে গ্রামে। নন্দদুলালের বাড়ির মেয়েরাও পাল্কিতে চড়বে না। তারা চড়ে টাপর-দেওয়া গো-গাড়ি।

পাল্কির প্রস্থানের প্রায় সমসময়েই এসেছে সাইকেল। পয়সা হলে গ্রামের লোক দুটি জিনিসের সন্ধান করে। অল্প পয়সা হলে টর্চবাতি, আর বেশি হলে সাইকেল। বিজ্ঞান কী না করতে পারে? আঁধার ঘুটঘুটে অমাবস্যার রাত—তুমি পথে বের হবে? যাও। ঝড়, জল? তাতে কী? কেরোসিন নাই, পলতে নাই, জলে চিমনি ফেটে যাবে না—চক্‌চকে ওইটুকুন যন্তর। বোতাম টেপ—বাস, দিন দীপ্যমান! কী রোশনাই। এর নাম টর্চ!

আর সাইকেল! বিজ্ঞানের আর এক অবদান।

পিয়ারিলাল আর ইদ্‌রিস আসে সাইকেল চেপে। দরদস্তুর করে মাল খরিদ করে ফিরে যায় বড় সড়কে। সার দিয়ে তাদের অনুগমন করে গো-গাড়ি। লরিতে লোড করে মাল—নগদ টাকা নিয়ে কোঁচার খুঁটে বাঁধে।

ছিনিবাসের মেজাজটা ভালো নেই। বেচারির তেলেভাজা আজ একেবারে বিক্রি হয়নি। এ মঙ্গলবারের হাট নিয়ে পর পর তিন হপ্তা লোকসান দিচ্ছে সে। অনেক তেলেভাজা বেগুনি, ফুলুরি স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে কাঠের বারকোশে। আসছে হাটে সাবধান হতে হবে তাকে। না হলে লোকসানটা বড় কম হবে না। এগুলোকেও কোনক্রমে ফিরি করে বেচে দিতে পারলে হত। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে—কোথায় বিক্রিটা বাড়বে—তা নয় অস্বাভাবিকরকমভাবে কমে গেছে। কমবে না? ঐ গিধ্‌ধর শালা!

গিধ্‌ধর নয়—গিরিধারীলাল ! ছিনিবাস বলে গিধ্‌ধর। বলার সঙ্গত কারণ আছে।

হাটুরে হাট করতে আসে—অর্থের বিনিময়ে এক হপ্তার জন্যে সওদা ক'রে নিয়ে যায় সংসারের নানান প্রয়োজনীয় জিনিস। অর্থ এদের অল্প—তাই প্রত্যেকটি দ্রব্য ক্রয় করার আগে দরটা যাচাই করে পাঁচ দোকানির কাছে। প্রত্যেকটি তামার চাকতি টিপে টিপে গোনে। যে বেচে সেও সিকি দোয়ানিগুলো বারে বারে পরীক্ষা করে নেয়। হাতে তালুতে ঘষে, দু'আঙুলে বাজিয়ে নেয়। মেকিতেই যে ছেয়ে গেছে বাজার। তা সত্ত্বেও সপ্তাহের এই একটা দিনের জন্য একটু বেহিসাবী হতে চায় মানুষ, একটু অমিতব্যয়ী হবার সখ জাগে। খেয়ালখুশিতে খরচ করতে চায় দু-চার পয়সা। মানুষের এই খুশিয়ালী মনের সন্ধান রাখে ছিনিবাস—এটাই তার মূলধন। ঐ অমিতব্যয়িতার সুযোগে গরম গরম তেলেভাজার লোভ দেখিয়ে ছিনিবাস জাঁকিয়ে বসতে চায় হাটে। প্রথমটা হয়েছিলও তাই—কিন্তু আজ পর পর কয়েক হাটে আসছে গিরিধারীলাল। বসছে হাটের একান্তে তার জুয়ার ছকখানা পেতে।

—এই চললো! বাজির খেল—আইয়ে মিয়া ভাই, পাকড়িয়ে লালবিবিরে। অ্যাই অ্যাই অ্যাই অ্যাই—বল কুন্‌টা তোমার বিবি আছে?

হাতের কায়দায় তিনখানা তাস উপুড় করে রাখে গিরধারী।

—ঐ মদ্দিরখান! —একটা সিকি টিপে ধরে তার উপর মিএগভাই।

হেসে গড়িয়ে পড়ে গিরধারী : পয়সাভি ভাগলো, বিবিভি ভাগলো।

চিৎ করে দেখিয়ে দেয় সে তাসখানা। চিড়িতনের নওলা।

রোখ চেপে যায় ওদের। ঘনিয়ে বসে জুয়াড়ির চারদিকে। ঘরের লক্ষ্মী যেন সত্যি ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে গিরিধারী তার হাত সাফাইতে। এবার নিশ্চিত ধরেছে! ডানদিকের ঐখানা। দোয়ানি-সিকি-মায় গোটা টাকাও পড়ে উপুড় করা তাসখানার উপর। চিৎ করলে সেটা দেখা যাবে ইস্কাবনের তিরি।

হাটের শেষে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মিএগভাই যখন বাড়ি ফেরে তখন পকেট ভারী করে উঠে পড়ে গিরিধারী। সকলের লক্ষ্মীকেই পকেটজাত করেছে সে। এই গিরিধারীলালই সর্বনাশ করেছে ছিনিবাসের—অন্তত তার সেই রকম বিশ্বাস। বাড়তি পয়সার বিনিময়ে নিশ্চিত তেলেভাজা প্রাপ্তির চেয়ে লক্ষ্মীকে জয় করাই শ্রেয়—এই হল মূর্খ গ্রামবাসীর বিশ্বাস। তাই গিরিধারীলাল যখন বাজার লুট করে ফেরে, ছিনিবাস তখন হাত দিয়ে মাছি তাড়ায়।

রতন এসে এসে ছিনিবাসের দোকানের সামনে চেরা বাঁশের বেঞ্চিটাতে বলে,—এক্কাপ চা দে ছিনে।

রতন প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় চা খায় না। হাটবারে খায়। ওর বাপ পিতামহ কখনও চা খায়নি—কিন্তু রতন শীতকালে মাঝে মাঝে চা খায়। শুধু রতন কেন, গাঁয়ের অনেকেই আজকাল চা ধরছে।

—তেলেভাজাও দিব নাকি একানার?

—নাঃ শুদ্ধ চা।

—ভালো ফুলুরি ছিল কিন্তুক, এক্কেরে গরম।

গর্জে ওঠে রতন, ম্যালা বকিসনি ছিনিবাস, টাক মারি খ্যালায়ে খুব সখা

ছিনিবাস বোঝে রতন ঘোষের মেজাজ ভালো নয়। শ্রীনিবাসের সেটুকু বোধশক্তি আছে। তবু বিনীতভাবে বলে : রাগ করছ ঘোষকাকা, কিন্তুক কী করি কও—সকাল থিকে শালা ছআনার বিক্রি হয়েলো। ঐ গিদ্ধর শালা ! অশ্লীল একটা বিশেষণ যোগ করে বলে—ঐ নিয়ে যাচ্ছে হাটুরের সবকটা পয়সা লুট করি। পার'তো ওর ঐ ছক-ডাইস আর তাসের বান্ডিলটা টান মারি ফেলি দাও না কাকা। মানুষগুলানের হাড় জুড়াক।

হাসে রতন। সে ভাবে—কী ছেলেমানুষ ছিনিবাসটা! সে ভাবে বুঝি হাট লুট করে নিয়ে যাচ্ছে ঐ মেড়ো ভূতটা। ক পয়সা পায় লোকটা? কী আর লুটছে সে? হাটের যে আসল লুটেরা সে ঐ পুঁটিমাছ গিরধারীলাল নয়। দেশের যারা আসল সর্বনাশ করছে তারা ঐ পাইকার! ঐ ইদ্‌রিস আর পিয়ারিলাল! ওরাই ষড়যন্ত্র করে চাষীর মাথায় পা দিয়ে তার ভরাডুবির ব্যবস্থা করছে! জংশনের বাজারে আলুর দর গেছে বাইশ। গত হাটে কুমিরমারিতেও দর ছিল সাড়ে একুশ, খবর রাখে রতন। এখন আলুর দর বাড়তির মুখে না হলেও পড়তি নয়। অথচ ইদরিস আর পিয়ারিলাল দরটা কমিয়ে ফেলেছে চোদ্দয়। এর বেশি দর তারা দেবে না। এর বেশিতে তাদের পোষায় না নাকি। আশ্চর্য ধূর্ত এই দুটি পাইকার। হাটে এসে বসে দুজন দু মুখো—যেন মুখ দেখাদেখি নেই। যেন পরস্পরের কতবড় শত্রু ওরা। দরাদরি ক'রে দাম চড়াতে থাকে—নিলামের মতো। মূর্খ কৃষাণ—যার পক্ষে বাইরের বাজার-দর জানা সম্ভব নয়—সে মনে মনে হাসতে থাকে। ভাবে বুঝি মস্ত দাঁও মারছে তারা। কিন্তু পাইকার দুজন এত নিচু থেকে হাঁকাহাঁকি শুরু করে যে নিলামের অভিনয় যখন শেষ হয়, শেষ দাম তারা যখন দেয় তখনও ন্যায্য মূল্যের বহু নিম্নে থাকে দরটা। ইদরিস বলে, চোদ্দর বেশি দর দিলি সে আলু হবে আমার হারাম!

পিয়ারিলাল ঠারে ঠারে হাসতে থাকে। তব লে যাও তোম ! ও দরে হামার পোষাবে না মিঞাসাব। লুকসান তোরও যাবে, আহাম্মককা মাফিক তুই দরটা বাড়িয়ে দিয়েছিস।

ইদরিস দুই হাতে মাথার ভারটা রক্ষা করে নিম্নমুখে বসে থাকে খানিকক্ষণ। হতাশার অভিনয় করে। যেন কত বড় সর্বনাশ হতে বসেছে তার। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলে, লেকিন জবান যখন দিয়েছি তখন চৌদ্দর দরেই লিব হামি। কই হে, কে কে মাল ছাড়বে?

লোকগুলি সত্যিই মূর্খ অথবা নিরুপায় তা বোঝা যায় না। মাল ছেড়ে দেয় ওরা। গো-গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায় সড়কের দিকে। ইদরিসের লরিতে আলু তুলে দিলে তবে দাম পাবে তারা। রতন কিন্তু বেচে না, বলে—ইদরিস ভাই, জবান দিয়ে ফেলিছ বলেই বুঝি এ লুকসান দিচ্ছ তুমি? কিন্তুক গত হাটে কী দর গিইছিল কুমিরমারিতে? জংশনেই বা কী দর যাতিছে? তোমরা কী দরে বেচ?

শাণিত দৃষ্টি মেলে ইদরিস তাকায়। তার সমস্ত অভিনয়টা বুঝি ব্যর্থ হতে বসেছে। তবু রত্নাকর ঘোষকে সমীহ ক'রে চলে সবাই। ইদরিস পাইকারও বলে, তুমি কী বুঝবা ঘোষ! দর আরও পড়ে গেইছে, আরও নামবে, বিশ্বাস না হয় এ হাটে বেচ না তুমি, ফিনহপ্তা আরও কমে তেরয় আমাকেই বেচতে হবে।

অতি দুঃখে রতন হাসে। তার বক্তব্যটা প্রাঞ্জল : এ হাটে তো বেচবই নি আমি, ফিন হপ্তাতেও বেচবনি তোমারে। জংশনের দর জানা আছে আমার। সেখানে গিয়েই বেচব আমি। ভালো দর না পাই ফিরে আসি জমিতে পুঁতে ফেলাব। আলুপচা ভালো সার!

—তোমার মর্জি!—বলে ইদরিস। পিয়ারিলালের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় তার!

এই ইদরিস আর পিয়ারিলাল! রতন তাই হাসে ছিনিবাসের ছেলেমানুষী দেখে। ও হতভাগা কী বুঝবে? লুটেরাদের খবর রাখে ছিনিবাস !

আশ্চর্যের কথা ! দিবাকরও ঐ কথাগুলোই বলেছিল একদিন রতনকে। তার মতে নাকি আসল লুঠেরা ঐ ইদরিস আর পিয়ারিলাল নয়—অন্য কারা যেন। কথাটা ঠিক বোঝেনি রতন। সে যাইহোক, গরম চায়ের ছোট কাচের গ্লাসটা বাড়িয়ে দেয় ছিনিবাস। কোঁচার খুঁট দিয়ে সেটাকে বাগিয়ে ধরে ঘোষ। ধীরে ধীরে চুমুক দেয়। ছিনিবাস ভাবে পুলিশে খবর দেওয়া যায় না? জুয়াখেলা তো শুনেছে বেআইনি! তবে কেন খবর দিলে পুলিশে ধরবে না গিদ্ধরটাকে? আর রতন ভাবে ইদরিসের গুদামে যদি ডাকাত পড়ে? জংশনের বাজারে লেনদেন মিটিয়ে যখন সে কাঁচা টাকা দিয়ে ঘরে ফেরে তখন যদি কেউ রাহাজানি ক'রে ছিনিয়ে নেয়? থানার ওরা টের পাবে আসল অপরাধী কে?

—রতন নাকি? এখানে বসে চা খাচ্ছ? ও ছিনিবাস, আমাকেও একগ্লাস দিও হে!

বেঞ্চিটাতে এসে বসে জনাবালি শেখ। এক পুরুষ আগে জনাবালির বাপ স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না কোন হিঁদুর চায়ের দোকানে এসে এক কাপ চা নিয়ে খাবে তাদের সঙ্গে বসে! এটাও প্রগতির একটা লক্ষণ।

—তুমিও হাট করতি নাকি? তাকে প্রশ্ন করে ঘোষ।

—না ভাই, কেষ্ট এসেছে হাটতোলায়। আমি সাথে আছি।

—কেন তুমি আবার সাথে এইচ কেনে? চৌধুরী বুড়ো নাকি ঢোঁড়া হয়ে গেইছে? তা তোমাকে আবার পাঠায় কেনে সাথে?

জমিদারের জমিতেই বসে হাট। আসলে যদিও জমিটা দেবোত্তর, মা আনন্দময়ীর। তবু যেহেতু আনন্দময়ীর মন্দির সংলগ্ন সমস্ত জমিটা জমিদারেরই দান—তাই হাটতোলা আদায় করে নিয়ে যায় জমিদারের পাইক। হাটতোলা আর কিছু নয়—জমিদারের লোক ইচ্ছামত এর টুকরি থেকে কিছু পেঁয়াজ, ওর ছালা থেকে কিছু আলু, হ'ল তো একটা বড় মাছ তুলে নেয়। আবহমান কাল থেকে বাপ-পিতামহের আমল থেকে এ দস্তুরীটা মিটিয়ে এসেছে ওরা। কেউ কখনও প্রতিবাদ করেনি। এটা যে অন্যায় জুলুম—এ কথা কেউ মনে করে না। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে অন্যায়ের ধার ক্ষয়ে যায়। এজন্যে জমিদারের চাকর অথবা ঝি এতাবৎকাল একাই আসত। পাইক-লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে আসতো না। সম্প্রতি গ্রাম্যমানুষের অধিকারবোধ হঠাৎ জাগ্রত হয়েছে অনুভব ক'রে হরিহর এখন ঝি-চাকরের সাথে হরকিষণ অথবা জনাবালিকেও হাটে পাঠান। কী জানি ফস ক'রে কেউ যদি বলে বসে—দেব না!

রতন ঘোষের প্রশ্নটা কমলাপতির পক্ষাঘাতজনিত অসহায়তাকে কেন্দ্র করে। কমলাপতি অসুস্থ, তিনি উত্থানশক্তি রহিত। গাঙ্গুলিমশাইও ব্যতিব্যস্ত তাঁর চিকিৎসা নিয়ে। জোর-জুলুম বন্ধই আছে আপাতত।

জনাবালি বলে, জাতসাপ ঢোঁড়া হয় না ঘোষ! মসনদে লতুন নবাব উঠেছে। বুঝবে আজ-কালের ভিতরই।

কৌতূহলী হয় রতন ঘোষ। যদিও জনাবালি আর রত্নাকর বিপক্ষ শিবিরের লোক তবু এই দুটি দুর্ধর্ষ বেপরোয়া লাঠিয়ালের অন্তরে পরস্পরের জন্য সঞ্চিত আছে গোপন শ্রদ্ধা। সাংসারিক পরিচয়ে এরা পরস্পরের শত্রু, একের উদ্দেশ্য জমিদারের স্বার্থরক্ষা, অন্যের উদ্দেশ্য জমিদারের শ্যেনদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা। তবু বাহ্যিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে যে মানুষ—সেই মানবিকতার মালভূমিতে ওরা পরস্পরের বন্ধু। জনাবালি নিম্নস্বরে বলে, চাকা পালটেছে ঘোষ! আর চাকরি করা পোষাবে না আমার। তিন পুরুষের চাকরি আমার ঘোষ ভাই—এবার সব সম্পর্ক চুকিয়ে চলে যাব। হরকিষণকে ছোটবাবু সেদিন যে ভাবে বাপ-মা তুলে গাল দিলেন—কসম খেয়ে বলছি ঘোষ, আমি হলে চাকরিতে ইস্তফা তো দিতামই—তাছাড়া একটি চড় কষিয়ে দিতাম!

স্তম্ভিত হয়ে যায় রত্নাকর। জনাবালি শেখ চিরকালই কথা বলে কম। তাছাড়া জমিদার পরিবারের প্রতি অসম্মানসূচক কথা ইতিপূর্বে কোনদিন তার মুখে শোনা যায়নি। সামন্ততন্ত্রের যুগ যে শেষ হয়ে এসেছে এটা বুঝতে পেরেছে রতনও তার নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী—দিনে দিনে যে ভেঙে পড়ছে সাত পুরুষের গড়া ইজ্জতের ইমারত এটা যে কোন মূর্খ বুঝতে পারে। কিন্তু তার মূল ভিত্তিটাই যে নড়ে গেছে সেটা আজ অনুধাবন করে, যখন দেখে মৃদুভাষী জনাবালিও জমিদারের সম্মানরক্ষা করে কথা বলতে পারছে না আর।

জনাবালি সম্ভবত মনের বোঝা হাল্‌কা করার মতো একটা লোক খুঁজছিল। তার বুকে যে ব্যথা, যে অভিমান তিলতিল করে জমে উঠছিল তা অনুভব করেনি কেউ। তাই স্বল্পভাষী লোকটা দৈনন্দিন কাজ ক'রে যায় আর মনে সঙ্কল্প আঁটে পরদিন প্রাতেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবে। সঞ্চিত অর্থ তার সামান্যই—তবু যদি বিঘে পাঁচ-সাত জঙ্গলাকীর্ণ মানাও পায় তবে নিজ বাহুবলে সে করে তুলতে পারে সেই ঊষর ভূখণ্ডকে উর্বর স্বর্ণপ্রসূ। ছোট্ট একখানি মেটে ঘর। সে আর ফতিমা আর তার সাত বছরের কন্যা আয়েষা। সুখেই থাকবে তারা। কিন্তু সে যে চাষবাস জানে না। জীবনে কখনও ধরেনি লাঙলের মুঠ! লাঠি ধরাই শিখেছে সে, লাঙল নয়।

রতন বলে বলে, কী করবা কও জনাবালি! পরের চাকরি! তা সে চাকরি কেনে কর তুমি? আজও সময় যায়নি। আমি বলি বিঘে কতক মরা ভুঁই বন্দোবস্ত লাও তুমি চাঁপাডাঙায়! আর চাঁপাডাঙাতেই বা কেনে—চল ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে আমরা বন্দোবস্ত নিই জমি। জঙ্গল জমি—অল্পেই পাবনে। এমন গাঁয়ে যাব যিখানে ঐ চৌধুরী জমিদারের নাগাল পৌঁছাবেনি, যিখানে ইদরিস-পিয়ারিলাল আর রায়েরা নাই! তোমার কব্জিতে জোর আছে। লতুন করি সোনা ফলাতে পারবা তুমি।

এ উচ্ছ্বাসে জনাবালির হৃদয়ের অর্গল খুলে যায়। সে বলে, কিন্তু আমি যে চাষবাস জানি না ভাই!

—আমি তো জানি। শিখায়ে দুব তোমারে। তুমি রাজি হলে আমি গাঁ ছাড়ি লতুন বন্দোবস্ত নিতে রাজি আছি। এ শালার গাঁয়ে আর ভালো লাগে না। বেড়াজালে যেন ধরে রাখিছে এ্যারা!

জনাবালি বলে, ভেবে দেখি। এ বয়সে কি নতুন ক'রে চাষবাস শেখা যায়!

যেন সেটাই একমাত্র প্রশ্ন। যেন আর কোন বাধা নেই ওদের কল্পনার পথে। যেন চাইলেই ওরা পাবে এমন ভুঁই যেখানে কমলাপতি, নন্দদুলাল, হৃদরিস পাইকারের কোন নবতম সংস্করণের আভাস মাত্র নেই!

কথায় কথায় ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জনাবালি অনায়াসে বলে যায় তার নিরুদ্ধ হৃদয়ের বারতা—জমিদারের এই পরম শত্রুটির কাছে। সমস্ত কাহিনীটা শুনে রতন বিচলিত বোধ করে।

কমলাপতি নাকি নিজ প্রাসাদে বন্দীজীবন যাপন করছেন। জমিদারীর সমস্ত কাজ দেখাশোনা করছেন ছোটবাবু! ইতিমধ্যে সেরেস্তার অনেক কিছুই অদলবদল হয়ে গেছে। পুরানো আমলা, গোমস্তা কিছু কিছু ইতিমধ্যে বরখাস্ত হয়ে গেছে ; হরিহর গাঙ্গুলিও তটস্থ হয়ে আছেন। অল্পদিনের কথা, তাই গ্রামে সেটা এখনও জানাজানি হয়নি। কমলাপতি উত্থানশক্তি-রহিত—তাঁর সঙ্গে বাইরের কাউকে দেখা-সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না। এমনকি সে হিসাবে হরিহরকেও বাইরের লোক বলে ধরা হচ্ছে। ক'লকাতার বড় ডাক্তার নাকি বলে গেছেন কোন রকমেই যেন বড়কর্তা মস্তিষ্কচালনার কোন কাজ না করেন। হরিহরকে দেখলেই জমিদারী সংক্রান্ত কথাবার্তা তাঁর মনে জাগতে পারে, এবং সেই সূত্রে মানসিক উত্তেজনায় কষ্ট পেতে পারেন মনে হওয়ায় তাঁকে একেবারে আড়াল করে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুত কথা হ'চ্ছে কমলাপতির খাস চাকরকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—তার জায়গায় বহাল করা হয়েছে একজন নতুন লোক। জনাবালির ধারণা ছোটবাবু একটা অদৃশ্য জাল রচনা করেছেন বড়বাবুর চতুর্দিকে তাঁর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে। ক'লকাতা থেকে একদিন অ্যাটর্নিবাবু এসেছিলেন বড়কর্তার 'তার' পেয়ে। বড়কর্তার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি—অর্থাৎ সাক্ষাৎকারটা ঘটতে দেওয়া হয়নি। রূপার থালায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করা হয়েছে—যত্নের কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন সেটা সফল হয়নি। অজুহাত তৈরিই ছিল—ডাক্তারবাবুর মানা। বৈষয়িক চিন্তা করা বারণ তাঁর। অ্যাটর্নিবাবু বহুদিনের পুরানো লোক। এ পরিবারের অনেক কথাই তাঁর জানা আছে। তিনি হেসে বলেছিলেন, শ্রীপতিবাবু, আপনার বাবা আমাকে ডেকে এনেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত্রিশ-চল্লিশ বছরের। আমি তো তাঁর সঙ্গে দেখা না করে যাব না। আপনি বরং আপনার ডাক্তারবাবুকে খবর দিন—তিনি না হয় নাড়ি ধরে বসে থাকবেন। তাঁর উপস্থিতিতেই আমি গুটিকয়েক কথা বলে যাব আপনার বাবাকে!

শ্রীপতি বিরক্ত হয়ে বলে, আপনি আমার বাবার বয়সী, বাবার বন্ধু আপনি। এবার নিয়ে তিনবার আপনাকে বলেছি যে, এ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে না, ডাক্তারের বারণ। এর পরেও যদি পীড়াপীড়ি করেন তখন আমাকে যে ব্যবস্থা করতে হবে তাতে আপনার সম্মান রক্ষা করা একটু মুশকিল হয়ে পড়তে পারে।

অ্যাটর্নি এবারও হেসে বলেছিলেন, সে আমি জানি। তোমাকে বাবুই বলি, আপনিই বলি—এতটুকু বেলা থেকে তো তোমাকে দেখেছি আমি! বাপকেই যখন নজরবন্দী

ক'রে রাখতে পেরেছো তখন বাপের বন্ধুকে যে দারোয়ান ডেকে বিদায় করতে পার এটুকু কি জানি না আমি?

শ্রীপতি বলেছিল, সবই যদি জানেন তবে দয়া করে আসুন আপনি!

—হ্যাঁ যাচ্ছি, তবে এ বুড়োর একটি কথা মনে রেখ—এতে কখনও ভালো হয় না। খুররম তাঁর ভাইদের রক্ত মেখে মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সিংহাসনে উঠেছিলেন—শেষজীবনে তাঁকে বন্দী থাকতে হয়েছিল আগ্রা দুর্গে। তোমার বাবাকে দেখে সে কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। কিন্তু শ্রীপতি, ঔরঙ্গজেবের শেষ জীবনটাও কি মনে পড়ছে না তোমার?

শ্রীপতি এ কথার জবাব দেয়নি। তৎক্ষণাৎ ড্রাইভারকে ডেকে বলে—আজ দশটার ট্রেনে অ্যাটর্নিবাবু ক'লকাতা যাবেন—গাড়ি যেন তৈরি থাকে।

জনাবালি খবরটা দেয় ঘোষকে। কমলাপতির জন্যে রতন ঘোষের হৃদয়ে একটা অনুতাপ জাগে। যে কমলাপতিকে একজন অত্যাচারী পরস্বাপহারী জমিদার ছাড়া অন্য কোনও ভাবে সে কল্পনা করেনি—আজ তাঁকেই যেন চোখের উপর দেখতে পায় অসহায় পঙ্গু বন্দীরূপে। বলে, আর জমিদারী তো তোরেই দিয়ে যাবে বাপু। তবু বুড়া বাপের পিছে লাগছিস্ কেনে?

জনাবালি বলে, ভুল হ'ল তোমার ঘোষ! গোটা সম্পত্তিটা ছাওয়ালকে বোধায় দিয়ে যেত না বুড়াকর্তা। মায়ের আর দিদিমণির অংশটা হাত করতে চায় ছোটবাবু!

এতটা সন্দেহ হয়নি রতনের।

ছিনিবাস বলে, তা বুড়োকর্তা উইল ক'রি যায় না কেনে?

হঠাৎ উঠে পড়ে জনাবালি। ওদের কথোপকথন যে তৃতীয় একজন এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল—হঠাৎ সেই সত্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঠং করে একটা আনি ফেলে দেয় সে যাবার সময়। রতনও ওঠে। সে যেন কেমন উদাস হয়ে গেছে।

বেলা দশটা বাজতেই ভাঁটির টান পড়ে হাটতলায়। মানুষের কলগুঞ্জন কমে আসে। হাটুরের দল বাড়িমুখো রওনা দেয়। গরুর গাড়ির সারি চলে ধুলোর সড়ক বেয়ে। ফাগুন মাসের প্রথমেই এবার শীত বিদায় নিয়েছে। এই সকালেই কী রোদের তাপ! মাঠের উপর দিয়ে গো-গাড়ির ধুলো একটা গৈরিক আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। ছিদাম মুদীর দোকানের নিচে বেঞ্চির তলায় শুয়ে ঝিমায় ঘিয়েভাজা গেঁয়ো কুকুরটা—ছিদাম বলে ভুলো। জিবটা বেরিয়ে আছে তার—হাঁপাচ্ছে! আর আধঘণ্টার মধ্যেই হাটটা হয়ে পড়বে একেবারে জনহীন। মনে হবে না এখানে, এই হাটতলা ঘিরে এতগুলি মানুষের ভাগ্য নিয়ে দুকুড়ি-সাতের খেলা খেলে গেছে গিরিধারী, পিয়ারিলাল আর ইদরিস!

* * *

দিবাকর গিয়েছিল পণ্ডিত তারাপ্রসন্নের কুটিরে।

একা মানুষ। বিপত্নীক। ছেলেটি যুদ্ধে যোগদান করেছিল। ফিরে আসেনি। পুত্রবধূই দেখাশোনা করে! দিবারাত্র পূজা-অর্চনা আর গ্রন্থপাঠ করেন একা। দুনিয়ার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। পুত্রবিয়োগের পর আরও আত্মস্থ হয়ে পড়েছেন। গ্রাম্যসমাজের

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি গ্রামে থেকেও গ্রামছাড়া। দিবাকর মাঝে মাঝে ওঁর কাছে আসে। মনে-জাগা নানান প্রশ্নের সমাধান জেনে যায়।

পরিষ্কার করে গোবর দিয়ে নিকানো দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে কী একখানা পুঁথি পড়ছিলেন তারাপ্রসন্ন। বসতে বললেন দিবাকরকে। কোন ভূমিকা না করে দিবাকর সরাসরি বললে আপনার কাছে একটা প্রশ্নের সমাধান জানতে এলাম।

তারাপ্রসন্ন প্রশান্ত হাসলেন—তাকিয়ে রইলেন জিজ্ঞাসু নেত্রে।

—পাকিস্তানের এই যে নতুন ধুয়োটা উঠেছে এটাকে আপনি কী মনে করেন?

চোখ থেকে চশমাটা খুলে তারাপ্রসন্ন বলেন, ধুয়োটা মোটেই নতুন নয়—কিন্তু কী জানতে চাইছ তুমি?

—আপনি কি মনে করেন এ দাবি ন্যায্য ? এটা কি বাস্তবে সম্ভব ?

তারাপ্রসন্ন বললেন, একটা প্রশ্নের সমাধান জানতে এসে পর পর দুটো প্রশ্ন করে বসলে যে তুমি? আমার মতামত প্রকাশ করার আগে তোমার মতটা শুনি! তুমি কী বল?

—আমার মতে এ দাবির পিছনে কোন যুক্তি নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের কথা জানি না, কিন্তু বাঙলাদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে ভূমিসাৎ করে বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করা শুধু অন্যায় নয়, পাপ। লর্ড কার্জনের আমলেই প্রমাণ হয়ে গেছে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান একজাতি, একপ্রাণ, ভাই-ভাই।

পণ্ডিত ন্যায়তীর্থ তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন—বাঙলাদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্য বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ?

—আমি বলতে চাই, রাজা শশাঙ্কের আমল থেকেই উত্তর এবং দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম বাঙলা এক নেশানে পরিণত হয়েছে। আমরা সবাই বাঙালি, আমরা এক নেশান।

—'নেশান'-শব্দটা আমি ঠিক বুঝলাম না—ওর সংজ্ঞা কী?

দিবাকর বললে—নেশানের সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ আছে। নেশান ঠিক 'জাতি' নয়। অথচ বাঙলায় অন্য কোন শব্দ নেই যা দিয়ে ওটা বোঝানো যায়। লা-পেরা রেনান নামে একজন পণ্ডিত এর একটা সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—"Man is enslaved neither by race nor by religion, neither by the courses of streams nor by the ranges of mountains—great congregation of men, sane of mind and warm of heart creates a moral consciousness, which is called 'Nation'.

তারাপ্রসন্ন হেসে বললেন, পণ্ডিতের নামটা শুনে মনে হচ্ছে তাঁর মূল বক্তব্যটা ছিল ফরাসি ভাষায়, অনুবাদই যদি করতে হয় তবে বঙ্গানুবাদ না করে ইংরেজিতে অনুবাদ করছ কেন?

দিবাকর লজ্জা পায়। পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থ সংস্কৃত-আরবি-ফার্সি তিনটি ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না। তাড়াতাড়ি বলে, তার অর্থ : মানুষ জাতি অথবা ধর্মের ক্রীতদাস নয়, নদনদী অথবা পর্বতমালার বাধাই তার কাছে বড় নয়, একই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ অনুভূতিপ্রবণ একদল মানুষ পরস্পরকে ভালবেসে ফেলে—তারা একই আত্মিক সচেতনায় অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়—তাকেই বলি নেশান।

অনুবাদটা নিজেরই পছন্দ হয় না দিবাকরের। তারাপ্রসন্ন বলেন, বুঝলাম, কিন্তু তোমার এ সংজ্ঞা অনুযায়ী তো পূর্ব আর পশ্চিম বাঙলার মানুষ এক নেশানভুক্ত নয়।

—কেন নয়?

—বুঝিয়ে বলছি গোড়া থেকে।

একেবারে আদিযুগ থেকে শুরু করলেন তারাপ্রসন্ন।

পুরাণে আছে, অসুররাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র হয়েছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। পাঁচজন পাঁচটি রাজ্য স্থাপন করেন নিজ নিজ নামে। রিয়াস্-উস্-সালাতিন অনুসারে নোয়ার ছয় পুত্র ছিল—হিন্দ, সিন্ধ, হাবেশ, যাঞ্জ, বরবর ও নুরা। তাঁরা ছয়টি রাজ্যস্থাপন করেন—তাই হল হিন্দুস্থান। আবার হিন্দের ছিল চার পুত্র; তার মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম ছিল বঙ্গ। তিনি যে দেশে রাজ্যস্থাপনা করেন তারই নাম হল বঙ্গ। এই বঙ্গদেশে প্রচুর বর্ষা হত—দেশের লোকে আল বা 'আলি' বেঁধে জলকে নিয়ন্ত্রিত করত। তাই বঙ্গ দেশের মানুষের নাম হল বঙ্গ + আলি = বাঙ্গালি। আইন-ই-আকবরিতেও বাঙ্গালি নামের উৎপত্তির এই ইতিহাসই পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, 'বঙ্গ' বলতে তখন কোন দেশকে বোঝাত? দীর্ঘতমসের দ্বিতীয় পুত্রই হোক অথবা হিন্দের মধ্যমপুত্রই হোক বঙ্গদেশে আদিরাজা, যে রাজ্য স্থাপনা করলেন তার সীমানা কী? মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়ের প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে তিনি পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম ও বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন। এর মধ্যে পুণ্ড্র ছিল দিনাজপুর, বগুড়া—অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গ। তাম্রলিপ্ত হচ্ছে মেদিনীপুরের তমলুক সংলগ্ন দক্ষিণাঞ্চল। সুহ্ম সম্ভবত দক্ষিণ রাঢ়—অর্থাৎ আজকের বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলি জেলা। কর্বট বোধহয় কাটোয়া অঞ্চল। তাহলে ভীমসেন যে বঙ্গবিজয় করেছিলেন সে কোন বঙ্গদেশ? উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাদ দিলে যা থাকে তাই? অর্থাৎ আজকের দিনে যাকে আমরা পূর্ববঙ্গ বলি তাই কি ছিল মহাভারতের যুগে বঙ্গ? আজকে 'অখণ্ড-বঙ্গ' বলতে যা বুঝি তাকে কি মহাভারতের যুগে দু-তিনটি নাম দিয়ে বোঝান হত?

মৌর্যযুগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। গুপ্তযুগের পরে মহারাজ শশাঙ্কের আমলেই গৌড়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল একচ্ছত্র একটা রাজ্য—সাম্রাজ্যই বলা উচিত। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে—মুর্শিদাবাদ জেলায়। আজকে যে ভূখণ্ডকে আমরা মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, হাওড়া, হুগলী বলি তা ছিল গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববঙ্গ এর ভিতরে পড়ে না। তাই শশাঙ্ককে বঙ্গাধিপতি বলা ঠিক হবে না। তিনি ছিলেন গৌড়াধিপতি। গৌড় উন্নতির শিখরে ওঠে পালরাজাদের আমলে। পাল সম্রাটদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে সঙ্গীতে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, মন্দির-ভাস্কর্যে নূতন গৌড়ীয় রীতির উদ্ভব হল। বঙ্গদেশকে চাপা দিল গৌড়। ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তের মানুষেরা পরিচিত হল গৌড়জন নামে—বাঙ্গালি নামে নয়। মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্মের নাম হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, এমনকি রাজা রামমোহন পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থের নাম দিলেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'—বঙ্গীয় ব্যাকরণের অনুপ্রাস উপেক্ষা করে।

এই গৌড়ের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের ক্ষুদ্রতর অঞ্চল। ক্রমে মুর্শিদাবাদ এবং কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত হলে নদীয়া সমেত ভাগীরথীর পূর্ব-উপকূলেও বিস্তৃত হল এর এক্তিয়ার। ভারত-সংস্কৃতির মূল সুরটি যেমন গঙ্গার দুইকূল কর্তৃক বিধৃত—বঙ্গ-সংস্কৃতির যা কিছু সম্পদ তাও তেমনি ভাগীরথীর দুইতীরে সীমায়িত। ঢাকা-মৈমনসিং-বরিশালে সাক্ষাৎ পাই না কেন্দুবিল্ব, নান্নুর, ফুলিয়া, নবদ্বীপ, কাঁঠালপাড়া, বিষ্ণুপুরের সমতুল ঐতিহ্যসমৃদ্ধ একখানি গ্রামও।

তারাপ্রসন্ন বললেন—সুতরাং হাজার বছরের ঐতিহ্য বলতে তুমি সমগ্র বঙ্গের কোন সংস্কৃতিকে বোঝাতে চাইছ বল?

দিবাকর প্রশ্ন করে—তাহলে পূর্ববঙ্গে এতদিন কী ছিল?

—ছিল উর্বর অকর্ষিত ভূমি—ছিল অসুরদের বাসভূমি—একেবারে আদিযুগে। তারাই আসলে বঙ্গবাসী, আমরা গৌড়জন। গৌড় সাম্রাজ্যের সমসময়েও আরও তিনটি আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায়—রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকেরা গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্র নামে এক রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে তাই গঙ্গারাঢ় বা সংক্ষেপে রাঢ় হয়েছে। এটি আসলে দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গ। বরেন্দ্র ছিল পালরাজাদের জনকভূঃ রাজশাহী ও মালদহ জেলায়। বঙ্গ ছিল প্রকৃত পূর্ববঙ্গ যা আজকে মুসলমানেরা পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার দাবি করছে। যীশুখ্রীস্টের জন্মের পর এক হাজার বছর ধরে যখন আর্যসভ্যতা গৌড়ীয় সংস্কৃতির রূপ নিচ্ছে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে, তখনও পূর্ববাঙ্গলা নিজ-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। এদেশ পাণ্ডব-বর্জিত—এখানে গেলে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এদেশের মানুষ অসুরভাষী, আর্যরা এঁদের ঠিক সম্মানের সঙ্গে হয়তো দেখতেন না। ক্রমে দুই বাঙলার মধ্যে মেলামেশা শুরু হল। মাঝে মাঝে পশ্চিম বাঙলার ভাগ্যান্বেষী মানুষ পূর্ব-বাঙলায় দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছে। সেখানে গিয়ে রাজ্যস্থাপন করেছে। সেখানে তারা শাসন ও শোষণই করেছে শুধু, আজ আমাদের যেমন করছে ইংরেজ। ওদেশের মানুষ গৌড়ের ভাষা গ্রহণ করতে বাধ্য হল—কিন্তু উচ্চারণ-বৈষম্যে অদ্ভুত এক রূপ নিল। আমরা যেমন ইংরেজের মতো ইংরেজি বলতে পারি না—ওরাও তেমনি পারল না বাঙলা বলতে। জাত্যভিমানী পশ্চিমবাঙলা বললে—ওরা হলো বাঙাল! প্রচার করল—এমন যে পতিতপাবনী গঙ্গা তিনিও সেদেশে প্রবেশ করে জাত হারিয়েছেন। পদ্মায় গঙ্গারই জল বহে যাচ্ছে—কিন্তু সে জলের পবিত্রতাটুকু পর্যন্ত হরণ করা হল।

দিবাকর বললে—উদ্দেশ্য?

—উদ্দেশ্য কিছু নেই। আমাদের জাত্যভিমান। আমরা আশপাশের লোকদের নিচু নজরে দেখি। পশ্চিমের প্রতিবেশীকে বলি 'মেড়ো', দক্ষিণের মানুষকে বলি 'উড়ে', আর পুবদিকের প্রতিবেশীকে—হ্যাঁ, প্রতিবেশীকেই, বলি 'বাঙাল'। এর ফল কখনও ভাল হয় না দিবাকর। আমাদেরও হয়নি, হবে না। কড়ায় গণ্ডায় আমাদের এ-ঋণ শোধ দিতে হবে।

দিবাকর বললে—এই প্রসঙ্গে আমার মনে আরও একটা প্রশ্ন জাগে। ইসলাম এল

উত্তর-পশ্চিম থেকে। ঘাঁটি গাড়ল দিল্লিতে। পাঞ্জাব, দিল্লি, আগ্রা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার হয়ে যতই আমরা এগিয়ে আসি ততই দেখি মুসলমানের সংখ্যা কমে আসছে—সেটাই স্বাভাবিক—কিন্তু হঠাৎ পুববাঙলায় এসে দেখি তারাই সংখ্যায় বেশি। কেন এমন হল? দিল্লির বাদশা দিল্লি, এলাহাবাদ, বিহার ডিঙিয়ে হঠাৎ পুব-বাঙলায় এসে তলোয়ার চালিয়ে মানুষজনকে মুসলমান করলেন কেন?

—জবাবে আমি যদি বলি দিল্লির বাদশারা তলোয়ার চালাননি, চালিয়েছিল বাঙলার স্বাধীন পাঠান নবাবেরা?

—সে সন্দেহের কথা আমারও মনে জেগেছে। কিন্তু তাই বা কেন হল? সে যুগে তো পাঠান বাদশার রাজত্ব শুধু বাঙলাদেশেই ছিল না—বিহারে ছিল, দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদাবাদেও ছিল মুসলমানের রাজত্ব। তাঁরা তো বলপ্রয়োগে জনসাধারণকে মুসলমান করেননি?

—ঠিক কথা। আর যদি আমি বলি, বক্তিয়ার খিলজির আগে বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল—তারা হিন্দুধর্মে ফিরে আসবার মুখেই এল ইসলামের প্লাবন। বৌদ্ধপ্রধান বাঙলাদেশ তাই মুসলমান হয়ে গেল?

—কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে—সে যুগে বৌদ্ধপ্রধান স্থান তো আরও ছিল। বাঙলার চেয়ে বিহারে, যুক্তপ্রদেশে বৌদ্ধদের বড় ঘাঁটি ছিল। নালন্দা, পাটলিপুত্র, রাজগীর, বুদ্ধগয়ার আশেপাশে তো আজ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়?

তারাপ্রসন্ন বললেন, সুতরাং কারণটা আরও গভীরে নিহিত। এ বিষয়ে একটি মত আছে। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকের মত সেটা। কথাটা আমার মনে লেগেছে। তোমাকে বলি—

তারাপ্রসন্ন বলতে থাকেন সেই ব্যক্তির কথা।

বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের ঘটনা যীশুখ্রীস্ট জন্মাবার বারশ' বছর পরের কথা! তিনিই বাঙলাদেশে প্রথম মুসলমান নন। তাঁর আগমনের চার পাঁচশ, বছর আগে থেকেই আরবের মুসলমান বণিকেরা জলপথে বাঙলাদেশে যাতায়াত করত। চট্টগ্রাম সোনারগাঁয়ের বন্দরে লেনদেন করত। পুববাঙলার মাঝি-মাল্লারাও সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শী ছিল। পূর্ববর্তী যুগে পুববাঙলার বণিক যবদ্বীপ, সিংহল, লাক্ষাদ্বীপে বাণিজ্য করতে যেত। এই ছিল বহু লোকের জীবিকা। সেটা বৌদ্ধ যুগ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন বৌদ্ধযুগের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইল তখনই হয়তো ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীপতিরা সাগরপারে যাত্রা নিষিদ্ধ করে দিলেন। সম্ভবত তাঁরা চাইলেন সাগরপারের বৌদ্ধদের সঙ্গে আমাদের কোন আদানপ্রদান বা যোগসূত্র না থাকে। সমুদ্রযাত্রা করলে জাতে পতিত করা হত হিন্দু নাবিককে। ফলে অষ্টম-নবম শতাব্দীতে পুব-বাঙলার মাঝি-মাল্লা বণিক-ব্যবসায়ীদের অবস্থা দাঁড়াল সঙ্গীন হয়ে। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় এরা হল অন্নহীন। এই যুগে আরব বণিকেরা রীতিমত ঘাঁটি গেড়েছে পুববাঙলার সমুদ্রের ধারের বন্দরে। আরব বণিকরা বেকার হিন্দু মাঝি-মাল্লাদের আহ্বান জানাল—তাদের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় যেতে। হিন্দু বণিক সমুদ্রযাত্রা করে না, জাত যাবার ভয়ে। প্রলোভন দেখায় আরব বণিক। মুশকিলে পড়ল হিন্দু মাঝি-মাল্লারা। আরব মোল্লারা বললে,—

হিন্দুরা তোমাদের পতিত করবে? করুক। আমরা তোমাদের আমাদের সমাজে গ্রহণ করব। আমাদের ধর্মে, আমাদের সমাজে নবদীক্ষিতের সর্বোচ্চ সম্মান—আমরা জাতিভেদ মানি না। তুমি আছ ধীবর, তোমার হাতের জল খায় না তোমার মালিক। আমরা সবাই তোমাকে এক পংক্তিতে বসাব। ফলে দলে দলে ওরা মুসলমান হতে শুরু করল। হিন্দুধর্মের মজা হচ্ছে এই যে অনিচ্ছায় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলেই মানুষের জাত যায়, আর জাত ফেরে না। পরিবারের একজন অন্যায় করলে, গোটা পরিবার জাতিচ্যুত হয়। ভালবেসে প্রতিবেশী যদি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, এক সঙ্গে খায়, বাড়িতে আশ্রয় দেয় তবে তারও জাত যায়। ফলে ইসলাম দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল ওদের মধ্যে। বক্তিয়ার খিলজি যখন বাঙলাদেশ আক্রমণ করেন তার বহু পূর্ব থেকেই বাঙলায় যথেষ্ট মুসলমান ছিল। জাতিভেদের জন্যই হোক অথবা অর্থনৈতিক শোষণের জন্যই হোক—বাঙলাদেশের জনসাধারণ, বিশেষত মুসলমান জনসাধারণ অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমেত বক্তিয়ারকে হয়তো পরিত্রাণকর্তারূপে দেখেছিল। যে মনোভাব নিয়ে জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, মীরজাফর আহ্বান করেছিল ক্লাইভকে—সিরাজের পতন কামনা করেছিল, সে মনোভাব নিয়ে রায়মশাই, শিরোমণি, জগবন্ধু কমলাপতিকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন আব্বাসভাইয়ের দরবারে—হয়তো ঠিক সেই মনোভাব নিয়েই লক্ষ্মণসেনকে ত্যাগ করে সে যুগের সমাজপতিরা কামনা করেছিল বক্তিয়ার খিলজিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারাপ্রসন্ন বলেন : কে জানে হয়তো সেই ইতিহাস আবার রচিত হতে চলেছে। ইংরেজি শিক্ষা প্রথমে গ্রহণ করে গত দুই শতাব্দী আমরা ভারতবর্ষের বাজারে নেতৃত্ব করেছি। রামমোহন থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত আমরা আজ যা চিন্তা করেছি বাকি ভারতবর্ষ তা চিন্তা করেছে পরের দিন। সত্য সে কথা। কিন্তু আমরা খেয়াল করছি না—এ দুশো বছরে আমাদের প্রতিবেশীরাও এগিয়ে এসেছে—আমরা ক্রমশ পেছিয়ে পড়ছি। এখন আমরা সমান সমান চলেছি; কিন্তু জাত্যভিমানটুকু তেমনিই আছে। নেতৃত্ব ছেড়ে মোড়লি ধরেছি আমরা। ডাইনে ছাতুখোর খোট্টা-মেড়ো, বাঁয়ে অজ-বাঙ্গাল, নিচে উড়ে ভূত—আর মাঝখানে অমৃতের সন্তান আমরা বাঙালি! হয়তো সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার দিনই আসছে এবার!

দিবাকর ব্যাকুল হয়ে বললে—কিন্তু ওরা কি সত্যিই আলাদা হয়ে যাবে? মার খেতে হবে আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে, আধখানা দেশ ত্যাগ করে?

তারাপ্রসন্ন হেসে বললেন—আমরা ইতিহাস আলোচনা করছিলাম এতক্ষণ দিবাকর—জ্যোতিষ নয়।

* * *

রাত্র এক প্রহর অতীত হয়ে গেছে। দিবাকর শুয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছিল। ঠিক পড়ছিল না। বইখানা হাতে নিয়ে আকাশপাতাল ভাবছিল। গ্রামের কথাই—ক্রমে নিজের কথা। কাল সন্ধ্যাবেলা সতীশ এসেছিল। বলে গিয়েছিল, উমা তাকে দেখা করতে বলেছে। কারণটা কী তা বলতে পারেনি সতীশ, দিবাকরও আন্দাজ করতে

পারেনি। সে স্থির করেছিল যাবে না। সুতরাং ও কথা ভাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবু ফিরে ফিরে সেই কথাই মনে পড়ছে। সেদিন মন্দির-প্রান্তরে উমা যে কথা বলেছে তারপর আর কোনও সম্পর্ক তার সঙ্গে রাখার দরকার নেই। নিজের কাছে স্বীকার করতে আজ আর লজ্জা কী—হ্যাঁ উমাকে সে ভালোবেসেছিল; কিন্তু সে জানতো এ অসম্ভব। জমিদারের মেয়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিয়ে—ও সে গল্পের বইতেই হয়—বাস্তবে হয় না। তাছাড়া ছিল আর একটা বিরাট বাধা—জাতের বাধা। উমা শাক্ত আর সে বৈষ্ণব! ও কায়স্থের চেয়েও নিচু। নবশাক। মনে আছে উমার প্রণাম মা কখনও নিতেন না। সেও আপত্তি করত—কিন্তু উমা শুনত না—ওকে বিরক্ত করবে বলেই হঠাৎ এক খামচা পায়ের ধুলো নিয়ে বসত। প্রথম প্রথম আপত্তি করলেও—শেষদিকে হাল ছেড়ে দিয়েছিল পণ্ডিত। মনকে বোঝাত এখন ছেলেমানুষ আছে তাই বুঝছে না; বড় হলেই বুঝতে পারবে তার পক্ষে দিবাকরকে প্রণাম করা অন্যায়।

এখন মনে হয়—হ্যাঁ, বড় হয়েছে উমা আজ। শুধু বয়সে নয়, আরও কিছুতে। এত বড় হয়েছে যে, তার মাথাটার আর নাগালই পাওয়া যাচ্ছে না। বুদ্ধিটাও বেড়েছে সেই অনুপাতে—নইলে এমন উদ্ভট কল্পনা সে করল কেমন করে? পণ্ডিত নাকি পরস্ত্রীর প্রেমপ্রার্থী!

উমাকে সে ভালোবাসতো—একথা ঠিক; কিন্তু জীবনে কখনও কারও কাছে তো তা সে স্বীকার করেনি। এমন কি উমার কাছেও নয়। যে রাত্রে উমা লুকিয়ে এসেছিল তার কাছে—তাকে উদ্ধার করতে বলেছিল, সেদিনও পণ্ডিত সংযম হারায়নি। ঘুণাক্ষরেও উমাকে জানতে দেয়নি তার হৃদয়ের দুর্বলতার কথা। দিবাকর জানত যে, সে কথা জানতে পারলে কোনও লাভ হত না উমার—বরং মনোকষ্ট বাড়ত আরও কিছুটা। তাই সেদিন মিষ্টি কথা বলে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়েছিল। সেই নির্জন রাত্রে একটি উন্মুখ কুমারী কিশোরী মেয়ের আত্মনিবেদন যে লোক সংযত চিত্তে সহ্য করতে পারে—সে করবে আজ পরস্ত্রীর প্রতি প্রেমনিবেদন? কী ভাবে উমা? এত ছোট হয়ে গেছে সে?

রান্নাঘর থেকে একটা পোড়াপোড়া গন্ধ ভেসে আসে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দিবাকর। ছুটে যায় রান্নাঘরে। যা ভেবেছে। জল শুকিয়ে গেছে হাঁড়ির। চালটা টিপে দেখে। না, শক্ত আছে এখনও। আবার একটু জল ঢেলে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ে। দুলালটা আজ আবার যাত্রা শুনতে গেছে। রায়বাড়িতে যাত্রা হচ্ছে আজ। দিবাকরকে তাই রান্না করতে হচ্ছে। ভাতটা নামিয়ে নিজের আহার শেষ করে দুলালেরটা ঢেকে রেখে দিতে হবে। তিনি ফিরবেন সেই ভোর রাতে হাঁ-হাঁ করা খিদে নিয়ে। এক পেট খেয়ে বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে যাত্রা দেখার শোধ তুলবেন! ভালো কাজ হয়েছে পণ্ডিতের! কিন্তু যাক ও কথা। কী যেন ভাবছিল সে?

হঠাৎ খুট করে শব্দ হয় অগাড় খোলার। ঝাঁপের দরজা বাইরে থেকেই খোলা যায়। অবশ্য কায়দাটা যার জানা আছে সেই শুধু খুলতে পারে। দিবাকর জানে, দুলাল ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ও কায়দাটা জানে না—তাই মুখ না তুলেই সে বুঝতে পারে দুলাল

ফিরে এসেছে। বলে, শেষ না হতেই চলে এলি যে? দ্যাখ তো, ভাতটা হয়ে গেছে বুঝি।

দুলাল নয়, এসেছে উমা। ছোট একটি বছরচারেকের ছেলেকে নিয়ে। ছেলেটি বামুনদির—অর্থাৎ চৌধুরীবাড়ির পাচিকার। উমা কোন কথা বলে না। নিঃশব্দে ঘরটা পার হয়ে নেমে যায় ভিতরের উঠানে। সেটা পার হয়ে বাঁয়ে রান্নাঘর। সবকিছুই তার পরিচিত—কিছুই নতুন নয় এ বাড়ির। না হয় কিছুকাল আসেইনি—তাই বলে সব কি ভুলে যাবে? কিছুই ভোলেনি সে। হুড়কো খোলার কায়দাও যেমন মনে আছে—তেমনি মনে আছে রান্নাঘরের কোন কোনায় কী আছে। ভাতটা নামিয়ে হাঁড়িটা কাত করে বসিয়ে দেয়। মুখে চাপা দেয় একটা কলাই-করা থালা। আপনিই ফ্যানটা ঝ'রে যাবে। একটু মেয়েলী কৌতূহলে পাশের ঢাকনাটা তোলে। ওবেলার এক-কাঁসি খেঁশারির ডাল। গোটাতিনেক আলু আর আধখানা বেগুন সেদ্ধ করা হয়েছে ডালে। ওপাশে আর একটা কী চাপা দেওয়া আছে। ঢাকাটা তুলে দেখে কাঁচা আনাজ। আর কিছু নেই। মাছ মাংস দিবাকর খায় না—কিন্তু একফোঁটা দুধ পর্যন্ত নেই। ঐ তিনটি আলুসেদ্ধ আর আধখানা বেগুন দিয়ে পুরুষমানুষ ভাত খেতে পারে নাকি? চোখ ফেটে জল আসে উমার।

বেচারি অবশ্য জানতো না—এটা দুজনের খাদ্য।

রান্নাঘরের দ্বার থেকে ছেলেটি ডাকে—মাসি!

চোখের জল মুছে উমা বেরিয়ে আসে। দাঁড়ায় ফাঁকা উঠানে। এক আকাশ তারা। ছোট ছেলেটি সভয়ে তার আঁচল ধরে পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছে অন্ধকারে। একমুঠো জোনাকিপোকা উড়ছে তুলসীর ঝোপে। তুলসীগাছটা আজও আছে, আশ্চর্য! মাটির বেদিটা অবশ্য ধ্বসে পড়েছে মেরামতির অভাবে। কেউই ওতে নতুন করে মাটি দেয় না, নিকোয় না। তুলসী নাকি নারায়ণ—তার মৃত্যু নেই। তাই দিবাকরের এ মৃত্যুপুরীতেও টিকে আছে সে আজও।

তাকিয়ে তাকিয়ে উমা চারিদিক দেখছিল—পেঁপেগাছ দুটো কত বড় হয়ে গেছে! পুবদিকের ঘরের দেওয়ালটা পড়ে গেছে। আগে উঠানের মাঝ-বরাবর একটা তার টাঙানো থাকতো—কাপড়জামা তাতে শুকাত—সেটা নেই।

ঘরের ভিতর থেকে দিবাকর বলে : কি রে নামালি ভাতটা?

ছোট ছেলেটির হাত ধরে ভিতর দিক দিয়ে ঘরে ঢোকে উমা। কৌতুক ক'রে বলে, নামিয়েছি!

উঠে বসে দিবাকর; তুমি!—চকিতে ওর নজর পড়ে দেওয়ালে টাঙানো ট্যাক ঘড়িটায়। রাত দশটা। পল্লীগ্রামের দশটা। অর্থাৎ মধ্যরাত্রি।

—হ্যাঁ আমিই!—প্রণাম ক'রে উমা সেই আগের দিনের মতো। বাধা দিতে ভুলে যায় দিবাকর। বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তার। ঘরে দ্বিতীয় কোন আসন নেই। দিবাকর ইতস্তত করে,—উমাকে চৌকির একপ্রান্তে বসতে বলা কি সুরুচি-বহির্ভূত হবে? বুঝে উঠতে পারে না। সাহস করে একই শয্যায় বসতে অনুরোধও করে না—শুধু বলে, হঠাৎ, এ সময়ে?

একটু চুপ ক'রে থাকে উমা। তারপর বলে—এরকম হঠাৎই তো আমি এককালে এ বাড়িতে আসতাম মাস্টারমশাই। আপনি তো এতটা বিচলিত হতেন না।

দিবাকর একটা রূঢ় জবাব দিতে গিয়েও সামলে নেয়। অপেক্ষাকৃত মোলায়েম ক'রে নিয়ে বলে, সে দিন আর এ দিনে তফাত আছে উমা। এরকম ক'রে আসাটা ঠিক হয়নি তোমার।

—জানি। কিন্তু উপায় কী বলুন—আপনাকে ডেকে পাঠালেও তো আপনি গেলেন না। আজ সাতদিন ধরে কত লোককে দিয়েই তো খবর পাঠিয়েছি। পাননি খবর?

—পেয়েছিলাম।

—তবে যাননি যে?

কতটা কড়া জবাব দেওয়া উচিত স্থির করতে পারে না দিবাকর।

উমাই আবার বলে, পুরুষমানুষের অতটা অভিমান কিন্তু ভালো নয়!

গা জ্বালা করে ওঠে পণ্ডিতের। বলে, অভিমান! অভিমান কিসের? আর করব কার কাছে? কেন?

—নিশ্চয়ই রাগ করে আছেন বলে যাননি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আপনি বেফাঁস একটা কথা বলে ফেলেছিলেন বলে আমি ধমক দিয়েছিলাম—সেই অভিমানেই তো আসেননি—সেদিন ডাক্তারবাবুর সামনে 'উমাদেবী' বলে রাগ দেখালেন!

দিবাকর বাধা দিয়ে বলে ওঠে, সেটা তোমার ভুল ধারণা উমা। সেদিন মন্দিরে—

উমাও বাধা দিয়ে বলে, যাক ও কথা! কিন্তু আমাকে বসতেও বলবেন না নাকি? একটু বসব এখানে? নাকি পরস্ত্রীর সঙ্গে একখাটে বসতেও আপত্তি আছে আপনার।

আর সহ্য হয় না দিবাকরের, বলে, ঠিক ঐ কথাই আমি ভাবছিলাম উমা। এখানে তো দ্বিতীয় কোন আসন নেই। তুমি অতিথি—না হয় তুমিই এখানে বস, আমি উঠে দাঁড়াই।

—থাক্ থাক্!—উমা মাটিতেই বসে পড়ে। ছেলেটিকে টেনে নেয় কোলের কাছে।

দিবাকর মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল, বলে, এরকম রাত ক'রে তোমার আসার কারণ লোকে অন্য অর্থেও নিতে পারে—এটা বোঝ নিশ্চয়ই!

উমা মুখ লুকিয়ে হেসে বলে, কী অর্থ মাস্টারমশাই?

দিবাকর চুপ করে থাকে।

উমাই হেসে বলে, আপনার কলঙ্ক রটাতে পারে, না মাস্টারমশাই?

দিবাকর এবারও কোন জবাব দেয় না।

—আপনি আর আমার আগেকার সেই মাস্টারমশাই নেই। বড্ড গম্ভীর হয়ে গেছেন আপনি। না হ'লে আমাকে দেখে এতটা আড়ষ্ট হবার তো কিছু নেই।

—তুমিও যে আগেকার সেই উমা নও। সহজ হওয়ার পথটা যে তুমিই বন্ধ ক'রে দিয়েছ। কী জানি আমার ব্যবহারে কখন তোমার হাস্যোদ্রেক করে বসি।

—ও, সেদিনের কথা? কিন্তু—না থাক, ও কথা না তোলাই ভালো। এই ঘরে আমিও একদিন আত্মবিস্মৃত হয়ে ছেলেমানুষি করে গিয়েছিলাম। আপনি সেটা মনে করে রাখেননি। আমিও তেমনি না হয় ভুলে যাব আপনার সেই একদিনের দুর্বলতার কথা।

—না!—প্রতিবাদ করে দিবাকর দৃঢ়কণ্ঠে।—সেদিন কোনও দুর্বলতা ছিল না আমার। ধন্যবাদের বদলে আমি ও জিনিস চাইনি তোমার কাছে। অত ছোট মন নয় আমার। আমি চেয়েছিলাম শুধু তোমার—

—থাক না মাস্টারমশাই। আমি যা বুঝেছিলাম—তাই বুঝতে দিন আমাকে।

—না, ভুলটা তোমার শুধরে দেওয়া দরকার। আমি তোমার কাছে শুধু শ্রদ্ধাই চেয়েছিলাম—তার বেশি কিছু চাইনি। কেন তুমি বললে আমি তোমার প্রেমের ভিখারি, কেন অপমান করলে আমাকে—

উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে দিবাকর। উমা অনেকক্ষণ কোন জবাব দেয় না। তারপর শান্ত উদাস ধরা-গলায় অদ্ভুত স্বরে সে ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে—

—আমি জানতাম না! কিন্তু,...কিন্তু না হয় ভুলই বুঝতাম আমি?

—কিন্তু ভুল বুঝতে আমি দেব কেন?

যেন বেহালার একটানে রিমঝিম করে বেজে ওঠে উমা,

—সত্যিকারের কোন কিছু তো কখনও হাতে তুলে দিলে না—মনগড়া একটুকরো ভুলকেও যে আঁকড়ে ধরব তাও সহ্য হবে না তোমার! উঃ, কী নিষ্ঠুর তুমি!

দুজনেই নির্বাক বসে থাকে অনেকক্ষণ।

দিবাকর শেষে সাহস সঞ্চয় ক'রে বলে, তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

—বলুন।

—তুমি কি বিয়ে ক'রে সুখী হওনি?

এত দুঃখেও উমা ম্লান হাসে। চোখ মুছে বলে, সে জেনে আপনার লাভ?

—লাভ আছে বইকি উমা। তোমাকে সুখী দেখে আমার লাভ নেই? আজ আমার একটি প্রশ্নের জবাব দাও। অমলবাবু কি তোমাকে সুখী করবার চেষ্টা করেন না?

—কেন করবেন না! বরং গহনা-শাড়ি না চাইলেও পাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বেড়াবার জন্য চাইলেই গাড়ি পাওয়া যায়—অল্প খরচ করি বলে অনুযোগ শুনতে হয়—

—তাহলে—

—কী তাহলে?

—আমার মনে হয়েছিল তোমাদের বিবাহটা—শেষ করতে সঙ্কোচ বোধ হয় দিবাকরের।

—আমাকে তিনি সুখী করার যথেষ্ট চেষ্টা করেন—আমিই বরং তাঁকে সুখী করতে পারিনি।

—সে কী? কেন?

—হাসে উমা। বলে—দোষটা আমার নয়—আপনার।

—আমার!—চমকে ওঠে দিবাকর।

—হ্যাঁ, আপনার শিক্ষার। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবে এইরকম একটা শিক্ষাই দিয়েছিলেন আপনি। বিবাহের পর দেখলাম—সেটা খুব ভুল ধারণা—স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই ইচ্ছা করলে অন্য বৃক্ষের ফলাস্বাদন করতে পারেন—

যদি স্ক্যান্ডাল পর্যায়ে না পৌঁছায় ব্যাপারটা। কয়েকটি ককটেল পার্টিতে গিয়ে সে সত্য অনুভব করে আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল। আমি পালিয়ে বেঁচেছি!

—তুমি বলছ কী উমা?

—থাক ও কথা মাস্টারমশাই। আমি ওসব কথা বলতে আসিনি। অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজনে এসেছি আজ আমি। সময় অল্প। আসল কথাটা বলে নিই। আপনি জানেন কাকাবাবু উত্থানশক্তিরহিত। দাদাই এখন সমস্ত জমিদারী দেখাশোনা করছে। কাকাবাবুর ইচ্ছা ছিল একটা উইল করে সম্পত্তির একটা অংশ দান করে যাবেন। আমাদের যিনি অ্যাটর্নি তাঁকে আসতে লিখেছিলেন। তিনি এসেও ছিলেন। কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি—

দিবাকর একদৃষ্টে তাকিয়েছিল ক্ষয়ে যাওয়া মোমবাতিটার দিকেই। হঠাৎ বলে ওঠে—

—কিন্তু অমলবাবু কি এসব জানেন?

—কীসব? এই উইল করার কথা? তিনি এসব কথা কিছুই জানেন না।

—না, আমি বলছিলাম—এইসব পার্টিতে যাঁরা যান তাঁরা ভাল লোক নন?

উমা হাসে—আপনি বুঝি এখনও সেই ক‍্‍টেল পার্টির কথা ভাবছেন?

—হ্যাঁ, মানে—তিনি কি জানেন এইসব পার্টিতে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁরা সকলে সচ্চরিত্র লোক নন?

—হ্যাঁ জানেন—কারণ তিনি নিজেও কিছু মনু-পরাশর নন। আর আমাকেও দু-এক রাত্রি অহল্যা-কুন্তীর মতো মহিমময়ী হয়ে উঠতে দেখলে আঁতকে উঠবেন না তিনি, যতক্ষণ না—ঐ যে বললাম—স্ক্যান্ডাল পর্যায়ে না পৌঁছায়। কিন্তু ওকথা যাক, আপনি আসল কথাটা মন দিয়ে শুনছেন না।

—বেশ বল।—এবার সত্যিই একমনে শোনে দিবাকর।

শোনবার মতোই ঘটনা বটে।

পিতাপুত্রে দ্বৈরথ সমর চলছে। পিতার চতুর্দিকে চক্রব্যূহের দুর্ভেদ্য পরিখা রচনা করেছে শ্রীপতি। একটি বাইরের লোকের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। হরিহর পর্যন্ত যেতে পারে না বড়কর্তার কাছে। দয়াময়ী, উমা, জাহ্নবী এবং শ্রীপতির বহাল করা একটি চাকর। আর আসেন চিকিৎসক। শ্রীপতির কড়া পণ—জনসাধারণের সামনে যখন অসূর্যম্পশ্য পিতৃদেবকে বার করবে তখন সাড়ম্বরে বার করবে সে। চন্দনকাঠের পালঙ্কে—ফুলের স্তূপের মধ্য থেকে দেখা যাবে অস্তমিত সূর্যের মুখখানি।

পিতাও কম নন; তিনি কমলাপতি চৌধুরী—জীবনে যিনি কখনও নত করেননি মাথা। তিনিও গোপনে পণ করেছেন, তাঁর সম্পত্তির একটা বিরাট অংশ তিনি দান করে যাবেন। গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হবে একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় আর একটি স্কুল। একটি লক্ষ্মীপতির নামে, একটি মৃণালিনী দেবীর নামে। কমলাপতির পিতৃস্মৃতি এবং মাতৃস্মৃতি!

শ্রীপতির কানে গিয়েছিল গুজবটা। এ নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে পিতাপুত্রে কী একটা দ্বৈরথসমর হয়ে গেছে। শ্রীপতি বলেছে—বৃদ্ধবয়সে ভীমরতি হয়েছে বাবার। এমনিতেই

শুনেছি জমিদারি অ্যাবলিশন আইন হবে নাকি! তার উপর খুদকুঁড়ো যা থাকবে তা এভাবে বিলিয়ে যেতে দেব নাকি ঐ ভীমরতি ধরা বাহাত্তুরেকে!

কমলাপতি কোনও জবাব দেননি। জনান্তিকে জাহ্নবী দেবীকে জানিয়েছেন তাঁর মনোবাসনা। তাই আজ এসেছে উমা। কাকাবাবু উইল করবেন। কাল সকালেই দিবাকরকে যেতে হবে সদরে—গভর্নমেন্ট প্লিডার, সিভিল-সার্জেন, সার্কেল অফিসার, আর এস. ডি. ও. অথবা ডি. এম.-কে নিমন্ত্রণ করে আসতে হবে আগামী রবিবার। কমলাপতিও দেখতে চান শ্রীপতির ক্ষমতাটা। কেমন করে এস. ডি. ও. আর সিভিল সার্জেনকে রোখে সে! তিনি আরও বলেছেন দিবাকর যেন সমস্ত কথা খুলে বলে ডি. এম.-কে—যাতে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে উইলটা করিয়ে নিতে পারেন। দানপত্র লিখে নিতে পারেন। তিনি সুস্থমস্তিষ্কে দান করছেন একথা যেন তাঁকে পরীক্ষা করে সেখানেই সিভিল সার্জেন রায় দিয়ে যান। আইনের কোন ফাঁক তিনি রাখবেন না।

এতদিনে প্রাণ খুলে কমলাপতিকে প্রণাম করল দিবাকর। হ্যাঁ, মানুষ বটে! রাজি হল সে। নিশ্চয়ই যাবে। প্রত্যেককে জানিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গেও সে দেখা করবে এবং সমস্ত কথা খুলে বলবে। হঠাৎ চমকে ওঠে উমা, একি, রাত সাড়ে-এগারোটা বাজে যে! দিবাকরও চমকে ওঠে ঘড়ির দিকে চেয়ে।

—কী আশ্চর্য! এত রাত্রে তুমি একা ফিরবে কী ক'রে?

উমাও কোন জবাব দিতে পারে না। একটা টর্চ নিয়ে এসেছিল সে। আসার সময় বামুনদির ছেলেটাও হেঁটে এসেছে।

—তুমি যে এখানে এসেছ—তা কে কে জানে?

—একমাত্র মা জানেন।

—তুমি হরিকিষণ অথবা জনাবালিকে সঙ্গে আনলে না কেন?

—আপনি তো দরবারী রাজনীতি করেননি কখনও—জানবেন কোথা থেকে? কে যে এখন কোন পক্ষে তা বুঝব কী করে?

—আমি যাব তোমার সঙ্গে?

—তা ছাড়া আর উপায় কী? কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে?

—এত রাত্রে আর কে পথে আছে?—দিবাকর জবাব দেয়।

উমা বলে, কিন্তু আমাদের টর্চের আলো দেখে কেউ যদি বাড়ি থেকেই হাঁক দেয়!

দিবাকর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, কাজ নেই টর্চ জ্বেলে। আমি অন্ধকারেই নিয়ে যাব তোমাকে। তুমি আমার হাতটা ধর শক্ত করে।

ঝাঁপের দরজাটা খুলে ওরা পথে নামে। দিবাকর শিশুকে কাঁধের উপর তুলে নেয়। আর একটা হাতে শক্ত করে ধরে উমার নরম মুঠি।

পাড়াগাঁয়ের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি কৈশোরেই স্তব্ধ। এখন তো রাত্রি দ্বিপ্রহর।

ঝিল্লির একটানা আওয়াজ ছাড়া স্তব্ধ চরাচরে জনপ্রাণীর সাড়া নেই। তারায় ভরা আকাশের তলায় মুঠো মুঠো জোনাকির মেলা। উমা অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, আজকের রাতটা আমি জীবনে ভুলব না।

দিবাকর তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য বলে, তুমি আর কতদিন এখানে থাকবে?

—সেটা যদি আমার উপরে নির্ভর ক'রে তাহলে আমি আর ফিরে যাব না।

—সে কী! একবার একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বলে আর কোনদিন ফিরে যাবে না স্বামীর ঘরে?

—স্বামী বলে তো আমি তাঁকে স্বীকার করতে পারিনি। আপনাদের মন্ত্রের নিশ্চয় কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু আমি মানি না ও মন্ত্রকে। আমি ফিরে যাব না।

—কিন্তু তাঁর তো জীবনসঙ্গিনীর দরকার—তিনিই বা তোমাকে ছেড়ে দেবেন কেন?

—জীবনসঙ্গিনীর তাঁর প্রয়োজন নেই—তাঁর প্রয়োজন শয্যাসঙ্গিনীর। সে জন্য বিকল্প ব্যবস্থা আছে। তবে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তিনি হয়তো করবেন—জানি না শেষ পর্যন্ত তাঁকে রুখতে পারব কি না।

দিবাকর চুপ করে থাকে, তারপর বলে, আচ্ছা মানুষের পরিবর্তনও তো হয়?

উমা তৎক্ষণাৎ বলে, কই হয়? আপনার তো একতিলও পরিবর্তন হয়নি—যে পাথর ছিলেন সেই পাথরই রয়ে গেছেন। একটা মিষ্টি কথাও তো বললেন না আমায়।

দিবাকর আরও নিবিড় করে ধরে উমার নরম হাতখানি। তারায় ভরা মুক্ত নীলাকাশের নিচে হঠাৎ বলে বসে দিবাকর—কীই বা বলতে পারতাম তোমায় উমা? আমি কি বুঝি না কিছু? আমিই ব্যর্থ ক'রে দিলাম তোমার জীবনটা। না হয় নাই জুটতো তোমার দুবেলার অন্ন—তবু বোধহয় এমন করে তিলে তিলে দগ্ধ হতে না তুমি আমার এ ভাঙা ঘরে! আমিও হয়তো এতটা ছন্নছাড়া হয়ে পড়তাম না তা হলে। আমিও বোধহয় একটা অবলম্বন পেলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতাম।

উমা অন্ধকারের মধ্যেই একটা হোঁচট খায়। ভ্রূক্ষেপ না করে বলে, আপনার তো এখনও সময় যায়নি মাস্টারমশাই। আপনি বিয়ে করুন। ঘরসংসারের মধ্যে আবার দাঁড়াতে পারবেন আপনি।

সখেদে দিবাকর বলে, তা আর হয় না, উমা! কেন হয় না তা এতদিন স্বীকার করিনি তোমার কাছে;—কিন্তু আজ আর তা গোপন রাখতে পারছি না। আমার জীবনে একটি নারীকেই স্থান দিতে পারতাম—সে এসেও ছিল আমার ভাঙা ঘরে। কিন্তু আমি নিজেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সে মেয়েটিকে আজও আমি—

—মাস্টারমশাই!—দিবাকরের মুখে হাত চাপা দিতে গিয়েছিল উমা। দিবাকর চমকে ওঠে। উমার প্রসারিত কর অন্ধকারের মধ্যেই আবার গ্রহণ ক'রে বলে—আজ আমার প্রগলভতা মাপ কর। হয়তো এমন একটা রাত্রি আর আসবে না আমাদের জীবনে। আমি জানি, তোমার কাছে একথা স্বীকার করা মহা লজ্জার কথা—তোমারও, আমারও। তবু আজএ সত্য অস্বীকার করতে পারছি না কিছুতেই।

উমা উদগত অশ্রু গোপন ক'রে বলে, এটুকুই থাক আমার সঞ্চয়—আর কিছু চাই না আমি।

—আর কিছু দেবার ক্ষমতাও নেই আমার। সেদিন তোমাকে গ্রহণ করতে পারিনি। বাধা ছিল জাতের। আজও তোমার চোখের জল নিজের হাতে মুছিয়ে দেবার ইচ্ছাটা আমাকে দমন করতে হল—কারণ আজকের বাধাটা আরও বড়।

উমার নিজেই আঁচল দিয়ে চোখটা মোছে। কী একটা কথা বলতে চায়। তার আগেই বাঁধের উপর থেকে কে চেঁচিয়ে ওঠে, কে যায়?

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। চলবার শক্তি নেই যেন আর!

বাঁধের উপর থেকে লোকটা নেমে আসে। টর্চ জ্বালে। দিবাকর সাহস সঞ্চয় করে বলে, কে তুমি?

লোকটা কাছে এসে টর্চ ফেলে ওদের উপর।—একি পণ্ডিতমশাই? এত রাত্রে?

নন্দ চৌকিদার।

—কোথায় যাচ্ছেন এত রাত্রে?

দিবাকর জবাব দেয় না। হনহনিয়ে চলতে থাকে। নন্দ তো থ!

আয়োজনের কোন ত্রুটি হয়নি। সব কটি মহাপ্রাণ ব্যক্তিকেই আহ্বান করেছিলেন রায়মশাই। গুটিগুটি এসে জুটেছিলেন সকলে রায়মশাইয়ের বৈঠকখানায়। ননীমাধব মোদক, সরোজ সাঁই, হৃদয় ঘোষ আর রসিকলাল চাটুজ্জে। বেশ বড় বৈঠকখানা রায়মশায়ের। পাকাঘর—টিনের চালা। ছাদের নিচে চাটাইয়ের বোনা একটা সিলিং। তার উপর মাটির পলেস্তারা করা আছে যাতে ঘরটা গরম না হয়। সিলিং-এর তলায় ঘর-জোড়া একটা চন্দ্রাতপ। এককালে সাদা ছিল, এখন ধূসর হয়ে গেছে। মাঝখানে লাল রঙের একটা ফুল! কাপড়েরই। তার এক-একটা পাপড়ি দেড় দু হাত লম্বা। চার কোনাতেও অর্ধচন্দ্রাকৃতি শালুর ফুল। ঘরে আসবাব খুব বেশি নেই। একদিকে মস্ত তক্তপোষ। তার উপর ফরাস পাতা। খান চার-পাঁচ তাকিয়া বিছানো। ঘরের অন্য দিকে কিছু নিচু ডেস্ক। ওখানে বসে রায়ের কর্মচারীরা হিসাবপত্র কষে। দেওয়ালের গায়ে একটা গা-আলমারি। লাল খেরোখাতায় ভর্তি। একটা দেওয়াল-ঘড়ি। কাচের উপর ইংরেজিতে লেখা আছে রবিবার। কুলুঙ্গিতে একটি গণেশমূর্তি, তার নিচে সিঁদুর রঙে লেখা শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৫৩ সাল। সাবেকী সাজসজ্জা—সাবেকী বন্দোবস্ত। আর সবকিছুর সঙ্গে অসঙ্গতি রক্ষা করে ঘরে ঝুলছে একটি ইংরেজি ক্যালেন্ডার। অতি আধুনিকা একটি তরুণী রায়মশায়ের দিকে বাড়িয়ে আছে তার জুতাসুদ্ধ একখানি পা। বাটা কোম্পানির বিজ্ঞাপন!

সকলে এসে বসেছেন বেশ জাঁকিয়ে। দু রকম হুঁকোয় তামাক দিয়ে গেছে হুঁকারদার। এতক্ষণ পাখা করছিল আর একজন ভৃত্য বিরাট তালপাখায়;—কিন্তু তাকেও বিদায় দিয়েছেন রায়। ব্যাপারটা গোপন।

ননীমাধব বলেন, ব্যাপারটা কী হে রায়-ভায়া? এমন করে খবর দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছ সবাইকে?

রায় গুড়গুড়িতে একটি আশ্লেষচুম্বন করে বলেন, বলছি। তার আগে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দেবে? তোমরা বেঁচে আছ, না মরে গেছ?

এঁরা বুঝতে পারেন এটুকু হচ্ছে গৌরচন্দ্রিকা। কথা বলার আগে রায় একটু গলাখাঁকারি দেন—সেটাও তাঁর ভূমিকা।

শিরোমণি বলেন, মরে বেঁচে আছি ভাই—কিন্তু সে তত্ত্বকথা কেন?

—নাহ'লে গাঁয়ের বুকে এ অনাচার চলতে থাকবে দিনের পর দিন—আর তোমরা মুখ বুজে থাকবে? বলি জমিদারবাড়ির মেয়ে বলে কি সমাজবদ্ধ মানুষ নয়? অত ঢলাঢলি করার ইচ্ছে থাকে—তো যা না, যশোরে না কোথায় তোদের বাগানবাড়ি আছে। সেখানে মরগে যা। গাঁয়ের বুকের উপর এসব কী?

হৃদয় ঘোষ চোখ দুটি ছোট ক'রে বলেন, গুজবটা তাহ'লে সত্যি?

—গুজব? গুজব রটাবার সাহস কার? নন্দ চৌকিদার আমার পা ছুঁয়ে বলেছে! বামুনের পা ছুঁয়ে মিছে কথা বললে জিব খসে যাবে না? মুখে পোকা পড়বে না?

এঁরা সমস্বরে স্বীকার করেন সংবাদটা যাচাইয়ের আর অপেক্ষা রাখে না।

ননীমাধব তবু বলেন, কিন্তু দিবা ছেলেটাকে তো তেমন মনে হত না। হ্যাঁ, একটু ডাকাবুকো ছিল বটে—বয়সের সম্মান দিতে যেন বুক ফেটে যেত—কেমন যেন গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল, সবজান্তা ভাব ছিলই। কিন্তু মেয়েছেলে-ঘটিত ব্যাপারে—

শিরোমণি ধমক দিয়ে ওঠেন—তুমি আর বাজে বকো-না ননী। মনুষ্য চরিত্রের কী বোঝো তুমি? বলে, কত জ্ঞানীগুণী মানুষই কামের বশবর্তী হয়ে পাপাচরণ করে, তা ও-তো ছেলেমানুষ। গীতায় ভগবান বলেছেন—আবৃতং জ্ঞানবৃতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা, কামরূপেণ কৌন্তেয়—

রায় ধমক দিয়ে ওঠেন, আরে রাখো তোমার গীতগোবিন্দের কচকচি...

শিরোমণি আমতা আমতা করে বলেন, না গীতগোবিন্দ হয়—শ্রীমদ্ভগবতগীতা।

রায় দুটি হাত কর্ণমূলে স্পর্শ করিয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকান : আগে বলতে হয়! তা এই কি তোমাদের গীতাপাঠের আসর হল শিরোমণি?

অপ্রস্তুত হয়ে একেবারে নিভে যান রসিকলাল।

হৃদয় ঘোষ বলেন, তা হলে কী করতে চাও?

—সেইটেই তো জিজ্ঞাস্য আমার।—বলেন রায় ফর্সি টানতে টানতে।

ননীমাধব বলেন, একঘরে করা উচিত দিবাকরকে। ধোপা-নাপিত বন্ধ।

হৃদয় ঘোষ বলেন, ওসবে আজকাল কোন কাজ হয় না। সেপটি-রেজার আছে, সানলাইট সাবান আছে—দিব্যি চলে যায়। বরং স্বাবলম্বী হয়ে ওতে খরচ বাঁচে কিছু।

রায় বলেন, একঘরে নয়—হা-ঘরে করা উচিত। গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত অমন লোককে।

এবারও হৃদয় ঘোষ বলেন, নীলকুঠির আমল নয় এটা রায়। যাও বললেই যে যাবে কেন—কোর্ট-কাছারি আছে না?

রায় দৃঢ়স্বরে বলেন, না নেই! কোর্ট আছে, কাছারি আছে, থানা-পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট সবই আছে—কিন্তু এ গাঁয়ে কিছু নেই। এখানে তুমি-আমিই কর্তা। আমরা যদি পাঁচজনে জোর গলায় বলি—'যাও', তো দিবাকর তো ছার, তার বাপও পালাবার পথ

পাবে না! তুমি ভেবেছ কী ঘোষ! কমলপুরের নন্দদুলাল রায় এখনও মরেনি—আর রসিকলালের মতো সে বলে না যে, সে মরে বেঁচে আছে! তোমরা পাঁচজনে রায় দাও—দেখি কোন্ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ওকে দখল দিতে গাঁয়ে আসে? আড়াই কুড়ি বয়স হল তোমার ঘোষ—কটা ম্যাজিস্ট্রেট দেখেছ তুমি জীবনে?

হৃদয় ঘোষ বিব্রত হয়ে বলেন, আহা আমার কথা হচ্ছে না।

ননীমাধব বলেন—এতো গেল এক তরফের কথা। আর সে মাগীর কী ব্যবস্থা করবে?

রায় বলেন, তার খুড়ো-ভাইদের স্পষ্ট বলতে হবে যে, ঐ ধিঙ্গি মেয়ে গাঁয়ে রাখা চলবে না। হয় মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাও, নয় তোমাদের যশোরের বাগানবাড়িতে চালান দাও—আমরা দেখতে যাবো না। গাঁয়ের মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করতে হয়—বাঁধের ওপর রাত বারোটার সময় এসব খ্যামটা নাচ সহ্য হবে না আমাদের।

হৃদয় বলেন, কিন্তু ওরা অত রাতে গিয়েছিল কোথায়? তা ছাড়া একটি ঘুমন্ত ছোট ছেলে ছিল শুনলাম গোঁসাই-এর কাঁধে। সেটাই বা কে? উমার তো ছেলেপিলে হয়নি।

রায় বাঁ চোখটি বন্ধ করে বলেন, এইবার হবে!

—মানে?

—মানে তো সোজা! উমা গিয়েছিল রাত নিশুতি হলে দিবার বাড়িতে। ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। দিবার রান্নাবান্না করে যে রাখাল ছেলেটা, দুলাল না কি যেন নাম—তাকে আগেভাগেই ছুটি দিয়েছিল এখানে যাত্রা শুনতে আসবার জন্য। সুতরাং চমৎকার পরিবেশ। নন্দ ওদের দেখবার পরে উত্তরমুখো যায়। দিবাকরের ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে দেখে ঝাঁপ ঠেলে ভিতরে ঢোকে ঘরদোর সব হাঁ হাঁ করছে। বাইরের ঘরে বিছানাটা আলুথালু!

ননীমাধব বলেন—দেখ ভাই, আমার মনে হয় কাজটা আমরা ঠিক করছি না। খুনী আসামীরও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। আমাদেরও উচিত হবে আসামীকে ডেকে পাঠিয়ে প্রথমে তার কৈফিয়ৎ নেওয়া।

—কৈফিয়তের আবার নতুন কী আছে?

রসিকলাল বলেন, বেশ তো ননীভায়ার ইচ্ছাই পূর্ণ করা যাক না। আজ তো সংক্রান্তি। কাল সন্ধ্যায় আমরা তো বসছিই মায়ের স্থানে, দিনুরীর হিসাব মেটাতে। সেখানেই আসতে বলা হোক দিবাকরকে। তার যা বলার আছে সে বলুক। আমরাও যা বিচার ক'রে রায় দেব তা সর্বসমক্ষেই দেব! কী বল রায় ভায়া?

—আমার আপত্তি নেই। তোমরা পাঁচজনে যে ব্যবস্থা দেবে তাই মেনে নেব আমি।

এই সময়ে নন্দদুলালের বড় ছেলে গোপীনাথ এসে বলে, বড় সতরঞ্চিটা কোথায় যাবে বাবা?

—ওটা রত্নেশ্বর পাঠিয়েছিল—ধানকলে যাবে।

রায়ের অনেক কাজ। যাত্রার আসর ভাঙা হ'চ্ছে। হ্যাজাক, ডে-লাইট, সতরঞ্চি,

চন্দ্রাতপ সব গাদা দেওয়া আছে প্রাঙ্গণের একপাশে। সব হিসাবমতো ফেরত পাঠাতে হবে। উঠে পড়েন তিনি। মজলিস ভেঙে যায়।

* * *

গাজনের উৎসবটা এ অঞ্চলের বিখ্যাত উৎসব। পয়লা চৈত্র মায়ের মন্দির সংলগ্ন ছাতিম গাছতলায় মায়ের দিনুরী সংগ্রহের বাক্সটি সিলমোহর খুলে ফেলা হয় পঞ্চজনার সম্মুখে। টাকা-সিকি-আনি-দোয়ানি সব ভাগে ভাগে সাজানো হয় কাঠের বারকোসে। তারপর সেটা ভাগ করা হয়। মায়ের নিত্যপূজার অংশ, পূজারীর প্রাপ্য আর গাজন-উৎসবে কতটা খরচ করা হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায় ঐদিন সন্ধ্যাবেলা।

গুটিগুটি সকলেই এসে বসেছেন ছাতিম গাছতলায়। রসিকলাল দিনুরী সংগ্রহের বাক্সটি সর্বসমক্ষে খুলে থাকে থাকে মুদ্রাগুলি সাজিয়ে তুলছিলেন। রায়, ননীমাধব, সতীশ, হৃদয় তো আছেনই—এ ছাড়া সাধারণ মানুষও এসেছে অনেকে! জগবন্ধু, নবীন, দ্বিজপদ, রতন, ছিনিবাস। দিবাকরকেও ডাকতে পাঠানো হয়েছে। এটা যে পঞ্চায়েতের একটা বিচারসভা, তা অবশ্য অনেকেই জানে না। ওরা এসেছে চিরাচরিত প্রথায় পয়লা-চৈত্রের বৈঠকে।

ছাতিমগাছের নিচু ডাল থেকে ঝোলানো হয়েছে একটা পেট্রম্যাক্স। তার উজ্জ্বল আলোয় গাছতলার নিচে খানিকটা অংশ আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। তার বাইরে অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছে। হাটতলার এখানে ওখানে জ্বলছে দু-একটা হ্যারিকেন। অল্প সময়েই হিসাব মিটে যায়। ডাক্তার বলে, এবার উঠি তাহলে—আমার গুটিকয়েক রুগী বসে আছে।

রায় বলেন, আরে দু-পাঁচ মিনিটে তোমার রুগী মরে যাবে না সব। একটু বসে যাও না।

ননীমাধব ঠাট্টা করে বলেন, আর শতমারী সহস্রমারী না হলে পশার জমবে কেন!

ডাক্তার বলে, আবার কী?

—দিবাকর গোঁসাইকে ডাকতে পাঠিয়েছি। তার বিচারটা হওয়া দরকার।

—বিচার?—কৌতূহলী হয়ে ঘনিয়ে আসে লোকগুলো।

রায় তখন আকারে ইঙ্গিতে একটা আভাস দিতে থাকেন। দেখা গেল, কথাটা অনেকেরই জানা। এমন মুখরোচক সংবাদটা গোপন থাকেনি গ্রামের উৎকর্ণ শ্রবণশক্তির কাছে।

ঠিক এই সময়েই রসিকলাল হঠাৎ হাঁ হাঁ করে ওঠেন : থাক্ থাক্ মা, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কালী ফিরে এসেছে। আজ থেকে পূজার জোগাড়টা সেই করবে।

কৌতূহলী দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ওদিকে। পূজার জোগাড় হাতে করে আনন্দময়ীর মন্দিরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল উমা। হঠাৎ এ আক্রমণে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। রসিকলাল ওর হাত থেকে পূজার জিনিসপত্র নামিয়ে নিতে যান; বলেন, কাল থেকে কালীই পূজার জোগাড় দেবে।

শিরোমণির কন্যাই কুমারীকালে পূজার জোগাড় দিত। তার বিবাহের প্রায় সমসময়ে উমা ফিরে আসে শ্বশুরবাড়ি থেকে এবং স্বেচ্ছায় এ দায়িত্বটা হাতে তুলে নেয়। জাহ্নবীও আপত্তি করেননি। কন্যা-জামাতার মধ্যে যে একটা মনোমালিন্য চলেছে এটুকু তিনি আন্দাজ করেছিলেন। তাই উমা যখন স্বেচ্ছায় এ দায়িত্বটা হাতে তুলে নিল তখন তিনি খুশিই হয়েছিলেন। মায়ের পূজা, ওতে মন শান্ত হয়—তাছাড়া, থাক না মেয়েটা কিছুদিন ঐ নিয়ে ভুলে। আজ প্রায় ছয় মাস উমাই নিয়মিত এসে মায়ের নিত্যপূজার জোগাড় দিয়ে যায়। প্রাতে একবার, সন্ধ্যায় একবার। চৌধুরীবাড়ির বাগানেই এখন যথেষ্ট ফুল ফোটে। সেগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে তোলে—একটি একটি ক'রে মালা গাঁথে। পূজার অন্যান্য উপকরণ থাকে মায়ের গর্ভগৃহ-সংলগ্ন কুটুরিতে।

হঠাৎ এ আক্রমণে উমা হতচকিত হয়ে বলে বসে, কেন শিরোমণি কাকা?

—সেটা আর নাই শুনলে মা। মায়ের পূজার জোগাড় করা কি চাট্টিখানি কথা। শুচিশুদ্ধ অন্তঃকরণ না হলে যে ও কাজ হয় না। মা আমার বড় কড়া মনিব!—হা হা ক'রে অকারণেই হাসেন তিনি।

উমা এতক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে, বলে, তা মা কি আপনাকে বলেছেন—আমাকে দিয়ে তাঁর কাজ হবে না?

কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না শিরোমণি।

রায়মশাই বলেন, বেশ তো, একটু সবুর করে যাও—এখনি বুঝতে পারবে কারণটা।

শিরোমণি আর একবার হাতবাড়িয়ে পূজার থালাটা নিতে যান। উমা বাধা দিয়ে বলে, থাক! কারণটা আগে শুনি।

একগুঁয়ে মেয়েটা দেবমন্দিরের একটি স্তম্ভে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করে। বিনা প্রতিবাদে সে পূজার থালাটা সমর্পণ করতে রাজি নয়। সে জেনে যেতে চায়—কোন্ অপরাধে তাকে এ অধিকারচ্যুত করা হচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে একজন এসে খবর দেয়, দিবাকর পণ্ডিত বাসায় নেই—গোয়াড়ী গেইছে!—গোয়াড়ী হচ্ছে সদর কৃষ্ণনগরের অপর নাম।

রায় ধমকে ওঠেন, মিছে কথা! কোথায় লুকিয়ে আছে ছোঁড়া। জানে তার বিচার হবে আজ পঞ্চায়েতের কাছে, তাই গা-ঢাকা দিয়েছে কোথাও।

লোকটি বলে, না কত্তা! দুলাল বুললে—সেই সকালবেলা ছাইকেল চেপে কেষ্টনগর গেইছে—এখনও আসে নাই!

কলগুঞ্জন ওঠে একটা—ডাক্তার বলে, কাউয়ার্ড!

ননীমাধব বলেন, গায়ে ইয়ে মাখলে তো যমে ছাড়বে না। নন্দ চৌকিদার তো আছেই—সে বলুক। আসামী থাকে থাক, না থাকে না থাক—বিচার এখানেই শেষ করব আমরা।

রায় বলেন, উমা মা অবশ্য পঞ্চায়েতকে দু-একটা খবর বলতে পারে।

সকলের দৃষ্টি পড়ে আধা-অন্ধকারের ভিতর মন্দিরের চত্বরে। পাষাণস্তম্ভের পাদমূলে নামানো রয়েছে পূজার আয়োজন—এক থালা ফুল আর বেলফুলের গোড়ে মালা একটা—উমা চলে গেছে।

বাঁকা হাসি হাসলেন রায়। চোখে চোখে তাঁর কথা হয়ে গেল ননীমাধবের সঙ্গে।

—নন্দ! এগিয়ে এস তুমি! পরশু রাতে যা দেখেছ বল। মনে থাকে যেন, মায়ের মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে কথা বলছ তুমি। বামুনের কাছে মিছে বললে জিব খসে যাবে তোমার!

নন্দ দুই হাত কানে ছুঁইয়ে তার বিবৃতি দিতে ওঠে। থিয়েটারের অভিনয়ের সময় যেমন বিশেষ অভিনেতার উপর মাঝে মাঝে জোরালো আলো ফেলা হয়—তেমনি একটা জোরালো আলো এসে পড়লো নন্দ চৌকিদারের মুখে। চোখটা ধাঁধিয়ে গেল নন্দর। একটা নয়, পর পর তিন জোড়া সার্চ লাইট পড়ল এবং ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো সমস্ত তল্লাটটার উপর। আলোর প্লাবন খেলে গেল যেন। অদ্ভুত একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ। সকলেই চকিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তিনখানা জিপ চৈতালী ঘূর্ণি পিছনে ফেলে বড় সড়ক থেকে চলে গেল পুবমুখো চৌধুরীবাড়ির দিকে।

—ব্যাপার কী? কমলপুরে একসঙ্গে তিনখানা জিপ?—রায় হতচকিত।

—পিছনের খানা ওয়েপন ক্যারিয়ার!—বলে জগবন্ধু।

—ওয়েপন ক্যারিয়ার—সেটা কী?—রায় সভয়ে প্রশ্ন করেন।

জগবন্ধু বুঝিয়ে দেয়—ওতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়—ওয়েপন মানে অস্ত্রশস্ত্র—বন্দুক, গোলা-বারুদ।

কাছাটা ভালো ক'রে এঁটে উঠে পড়েন রায়মশাই।—তা যুদ্ধ তো থেমে গেছে। এখন এমন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কে এল গাঁয়ে?

জগবন্ধু হেসে বলে, আরে আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? যুদ্ধের সময় ওতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হত বলে ওর নাম ওয়েপন ক্যারিয়ার! এখন এগুলো এমনিই ব্যবহার করা হয়। আড়াই কুড়ি বয়স তো আপনারও হ'ল।

—না না, ঘাবড়াব কেন?—মনকে সান্ত্বনা দেন রায়!

ঠিক এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একজন খবর দেয়, পুলিশ!

জগবন্ধু চট ক'রে ওর সাইকেলে উঠে পড়ে বলে, বসুন আপনারা, আমি জেনে আসি ব্যাপারটা কী!

অল্প পরেই সে ফিরে এসে যে খবরটা দিল তাতে গ্রাম্য পিলে চমকে যাবে এ আর বিচিত্র কী? জেলা-সমাহর্তা, এস. ডি. ও. নর্থ, সার্কেল অফিসার আর ডাক্তার সাহেব এসেছেন—আরও যেন কে কে আছেন সঙ্গে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেন না এঁরা। চণ্ডীমণ্ডপের বৈঠক ভেঙে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কৌতূহলী জনতা গুটি গুটি এগিয়ে চলে চৌধুরীবাড়ির দিকে।





4 লঙ্কাকাণ্ড

স্থান-কাল আর পাত্র। এ পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে পটভূমি। মহাকাল যে ইতিহাস রচনা করে চলেছেন তার তিনটি ভেরিয়েব্‌ল্‌। আমাদের জীবনে আমরা তার একটা খণ্ড-অংশ দেখতে পাই মাত্র।

কমলপুরের সেই মানুষগুলিকেই আমরা আবার দেখতে পেলাম পাঁচবছর পরে। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ের মাতনে যুগান্তর ঘটে গেছে ওদের জীবনে। সেই পরিচিত মানুষগুলিকেই আবার আমরা দেখতে পেলাম নতুন কালে, নতুন পরিবেশে।

কাল—তেরশ আটান্ন সালের শেষ। ভারতরাষ্ট্র তিন বৎসরের শিশুমাত্র।

স্থান—কমলপুর নয়, লক্ষ্মীপুর, জিলা বর্ধমান।

লক্ষ্মীপুরও বহু প্রাচীন গ্রাম। কতকালের প্রাচীন কেউ তা বলতে পারে না। লক্ষ মানুষের পদচিহ্ন-লাঞ্ছিত এ গ্রামের কোন ইতিহাস নেই—আর বাঙলাদেশের কোন গ্রামেরই বা তা আছে? লক্ষ্মীপুরের আদি নাম ছিল নাকি লক্ষ্মণাবতী। লক্ষ্মণাবতীর কোন আদি ইতিবৃত্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে ইতিহাস যদি কোথাও থাকে, তা আছে মহাকালের দপ্তরে! কিছুটা নিদর্শন হয়তো আজও লুকানো আছে গ্রামের উত্তর-পশ্চিম সীমানায়—ঐ বিস্তীর্ণ অনাবাদী উঁচু ডাঙা জমিটায়। ওরা বলে আউলিয়ার মাঠ। আজও ওখানে খুঁড়লে ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে প্রাচীন কালের ইট, পোড়ামাটির নকশাকাটা টালি, অথবা তৈজসপত্র।

দামোদরের ধারে গ্রাম। দামোদর কিন্তু আবহমানকাল ধরে এই একই অববাহিকায় বইছে না। রাঢ়খণ্ডের জল কখনও খাড়ি, বাঁকা, কখনও বা বেহুলা নদীতে বয়ে গেছে। ঘেয়া, কানা-দামোদর, রাণাবাঁধ খাল—কখন কোন মরাখাত জলে ভরে উঠবে কেউ জানে না। এই নদীতীরের গ্রামগুলিতেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ বঙ্গ-সংস্কৃতির উত্থান-পতন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দামোদরের প্রবাহের পরিবর্তনে গ্রাম্য-সমাজের বিকাশ আর বিলোপ হয়েছে। আদিতে দামোদর ছিল অসভ্য মুণ্ডাদের দখলে। ওদের দেওয়া নামটাই সহস্রাব্দির বাধা অতিক্রম করে আজও টিকে আছে। 'দা-মুণ্ডা'—ক্রমে দামোদর। ঐটুকু নামের নিশানা ছাড়া মুণ্ডা-সংস্কৃতির আর কোন নিদর্শন নেই লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

পরবর্তী যুগ গোপদের যুগ।

আউলিয়া মাঠের মালভূমিটায় নাকি গোপ রাজাদের গড় ছিল। গোপভূমের সদগোপ রাজাদের দৌহিত্র বংশের একটা শাখা ওখানে এসে স্বতন্ত্র জনপদ গড়ে তোলে। আউলিয়ার বিস্তীর্ণ মাঠের মালভূমিতে ছিল গোপরাজার গড় বা কেল্লা। জনপদ ছিল গড়ের পাদদেশে এই লক্ষ্মণাবতী। অবশ্য সে যুগে এ গ্রামের কী নাম ছিল জানা যায় না; বস্তুত আদি গোপরাজ সম্ভবত রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন

গোপবংশের একটি শাখার গোষ্ঠীপতি অথবা কৌমপতি। এদেরই আদিপুরুষ হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগে পশুপালন থেকে কৃষির উপর নির্ভর করতে শিখেছিল। গোপরাজাদেরও ঐটুকু কিংবদন্তি ছাড়া আর কিছু স্মৃতিচিহ্ন নেই।

এরপর এসেছিলেন দত্তরা। বণিক সম্প্রদায়। সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তাম্বুলবণিকেরা। বর্ধমান আর হুগলি জেলাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে বাঙলার অর্থনৈতিক আর সামাজিক ইতিহাসে যে বণিক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়, তাদেরই ধারার-বাহক এই দত্তরা। উজানিগরের লক্ষপতি সওদাগর ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধে যে সাতশত বণিককে আমন্ত্রণ করেছিলেন তার ভিতর বর্ধমানভুক্তির লক্ষ্মণাবতীর গন্ধবণিক দত্তদেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। এ গ্রামে এসে উপনিবেশ গড়ে তোলার পর পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন এ সত্যটি একদিন আবিষ্কার করেছেন কবিকঙ্কণের মঙ্গল-কাব্য থেকে। মধ্যযুগে এ যুগের মতো অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা ছিল না। সামন্ত রাজারা এইসব প্রতিষ্ঠাবান বণিক সম্প্রদায়কে খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। ফলে, বর্ধমান মহারাজার প্রাচীর-বেষ্টিত গড়ের বাইরে অথচ বর্ধমান জনপদের অনতিদূরে দামোদর নদের ধারে পৃথক উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন গন্ধ-বণিকেরা! এঁরাই মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত লক্ষ্মণাবতীর অনুকরণে গ্রামের নামকরণ করেন লক্ষ্মণাবতী।

লক্ষ্মীপুরের ইতিহাসে সে এক স্বর্ণ অধ্যায়।

লক্ষ্মণাবতীর গন্ধবণিকেরা সাতসমুদ্র মন্থন করে সম্পদ আহরণ করে আনতেন। গ্রামলক্ষ্মীর সম্পদ রাখার আর ঠাঁই ছিল না! হীরা-মুক্তা-স্বর্ণে ঝল্‌মল্ করত গ্রামশ্রীর সর্বাবয়ব। দামোদর, রূপনারায়ণ, ভাগীরথী বেয়ে সপ্তডিঙা, মধুকর, শঙ্খচূড় ভাসিয়ে লক্ষ্মণাবতীর দত্তরা বাণিজ্যযাত্রা করতেন। তাঁদের প্রতিযোগিতা ছিল উজানির লক্ষপতি সওদাগরের সঙ্গে, চম্পাই নগরের চাঁদ-সওদাগরের সঙ্গে, কর্জনী-সপ্তগ্রাম-বিষ্ণুপুর-ত্রিবেণী-তেঘরার বণিক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে অচলাসনে বেঁধেছিলেন গন্ধবণিক দত্তরা। উত্তরে বারাণসী থেকে দক্ষিণে সিংহল-যবদ্বীপ পর্যন্ত ভেসে বেড়াত তাঁদের বাণিজ্যতরী। তিল তিল করে সাতপুরুষ ধরে বাণিজ্যসম্ভারে পূর্ণ হয়ে উঠল গ্রামলক্ষ্মীর ভাণ্ডার। মনে হত সহস্রাব্দির অপব্যয়েও বুঝি শেষ হবে না মা লক্ষ্মীর সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার।

শতাব্দী-সঞ্চিত সম্পদ কিন্তু নিঃশেষ হয়ে গেল একরাত্রে!

নবাব আলিবর্দী খান্ তখন বাংলার মসনদে।

আরামবাগের মুবারক মঞ্জিলে বসে নবাব সংবাদ পেলেন যে, নাগপুর থেকে একদল অর্বাচীন মারাঠা দস্যু পঞ্চকোট অতিক্রম করে এসেছে বর্ধমানভুক্তিতে—লুঠ-তরাজ শুরু করেছে সে অঞ্চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। নবাব সসৈন্য বর্ধমান এসে পৌঁছালেন। কোথায় মারাঠা দস্যু? তাদের নামগন্ধও নেই। নবাবী ফৌজের বড় কর্তারা আর হেসেই বাঁচেন না। লুঠেরাগুলো নবাবীসৈন্যের নাম শুনেই পালিয়েছে। বর্ধমান রাজ-প্রাসাদে আরাম করে নিদ্রা গেলেন পথশ্রান্ত সেনাধ্যক্ষেরা। পরদিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠে শোনেন—নগর অবরুদ্ধ! বর্ধমান শহর ঘিরে রয়েছে দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী মারাঠাবাহিনী। নবাব প্রমাদ গণলেন। প্রায় এক সপ্তাহ আটক রইলেন বর্ধমান রাজপ্রাসাদে।

তারপর একদিন অতর্কিত আক্রমণে মারাঠা বাহিনীর একাংশ ভেদ করে নবাবী ফৌজ তীর বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল কাটোয়া হয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে।

পথে গ্রাম লক্ষ্মণাবতী অর্থাৎ লক্ষ্মীপুর।

গন্ধবণিকেরা তখন নেই;—কিন্তু তাদের উত্তরসাধকদের কাছে তখনও বন্দিনী ছিলেন চঞ্চলা লক্ষ্মী।

নবাবী ফৌজের অশ্বক্ষুরপেষণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল গ্রাম। মারাঠা সৈন্যের কাছে অপমানিত হয়ে নবাবী সৈন্য তাদের বিক্রম দেখাল গ্রামবাসীর উপর। যা কিছু রক্ষা পেয়েছিল তাই কুড়িয়ে গুছিয়ে নিতে নিতে এসে পড়ল পশ্চাদ্ধাবনকারী মারাঠাবাহিনী।

লক্ষ্মীপুর শ্মশান হয়ে গেল একরাত্রে।

গন্ধবণিকদের সুবর্ণ-অধ্যায়ের এখানেই শেষ।

ঘুরল মহাকালের রথচক্র আর এক পাক। এবার এলেন সিংহরা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাকা-দলিল হাতে। গত দুশ' বছর ধরে তাঁরাই লক্ষ্মীপুরের ভাগ্যবিধাতা।

লক্ষ্মীপুর গ্রামের ইতিকথা এত বিস্তারিত বলতে হল শুধু একথা জানাতে যে, এ হেন লক্ষ্মীপুরেও স্থায়ী ব্যবস্থা হল না কমলপুরের মানুষের। মুণ্ডাদের অঞ্চলে একদিন এসেছিল গোপরা—স্থায়ী আসন পেতেছিল তারা। গোপভূমে এসে পড়েছিল গন্ধবণিকদের বীজ। মহীরুহ দেখা দিয়েছিল কালে। দত্তরা এসে গোপ-জনপদে শিকড় গেড়েছিল। সে বনস্পতির ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল অনেকে, নীড় বেঁধেছিল শাখাপ্রশাখায়। নবাগতকে আপন করে নেবার অদ্ভুত আকর্ষণীশক্তি ছিল লক্ষ্মীপুর গ্রামের রক্তে। অষ্টাদশ-শতাব্দীর মাঝামাঝি যে লঙ্কাকাণ্ডে বিধ্বস্ত হয়েছিল গ্রাম তাতেও তার জীবনীশক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। এসেছিল নতুন অতিথি—সিংহরা। তারা ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল গ্রামের জীবনের সঙ্গে। আশ্চর্য, এ হেন লক্ষ্মীপুরে এসে আশ্রয় নিয়েও কমলপুরের মানুষগুলি এ গ্রামের মানুষ হয়ে উঠল না!

সোনার লঙ্কায় আগুন দিয়েছিল হনুমান—সে নিজে স্বর্ণলঙ্কার বাসিন্দা ছিল না। কিন্তু হনুমানের লাঙ্গুলে নাকি প্রথম আগুন জ্বেলেছিল লঙ্কাপুরীর বাসিন্দাই। সোনার পুব-বাংলাতেও স্বাধীনতার ঊষা মহূর্তে যে আগুন জ্বলল তার নায়ক পুব-বাংলার মানুষ নয়। দ্বি-জাতিতত্ত্বের যে থিয়োরি পুব-বাংলার ঘরের চালা থেকে চালায় লাফ দিয়ে গোটা দেশটাকে পুড়িয়ে খাক করে ফেলল—সে থিয়োরিও এসেছিল একদিন হঠাৎ বাইরে থেকে লাফ দিয়ে। কিন্তু তার লাঙ্গুলে যে আগুন প্রথম জ্বলল তা কি দিয়েছিল পুব-বাংলার মানুষেই? প্রতিটি খড়ো-চালার যে দাহিকা-শক্তি সে তো আর বাইরে থেকে আসেনি? না হলে রাতারাতি সে আগুন এমন ব্যাপক লঙ্কাকাণ্ডের সূচনা করল কেমন করে?

সে যাই হোক, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে বিভক্ত হয়ে গেল দেশ। কমলপুরের মানুষগুলিকে একদিন জানানো হল, তাদের সাতপুরুষের ঐ ভিটাগুলি ভিন্ন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। স্তম্ভিত হয়ে গেল ওরা। শুধু কমলপুর নয়, এমন হাজার গ্রামের মানুষ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনল এ বার্তা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল্য মেটাতে ওদের হৃতসর্বস্ব হতে হল। ওদের শান্তির নীড় পুড়ে ছাই হয়ে গেল লঙ্কাকাণ্ডের লেলিহান আগুনে। ওরা

দলে দলে চলে এল এপারে। বর্ডার-স্লিপ নিয়ে এসে উঠল রিসেপশান সেন্টারে—সেখান থেকে ট্রানসিট ক্যাম্প। কমলপুরের মানুষগুলিকে অবশেষে চালান করা হল লক্ষ্মীপুরের পি. এল. ক্যাম্পে।

পি. এল. ক্যাম্প—অর্থাৎ পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি ক্যাম্প।

এই ক্যাম্পের যারা বাসিন্দা তারা পি. এল.—অর্থাৎ সরকারের স্থায়ী পোষ্য। যাবৎ জীবেৎ ডোলং ভক্ষেৎ। আউলিয়া মাঠের অনাবাদী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছে সারি সারি দোচালা ঘর। মুলি বাঁশের দেওয়াল, দরমার ঝাঁপ দরজা-জানলা, আর শালখুঁটির উপর করোগেটের টিনের চালা। লক্ষ্মীপুর পি. এল. ক্যাম্প। বর্তমান সিংহ-জমিদার রায়সাহেব ত্রিদিবেশ সিংহ করিতকর্মা ব্যক্তি। আউলিয়া মাঠের অনাবাদী জমিটা তিনিই বিক্রয় করেছেন সরকারকে। সওয়া লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন ত্রিদিবেশ। সারি সারি দরমার বাড়ি তুলে রূপায়িত করেছিলেন পি. এল. ক্যাম্পটিকে। তারপর একদিন এসে গেল উদ্‌বাস্তুর দল। ওরা সকলেই নাকি এসেছে পাকিস্তানের কী এক নদীর ধারে কোন এক কমলপুর গাঁ থেকে। কয়েক ক্রোশের জন্য বেচারিরা হারিয়েছে সাতপুরুষের ভিটে-মাটি। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কল্পিত লাইনটা যদি আর দু-ক্রোশ পুবে ঘেঁষে চলে যেত তাহলে ওদের আর এ দুর্ভোগ ভুগতে হত না। দুর্ভোগ বই কি! যুগ যুগ ধরে যে জমি চষে এসেছে, যে ভিটের চালে চাপিয়েছে নতুন খড়, দেওয়ালে দিয়েছে মাটির প্রলেপ তা ছেড়ে চলে আসতে হল। নগদ কীই বা আনতে পেরেছে?

এপারে এসে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। এতদিনে বুঝতে পেরেছে নিজেদের অবস্থা। এখানে ওদের নতুন জমি দেওয়া হবে না—নতুন করে রোজগার করার কোনও সুযোগ দেওয়া হবে না, ওরা এ ক্যাম্পে এসে নতুন এক সংজ্ঞা লাভ করেছে :—পি. এল.—স্থায়ী পোষ্য! বৈচিত্র্যহীন ভিক্ষুকের জীবন। ভিড় হয় প্রতিদিন ডোল অফিসের কাউন্টারে। কার্ডে দাগ দিয়ে ক্যাম্প-ক্লার্ক বীরু গুপ্ত হিসাব করে টাকা দেয়। মাথাপিছু চার টাকা নয় আনা করে প্রাপ্য প্রাপ্তবয়স্ক একজনের একপক্ষকালের জন্য। এ ছাড়া আছে র‍্যাশন। দু'সের চাল, দু'সের আটা আর চৌদ্দ ছটাক ডাল। পনের দিনের রসদ।

বিনাপরিশ্রমে এমন ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও কিন্তু পছন্দ হল না লোকগুলোর। দুষমনের মতো দেখতে একটা লোক—রতন ঘোষ না কী যেন নাম—সেই দল পাকালো।

—আমরাঁয় ভিক্ষুক নয় মশয়, আমরা পুনর্বাসন চাই। আমাদের জমি দেন, বীজধান দেন—ডুল আমরায় চাই না।

দয়ার অন্ত নেই সিংহ মশায়ের। তিনিই ওদের দরখাস্তটা মুসাবিদা করলেন। এর চেয়ে ভালো কথা আর কী হতে পারে? ওরা খেটে খেতে চায়! সে ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। উপরমহলে দৌড়াদৌড়ি ধরপাকড় শুরু হল। খুশি হয়ে উঠল উদ্‌বাস্তুদল। পি. এল. ক্যাম্প উঠে যাবে—এখানে হবে কলোনি! জমি পাবে, বীজধান পাবে, এগ্রিকালচারাল লোনও পাবে নাকি!

কিছুদিন পরেই কিন্তু চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওদের জমির কথা শুনে! আউলিয়া

মাঠের বাকি অংশ এবং দামোদরের গর্ভভুক্ত জমিটাই নাকি ওদের বিলি করা হবে চাষের জন্য! করিৎকর্মা রায়সাহেবের কিন্তু উৎসাহের অন্ত নেই। ব্যবস্থা করলেন নিখুঁতভাবে। কিছু খরচ করতে হল অবশ্য! সরকারি কৃষি বিভাগের লোক একদিন জমি দেখে গেলেন। রিপোর্ট পাওয়া গেল এ জমিতে চাষ সম্ভব। একদিন জরিপ করতে এল ল্যান্ড অ্যাকুইজিসন বিভাগের লোকেরা। আর চুপ করে থাকা চলে না। বাধা দিল রতন ঘোষের দলই। জরিপ করতে দেবে না তারা। এ জমি ওরা নেবে না। অনুর্বর কাঁকুরে জমিতে লাঙল চলবে না—কী ফসল হবে ওখানে? দামোদরের বিস্তীর্ণ চড়াটা তো আরও অনুর্বব—ঊষর বন্ধ্যা বালির বিস্তৃতি!

দ্বিজপদ কর্মকার রতন ঘোষকে বলে : ও জমিতে কী চাষ হবি হে ঘোষ মোড়ল? ওখানে তো শিয়ালেও ইয়ে করতি যায় না। চাষ সম্ভব হলি কি আর অনাবাদী পড়ি থাকে ও জমি আবহমানকাল? ঐ আউলের মাঠে জল উঠবি কোন মই বায়ি?

রতন ঘোষ গম্ভীর হয়ে বলে—হুঁ! বোঝছি! চাষ-আবাদে আর কাম নাই কম্মোকার ভায়া। ও ডুলের ব্যবস্থাই বরং ভালো, কী বল হে?

সায় দেয় আর পাঁচজন।

রায়সাহেব বন্ধুমহলে ব্যঙ্গ করে বলেছেন কথাটা—বসে বসে ডোল খেয়েই সর্বনাশ হয়েছে এই রিফুজিগুলোর। খেটে খাওয়ার আর মন নেই! মরবে ব্যাটারা।

★ ★ ★

দামোদরের বাঁধের উপর দাঁড়িয়েছিল রত্নাকর ঘোষ। এ পাড়ে বালি-ধুধু দামোদরের চড়া, ওপারে দিগন্ত-জোড়া ধানের জমি। এখন অবশ্য মাঠে ধান নেই। নাড়া-মুড়ো পড়ে আছে সারা মাঠ জুড়ে। গাঁয়ের আদিম-বাসিন্দা—পশ্চিমবঙ্গের চাষী চাষ করেছে ওখানে এ মরশুমে। করবে আগামী বছরেও। ও সোনা-ফলানো জমিতে কোন অধিকার নেই এই উদ্‌বাস্তু চাষী পরিবারগুলির। একবার লুকিয়ে ঐ জমিতে ভাগে চাষ করতে গিয়েছিল রতন—চোখের জলে পালিয়ে বেঁচেছে। ক্যাম্প থেকে নাম কাটা যাবার দাখিল! বীরু গুপ্তের হাতে পায়ে ধরে কোনক্রমে বেঁচেছে এ-যাত্রা। নাকেকানে খত, আর এমন কাজ করবে না রতন। ডোল-ভুক রিফুজি আছে—তাই থাকবে বাকি জীবনের দিন ক'টা!

সেই ফাঁকা মাঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এসে গেল রতনের। জাতে সে গোয়ালা। দুধের কারবারেই ছিল তার জীবিকা—চাষও করত। শেষদিকে গরু কমিয়ে চাষের জমিই বাড়িয়েছিল। এখন না আছে দুধের ব্যবসা—না চাষের জমি। আজ সে ডোল-নির্ভর রিফুজিমাত্র। মনে পড়ে পনের-বিশ বছর আগের কথা। তখন ওর ভরা যৌবন। কমলপুরের মাঠে দিগন্তবিস্তৃত ধানজমিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেল চোখের সামনে। থই থই করত সোনালী পাকাধানে ভর্তি মাঠ। ভোরের আকাশে ভুক্কোতারা ডোবে কি ডোবে না পাকাধানের খেতে ঝাঁপিয়ে পড়ত গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো, কার্তিক-অগ্রাণ মাসে। ভোর-রাতে হিম হিম হাড়-কাঁপানো বাতাস বইত সিরসিরিয়ে। কানমাথা ঢাকত ওরা গামছার ফেটি দিয়ে। গাছের পাতা থেকে টুপ-টুপ

করে ঝরে পড়ত রাতে-জমা শিশির। ধানের গুছিতে জমে থাকা শিশিরে লাগত সূর্যের প্রথম আলো। সাত রঙা হাসিতে অমনি ঝিক্‌মিক করে সাড়া দিত ধানের মাঠ। পায়ে-চলা পথের উপর শিশির-ভেজা ধুলোর আস্তরণ যেন পলিমাটির পাটালি। পা পড়লে ফেটে যায়। গাঁয়ের সবকটা ছেলে-বুড়ো জমায়েত হত মাঠে—কাস্তে হাতে। ধান-কাটার দিন। কী আনন্দের সে সব দিন। রতনও আসত। আর আসত মাঠে তার খুড়ো ভীমা ঘোষ। ঘোষপল্লীর সবকটা মরদই জন খাটতে নামত মাঠে। শুধু কি ঘোষপল্লী? বায়েনপাড়ার পেল্লাদ, উপীন, যগন্দ, হরীশ, মাধাই—আসতো গোবর্ধন, নেপেন, সখারাম, ছিদাম, জয়হরি—আর কত নাম করব? সবাই চেনাজানা লোক। কোথায় হারিয়ে গেল সেই সব মানুষগুলো। হরীশ গেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরে; নেপেন আর ছিদাম ডাকাতি-কেসে মেয়াদ খাটতে গিয়ে আর ফেরেনি। আর জয়হরি গিয়েছিল উড়ো-জাহাজ নামার মাঠ তৈরি করার কাজে—ধুব্‌লে। সেখান থেকে কে-জানে কোথায় গেল মানুষটা! রতনও একবার ধুব্‌লে গিয়েছিল যুদ্ধের আমলে; গাঁয়ের যত জোয়ানমদ্দ সেবার ছুটেছিল উড়োজাহাজের আস্তানা তৈরির কাজে। ছ-ক্রোশ লম্বা সে আস্তানা, এমুড়ো থেকে ওমুড়োয় নজর ঠাওর হয় না। হাজার হাজার মুনিষজন খাটতে আসত সেখানে। টাকাটার কম মজুরি নাই। পাকাঘরে ওদের থাকতে দিত, অসুখ-বিসুখ হলে বিন্‌-পয়সায় ওষুধ পাওয়া যেত। ইয়া ঢাউস ঢাউস হাওয়া-গাড়িতে চাপিয়ে মজুরদের নিয়ে যেত এমুড়ো থেকে সে মুড়োয়। লালমুখো সাহেব চালাত সে সব ঢাউস-গাড়ি। মেজাজ খুশি থাকলে টিনবন্ধ খাবার—আধ খাওয়া বোতলের মদ বকশিশ দিত। গাঁয়ের জোয়ান মানুষগুলো সেবার দল বেঁধে চলে গিয়েছিল ধুব্‌লে। রায়কর্তা বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত দুমকা থেকে একদল সাঁওতাল আনিয়ে কোনক্রমে সে বছর মাঠের লক্ষ্মীকে মরাইয়ে তোলেন, মনে আছে।

কিন্তু সাঁওতাল আসার আগে আর পরে কমলপুরের ধান কাটত গাঁয়ের মানুষেই। তখন তো তারা অমানুষ পি. এল.-মার্কা হয়ে যায়নি! কী প্রকাণ্ডমানুষ ছিল এক-একটা। নেপেন, ছিনাথ, জয়হরি, ভীমা ঘোষ, আর—হ্যাঁ আরও একজন জোয়ান মানুষের ছবি ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। কচি শালের চারার মতো ডাঁটো উঠতি একটা জোয়ান মানুষ—নীলু, নীলাম্বর—মনুয়ার বাপ। মোল্লাহাটির তাহের আলির বাড়ি ডাকাতি-কেসে ধরা পড়ে সে। যাবজ্জীবন মেয়াদ হয়ে যায়। নীলাম্বর ঘোষ মুছে গেছে রত্নাকরের জীবন থেকে।

কথাটা আজও বিশ্বাস হয় না রতনের। ডাকাতি করতে যে কজনকে নিয়ে সে যাত্রা করেছিল তার ভিতর নীলুর যাওয়ার কথা নয়। নীলুকে এ কাজ রতন কোনদিনই করতে দিত না। তাছাড়া নতুন বিয়ে দিয়েছিল ছেলের—ঘরে কাঁচাকচি বউ। ডাকাতির পরদিন ঘোষপল্লীর সবকটা জোয়ান মরদই গ্রেপ্তার হল। রতন-নীলুও। একমাত্র রতন ঘোষই খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসে—কিন্তু মুক্ত করা যায়নি নীলুকে। তাহের আলির পুত্রবধূ সনাক্ত করেছিল তাকে একসার লোকের ভিতর। আশ্চর্য! অথচ রতন নিজেও জানত না ভূষোকালিমাখা যে কজন সঙ্গী নিয়ে আঁধার রাতের বুক চিরে সে দলপতি হয়ে যাত্রা করেছিল—সে দলে নীলুও ছিল। সে কথা জেনেছিল অনেক পরে। নেপেন

কবুল খেয়েছিল। নেপেনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিল নীলুর। সাজা হয়ে গেল নীলাম্বরের—আর ফিরে আসবে না সে। জেলের ভেতরেই শেষ হবে তার জীবন। মনে আছে ফুলটুসীর সেই বুকফাটা আর্তনাদ। নীলুর কচি বউ ফুলটুসী। আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূকে জানাবার মতো কোন সান্ত্বনার ভাষা জানা ছিল না সেদিন।

সেইদিন থেকে পাথর হয়ে গেছে রতন। ঘর শূন্য করে বড় ছেলে চলে গেল মেয়াদ খাটতে; ছোট ছেলেটা মারা গেল বিনা চিকিৎসায়। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে রতন হয়তো বাউল হয়ে বেরিয়ে পড়ত। পথে পথে মাধুকরী করে ফিরত। কিন্তু তা হয় না। মনুয়াকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব আছে। বুড়িটা আজও বেঁচে আছে। আর আছে নীলুর ডাগর বউটা—ফুলটুসী। আশ্চর্য মেয়ে! প্রথম যৌবনেই হারিয়েছে স্বামীর সান্নিধ্য। সিঁদুরটুকুই আছে। নইলে বিধবা ছাড়া আর কী? তবু গাঁয়ের আর পাঁচটা জোয়ান ছেলে কোনদিন তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়নি। ঐ নিরলস কর্মপটু নম্র পুত্রবধূর মুখ চেয়ে, মনুয়ার কথা ভেবে আবার বুক বেঁধেছিল রতন। পাপ কাজ ছেড়ে দিয়েছিল একেবারে। মন দিয়েছিল সৎপথে উপার্জনের। তাও বোধকরি সইল না ভগবানের। কেড়ে নিলেন জমি, গরু, বাড়ি। বউ, ছেলের বউ আর মনুয়ার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল একদিন অজানার উদ্দেশে। পিছনে পড়ে রইল ধান-থই-থই সোনালী-ক্ষেত, পুব-দুয়ারী মেঠো বাস্তু, ফলের বাগান আরও কত কী শখের জিনিস; তখন কি জানত গাঁ-ছেড়ে সেই যে চলে এল আর ফিরে যেতে পারবে না কোনদিন? তার আঙিনায় তুলসী-মঞ্চ বর্ষায় ফেটে ফেটে পড়বে—সাঁঝের পিদিম জ্বলবে না সেই তুলসীমুলে আর কোনদিন। কার্তিক মাসে তার ভিটের সামনে কদমগাছের মগডালে বাঁশ বেঁধে আর আকাশপিদিম জ্বালবে না কেউ—পিতৃপুরুষ অবাক হয়ে যাবে সেই ভুষো আঁধারের পানে তাকিয়ে! বলবে—তারা গেল কোথায়? কমলপুর আজ আর তার গাঁ নয়—সে পরদেশী সেখানে; সে ভারতবাসী—গৃহহীন যাযাবর! সে আজ পি. এল.। সদাশয় সরকারের স্থায়ী পোষ্য!

ভূষণ্ডীকাকের মতো কমলপুর গ্রামের উত্থানপতনের সাক্ষী হয়ে বেঁচেছিল সে এতদিন; আজও মরে বেঁচে আছে। তিনকুড়ি বয়স পার হয়ে গেল—তবু বার্ধক্য তো দূরের কথা, প্রৌঢ়ত্বও যেন এখনও ভাল করে দখলজারী করেনি তার ইস্পাতে-গড়া দেহখানি। কালো কষকষে গায়ের রঙ—কাঁধের মাংসপেশী সর্বদাই উঁচু হয়ে থাকে। লোমে ভর্তি ঢালের মতো দুই বুকের পাটা! দশাসই জোয়ান মানুষ। হাতের পাঞ্জা যেন বাঘের থাবা। খালিহাতে ওর পাঞ্জা ধরবে এতবড় বুকের পাটা ছিল না পাঁচখানা গাঁয়ের কোন মরদের। আর লাঠি হাতে? একটিমাত্র মানুষ শুধু এসেছে তার জীবনে যে লাঠি হাতে তার সামনে দাঁড়াবার তাগদ রাখত। সাহস তার দৈহিক শক্তিতে নয়, সাহস তার শিক্ষায়। লিকলিকে একহারা শঙ্কর মাছের চাবুকের মতো হিলহিলে একজন লাঠিয়াল—জনাবালি শেখ!

আঃ! অস্ফুটে একটা আর্তনাদ করে রত্নাকর। জনাবালি শেখ! লোকটা মারা গেছে চুয়ান্ন সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়!

দাঙ্গায় মরেছে তো অনেকেই! লঙ্কাকাণ্ডের লেলিহান অগ্নিশিখায় কত সংসারই

তো পুড়ে খাক হয়ে গেছে। বায়েনপাড়ার পেহ্লাদ বায়েন, মাধাই—ঘোষেদের সখারাম, তাঁতিপাড়ার ছিনিবাস যুগী আর চৌধুরীকর্তার জোয়ান মদ্দ ছেলেটাও তো জান দিয়েছে ঐ কাল-দাঙ্গায়। কিন্তু জনাবালির মৃত্যুটাই বুকে বেজে আছে রতনের। জনাবালি ল্যাঠিয়াল বলে নয়, জনাবালির সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে নতুন দেশে গিয়ে নতুন করে পত্তন নেবার প্রস্তাব করেছিল বলে নয়। রতনের মনে হয়, জনাবালির মৃত্যুর মধ্যে কেন যেন একটা লজ্জাকর ইতিহাস রয়ে গেছে। রতন নিজে সেখানে উপস্থিত ছিল না—থাকলে নিশ্চয়ই সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াত; তবু জনাবালির মৃত্যুতে যেন রতনেরই মাথা নিচু হয়ে যায়! দাঙ্গায় মরেছে তো কত মানুষ—কিন্তু ওর মতো মরে জিতল কে? একমাত্র সান্ত্বনা লাঠিহাতে জান দিয়েছে জনাবালি—তিনটি হিন্দুরমণীর ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে। আর একমাত্র দুঃখ এই যে, বেচারি মরেছে লাঠির ঘায়ে নয়, বুলেটের ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে। জান দিয়ে জনাবালি জবাব দিয়ে গেছে—সেই ধর্মান্ধ স্বার্থান্বেষীদের, যারা দ্বিজাতিতত্ত্বের জিগির তুলে একটা দেশকে জ্বালিয়ে খাক করে দিল। বীরের মৃত্যু জনাবালির!

নাঃ। সে দিনগুলোর কথা আর ভাবতে পারে না রতন। জনাবালির মৃত্যুর কথায় যেন জল এসে যায় পাষাণ রতনের চোখেও। কাটা-ধান লক্ষ্মীপুর গাঁয়ের নাড়া-মুড়ো-ভরা দিগন্ত-অনুসারী মাঠের দিকে তাকিয়ে কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে নেয় একবার। আজও হয়তো কমলপুরের মাঠ পাকাধানের সম্ভারে তেমনই থই থই করে। আজও হয়তো কাস্তে হাতে সে-মাঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পাকিস্তানের কৃষাণ। রতন জানে না তার জমিটা এখন কে ভোগদখল করছে। একখণ্ড বাঁশ বেদখল হওয়ায় সে মাথা নিতে চেয়েছিল জমিদারের। মাস্টারমশাই দিব্যি দিয়েছিলেন—তাই চৌধুরীবাড়ির পাঁচিল টপকে শুধু অকেজো করে চলে এসেছিল সাঙের বাঁশখানিকে, দখল সে ছাড়েনি। আর আজ হয়তো মোল্লাহাটির রহিম, তোরাব অথবা আলিজান মিঞা নির্বিবাদে তার খেতে ফসল ফলাচ্ছে। পাকা ধানের গুছি বাঁ হাতে চেপে ধরে কাস্তে চালাচ্ছে ডান হাতে—হেঁস, হেঁস, হেঁস! নিলাজ কুলটা ভূমি নেমকহারামের মতো ভারা ভারা ধান ভেট পাঠাচ্ছে তার গোলায়। আর পাঁচখানা গাঁয়ের লোক যাকে এক ডাকে চিনত সেই রত্নাকর ঘোষ এদিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ডোল-অফিসের সামনে, র‍্যাশনব্যাগ হাতে। পাঁচপো চালের ভাত না হলে যার দুবেলা পেট ভরত না তাকে কিউ-সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা—হপ্তাপিছু একসের চাল, একসের আটা আর সাত পো ডালের প্রত্যাশায়!

কমলপুরের ধানকল এসেছিল হাল-আমলে। ধানকল তো নয়, জাঁতিকল। চৌধুরীকর্তা গাঁয়ের বুকে কী কালসাপই এনেছিলেন ব্যবসায়ের খাতিরে! ধানকলের পথ বেয়েই গাঁয়ে এসে প্রবেশ করেছিলেন শনিঠাকুর। সুচ হয়ে ঢুকেছিলেন—ফাল হয়ে বের হলেন! তা সে যাই হোক—ধানকলের আগের যুগটাই ছিল শান্তির যুগ। সে আমলে, মনে আছে রতনের, ঘরে ঘরে ঢেঁকি ছিল। ভুল্কোতারা ডোবে কি না ডোবে, পাড় পড়ার আওয়াজ উঠত এ-চালা ও-চলা থেকে। কমলপুর গাঁয়ে যদি কোনদিন রাত কাটাতে তাহলে টের পেতে। ফাগুন-চোতে ভোরবেলা ঘুম ভাঙতো তোমার দোয়েলের

ডাকে—কার্তিকমাসে নিতাই বোরেগী, হাল-আমলে ছিদাম বোরেগীর রামকেলী গানে আর অঘ্রাণ মাসে এই ঢেঁকিশালের ঢকাটাঁই-টাঁই আওয়াজে! সারাদিন পালা করে ধান কুটতো গাঁয়ের মেয়েরা। সে আওয়াজ থামত সেই দোকর করে শেয়াল ডাকলে। সব ঘরেই কিছু ঢেঁকি ছিল না। ঘোষপাড়ায় ছিল যেমন শুধু রতনের উত্তর-দুয়ারী ঢেঁকিশালে। ঘোষপল্লীর মেয়েরা সবাই আসত মোড়লের ঘরে। ধান মেপে দিত। চাল মেপে নিত। কত ধানে কত চাল যে জানে না সে গাঁয়ের মেয়েই নয়। সারাদিন মেয়েলী জটলা লেগে থাকত ঢেঁকিশালকে কেন্দ্র করে। রতন গৃহস্বামী, তবু তার নিজেরও সে ঘরে তখন প্রবেশাধিকার থাকত না। শুধু রতন নয়, কোন পুরুষমানুষই তখন ভিড়ত না সে দিগড়ে। মেয়েলী ঠাট্টা-মশ্‌করা লেগেই থাকত ঢেঁকিশালে। কোন মরদ যদি ভুলে পা বাড়াত সে পথে—তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে সে পালাবার পথ পেত না।

একদিনের কথা মনে পড়ছে রতনের। পৌষ-সংক্রান্তির কাছাকাছি একটা দিন। টুসুর গুঞ্জন উঠছে এ-বাড়ি ও-বাড়ি—মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে। খেয়াল-খুশির খাটুনি-ছাড়া খাটো দিন। কাটা ধান সব খামারে উঠেছে। পুরুষদের বিশেষ কাজ নেই এ কদিন। এখন যা কিছু কাজ তা ঐ মেয়েমহলে। তারপর আবার ক-হপ্তা পরেই মালকোঁচা সেঁটে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কাজের বিলে। কৃষাণভাইদের মাঠের পাঠশালায় এটা বড় ছুটি। এখন শুধু উৎসব, গল্পগুজব, টুসুর গান আর পৌষপার্বণ। ছোট ছেলেরা করছে পৌষালী চড়ুইভাতি—'হোল-বোল-ঠ্যাঙা-ঠোল'। মেয়েরা পৌষ পিঠে। ঢেঁকিশালের উল্টোদিকে দখিন-দুয়ারি বড় ঘরের দাওয়ায় থেলো-হুঁকো হাতে রতন বসেছিল একটা কাঁঠালকাঠের খাটো জলচৌকিতে। মাঝে মাঝে মনের খুশিতে গুড়ুক গুড়ুক টান দিচ্ছে তামুকে। ঢেঁকিশাল থেকে কলকণ্ঠে হাস্যরোল ভেসে আসছে থেকে থেকে একটানা ঢকা-টাঁই আওয়াজকে ছাপিয়ে। হঠাৎ লক্ষ্য হল, গুলাব-বউ ঘরের ভিতর জল গড়িয়ে খাচ্ছে। তৃষ্ণা পেয়েছিল রতনের—সে গুলাবের কাছে একটু জল চায়, বড় তিয়াস্ লাগছে বড় বউ, আমারেও টুক জল দাও সে।

উত্তরে কবাটের ওপাশ থেকে শোনা গেল একটি অনুচ্চ নারীকণ্ঠ, মরণ!

রতন তখন লক্ষ্য করে দেখে, ঘরের ভিতর জল খাচ্ছে—গুলাব বউ নয়, যগন্দের বউ। লজ্জা পেয়েছিল বেচারি। কথাটা গোপন থাকেনি। সেবার টুসুর গানে পর্যন্ত সে কথার উল্লেখ ছিল। যগন্দ ঠাট্টা করে বলেছিল, তোমার ঘরে ধান ভান্‌তি বউ পাঠাই সে কি তোমার তিয়াস্ মিটাবার লেগে নাকি মোড়ল? বোঠানের হাতে জল খায়ে তিয়াস্ ম্যাটে না তোমার?

যগন্দের সঙ্গে রতনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাই সেও জবাবে বলে, তাই কি ম্যাটেরে যগন্দ। অমন শাঁখাপরা মিষ্টি হাতের জল-টুক, লুভ লাগে বইকি।

টেঁপী ছিল কাছেই, ফস্ করে বলে বসে—অ! দিদিমার ঠেঙ্গে জল চাইছিলা বুঝি রতনদাদু! হায় কপাল, দিদিমা আমার তা বোঝে নাই। জলের তিয়াস তা বোঝে নাই। ভাবছিল অন্যকিছুর তিয়াস্ বুঝি। পান খাইছিল কিনা দিদিমা!

ঘরের ভিতর থেকে যগন্দর বউ, টেঁপীর দিদিমা পুনরুক্তি করেছিল : মরণ!

টেঁপীর সঙ্গে রতনের ঠাকুরর্দা-নাতনির সুবাদ। যগন্দ তার বন্ধুস্থানীয়, বলে রতনদাদুর সঙ্গে রসিকতা করার হক আছে টেঁপীর কিন্তু তাই বলে এমন অশ্লীল ঠাট্টা করবে সে? মেয়েটা ভারি জ্যাঠা! পালাবার পথ পায়নি দশাসই জোয়ান রতন-মোড়ল।

কিন্তু টেঁপী!

রতনের মধুর স্মৃতিচারণ স্তব্ধ হয়ে যায় আবার। মনে পড়ে যায় টেঁপীর কথা। চওড়া-পাড় শাড়ি পরতে ভালবাসত টেঁপী, কপালের মাঝখানে পরত মোটা করে সিঁদুরের টিপ। নতুন বিয়ে হয়েছিল ওর, হাতে ঝলমল করত চারগাছা করে ব্রোঞ্জের চুড়ি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে রতনের চোখের সম্মুখে যে মূর্তি উঠ্‌ল—সেটা টেঁপীর এই কমলামূর্তি নয়। রক্তের ধারাস্রোতে ভূ-লুণ্ঠিতা হৃতসর্বস্ব টেঁপীর সেই নিরাবরণ মূর্তিটা মনশ্চক্ষে ভেসে উঠ্‌তেই আর্তনাদ করে উঠল রতন—আঃ, আঃ!

★ ★ ★

টেঁপী নেই। মারা গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। প্রাণ তো অনেকেই দিয়েছে। বায়েনপল্লীর বায়েন গেছে, মাধাই গেছে, পদ্ম গেছে,—সখারাম, গোবিন্দ, ছিনিবাস, জনাবালি, শ্রীপতি চৌধুরী। সকলেই বরণ করেছে রক্তক্ষয়ী যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। পাট-খেতের ভিতর উপীন বায়েনের মৃত্যুটাও বীভৎস—প্রহ্লাদ বায়েনের মুণ্ডটাই শুধু দেখেছিল রতন—বাকি দেহটা দেখেনি। শিরোমণি মশায়ের যন্ত্রণাটাও মরণান্তিক; কিন্তু টেঁপী তো শুধু প্রাণই দেয়নি—দিতে বাধ্য হয়েছিল আরও কিছু—যার কাছে নাকি প্রাণও তুচ্ছ! রতন ঘোষ নামকরা ডাকাত। বীভৎস দৃশ্য তার মনে দাগ কাটে না। অনেক রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের সাক্ষ্যই শুধু নয়, নায়ক সে। দাঙ্গার রাত্রে তো বটেই—তার আগেও সে নিজে হাতে মানুষের প্রাণ নিয়েছে। চোখের উপর মানুষকে মুণ্ডহীন হতে দেখেছে—কাটা-পাঁঠার মতো ধড়ফড় করা মানুষকে লাশ হতে দেখেছে। এহেন পাষাণ রতনও মধ্যরাত্রে শিউরে ওঠে আজ যখন দুঃস্বপ্ন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই দৃশ্যের সামনে।

দাঙ্গার কালরাত্রির অবসানে রতনই প্রথম বেরিয়ে এসেছিল পাট-খেত থেকে। চার হাত লম্বা লাঠিখানা ধরে ঘুরেছিল ঘরে ঘরে। যগন্দের বাড়িতে এসে ডেকে কারও সাড়া পায়নি। সস্ত্রীক যগন্দ তখনও ফিরে আসেনি নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে। কে কোথায় লুকিয়েছে কে জানে। টেঁপী আর গোবিন্দ পালাতে পারেনি। ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল ওরা দুজন, আর ওদের একবছরের একটি বাচ্চা। যারা ওদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল তারা বুঝতে পেরেছিল এ ঘরে মানুষ আছে। নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার শুনেছিল তারা এ ঘরের ভিতর থেকে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে জানলা দিয়ে আত্মরক্ষার লড়াই করেছিল গোবিন্দ। স্ত্রীর ইজ্জত আর সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে একা হাতে লড়াই করেছিল বেচারি। শেষ রক্ষা করতে পারেনি। দরজার আগল ভাঙেনি, খুলে গিয়েছিল একখানা তক্তা। সেই ছিদ্রপথে ওরা চালিয়েছিল সড়কি। তারপর দরজার আগল ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল একদল সশস্ত্র জানোয়ার। তখনও প্রাণ ছিল গোবিন্দের—কিন্তু সড়কি-বিদ্ধ মানুষটার বাধা দেওয়ার আর ক্ষমতা ছিল না। আর্তনাদ করে ঘরের কোণে আশ্রয়

নিয়েছিল টেঁপী, একবছরের শিশুপুত্রটিকে বুকে চেপে ধরে। কিন্তু রেহাই পায়নি। উল্লাসে চিৎকার করে উঠেছিল দলবদ্ধ মানুষগুলো। সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়েছিল মায়ের কোল থেকে। প্রতিরোধের কোন পথ খুঁজে পায়নি হতভাগ্য মেয়েটি। দশজোড়া দুঃশাসনের আকর্ষণে ঘরের কোণ ছেড়ে আসতে হল মাঝখানে। তারপর শুরু হয়েছিল ওদের উন্মাদ এক খেলা। দশবারোজন মানুষ তার বিবস্ত্র দেহটা নিয়ে লোফালুফি করেছে সমস্ত রাত! সড়কি-বিদ্ধ স্বামীর মৃতদেহের উপর নিরাবরণ হতভাগিনী টলে পড়েছে বারে বারে—টেনে তুলেছে ওরা আবার। কেউ তাকে ছোরা মারেনি, কেউ তার গলা টিপে ধরেনি—শুধু আদর করেছে, সোহাগ করেছে! তবু রক্তক্ষয়ী মৃত্যু হয়েছিল টেঁপীর—রাতের শেষপ্রহরে। দশবারোজন মানুষ পালা করে তার দেহ থেকে দোহন করেছে পৈশাচিক উল্লাসের রসদ!

রত্নাকর যখন তাকে আবিষ্কার করে তখন সর্বাঙ্গে সোহাগের চিহ্ন নিয়ে পড়ে ছিল হতভাগিনীর নিরাবরণ নিষ্প্রাণ দেহটা রক্তের ধারাস্রোতে। আর সবচেয়ে বীভৎস তার নখর-ক্ষত-চিহ্ন-লাঞ্ছিত বুকে মুখ দিয়ে অমৃত আস্বাদনের চেষ্টা করছে তখনও তার শিশুসন্তান! তার মাথায় গালে মুখে লেগেছে—মায়ের বুকের রক্ত!

দামোদরের বাঁধের উপর পদচারণ করতে থাকে রত্নাকর ঘোষ। না। ভুলতে হবে। সে সব দিনের কথা একেবারে মুছে ফেলে দিতে হবে মন থেকে। মাঝের কটা দিন আসেনি তার জীবনে। দাঙ্গার দিন কটা! তার আগেকার মধুর দিনগুলোই তার জীবনে শুধু সত্য। কী যেন ভাবছিল রতন? হ্যাঁ—ধানকোটার দিনগুলোর কথা। কী আনন্দের ছিল সেসব দিন। ঢেঁকিশালকে কেন্দ্র করে কত মজার মজার ঘটনাই না ঘটে গেছে ওদের গ্রাম্যজীবনে। মনে পড়ছে আর একটা দিনের কথা।

সেটাও পৌষমাস। ধানকোটার রোদ-পালানো ছোট্টদিন। পাঁচ-ভিটের মেয়ে এসেছে ঘোষ-মোড়লের বাড়ি। ধান কুটছে ওরা; গল্প-গুজব হাসি মশকরায় মশ্‌গুল হয়ে আছে নিজেদের মধ্যে। হঠাৎ রতনের নজরে পড়ে ঢেঁকিশালের মধ্যে একঘর ঝিউড়ি-বউড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন জোয়ান মরদ! পাগড়ি বেঁধে মালকোঁচা সেঁটে একজন বেঁটে মানুষ একটা খেলো হুঁকো হাতে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে; আর মেয়েগুলোই বা কী বেহায়া—হেসে বারেবারে লুটিয়ে পড়ছে এ-ওর গায়ে। রাগে টং হয়ে গিয়েছিল ঘোষ! কে ঐ হতভাগা? কী বলে বেহায়ার মতো গিয়ে ঢুকেছে ঐ ঢেকিশালে—পাঁচভিটের মেয়েরা যেখানে হৈ-হুল্লোড় করছে! ঘোষপাড়ার মাতব্বরের সহ্য হয়নি এ অনাচার! রে-রে করে গিয়ে পড়েছিল ঢেঁকিশালে : কে রে! কোন সুম্বুন্ধির পো ঢুকিছে ঢেঁকিশালে!

দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছিল মানুষটা। তবু তাকে চিনতে পেরেছিল। পেল্লাদ-বায়েনের মা-মরা ন্যাওটা মেয়েটা—পদ্ম!

আহ্! আহ্! আবার মোচড় দিয়ে উঠছে পাঁজরের মাঝখানে। আবার মনে পড়ে যাচ্ছে সব কথা! স্মৃতির হাত থেকে বুঝি ওর নিস্তার নেই! প্রহ্লাদ সহ্য করতে পারেনি আঘাতটা। লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে আত্মহত্যা করেছিল!

ফুটফুটে ঐ একহারা মেয়েটা বুকের পাঁজরের চেয়েও আপন ছিল বায়েনের। কতই

বা বয়স হবে ওর? পনের-ষোলো? নিকষ-কালো বায়েন-পল্লীতে কোথা থেকে এমন ফুটফুটে মেয়ে জন্মাল ভেবে পায়নি বায়েন। অতি শৈশব থেকেই বাপের ভারি ন্যাওটা ছিল পদ্ম। ওর জন্মের পরেই ভেঙে পড়ে ওর মায়ের স্বাস্থ্য। দিনরাত বায়েনকে গাল পাড়ত বসে বসে; এতটুকু বয়েস থেকেই এই মেয়ের কাছে আশ্রয় নিতে আসত প্রহ্লাদ। বাপ-বেটিতে বক্‌বক্ করত সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের পিদিম জ্বেলে। শেষে বাপের কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত পদ্ম। তিল তিল করে মেয়েকে মানুষ করে তুলছিল বায়েন। অর্ধেক দিনই ভরপেট অন্ন জুটতো না অভাবী মানুষটার—তবু আধপেটা খেয়েও পাতে ভাত রেখে উঠে পড়ত দশাসই জোয়ান লোকটা; ও-কটি ভাত পদ্ম খাবে। সরি বলত, মেয়ের লেগে ভাত রাখছি বাপু, ও-কটি তুমিই খেয়ে লেও! বায়েন হাসত, কথা বলত না। সরি রাগ করে বলল, আ মরণ, মিয়ে জান কারও হয় না!

সত্যিই এমন মেয়ে কখনও কোথাও দেখেনি বায়েন। এমন মেয়ে হয় না, ভাবত সে। সে যেন এক অপার বিস্ময়—হাঁটতে গেলে সে ছোটে, কথা কইতে গেলে যেন গান গেয়ে ওঠে! কথায় কথায় বাপের বুকে মুখ লুকায়, খিলখিলিয়ে হাসে। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল—ফুটফুটে সুন্দর হরিণবাচ্চর মতো।

অবাক বিস্ময়ে একদিন আবিষ্কার করল বায়েন—মেয়ে তার বড় হয়ে উঠেছে। সরিই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এদিকে। পাড়ার ছেলেরা নাকি রঙ্গরসিকতা করে। ফ্রক ছেড়ে এবার শাড়ি পরাতে হবে পদ্মকে। প্রহ্লাদ ছুটেছিল নায়েব হরিহরের কাছে পূজার বায়নার আগামের সন্ধানে। মেয়ের জন্য শাড়ি কিনবে।

দাঙ্গার আগেই মারা গিয়েছিল সরি। মেয়েকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছিল বায়েন। ওর শখের মধ্যে ছিল দা-কাটা তামাক আর মেয়ের গান। ভারি মিষ্টি সুরেলা গলা ছিল পদ্মর। সন্ধ্যেবেলায় এক ছিলিম তামাক আর মেয়ের গান না হলে রাতে ঘুমই আসত না বায়নের। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বায়েন এসে বসত তার দাওয়ায়—পদ্ম এসে বসত বাপের পাঁজর ঘেঁসে। মা-হারা মেয়েটির মাথায় বিলি দিতে দিতে বায়েন বলত, সিই গানটো গা দিকিনি—সিই শ্যামা মায়ের পায়ের তলায়...

পদ্ম ঠোঁট উলটে বলত, ফের শ্যামা মা! কেনে, এ কটা মায়েরে মনে ধরে না তুর?

হা-হা করে ঠারে ঠারে হাসত বায়েন, কী পাগলি মেয়েরে তু, এ্যাঁ? জগজ্জননীরে হিংসে করিস তু?

এই পদ্মকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল মোল্লাহাটির গুণ্ডারা—সেই দাঙ্গার রাত্রে। আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দাঙ্গার রাত্রে প্রহ্লাদের ঘুম ভেঙেছিল মেয়ের আতঙ্কভরা ডাকে। ঘুম ঘুম চোখে উঠে দেখে চারপাশে আগুন। দুরন্ত ভয়ে বাপের বুকে মুখ লুকিয়েছিল কিশোরী পদ্ম।

বায়েন বলেছিল—শিগ্‌গির বাইরে চ—আগুন লাগিছে মনে লাগে।

—না। দৃঢ় আলিঙ্গনে বাপকে জড়িয়ে ধরেছিল পদ্ম : আগুন লাগে নাই, ডাকাতি হতিছে।

—ডাকাতি হতিছে!—বায়েন পাড়ায়!—কথাটা বিশ্বাস হয়নি প্রহ্লাদের। হওয়ার

কথাও নয়। শ্রাবণ মাস। সমস্ত বায়েনপল্লী বন্যাবিধ্বস্ত খড়ে নদীর চড়া ত্যাগ করে এসে আশ্রয় নিয়েছে চাঁপাডাঙার মাঠে। ওদের এই অস্থায়ী গাছতলার সংসারে এমন কোন সম্পদ নাই যে, ডাকাত পড়বে এখানে। মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল ছাপরা ছেড়ে, পরী কনে গেল?

—মাসি পলাইছে!

আগুন, আগুন—চতুর্দিকে লেলিহান অগ্নিশিখা—সমস্ত গ্রাম পুড়ছে। জ্বলন্ত মশাল হাতে ছুটোছুটি করছে কতকগুলো মানুষ। আর্ত চিৎকার শোনা যায় এপাশে-ওপাশে। প্রহ্লাদের মনে হল সে কি স্বপ্ন দেখছে নাকি?

মশাল-হাতে মানুষগুলো এবার ওদের দেখতে পেয়েছে। ছুটে আসে এদিকেই। এবার একটু ভরসা পায় বায়েন—ঐ তো রহিমচাচার ভাইপো ফজলু মিঞা—ঐ তোরাব, মনিরুদ্দি, আলিজান। প্রহ্লাদ হাঁকাড় পাড়ে—ও মিঞাভাই—বলি ব্যাপারডা কী?

ভুল হয়েছিল বেচারি বায়েনের। ভুল সামান্যই এবং হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। পল্লীপ্রান্তের এই হতভাগ্য অশিক্ষিত মানুষটা খবরের কাগজ পড়ত না—দ্বি-জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও বক্তৃতাও শোনেনি কখনও। গোমাতার চিকিৎসা, চামড়ার কারবার, দা-কাটা তামাক আর কিশোরী মেয়ের গানেই মশগুল হয়ে ছিল। সরির মৃত্যুর পর বড় একটা বের হত না ঘর থেকে তাই আন্দাজ করতে পারেনি—'ও মিঞাভাই' বলে যাদের ডাক দিল তারা ইতিমধ্যে এভাবে বদলে গেছে! বুঝতে পারে ভুলটা মুহূর্ত পরেই।

বিশাল ছাতিমগাছটার সঙ্গে ওরা পিঠমোড়া করে বাঁধল প্রহ্লাদকে। অসুরের মতো বলশালী মানুষটাকেও শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে হল পাঁচসাতজন সশস্ত্র পিশাচের কাছে। বোবা জন্তুর মতো আর্তনাদ করা ছাড়া আর কোন প্রতিবাদের ক্ষমতা থাকল না ওর। ফুলের কুঁড়ির মতো যে ছোট্ট মেয়েটিকে পাপড়ি মেলতে দেখে প্রহ্লাদ ছুটেছিল নায়েবের দরবারে—আটহাতি এক শাড়ি কিনবার টাকার সন্ধানে—সেই মেয়েটিকে এবার ধরল ওরা। ঘর-জ্বালানো মশালের আলোয় প্রহ্লাদের চোখের সম্মুখে ওরা একে এক...

প্রহ্লাদ অভিশাপ দিয়েছিল ঈশ্বরকে—কেন সৃষ্টিকর্তা ওকে জন্মান্ধ করেননি। পদ্মর আর্ত চিৎকার শুনে বুড়োরাজাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল—কেন তাকে জন্মবধির করেনি ঈশ্বর!

পরদিন দাঙ্গাবিধ্বস্ত গাঁয়ের মানুষ এসে উদ্ধার করল ওকে। ছাতিমগাছ থেকে বাঁধন খুলে নামাল প্রহ্লাদকে। পদ্মর পরনের আট-হাতি শাড়িখানা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল বায়েন ছাতিমগাছের গুঁড়ির সঙ্গে। রক্তে ভেসে গেছে প্রহ্লাদের মুখ। প্রহ্লাদ কাঁদেনি। হাহা-করা রক্তাক্ত হাসি হেসে উঠেছিল ছাড়া পেয়ে। কারও নামে কোন অভিযোগ আনেনি প্রহ্লাদ। তোরাব, মনিরুদ্দি, আলিজান কারও নাম করেনি। কারও নামোচ্চারণের আর অবস্থা ছিল না তার। যাবার আগে এই নিরক্ষর বায়েনের জিবটা ওরা কেটে নিয়ে গেছে। অন্ধ করেনি,—বিবস্ত্র পদ্মের সর্বনাশ সে দেখেছে দু' চোখ

মেলে মশালের আলোয়! বধির করেনি—শুনেছে ভয়ে-অপমানে যন্ত্রণায় তার ফুলের মতো ফুটফুটে মেয়েটির আর্ত চিৎকার। শুধু মূক করে রেখে গেছে ওরা বায়েনকে। প্রয়োজন ছিল না কিন্তু। কারও নামে কোন অভিযোগ আনতে পারত না বায়েন বাকযন্ত্র অক্ষত থাকলেও।

সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল প্রহ্লাদ বায়েন—একরাত্রে।

পরী তার জিবে মলম লাগাতে এলে সে কামড়ে দিত—হি হি করে হাসত!

রতনের মনে আছে গ্রাম ছেড়ে যাবার জন্য সবাই যখন প্রস্তুত হল তখন প্রহ্লাদও ছিল সেই দলে। পাগলাটার মাথায় মস্ত এক বোঁচকা। কাজের জিনিস ছিল না কিছু তাতে। ছিল খেলাঘরের মাটির হাঁড়ি-কুড়ি; কাঠের পুতুল, তালপাতার ভেঁপু, পুঁথির মালা—কতকগুলো ছেঁড়া ফ্রক আর মাথার ফিতে রিবন। জিবের ঘায়ের জন্যই হোক অথবা পাগলের খেয়ালেই হোক—সারাটা পথ জলস্পর্শ করেনি। কেউ কোন প্রশ্ন করলে হি হি করে হেসেছে শুধু। দর্শনা পর্যন্ত এসেছিল দলের সঙ্গে। তারপর ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়।

দিনকয়েক পরে রতনই সনাক্ত করেছিল প্রহ্লাদ বায়েনের মুণ্ডটা।

রেলে মাথা পেতে দিয়েছিল পাগলা!

পাষাণ রত্নাকর চেষ্টা করে ভুলে থাকতে। পারে না। পাষাণে সহজে দাগ পড়ে না ; কিন্তু যদি একবার আঁচড় পড়ে পাষাণফলকে তবে তা সহজে উঠতেও চায় না। দামোদরের বাঁধের উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রত্নাকর। এই দুস্বপ্নের হাত থেকে কি সত্যিই তার নিস্তার নেই? সে কি ভুলে যেতে পারে না সেই রক্তক্ষয়ী দিনগুলোকে? আর সকলেই তো ভুলে যাচ্ছে, ভুলে যাবে। তবে সেই বা কেন পারবে না? ঐ তো উপীনের দ্বিতীয় পক্ষের ডবকা বউটা—কাঞ্চন; সে আর কাঁদে না তেমন ইনিয়ে-বিনিয়ে। পাড়ার পাঁচজন বলে ক্যাম্প-ক্লার্ক বীরু গুপ্তের সঙ্গে ওর কী একটা নেপথ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। লটের সবচেয়ে ভাল শাড়িখানা, কম্বলখানা বীরু গুপ্ত সরিয়ে রাখে উপীনের বিধবার জন্যে। কে জানে কোন নিরুদ্দেশের পানে ভেসে চলেছে মেয়েটা। আর শুধু কি একা কাঞ্চনই পড়েছে এই লোভে। ক্যাম্পের কত মেয়েই তো পা বাড়িয়েছে এ পথে। ওদের আজকের প্রয়োজনের তীব্রতা ঢেকে দিয়েছে আগামী দিনের শুভচিন্তা। ক' বছর আগে হলে হুঙ্কার দিয়ে হাজির হত রত্নাকর—ঘোষপল্লীর আনাচে-কানাচে কাউকে ঘুরঘুর করতে দেখলে যেমন হুঙ্কার দিয়ে উঠত। আজ আর উৎসাহ পায় না। যা পারে করুক ওরা। কতদিক দেখবে রতন? উপীনের বউ ভুলে গেছে উপীনকে। যায় যাক, ক্ষতি নেই। উপীনের বউ আমল দেয় বীরু গুপ্তকে। তার মধ্যে কতটা অভাবের জ্বালা আর কতটা স্বভাবের তা যাচাই করে দেখতে চায় না রতন। বাঁধা-গরু মুখ বুঁজে মার খায়, সহ্য করে। রতন দেখেও চোখ বুজে থাকে।

নবীন যুগীও ভুলে গেছে তার পুত্রশোক। ছিনিবাস পৃথক সংসার করেছিল—তবু সন্তান তো। নবীনের বউ সর্বাণীর সে কী বুকফাটা কান্না। তবু তো ছিনিবাস তার সতীন-পো! কিন্তু ঐ পর্যন্তই। দাঙ্গার এক বছরের মাথায় একটি বাচ্চা হয়েছে নবীনের। আবারও নাকি আসছে এক ভাগীদার নবীনের সংসারে।

ওরা সবাই যদি ভুলে থাকতে পারে তাহলে রতনই বা পারবে না কেন? তার তো বউ, ছেলের বউ, নাতি—কিছুই খোওয়া যায়নি দাঙ্গায়। জমি-বাড়ি বেহাত হয়েছে, দেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে—কিন্তু একেবারে তছনছ হয়ে যায়নি তার সংসার। চৌধুরী-কর্তা, রসিকলাল, পেল্লাদ, উপীন, যগন্দের তুলনায় তার ক্ষতির খতিয়ান তো অতি সামান্য। তবে সে কেন ভুলতে পারে না? সে কেন মধ্যরাত্রে উঠে পায়চারি করে অর্ধোন্মাদের মতো? ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে কেন? ঈশ্বর তো করুণাময়। তারও তো হতে পারত ঐ রকম অবস্থা! দশ বিশজন জোয়ান মরদ যদি তাকে শালখুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনেই পদ্ম অথবা টেঁপীর মতো মনুয়ার মাকে নিয়ে...

শিউরে ওঠে রত্নাকর। অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে বলে : হে বুড়োরাজা, হে শিবঅ! তুমি আমারে ভুলায়ে দাও—লইলে টানি নাও আমারে। আমি আর এ জ্বালা বইতে পারতেছি না ঠাকুর।

দিবাকরও ভুগছে ঐ একই রোগে। রতনের রোগে। পাঁচ-সাত বছর হয়ে গেল, তবু ভুলতে পারে না সেই দাঙ্গার দিনগুলোকে। কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে দাঙ্গার পর। একা মানুষ। থাকে নবারুণ প্রেসের কাগজের আড়তে। খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজও জুটেছে একটা। প্রুফ দেখা। ঐ প্রেসেই। মধ্য কলকাতার ঘিঞ্জি অঞ্চল। দিনের বেলাতেও লাইট জ্বেলে প্রুফ দেখতে হয়। গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে ছোটাছুটি করে ইঁদুর, ছুঁচো আর আরশোলা। কম্পোজিটর মুরারিবাবু বলেন, কী ব্রাদার? হইব নাকি হপ্‌কপ?

দিনে আটদশ কাপ, অর্থাৎ যোলো-বিশ হাফকাপ চা খান ভদ্রলোক। আর খান বিড়ি। দিবাকর বলে, আবার? এইমাত্র তো হল এক কাপ।

—এ ছাড়া আর কী আছে কন জীবনে?

মুরারিবাবুও উদ্‌বাস্তু, গ্রাসাচ্ছাদন করছেন নবারুণ প্রেসের কল্যাণেই।

প্রুফ দেখতে দেখতে স্বল্পালোকে চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। চোখটা বুজে একটু বিশ্রাম করতে হত। চোখ বুজলেই কিন্তু ফুটে ওঠে সেইসব দৃশ্য—যেগুলো ও ভুলতে চায়।

পাটের খেতের এক হাঁটু কাদার মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে আতঙ্ক-তাড়িত একদল মানুষ। আর চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলে যাচ্ছে তাদের গ্রাম, তাদের বাড়িঘর, গোলাভরা ধান! এ আক্রমণের আশঙ্কা ওরা করেনি। পাশাপাশি, সহস্রাব্দির নিরাপদ বসবাস তাদের আশ্বস্ত করেছিল। তারা আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। মধ্যরাত্রে হঠাৎ আক্রমণে ওরা দিশেহারা হয়েছে। আশ্রয় পাটখেতের মধ্যে নিতান্ত প্রাণরক্ষার তাগিদে। দিবাকর একবার ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়েছিল। শক্ত করে ওকে ধরে রেখেছিল রতন ঘোষ। বিসর্জনের দিনে ভাই-ভাই একদিন লাঠালাঠি করতে চেয়েছিল। সে অঘটন ঘটতে দেয়নি দিবাকর। দুপক্ষের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে রুখেছিল সে

রক্তক্ষয়ী গৃহবিবাদ। এবার কিন্তু সে রুখতে পারল না দুর্দৈবকে। সমস্ত রাত একহাঁটু কাদার মধ্যে বসে থাকতে হল নিরুপায়ের মতো। দূর থেকে কানে এসেছে আর্তনাদ—পুরুষ ও নারীকণ্ঠের। চৌধুরীবাড়ি থেকে শোনা গেছে বারেবারে বন্দুকের আওয়াজ। চোখের উপর কিছু দেখেনি—সে দেখা দেখতে হল পরদিন! মোল্লাহাটির মানুষ কমলপুরকে একরাত্রে শ্মশান করে দিয়ে গেল।

দু-দুবার আক্রান্ত হয়েছিল গ্রাম। দ্বিতীয়বারের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেনি দিবাকর। তার আগে প্রথম দলেই সে রওনা হয়েছিল বার্নপুরের দিকে। ওর দলেই চলে এসেছিলেন ননীমাধব, হৃদয় ঘোষ, এসেছিল ঘোষপাড়ার সকলে, নবীন, দ্বিজপদ—গোটা পালপাড়া। প্রায় প্রতিদিনই দু-দশঘর রওনা দিচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে। জনস্রোত চলেছে হাঁটাপথে—কাঁধে বোঁচকা, কাঁকালে শিশু, বুকভরা সন্ত্রাস। রাত কাটাতে হয়েছে জঙ্গলে আর পাটের ক্ষেতে। দূরে-অদূরে গ্রাম তখনও পুড়ছে—আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠছে আকাশ। মাঝে মাঝে আর্তনাদ আর ধর্মের জিগির।

একরাত্রের লঙ্কাকাণ্ডের পর শুরু হল পলায়ন-পর্ব। দিবাকরও চলে এসেছিল ওদের সঙ্গে। এই দুর্ঘটনাকে সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলেই ধরে নিয়েছিল—জানত না সেই দেশত্যাগই ওর চিরনির্বাসন। বিকিয়ে গেল জন্মভূমি।

মুরারিবাবু অবাক হয়ে বলেন, কন্ কী মশয়, মার খায়্যা ব্যাবাক পলায়ে আইলেন—লড়লেন না অগোর সাথে?

দিবাকর বলে, আপনারাও তো পালিয়ে এসেছেন।

মাথা নাড়েন মুরারিবাবু, লড়ায়ে হারজিত আছেই! লড়াই দিছি, তখন হটছি।

মুরারিবাবু তখন গল্প করতে থাকেন—তাঁদের প্রতিরক্ষার গল্প। ঢাকা, বরিশাল, মৈমনসিংহের গল্প। গল্প নয়, সত্য কাহিনী। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, আর তার পিছনে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অন্যদিকে মুষ্টিমেয় একদল লোক। তবু তারা বিনা প্রতিবাদে হটে আসেনি। বন্দুক নেই? ইট আছে। বাড়ির ছাদে তুলে রেখেছে আধ্‌লা ইটের স্তূপ। তীর-ধনুক বানিয়েছে, বর্শার ফলায় শান দিয়েছে। প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলছে। জনপদ আক্রান্ত হবার উপক্রম হলে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে শোনা যেত বিপদসূচক শঙ্খধ্বনি। মুহূর্তে আগল পড়ে যেত সদর দ্বারে। ছাদের আলসের আড়ালে জমায়েত হয় ওরা ইটের স্তূপের পাশে। বিনা লড়াইয়ে এরা হার মানেনি। একদিন নয়, মাসের পর মাস, বছরের পর পর চালিয়ে এসেছে সংগ্রাম। কর্তারা খাতায়-কলমে আধখানা দেশ খরচের খাতায় লিখে সন্ধির স্বাক্ষর না দিলে ওরা থামত না আজও! মুরারিবাবু তাই আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে বলেন, অরা তো মারে নাই; কর্তারাই আমাগো মারছেন, কী করুম কন্।

কমলপুরে কিন্তু এ দৃশ্য দেখেনি দিবাকর। এখানে ওরা সংখ্যলঘিষ্ঠ ছিল না। তাছাড়া এ জাতীয় দাঙ্গা একেবারেই হয়নি কখনও ও অঞ্চলে। তাই হঠাৎ আক্রমণে ওরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। রাজশক্তি সাহায্য করতে এগিয়ে এল না, নিজেরা প্রস্তুত নয়,—সমাজতন্ত্রের শেষ ধ্বজাধারী যারা ছিল—যাদের অন্তত নামমাত্র ছিল প্রতিরোধ ব্যবস্থা, তাদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না সাধারণ গ্রামবাসীর। সমাজ-ব্যবস্থার বনিয়াদে ছিল-

যে চোরাবালির স্তর এই অতর্কিত ভূমিকম্পে বোঝা গেল তার প্রতিক্রিয়া। বাইরের আঘাত না হলে ভিতরের গলদটা প্রকাশ পাবে কী করে? তাই মার খেতে শুরু করে ওরা হতচকিত হয়ে পড়ল শুধু। প্রতিরোধের চেষ্টা পর্যন্ত করল না। দলে দলে ত্যাগ করে এল গ্রাম। লঙ্কাকাণ্ডের পর যোজিত হল অযোদ্ধাকাণ্ড!

সবচেয়ে মর্মন্তুদ কমলাপতির শেষজীবন।

ভাগ্যের পাঞ্জা চেপে ধরেছিলেন তিনি—পক্ষাঘাতগ্রস্ত সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতিনিধি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যাবার আগে জানিয়ে যাবেন—কে গেল! সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনটি ফিরে পাওয়ার জন্য শেষ সময়ে বিরাট দান করে গিয়েছিলেন তিনি। দাতব্য চিকিৎসালয় হবে, আর হবে স্কুল। কমলাপতির পিতৃ-মাতৃ-স্মৃতি। শ্রীপতি এই অপব্যয় বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল—সফলকাম হতে পারেনি। চৌধুরীকর্তা গোপনে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন জেলাসমাহর্তার কাছে। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সরকারের পক্ষে গ্রহণ করেছিলন এ দান। সিভিল সার্জেনও এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে! চৌধুরী কর্তাকে পরীক্ষা করেছিলেন—তাঁর সুস্থ-মস্তিষ্কে করা এ দানপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন সাক্ষী হিসাবে। কোথাও কাজের কোন খুঁত রাখেনি মেজকর্তা। হাসপাতাল আর স্কুলবাড়ি তৈরির জন্য ইট পোড়ান হল—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবার আগেই এল ডাইরেক্ট অ্যাকশন। আব্বাসভাইয়ের নেতৃত্বে মোল্লাহাটি থেকে দল বেঁধে এল ওরা। শ্রীপতি মারা গেল বাড়ির ছাদে প্রথম আক্রমণেই—আচমকা গুলিতে। ছাদের আলসের আড়ালে বসে সেও বন্দুক চালাচ্ছিল। পরদিন থেকেই শুরু হল পলায়ন পর্ব। জমিদারের একমাত্র পুত্রের সৎকারের ব্যবস্থা হওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছিল। সেদিন—সবাই মোটঘাট বেঁধে রওনা হবার জন্য ব্যস্ত—রাত হবার আগেই রওনা দিতে হবে।

যে গেছে সে আর ফিরবে না। যারা এখনও আছে তাদের নিরাপত্তার কথাটাই বড়। কমলাপতি আদেশ দিলেন সকলকে চলে যেতে। কেউ কর্ণপাত করল না সে কথায়। অসহায় বোধ করলেন মেজকর্তা। এমন দিন আসতে পারে, তিনি হুকুম করছেন, আর কেউ তা তামিল করছে না—এ যে চিন্তাতেই ছিল না ওঁর। কর্তার স্পষ্ট আদেশ সত্ত্বেও মরণাপন্ন পক্ষাঘাতগ্রস্ত গৃহকর্তাকে ফেলে চলে যেতে কেউই রাজি নয়! দয়াময়ী তো উন্মাদ হয়ে যেতে বসেছেন শ্রীপতির মৃত্যুর পর থেকেই। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার প্রশ্নই ওঠে না। হরিহর গাঙ্গুলি আগেই পালিয়েছেন। নায়েব গোমস্তা কর্মচারীরা কেউ নেই—সেরেস্তায় ঘরে ঘরে তালা পড়েছে। চাকর দাসদাসীরাও চলে গেছে প্রতিদিন একজন দুজন। থাকার মধ্যে আছে শুধু জনাবালি শেখ। জমিদারের তিন-পুরুষের লাঠিয়াল শেখের-পো। কমলাপতি ডেকে পাঠালেন জাহ্নবীকে। রোগশয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন জাহ্নবী।

—আপনার সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা ছিল বৌঠান। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসুন।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে জাহ্নবী দাঁড়িয়েছিলেন দেবরের মুখোমুখি।

—আপনাকে একদিন সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলাম আমার [redacted] নিতে। আপনি গ্রহণ করেননি। করলে আজ এ দুর্দশা হত না আমার।

—এ কথা কেন বলছেন আপনি?—প্রশ্ন করেছিলেন জাহ্নবী।

—সে আপনি বুঝবেন না। কেউই বুঝবে না। সে কথা শুধু জানি আমি। থাক্ ওকথা। আজ আবার আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি—আমাকে এখানে জনাবালির জিম্মায় রেখে আপনি ছোট বউ আর উমাকে নিয়ে চলে যান।

—তা হয় না ঠাকুরপো।

—হয়। আপনি ইচ্ছা করলেই হয়।

—কিন্তু অমন অদ্ভুত ইচ্ছাই বা করব কেন আমি?

—কারণ এই আমার নিয়তি। আমাকে এখানে রেখে যান—আমি প্রায়শ্চিত্ত করব আমার পাপের। কিন্তু আপনারা তো কোনও অপরাধ করেননি—আপনারা কেন থাকবেন? আমি যুক্তকরে মিনতি করছি বৌঠান!

পক্ষাঘাতগ্রস্থ বাঁ হাতখানা টেনে এনে সত্যিই যুক্তকর হবার চেষ্টা করেন তিনি। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের একটি ধারা। বলেন, আমার শাস্তি কি আজও পুরো হয়নি বৌঠান?

কমলাপতির সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত করুণ মুখখানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন জাহ্নবী একদৃষ্টে। তারপর বলেন, হয়েছে ঠাকুরপো!

—কমলাপতি বলেন, কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত তা তো জিজ্ঞাসা করলেন না? সে কথাই যে আপনাকে বলব বলে ডেকেছিলাম।

জাহ্নবী ধীরে ধীরে বলেন, বলতে আপনাকে কিছুই হবে না ঠাকুরপো। ছোট বৌ জানে না—কিন্তু আপনার স্বর্গগত দাদাও জানতেন—আমিও জানি। আপনাকে খুব ভালবাসতেন তিনি—তাই উইল জাল করার জন্য আপনার বিরুদ্ধে মামলাও করেননি। মদের মাত্রা বাড়িয়েছিলেন শুধু!

কমলাপতি অবাক হয়ে বলেন, আপনি সব জানতেন?

—জানতাম বই কি ঠাকুরপো। অথচ কী অপূর্ব বিচার দেখুন ভগবানের। ঐ সম্পত্তিই জগদ্দল পাহাড়ের মতো আপনাকে পিষে মারল! শ্রীপতিও ঐ সম্পত্তির লোভে আপনাকে মরণান্তক যন্ত্রণা দিল। শেষে তার প্রাণ দিয়ে সে নিজের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

কমলাপতি হা-হা করে কেঁদে ওঠেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুখের সে কান্নাকে মনে হল যেন অট্টহাসি। বিকৃত গলায় কমলাপতি বলেন, আপনি পাষাণ বৌঠান! সব জেনে, সব বুঝেও কেমন করে বেঁচে আছেন এতকাল?

শান্তস্বরে জাহ্নবী বলেন, আপনার এই প্রায়শ্চিত্ত দেখে যাব বলে, ঠাকুরপো। আরও একটা মানুষকে আমি তিল তিল করে মরতে দেখেছি চোখের সামনে। সত্যিই আমি পাষাণ।

—তাহলে, তাহলে এক কাজ করতে পারেন না?

জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে থাকেন জাহ্নবী।

—ঐ আলমারির নিচের তাকে বন্দুকটা আছে। দাদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারেন না?

পাষাণ প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে থাকেন জাহ্নবী। চোখ দুটো জ্বলতে থাকে!

—আমাকে ছেড়ে আপনারা কেউ যেতে পারছেন না—পারবেন না। আমার মৃত্যু আসন্ন—দুদিন আগে আর পরে। অথচ আজ মরলে হয়তো আপনারা সকলে রক্ষা পান। বৌঠান আমি মিনতি করছি।

—সে হয় না ঠাকুরপো!

—আপনি যদি নিজে হাতে এ কাজ না করতে পারেন তবে আমার নাগালের মধ্যে রাইফেলটা এনে দিন। একটা হাত আজও চলে আমার।

জাহ্নবী স্থানত্যাগ করেছিলেন অতঃপর।

উদ্যোগী পুরুষসিংহ কিন্তু হাল ছাড়েননি। বন্দুকটা হস্তগত করেছিলেন কৌশলে। জনাবালি আলমারি থেকে বার করে দিয়েছিল তাঁকে। বেচারী বুঝতে পারেনি ওঁর উদ্দেশ্য। সে আন্দাজ করতে পারেনি যে, আত্মরক্ষার জন্য নয়, আত্মহত্যার জন্য অস্ত্রটা নাগালের মধ্যে চেয়েছিলেন মেজকর্তা।

নিজের হাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন মেজকর্তা। কমলপুর গ্রামের সামন্ততন্ত্রের শেষ উত্তরসাধক। দয়াময়ী কাঁদেননি—শ্রীপতির মৃত্যুতেই তাঁর কান্নার উৎসমুখ ঊষর হয়ে উঠেছিল বলে নয়—তাঁর মস্তিষ্কে মানুষের ভালো-মন্দ জীবন-মৃত্যুর আর কোন পৃথক মূল্যায়ন ছিল না। মেজকর্তার ঘরে বন্দুকের আচমকা শব্দ হওয়ায় সবাই ছুটে গেল সেখানে। রক্তের ধারাস্রোতে পড়েছিলেন তিনি। সবাই ঘিরে ধরল ওঁকে। তখনও একটু জ্ঞান ছিল ওঁর। চারদিকে বিহ্বল হয়ে কাকে খুঁজছেন। আর কেউ না পারলেও জাহ্নবী বুঝতে পেরেছিলেন কাকে খুঁজছেন তিনি। বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর ছেড়ে। কিন্তু কোথায় দয়াময়ী? উপরতলায় নেই, নিচে নেই, সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন তিনি। সবাই জড়ো হয়েছে মেজকর্তার ঘরে—খাঁ খাঁ করছে মহলগুলো। রান্নাঘরের বারান্দায় একটা বেড়াল দুধের বাটি উল্টে দুধ খাচ্ছে। অবশেষে দয়াময়ীকে আবিষ্কার করলেন জাহ্নবী। গোয়ালঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে কান পেতে কী যেন শুনছেন তিনি। ধুলা-কাদা-গোবরে সর্বাঙ্গে তাঁর ময়লার দাগ। দয়াময়ী জা'কে দেখে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখলেন, কানে কানে বললেন, এই পার্টিশান দেওয়ালে কান দিয়ে শোন তো দিদি—কেউ কাঁদছে ওখানে?

কমলপুরের সবার সেরা মানুষটার শ্রাদ্ধ হল না। চতুর্থী সেরেই জাহ্নবী গোয়ানে রওনা হয়ে পড়লেন উন্মাদিনী দয়াময়ী, আর ভয়ে-আতঙ্কে নীল-হয়ে-যাওয়া উমাকে নিয়ে। কমলপুর তার আগেই শ্মশান হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে দগ্ধাবশেষ বাস্তুভিটার চিহ্ন। শকুন নেমেছে দলে দলে কোন বাড়ির আঙিনায়। মাঝে মাঝে উৎকট দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়। জনহীন গ্রাম। বোধকরি ওঁরাই রওনা হয়েছিলেন সবার শেষে। ঝাঁসির রানীর গল্প পড়া ছিল, চাঁদ-সুলতানা রিজিয়া-জোয়ান অব আর্কের কাহিনী পড়া ছিল বইয়ের পাতায়—দিবাকরের বিশ্বাস জাহ্নবী দেবীর রক্তেও ছিল অমনি ঝড়ের মাতন। ধীর স্থির মস্তিষ্কে বিপদের সম্মুখীন হবার শিক্ষা ছিল তাঁর। মিষ্টি কথা ছাড়া রূঢ় কথা কেউ কখনও শোনেনি তাঁর মুখে। সব আঘাত, সব বিপদ নিজে বুক পেতে নেবার সাহস ছিল তাঁর। না হলে এ দুঃসাহসিক যাত্রায় স্থিরমস্তিষ্কে কেউ

বার হতে পারত না। গো-গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলেছিল জনাবালি শেখ। পাশে শোয়ান তার চারহাত লম্বা প্রিয় লাঠিগাছখানা। ঘেরা টাপরের নিচে বোরখা-পরা তিনটি মহিলা! গোটা দুই স্যুটকেস আর খড়ের গদির নিচে লম্বালম্বী করে পাতা একটা টোটা-ভরা রাইফেল। ভিক্টোরীয় যুগের শেষ আমলের অস্ত্র সেটা। সিপাহী-বিদ্রোহের আমল থেকে মানুষের বুকে হেনেছে মৃত্যুবাণ—তার শেষ শিকার সামন্ততন্ত্রের অন্তিম ধ্বজাধারী কমলাপতি চৌধুরী!

দিবাকর ওঁদের আগেই গ্রামত্যাগ করেছিল। এই দুঃসাহসিক অভিযানের পুরো বিবরণ সে জানে না। লোকমুখে পরে শুনেছিল ওঁদের গাড়ি দু-দুবার আক্রান্ত হয়। ক্ষীণদেহ গাড়োয়ানকে আক্রমণকারীরা যথোচিত সম্মান দেখায়নি। ফলে লুট করতে এসে ধরাশায়ী হতে হয়েছে তাদের বারে বারে। সমস্ত দিন গাড়ি চালিয়ে রাত্রে ওরা আশ্রয় নিয়েছে ঝোপে-ঝাড়ে-জঙ্গলে। লাঠি হাতে জেগে বসে থাকত জনাবালি আর বন্দুক হাতে জাহ্নবী। নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছিল অবশেষে তিনটি মহিলাকে—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে। শুধু একটা কথা কারও খেয়াল হয়নি—আশ্চর্য, জনাবালিরও নয়। যে ছদ্মবেশ আত্মরক্ষার জন্য ধারণ করেছিলেন তাঁরা স্থানমাহাত্ম্যে সেটাই সর্বনাশের কারণ হতে পারে! হয়েছিলও তাই। সীমান্তের এ পারে যখন তৃতীয়বার আক্রান্ত হলেন তাঁরা, তখন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন জাহ্নবী। ফলে তিনটি মহিলাকে রেহাই দিল ওরা—কিন্তু রেহাই দিতে চাইল না গাড়োয়ানকে। তিন দিনের অস্নাত, অভুক্ত মানুষটা আবার উঠে দাঁড়াল লাঠি হাতে। দু রাত্রি ঘুমায়নি সে—জেগে পাহারা দিয়েছে। তবু সে দাঁড়িয়েছিল শক্ত হাতে লাঠি চেপে ধরে। সে বুঝতে পেরেছে এ বারের লড়াই হচ্ছে তার নিজের আত্মরক্ষার লড়াই—তিনটি মহিলার ইজ্জত রাখার লড়াই নয়। বিপক্ষের কেউ মেয়েদের গায়ে আর হাত দেবে না। জাহ্নবী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দু পক্ষের মাঝখানে। কিন্তু। দুর্ভাগ্য জনাবালির—এ পক্ষে কেউ লাঠি হাতে এগিয়ে এল না। আচমকা একটা বন্দুকের আওয়াজ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের পাঁজরে লাগল প্রচণ্ড ধাক্কা। পড়ে গেল মাটিতে। যাক, দুঃখ নেই শেখের-পোর। নেমকহারামি সে করেনি মুসলমানের বাচ্চা হয়ে। তিন-পুরুষে খাওয়া নুনের দাম দিয়ে তবে সে মাটি নিয়েছে।

জাহ্নবী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন রক্তাপ্লুত মানুষটাকে।

জনাবালি শুধু বললে, মা! ফতিমা, আয়েষা?

জাহ্নবী জবাব দেবার আগেই চোখ বুজেছিল শেখের-পো। জাহ্নবী জানতে পারেননি ফতিমা কে, আয়েষা কার নাম। কোথায় থাকে তারা, কী সম্পর্ক তাদের জনাবালির সঙ্গে।

রত্নাকর একদিন বলেছিল, আমি বলি বিঘে কতক্ মরাভূঁই বন্দোবস্ত লাও তুমি চাঁপাডাঙায়। আর চাঁপাডাঙাতেই বা কেন—চল ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে আমরা বন্দোবস্ত নিই জমি। জঙ্গলা জমি—অল্পেই পাবে। এমন গাঁয়ে যাব, যিখানে চৌধুরী জমিদারের নাগাল পৌঁছাবিনা, যিখানে ইরসাদ, পিয়ারিলাল আর রায়েরা নাই। তোমার কব্জিতে জোর আছে। চাষের কাজ শিখায়ে দুব তোমারে। তুমি রাজি থাকলি আমি গাঁ ছাড়তি

রাজি আছি। চল তোমাতে আমাতে ভিন গাঁয়ে লতুন বন্দোবস্ত নেই। এ শালার গাঁয়ে আর ভালো লাগে না।

খোদাতালা জানেন, তারপর থেকে শুধু এই স্বপ্নই দেখে এসেছে জনাবালি নতুন দেশে চলে যাবে তারা দুজন। সে আর রতন। নতুন করে চালা তুলবে। নিয়ে আসবে ফতিমাকে, আট বছরের মেয়ে আয়েষাকে। রত্নাকর ঘোষ আর জনাবালি শেখের যৌথ প্রতিরোধের সামনে কোন্ 'সুম্বুন্ধির-পো' সাম্প্রদায়িক কানাকানি করতে আসে দেখে নেবে তারা। এই ছিল তার স্বপ্ন। রতন ঘোষ সেই দেশান্তরেই গেল—গেল জনাবালিও, তবু এই দুই গ্রাম্য লাঠিয়ালের পাশাপাশি ঘর বাঁধাটা আর হয়ে উঠল না।

এর পরের খবর আর জানে না দিবাকর। এই বিপুলা পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে সেই দুটি বিধবা মহিলা আর একটি স্বামীত্যক্তা হতভাগিনী আশ্রয় খুঁজে পেল কি না তাও সে জানে না। ওদের গাঁয়ের অনেকেই আছে বর্ধমানের কাছে লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পে। কিছু আছে ধুবুলিয়ায়, কিছু পিয়ারডোবায় আর কিছু রানাঘাটে, রূপশ্রীপল্লীতে। অনেকের সঙ্গেই চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়। জগবন্ধু ডাক্তার চলে গেছে আসামে। আবার নতুন করে প্র্যাকটিসে বসেছে গোরক্ষপুরে। ননীমাধব আর হৃদয় ঘোষও বসেছেন সেখানে নতুন ঋণ পেয়ে! পরী প্রথমে উঠেছিল রানাঘাট উইমেন্স ক্যাম্পে—চলে গেছে সেখান থেকে। দেহকে মূলধন করে ব্যবসা খুলে বসেছে রানাঘাটের বাজারে। ওদের গ্রামের মেয়েদের মধ্যে একমাত্র পরীই প্রকাশ্যে নেমেছে এ ব্যবসায়—অন্য কারও নামে কানাঘুষা শুনেছে, সত্যমিথ্যা জানে না। দ্বিজপদ, নবীন, মতি পালেরা আছে লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পে—তারাপ্রসন্নও আছেন ওখানে। শিরোমণিকে একবার দেখেছিল নৈহাটি স্টেশানে। সরকারি শিবিরে তাঁর স্থান হয়নি। তাঁর বর্ডার স্লিপ আর রেজিস্ট্রেশান কার্ড দুইই খোওয়া গেছে। অসাবধানী মানুষ, মনেরও তখন ঠিক ছিল না। কোথায় ফেলতে কোথায় ফেলেছেন। ফলে আজ আর তাঁর উদ্‌বাস্তু পরিচয় নেই! রসিকলাল শিরোমণি ধর্মের বদলে প্রাণটাই দিতে বসেছিলেন। তবু প্রাণে বেঁচে আছেন আজও। কাঠের ক্রচে ভর দিয়ে খোঁড়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করেন নৈহাটি স্টেশনে। দুটি পা-ই জখম হয়েছে রসিকলালের।

রায়মশাই আবার প্রাণের বদলে ধর্মটাই বিসর্জন দিলেন; দুই প্রাচীন বন্ধু, রসিকলাল আর নন্দদুলাল প্রত্যক্ষ করেছিলেন কমলপুর গ্রামের উপর দ্বিতীয় আক্রমণ। মানুষ বলতে তখন আর বিশেষ কেউ ছিল না গ্রামে। জাহ্নবীরাও তার পূর্বে গ্রামত্যাগ করেছিলেন। ধর্মান্ধ রসিকলালকে কোনদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি দিবাকর। এই দাঙ্গার হাহা-করা মশালের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেই ধর্মান্ধ মানুষটির চরিত্রের আর একটা দিক। মায়ের মন্দির ছেড়ে পালিয়ে যেতে রাজি হলেন না—ধর্মত্যাগ করতেও নয়। অথচ অতি সহজেই রাজি হয়ে গেলেন নন্দদুলাল। তিনিও বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে পালাতে পারেননি। ফলে নন্দদুলাল আজ রয়ে গেছেন কমলপুরে, আজও তমসুক লিখছেন জাতভাইদের নামে, আর বিকলাঙ্গ রসিকলাল নৈহাটি স্টেশানে কাঠের ক্রাচ বগলে মায়ের নামে ভিক্ষা করেন।

তারাপ্রসন্নের কথাগুলো মনে পড়ে—আর্যধর্ম এবং আর্য সংস্কৃতি নাকি ঐ পুব

বাঙলার মানুষের প্রাণে দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়তে পারেনি। তাই বাইরে থেকে যখন যে ধর্মমত এসেছে ওরা সহজেই তা গ্রহণ করেছে। ওরা বৌদ্ধ হয়েছে, নাথ হয়েছে, মুসলমান হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে যে আর্যসংস্কৃতির জোয়ার এসেছিল তাকে নাকি মনে প্রাণে স্বীকার করে নেয়নি। অন্তরের গভীরে নাকি ওরা বরাবরই পুষে রেখেছে একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ!

কথাটা মেনে নিতে রাজি হয়নি দিবাকর। তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়াও যায় তবু কমলপুরে এ ঘটনা ঘটল কেন? কমলপুর পুব বাঙলার নয়। ভাগীরথী-বিধৌত পশ্চিমবঙ্গের সন্তান এই কমলপুর-রায়না-মোল্লাহাটি-মধ্যমগ্রাম। মাতৃকুলে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ফুলিয়া এবং পিতৃকুলে ত্রিবেণী, কেন্দুবিল্ব, নান্নুর—এদের সগোত্র তারা। তাহলে এই বিজাতীয় বিদ্বেষ জন্ম নিল কোথা থেকে ওদের পঞ্চগ্রামের মাঝখানে? আব্বাসভাই বহিরাগত—কিন্তু আব্বাসভাইয়ের একার ক্ষমতা ছিল না এভাবে পঞ্চগ্রামের সংহতিকে ধ্বংস করে দিতে। রহিম শেখের ভাইপো ফজলু আর বায়েন-পল্লীর প্রহ্লাদ—এরা পরস্পরের কত পরিচিত! এরা সমব্যবসায়ী। কতবার প্রহ্লাদ বায়েনের হাত ধরে কিশোরী পদ্ম গেছে মোল্লাহাটিতে মহরমের তাজিয়া দেখতে। ফজলুচাচার লাঠি ঘোরানো দেখে ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়েটি হাততালি দিয়েছে। মহরমের মিছিলে লাঠি ঘুরিয়েছে জনাবালি আর রতন ঘোষ। ঘোষপাড়ার লেঠেলের দল খেলা দেখাতে যেত মোল্লাহাটি। আবার বীরাষ্টমীর রাত্রে ফজলু-জনাবালিরাও খেলা দেখিয়েছে মায়ের মন্দির চাতালে। চৌধুরী-বাড়িতে ঠাকুর দেখতে আসত মোল্লাহাটির মানুষ। কতবার ফজলু, তোরাব, আলিজান, মনিরুদ্দি, কুদরতের দল ঠাকুর দেখতে এসে দেখেছে, পূজা-তলায় নতুন ফ্রক পরা পদ্মকে ছুটোছুটি করতে। একই জলহাওয়ায় বেড়ে-ওঠা এই মেয়েটিকে কেমন করে সেই কালরাত্রিতে তার বাপের চোখের সামনেই....

আর ভাবতে পারে না দিবাকর!

যে দেশকে ভাগ করতে গিয়ে হটে এসেছিল কার্জন-লাট—সেই দেশটাকেই কেটে দু'খণ্ড করল একদল ধর্মান্ধ গুণ্ডা। মানুষকে মানুষ বলে দেখল না ওরা, দেখল হিন্দু বলে, দেখল মুসলমান বলে। না হলে যে মুসলমানের বাচ্চা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তিনটি হিন্দুরমণীর ইজ্জত বাঁচাতে অকুতোভয়ে পার হয়ে এল সীমান্ত, তাকে গুলি করে মারল কেন এ পারের ধর্মান্ধ মানুষ? রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে একদল ধর্মান্ধ মানুষ পৈশাচিক উল্লাসে অত্যাচার চালালো পুব-বাঙলায়—সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর রাজশক্তির পোষকতায়। আর একদল মানুষ তাদের জীবদ্দশায় গদি পাওয়ার লোভে স্বীকার করে নিল সেই দ্বিজাতিতত্ত্ব!

ফলে আধ-কোটি মানুষ তাদের ভিটে-মাটি বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে চলে এল পুব-বাঙলা থেকে। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে একদিন হাসিমুখে জেলে গিয়েছে, লাঠি খেয়েছে, ফাঁসীকাঠে ঝুলেছে—অকথ্য অত্যাচার সয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তারা, বিনা যুদ্ধে চিরদিনের জন্য হারালো দেশমাতৃকাকে।

নিভল আগুন। স্বাধীনতা এল। শান্তি স্থাপিত হল। লঙ্কাকাণ্ডের উপসংহার হল অ-যোদ্ধাকাণ্ডে। দেহে-মনে শ্রান্ত হৃতসর্বস্ব মানুষ সীমান্ত পার হয়ে চলে এল, জায়া-

কন্যা-জননীর সম্মান বাঁচাতে। কেন? যাদের তারা সেনানায়ক করেছিল তাঁরা দিল্লীর মসনদে বসে একখণ্ড কাগজে সই করেছেন বলে? অখণ্ড-ভারতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্ধশতাব্দীকাল ধরে বাঙালির রক্ত অঞ্জলিভরে গ্রহণ করে শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে? দিবাকর জানে না।

ছিন্নমূল মানুষগুলো নতুন করে শিকড় গাড়তে চায়—নতুন জমিতে, নতুন আবহাওয়ায়। পশ্চিমবাঙলার মানুষ কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তার আধপেটা-খাওয়া সংসারে সে স্থান দিয়েছে নবাগতদের। তার চাষ-যোগ্য জমির শেষ কাঠা পর্যন্ত দিয়েছে ওদের। তার চাকরির বাজারে উদ্‌বাস্তুদের অগ্রাধিকার মেনে নিয়েছে অপ্রতিবাদে। পশ্চিমবাঙলার সমাজ বা সাহিত্য একদিনের তরেও ওদের অবাঞ্ছিত অতিথি মনে করেনি। তাই পশ্চিমবাঙলার শহরে-গ্রামে আনাচে-কানাচে ওরা মাথা গুঁজবার আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে। কমলপুরের মানুষ নতুন করে ঘর পাতছে লক্ষ্মীপুরে। কমলপুরের কমলা রয়ে গেলেন সেখানকার পাকা ধানের মাঠে, লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীও বহুদিন বন্দিনী, মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যক্তির কবলে। তবু এ পাড়ার সাধারণ মানুষ ওপাড়ার সাধারণ মানুষকে কোল দিল। তাই জলাঙ্গীর ধারের মানুষ আজ আবার নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করছে দামোদরের পাড়ের গ্রামে। দুঃখ-দুর্দৈবকে মানুষ ভুলতে চায়—না হলে প্রাণধারণ করা চলে না। আউলিয়ার মাঠে সারি সারি অস্থায়ী কুটিরে আবার দানা বেঁধে উঠছে মানুষের সমাজ-বোধ। ওরা আবার ঘরের কোণে লক্ষ্মী পাতছে, পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ করছে, আঙিনায় লাউ-কুমড়োর বীজ পুঁতছে, হাসছে খেলছে—আবার মাঝে মাঝে নির্জনে চোখের জলও ফেলছে ফেলে-আসা দিনগুলোর স্মৃতিচারণে।

দিবাকর একবার গিয়েছিল লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পে। চেনা-জানা মানুষদের দেখতে। ওরা আদর করেছিল, আপ্যায়ন করেছিল। দিবাকর কিন্তু খুশি হতে পারেনি। ওর বারে বারে মনে হয়েছিল—এ ঠিক হচ্ছে না, এ ভুল হচ্ছে। এভাবে ওদের বসিয়ে বসিয়ে ডোল খাওয়ানোর ফল কখনও ভালো হতে পারে না। যত শীঘ্র সম্ভব এ পরিবেশ থেকে ওদের বেরিয়ে পড়া উচিত। এভাবে কিছুদিন বসে খাওয়ার পর কি নবীনের হাতে চলবে তাঁত? দ্বিজপদের হাতুড়ি কি নেহাইয়ে না পড়ে আঙুলে পড়বে না? নবা পালের চাক কি ঘুরবে কোনদিন তেমন জোরে? ওদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। ওরা আর কদিন? কিন্তু ওদের পরবর্তী বংশধরদের কী হবে? সতীশ, রসময়, আনন্দ? এরা কী করবে সারাজীবন? ভিক্ষা?

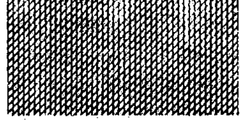
কথাটা বলেছিল রতনকে, ক্যাম্পের পাশে যে জমি দেখছি ওগুলো নিচ্ছিস না কেন? চেষ্টা করেছিলি?

রতন মাথা চুলকে বলেছিল, অরা বলে ভাগে জমি নিলি আর ডোল মিলবি না।

আর কথা বাড়ায়নি দিবাকর। কিন্তু ব্যবস্থাটাও পছন্দ হয়নি তার। বারে বারে মনে মনে বলেছিল—এ ঠিক নয়, এ ঠিক নয়!

উত্তরকাণ্ড

5



লক্ষ্মীপুর পি. এল. ক্যাম্প।

সতীশ আজও বসেছিল তার ছিপগাছখানা নিয়ে—সিংহীদের পদ্মদিঘির পাড়ে। পদ্মদিঘি। কৃতবিদ্য জমিদার প্রণবনারায়ণ সিংহের কীর্তি। মায়ের নামে দিঘি কাটিয়েছিলেন তিনি। ত্রিদিবেশের প্রপিতামহ প্রণবনারায়ণ ভালো জাতের পদ্ম এনে লাগিয়েছিলেন দিঘিতে। তাঁর মা পদ্মাবতীর নাম সার্থক করতে। এখন অবশ্য পদ্মদিঘিতে পদ্ম নেই। শ্যাওলা আর দামে ভরে আছে দিঘির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।

দামোদর অনেক দূর। গাঁয়ের মেয়েরা পদ্মদিঘি থেকেই জল নিয়ে যায় ঘড়ায় করে। জল নিতে আসে ক্যাম্পের মেয়েরাও। ওরা পুব পাড়ে, এরা পশ্চিম-পাড়ে। গ্রাম আর ক্যাম্পের মাঝখানে পদ্মদিঘি। দিঘিতে জল নাকি অতল। চৈত্র-বৈশাখ মাসেও ডুব জল থাকে। অসংখ্য মাছ আছে—বড় বড় মাছ; রুই, কাতলা, মিরগেল, কালবোস। সতীশ মাছ ধরতে আসে লুকিয়ে। অবশ্য ওর ছোট ছিপে আধসের তিনছটাক পোনাও ধরা দেয়-কি-না-দেয়। পর পর তিন দিন বসছে সে আজ নিয়ে! একদিনও মাছ ধরা পড়েনি একটাও। প্রতিদিনই খালিহাতে ফিরে যাচ্ছে। আজও এসে বসেছে কচুপাতার ঝোপের আড়ালে।

গুলাব বউ এসেছিল মনুয়ার হাত ধরে জল নিতে। মনুয়ার মা আসেনি আজ। এর আগে জল নিয়ে গেছে মঙ্গলা, জয়া, মতির মা আর পাঁচ বাড়ির মেয়ে। সতীশকে কেউ নজর করেনি। কিন্তু মোড়লগিন্নির সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। গুলাব কঠিন স্বরে বলে, ঝোপের ভিতর কে রে?

সতীশ সাড়া দেয়, আমি!

—আমি! আমি আবার কে? বেইরে আয় ছোঁড়া।

সতীশ গুলাব বউকে ভয় করে। বেরিয়ে আসে ছিপহাতে।

—ও সত্শে। তা তুই এখানে রোজ এসে বসি থাকিস্ কেন রে?

সতীশ আমতা আমতা করে বলে, রোজ তো না, আজই আসছি—মাছ ধরতি।

—আজই? না কাল-পরশুও তুই আসছিস। পরের পুকুরের মাছ চুরি করতি লজ্জা করেনা তোর!

সতীশ ম্লান হয়ে গিয়ে বলে, চুরি করি নাই তো। একটাও পাই নাই, দ্যাখেন কেনে—

হেসে উঠে গুলাব, রাজা মুগ ডাল খান না! কেনে? না, পান না, তাই খান না। তোর হইছে সেই বিত্তান্ত। মাছ পাই নাই—তাই চুরি করি নাই। বলি পেলি কি নিতি না?

সতীশ জবাব দেবার আগেই গুলাবের দৃষ্টি পড়ে মনুয়ার উপর। কচু-কলমির বন-

বাদাড় ভেঙে মনুয়া ছুটেছে একটা গঙ্গাফড়িঙের পিছনে। অগত্যা গুলাবকেও ছুটতে হয় সেই দিকে। সতীশ এই সুযোগে আবার ঘাপটি মেরে বসে কচুঝোপের আড়ালে ছিপ নিয়ে।

গুলাব একটু পরে জল নিয়ে চলে যায়।

আবার নিঃঝিম হয়ে আসে পুকুর পাড়টা। সতীশ একাই বসে থাকে ফাৎনার দিকে তাকিয়ে। তিন দিনে একটি মাছও সে পায়নি। না পাক, তাতে তার দুঃখ নেই! সে জানে, মাছ সে পাবে না। তার বঁড়শীতে চারই নেই আসলে! বস্তুত মাছ ধরতে সে আসেনি। মাছ ধরার সরঞ্জাম একটা অজুহাত মাত্র। সে চুপ করে এই পুকুরের ধারে বসে থাকতে চায় একটা সুযোগের অপেক্ষায়। সে সুযোগ আজ তিন দিনেও আসেনি। আজ মনে হচ্ছে দেবতা দয়া করবেন। ক্যাম্পের সব মেয়েই জল নিয়ে গেছে—রাধা এখনও আসেনি। হয়তো নির্জনেই পাওয়া যাবে তাকে। একদৃষ্টে ফাৎনাটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে থাকে কমলপুরের হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলোর কথা। কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে ওদের জীবন!

একসার পিঁপড়ে চলেছে সামনে দিয়ে। গাছ থেকে নেমে চলে যাচ্ছে। ওড়কলমি ঝোপের দিকে। একটা কাঠবিড়ালি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে ওকে। মাদার গাছের কোটর থেকে বারে বারে মুখ বার করে সতীশকে দেখছে আর ঢুকে যাচ্ছে গর্তে। ও বোধহয় নামতে চাইছে মাদার গাছ থেকে—এই নতুন মানুষটার উপস্থিতিতে ঠিক সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে—টাকা-টাকা গোল-গোল রোদের ছোপ। এক নাগাড়ে বনের ভিতর কাঠঠোকরা ঠকাঠক করে চলেছে। মিঠে মিঠে সোঁদা সোঁদা একটা গন্ধ ভেসে আসছে কোথা থেকে।

সতীশ বসে আছে রাধার অপেক্ষায়। নিশ্চয়ই জল নিতে আসবে সে। এ কয়দিনই এসেছে—কিন্তু একা নয়। তাই এগিয়ে গিয়ে কোন কথা বলতে পারেনি সতীশ। রাধা আজকাল আর সচরাচর বাড়ির বার হয় না। সতীশের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়নি অনেক—অনেক দিন। কেন? সতীশ নবীন যুগীর বাড়িতেও গিয়েছে দেখা করতে—দেখা হয়নি। সর্বাণী বলেছে রাধা কাজ করছে ঘরের ভিতর—এখন দেখা হবে না। ঐ তো এককামরা ঘর। বারান্দায় বসে সে শুনতে পায় রাধার কাচের চুড়ির ঠুনঠুন—বাইরে আসে না সে। বোঝা যায় স্পষ্ট—সতীশ অবাঞ্ছিত অতিথি। ফিরে আসে তাই। ক'দিন ধরেই সে সুযোগ খুঁজছে রাধার সঙ্গে জনান্তিকে দেখা করবে বলে। সুযোগ আসছে না।

হঠাৎ লক্ষ্য হল সর্বাণী আসছে হরু যোগীর বউ-এর সঙ্গে, জল নিতে। আজ তা হলে আর রাধা আসবে না। তার মা নিজেই যখন জল নিতে এসেছে। সতীশ উঠে পড়ে। তার একটা কথা আচমকা খেয়াল হয়। এখন যদি সে নবীন কাকার বাড়িতে যায়? এখন তো তার মা সর্বাণী তাকে আগলে রাখতে পারবে না। যে কথা সেই কাজ। আশশ্যাওড়ার জঙ্গল ভেঙে বনবাদাড় মাড়িয়ে সতীশ ছুটে যায় নবীন যুগীর ঘরের দিকে।

দেখা হল রাধার সঙ্গে। গোয়ালঘরে ছিল সে। নবীন যুগী কিছু পুঁজি এনেছিল।

সেই টাকা দিয়ে গরু কিনেছে। আর কিছু না জোটে দুধ তো মিলবে। দ্বিজপদও কিনেছে একটা গরু।

সতীশকে দেখে অবাক হল রাধা, বললে, আবার তুমি আসিছ?

সতীশ চমকে উঠে বলে, কেনে, আমার আসা বারণ নাকি?

—মা কিছু বলে নাই?

—না তো। কী কথা?

নতমুখে রাধা জাবনা মাখতে থাকে। কিন্তু এই কথাটাই জানতে চায় সতীশ। এই জন্যই আজ তিনদিন ধরে বসছে গিয়ে পুকুরপাড়ে। কী অপরাধ সে করেছে—যে তাকে আসতে বারণ করা হবে! রাধার সঙ্গে গল্প করার, খেলা করার অধিকার সে হারাল কোন অপরাধে? জাবনামাখা কাঁচের-চুড়ি-পরা রাধার হাতখানা চেপে ধরে সতীশ। হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে রাধা।

সতীশের চেয়ে রাধা চার বছরের ছোট—তবু রাধা যে সত্য অনুভব করেছে সে সত্য আজও বুঝতে পারেনি সতীশ। নরনারীর আদিম সম্পর্কটা রাধা আন্দাজ করে ফেলেছে দাঙ্গার বীভৎসতায়। ওর চোখের সামনেই ঘটে গেছে একটা দুর্ঘটনা। পাটখেতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল ওরা। সর্বাণী ওকে বুকের মধ্যে গুঁজে বসেছিল এক হাঁটু কাদায়। হঠাৎ একটা মেয়ের আর্তনাদে মায়ের বুক থেকে মুখ তুলেছিল রাধা। মশালের আগুনে দেখতে পেয়েছিল অত্যাচারের একটা খণ্ড দৃশ্য। চ্যাংদোলা করে যে বিবস্ত্র মেয়েটাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তাকে চিনতে পেরেছিল রাধা—সে ওর খেলার সাথী—পেল্লাদকাকার মেয়ে পদ্ম! রাধা চিৎকার করে উঠতে গিয়েছিল। সর্বাণী চেপে-ধরেছিল তার মুখটা বুকের মধ্যে, সেই থেকে পুরুষমানুষকে ভয় করে চলে রাধা। সতীশকে কিন্তু আজও সে ভয় করে না। তবু রাধা বুঝতে পারে সে বড় হয়ে উঠেছে। একা সে আর পথে বার হয় না। শুধু সতীশ বলে নয়, কোন পুরুষমানুষের সঙ্গেই সে আর কথা বলতে পারে না—বুকটা গুরগুর করে ওঠে। সে যে আর ছেলেমানুষ নয়, সে এখন মেয়েমানুষ। ভাঙাভাঙা গলায় রাধা বলে সে কথা, আমি যে বড় হয়ে গেছি!

সতীশ অবাক হয়ে যায়। আপাদমস্তক লক্ষ্য করে রাধাকে। কথাটার সত্যতা অনুভব করবার চেষ্টা করে। সত্যই তো। রাধা তো আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নয়। বয়ঃসন্ধির লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার দেহে। দৃষ্টি হয়েছে নত। কখন অলক্ষ্যে রাধার জাবনামাখা হাতখানা ছেড়ে দিয়েছে সতীশ।

রাধা বলে, মা অখুনি ফিরে আসপে—তুমি যাও কেনে।

—আর দেখা হবি না?

—দেখা হবি না কেনে? তবেই ই ভাবে নয়।

—কেনে ইভাবে হলিই বা ক্ষেতি কি? আমি কি তোমার কোন ক্ষেতি করতে পারি?

কথাটা বলে নিজেই অবাক হয়ে যায় সতীশ। এর আগে সে রাধাকে কখনও তুমি বলেনি। চিরকাল 'তুই-তোকারি' করে এসেছে। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটে গেছে এ কয়

বছরে। নিশ্চয় ঐ হঠাৎ বেড়ে-ওঠা মেয়েটার চাহনিতে এমন কিছু ছিল যাতে অজান্তেই তাকে 'তুমি' বলে বসল!

রাধা ভাবছিল অন্যকথা। সে ভাবছিল—সতীশ কি তার কোন ক্ষতি করতে পারে? 'ক্ষতি' কাকে বলে? পদ্মদির যেমন 'ক্ষতি' করেছিলে গুণ্ডাগুলো? শিউরে ওঠে সারাশরীর। সতীশ পুরুষমানুষ। ওরা নাকি মেয়েমানুষের ক্ষতি করবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়ে সুযোগ খোঁজে। কিন্তু সতীশ? তার ছেলেবেলার বন্ধু সতীশ কি অমন বর্বর হয়ে উঠতে পারে? শুধু বলে, তুমি ইবারে যাও।

অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে পা বাড়ায় সতীশ।

—শোন।

সতীশ দাঁড়িয়ে পড়ে আবার।

ঘরের ভিতর থেকে নবীন ডাকে, রাধা! কথা কইছিস্ কার সাথে?

সতীশ চাটাইয়ের বেড়ার গায়ে সেঁটিয়ে যায়। তার দিকে চোখ মটকিয়ে রাধা বলে—'এই তোমার কেলের সাথে—কিছুতেই জাবনা খাতিছে না।'

খুক খুক করে সতীশ হেসে ওঠে—কোঁচার খুঁটে মুখ গুঁজে। নবীন ওখান থেকেই বলে—তা মুখে তুলে খাওয়ানোর দরকার কী বাপু—মেখে থুয়ে চলি আয়। খায় খাবে, নয় না। বলে, আপনি পাই না খাতি—তা মুখে তুলে না দিলি কেলেসোনার খাওয়া হবেনি।

—তোমার আশ্‌কারাতেই তো কেলেসোনার এ লবাবী।—বলে রাধা। চুপিসাড়ে সতীশকে বলে, এবার পালাও কেলেসোনা!

সতীশ বলে, কেলেসোনা? আমি কি তোমার কেলেসোনা?

রাধা জবাব দেয় না। ওর ভাই আনন্দ আসছিল এদিকে। তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় গোয়াল থেকে। সতীশও পালিয়ে বাঁচে। কেলেসোনা! কথাটা তার মনে লাগে। সতীশ কবি, তাই নামকরণটা তার পছন্দ হয়। শ্রীরাধার কালোসোনা! সতীশ কালো—কেষ্টঠাকুরের মতই কালো।

* * *

কাজটা ভালো হয়েছে কি না আজও বুঝে উঠতে পারেন না জাহ্নবী। দুঃখের আঘাতে সহজে ভেঙে পড়ার মানুষ নন—বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবার শিক্ষা আছে তাঁর। শ্বশুরের মৃত্যুর পর থেকে ক্রমাগত দুঃখের আঘাতে মনে মনে পাষাণ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। দাঙ্গার পর সেদিন উমা আর উন্মাদিনী দয়াময়ীকে নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন বানপুরের উদ্দেশে—সেদিনও তিনি শক্ত ছিলেন—এমন দিশেহারা হয়ে পড়েননি।

সাতরাজ্য ঘুরে শেষ পর্যন্ত এসে উঠেছিলেন এখানে—এই দীপঙ্করের বাসায়। সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছিল তাঁর। দীপঙ্কর তাঁর ছেলের মতো। চৌধুরী পরিবারই তাকে মানুষ করেছে। লক্ষ্মীপতির আমলে এরকম অনেক মেধাবী ছেলেকে বৃত্তি দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। পিতৃমাতৃহীন দীপঙ্কর কলকাতায় থেকে পড়ত—ছুটিছাটায়

কমলপুরেও গিয়েছে। জাহ্নবীকে সে বড়মা বলে ডাকত। ফ্রকপরা উমাও দীপুদাকে ভাল করে চিনত সে যুগে। দীপঙ্কর ছিল চৌধুরী পরিবারের নিকটজন। ক্রমে সে বড় হয়েছে—চাকরি-বাকরি করছে, বিয়েও করেছে। তারপর যেমন হয় ; চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকে সে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গেছে। বৎসারান্তে বিজয়াদশমীতে একখানা করে প্রণামী চিঠি লেখা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবু বছরখানেক আগে সেই পূর্বসম্পর্কের সূত্র ধরে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন মা ও মেয়ে। উমার অবশ্য আপত্তি ছিল—কিন্তু সে আপত্তিতে কান দেননি। মনে মনে সেদিন হেসেছিলেন জাহ্নবী। মেয়ে অভিমান করেছে! রানাঘাট উইমেনস ক্যাম্প থেকে দু-তিনখানা চিঠি লিখেও যখন দীপঙ্করের কাছ থেকে জবাব পাওয়া গেল না—তখনই বুঝতে পারা গিয়েছিল—তার মনোভাব। পূর্বসম্পর্ক অস্বীকার করতে চায় দীপঙ্কর। এই দুটি অনাথা মা-মেয়েকে আশ্রয় দিতে চায় না সে। তাই অভিমান করে উমা বলেছিল, এর পরেও তুমি কী করে সেখানে গিয়ে উঠতে চাইছ আমি তো ভেবেই পাই না!

জাহ্নবী জবাব দেননি! বেঁধে নিয়েছিলেন বাক্স-বিছানা।

অভিমান! ঐ একটিমাত্র জিনিসই তো ছিল তাঁর সম্বল! স্বামীর মৃত্যুর পর জাল-উইলে যে ঘরখানিতে তাঁর জীবন-স্বত্ব ছিল সেই ঘরের চৌহদ্দির বাইরে পা বাড়াননি কোনদিন। দেবরের ঐশ্বর্যের একান্তে ঐ অভিমানকে মূলধন করেই কাটিয়ে দিয়ে এসেছেন একটা যুগ। উমাই তখন ভাবে-ভঙ্গিতে প্রকাশ করে যেন বলতে চেয়েছে—মায়ের এতটা অভিমানের বাড়াবাড়ি যেন সহ্য হয় না তার। অথচ সেই জাহ্নবীই সেদিন বিনা আমন্ত্রণে মেয়ের হাত ধরে গিয়ে উঠেছিলেন দীপঙ্করের টালিগঞ্জের বাড়িতে।

উপায় ছিল না তাঁর। চেষ্টার ত্রুটি করেননি। জাহ্নবীর বাপের বাড়িও পাকিস্তানে। বাপ নেই—কিন্তু ভায়েরা আছেন। তাঁরাও দেশঘর ছেড়ে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে এখানে-ওখানে মাথা গুঁজেছেন। তাঁদের গলগ্রহ হওয়া চলে না। উমার শ্বশুরবাড়ি অবশ্য খাস কলকাতাতেই। সেখানে গিয়েও বিশেষ সুবিধা হয়নি। বার্নপুর রিসেপ্‌শান সেন্টার থেকেই একটা টেলিগ্রাম করেছিলেন বৈবাহিককে। দিনসাতেক অপেক্ষা করেও যখন কেউ এল না তখন বাধ্য হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে। জনাবালি তার আগেই মারা গেছে। ওঁদের পুরুষ অভিভাবক কেউ ছিল না—তাই কদিনের মধ্যেই তাঁদের কুপার্স ক্যাম্প থেকে সরিয়ে আনা হল রানাঘাট উইমেন্‌স্ ক্যাম্পে। পুরুষ অভিভাবকবিহীন অনাথা মেয়েদের জন্য করোগেটের টিন দিয়ে ঘেরা এ এক প্রমীলারাজ্য। ওঁরা যখন গিয়ে আশ্রয় নিলেন তখনও করোগেটেড টিনের ছাউনি ওঠেনি। চারদিক খোলামেলা। বন্দুকটা খোয়া গিয়েছিল পথেই। সারারাত মেয়েকে আগলে জেগে বসে থাকতেন তাঁবুর ভিতর। সারি সারি তাঁবু। দরমা ঘেরা পায়খানা—চারপাশ খোলা টিউবওয়েলে স্নান করতে হত। এমন বে-আব্রুর মধ্যে থাকার কথা কল্পনাও করেননি কখনও! রাতের অন্ধকার নেমে এলে ওঁরা স্নান করতে যেতেন। প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতেন। আশেপাশে কাজ করছে পাঞ্জাবি ছুতার, বেহারি মিস্ত্রী। মুলি-বাঁশের দেওয়াল, দরমার ঝাঁপ দেওয়া এক-এক কামরার

ঘর উঠছে আশেপাশে। মাসখানেক ছিলেন সেখানে। এর মধ্যে খানতিনেক চিঠি লিখেছিলেন উমার শ্বশুরবাড়ি—তবু কোনও জবাব এল না। এল না দীপঙ্করের কাছ থেকেও।

লজ্জার মাথা খেয়ে শেষ পর্যন্ত অযাচিতই বৈবাহিকের ওখানে যাবার ব্যবস্থা করলেন। লজ্জা কিসের? তিনি তো নিজে আশ্রয় নিতে চাইছেন না। তিনি শুধু চাইছেন উমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে। উমার অধিকার আছে ও বাড়িতে। ওঁরা উপেক্ষা করলেই তো সে অধিকার নাকচ হয়ে যেতে পারে না। উমাকে তার শ্বশুরের ভিটায় পৌঁছে দিয়ে—নিজের কথা ভাববেন। দয়াময়ী অবশ্য তার আগেই ভারমুক্ত করে গেছেন ওঁদের। স্বামীর দেওয়া একটা নীলার আংটি এখনও আছে হাতে—ওটা বিক্রি করলেও নাহক দু-তিনশ' টাকা পাওয়া যাবে। অন্তত কাশী যাওয়ার ভাড়াটা আসবে হাতে। তারপর রইলেন তিনি আর বাবা বিশ্বনাথ। কাশীতে নাকি অনাহারে কেউ মরে না!

বেঁকে বসল উমাই। সুদিনেই যারা ত্যাগ করেছে তাকে, দুর্দিনে বারেবারে সংবাদ দেওয়াতেও যারা খবর নিতে আসেনি—সেখানে ভিখারিণীর মতো গিয়ে দাঁড়াতে সে রাজি নয়। কাশী যেতে হয় দুজনেই যাবে তারা—প্রয়োজন হয় পথে পথে ভিক্ষা করবে। জাহ্নবী কঠিন হলেন—নরম হলেন—শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল উমাকে। জাহ্নবীর যুক্তি অকাট্য। প্রৌঢ়া বিধবা জাহ্নবীর পক্ষে যা সম্ভব—পূর্ণযৌবনা সুন্দরী উমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। গরুর গাড়ির দুঃসাহসিক যাত্রার পথে এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। প্রাণ দিয়ে জনাবালি সে শিক্ষা দিয়ে গেছে ওদের।

শেয়ালদহ স্টেশান থেকে ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করে জাহ্নবী এসে উঠলেন বৈবাহিকের বাড়ি। জীবনে দ্বিতীয়বার। প্রথমবার এসেছিলেন উমার পাকস্পর্শের দিন। আমীর আলি এভিন্যুর বাড়িটা চিনতে কষ্ট হল না। সদর দরজার কাছে সেকেন্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াতে কেউ এগিয়ে এল না। এমন মক্কেল প্রায়ই আসে উকিলবাড়ি। জাহ্নবী নামলেন, মেয়েকে নামালেন হাত ধরে। বৈঠকখানায় অনেক লোক—ইতস্তত করছেন জাহ্নবী। হঠাৎ বাড়ির একটি ঝি চিনতে পারল ওঁদের। ছুটে এসে প্রণাম করল উমাকে, পরে জাহ্নবীকেও, ওমা! বৌরানী! আমি বলি কে না কে! আসুন আসুন।

খিড়কির পথ দিয়ে নিয়ে গেল ভেতরে। বেলা সাড়ে নটা-দশটা। অফিস টাইম। ভিতরের বারান্দায় তিন-চারজন পাত পেতে খেতে বসেছে। ঠাকুরে পরিবেশন করছে। পরেশবাবুর স্ত্রী একটি মোড়ায় বসে তদারক করছেন। খিড়কির দরজা দিয়ে ওদের ঢুকতে দেখে ঝিকেই প্রশ্ন করেন : কে রে বিন্দি?

বিন্দি-ঝি ছুটে ওঁর কাছে চলে যায়। কানে কানে কী-যেন বলে। কপালে কুঞ্চন-রেখা দেখা দিল গৃহিণীর। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, আমি একটু আসছি বাবা শুভ, তুমি যেন আবার উঠে পড় না—পায়েস আনছে ঠাকুর।

ঘোমটার ভিতর থেকে দেখতে পেল না উমা। বুঝল, ওর নন্দাই শুভঙ্করকে খাওয়াচ্ছিলেন শাশুড়ি এতক্ষণ। ঝি ওঁদের নিয়ে গিয়ে বসাল ভিতরের একখানা ঘরে। বেশিদিন ছিল না এ বাড়িতে—তবু এ ঘরখানিকে ভুলে যায়নি উমা। এটা তারই ঘর।

সেই ডবল-বেড খাট, ড্রেসিং টেবিল, বুক কেস, টেবিল ফ্যান। ফ্যানটা খুলে দিল বিন্দি। জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন, অমল বেরিয়েছে নাকি?

বিন্দি গালে হাত দিয়ে বললে, অ আমার কপাল! তাও জানেন না আপনারা? তিনি আজ দশমাস হল নেই।

নেই! চমকে উঠল উমা। নেই মানে কী?

বিন্দি লক্ষ্য করেছে সেটা। তাই তাড়াতাড়ি বলে, ব্যারিস্টার হতে বিলেতে গেছেন যে!

পরেশবাবুর স্ত্রী আসেন একটু পরেই। উমা প্রণাম করতে যায়—তিন পা পিছিয়ে যান তিনি, থাক্, থাক্ ছুঁয়ো না; আমার এখনও পুজো-আর্চা সারা হয়নি!

উমা একটু অবাক হয়—এতটা শুচিবায়ু তো ছিল না ওর শাশুড়ির। রেলের কাপড়ে এর আগেও প্রণাম করেছে সে—এমন করে পিছিয়ে যাননি তো কখনও!

জাহ্নবী বললেন, অমল বিলেত গিয়েছে? কই আমরা তো একটা খবরও পাইনি।

পরেশবাবুর স্ত্রী নিভাননী বললেন, তত্ত্ব-তালাস করলেই খবর পাওয়া যায়।

জাহ্নবী ঢোক গিলে বললেন, যা বিপদ গেল আমাদের, বেয়ান...

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিভাননী বলেন, বিপদ তো এই সেদিন এসেছে—সুদিনেই কি কোন খোঁজ-খবর নিয়েছেন আমার ছেলের? তখন তো জমিদারী চালে আমাদের মতো চুনোপুঁটিকে নজরই পড়ত না!

জাহ্নবী স্থির করে এসেছিলেন কোন-বাক-বিতণ্ডার মধ্যে যাবেন না। ওঁদের পুত্রবধূকে ওঁদের জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে নীরবেই ফিরে যাবেন। উমাকে তাই বললেন, তুমি ভিতরে যাও উমা, আমি ওঁর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিই।

উমা বুঝতে পেরেছিল দ্বারের বাইরেই উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে অনেকে। এখনও ধরতে গেলে এ বাড়িতে নববধূই সে। ওর ননদ অন্তত এসে ওকে হাত ধরে নিয়ে যাবে এখান থেকে—এটা সে আশা করেছিল। এখন বাধ্য হয়ে একাই সে বেরিয়ে যেতে চাইল। নিভাননী বাধা দিয়ে বললেন, না, তুমি এখানেই থাক, কথাবার্তা যা হয় তা তোমারও শোনা দরকার।

জাহ্নবী কী বলতে গেলেন—তার আগেই দুটি রূপার রেকাবীতে সন্দেশ নিয়ে বিন্দি প্রবেশ করল ঘরে। নিভাননীর কাছে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললে, বড়বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন।

নিভাননী বললেন, আপনারা মিষ্টিমুখ করুন ততক্ষণ, আমি আসছি এখুনি।

একেবারে যেতে হল না তাঁকে ঘর ছেড়ে। কপাটের অন্তরালেই অপেক্ষা করছিলেন গৃহস্বামী পরেশবাবু। দরজার সম্মুখেই তাঁদের যে দাম্পত্য আলাপ হল সেটা এ ঘরে বসে মা-মেয়ের কর্ণগোচর না হবার মতো অনুচ্চ নয়। পরেশবাবু বললেন, তুমি বলেছ ওঁদের সবকথা? ঘোড়ার গাড়ি থেকে গাড়োয়ান মালপত্র নামাচ্ছে যে!

নিভাননী বলেন, এ সব কি মেয়েছেলের কাজ? আমি বাপু পারব না বলতে। অনাথার মতো এসেছে দুজনে আশ্রয়ে খোঁজে—

—কিন্তু আমার বলাটা কি ভাল দেখাবে? উনি হয়তো কথাই বলবেন না আমার সঙ্গে—

জাহ্নবী এগিয়ে এসে বলেন, বেয়ান, ওঁকে ভিতরে আসতে বলুন। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে কোনও সঙ্কোচ নেই আমার। আর আমি অনাথা হতে পারি, কিন্তু আমি আশ্রয়ের খোঁজে আসিনি এখানে,—এসেছি আপনাদের পুত্রবধূকে তার শ্বশুরের ভিটায় পৌঁছে দিতে। গাড়োয়ান যে মালপত্র নামাচ্ছে, তা আমার নয়, আপনাদেরই বেটার বউয়ের।

এবার ঘরে এলেন পরেশবাবু। জাহ্নবীকে হাত তুলে নমস্কার করলেন। উমা এসে প্রণাম করল তাঁকে। উনি অবশ্য পিছিয়ে গেলেন না—আশীর্বাদ করলেও সেটা মনে মনেই করলেন। জাহ্নবীকে বললেন, দেখুন মিসেস চৌধুরী, আমাদের ব্যবহারটা আপাত-রূঢ় হতে পারে; কিন্তু খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে যা বেরিয়েছে তারপর তো আর আপনার মেয়েকে আশ্রয় দিতে পারি না আমি।

জাহ্নবী স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বললেন, খবরের কাগজে কী বেরিয়েছে?

উকিলবাবু তৈরি হয়েই এসেছিলেন। সময়মতো প্রমাণপত্র দাখিল করলেন পকেট হাতড়ে। খবরের কাগজের একটা কাটিং। জনাবালির প্রাণদানের কাহিনী।

জাহ্নবী স্তম্ভিত হয়ে বলেন, তার মানে? এ থেকে কী প্রমাণ হয়?

—আপনার মতো বুদ্ধিমতী মহিলার তা অবশ্যই বোঝা উচিত। যে মেয়ে মুসলমানের স্ত্রী সেজে তার সঙ্গে তিন-চার রাত্রি কাটাতে পারে তাকে তো আমি পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না।

জাহ্নবী আর্তকণ্ঠে বলেন, আপনি কী বলছেন? আমিও ছিলাম যে ওদের সঙ্গে! ও ছাড়া তখন আমাদের উপায় কী ছিল বলুন?

উকিলবাবু হাসি গোপন করে বলেন, আপনি কার স্ত্রী সেজে আত্মরক্ষা করেছিলেন সে কথা কাগজে লেখেনি—আর সে খবরের প্রয়োজনও নেই আমার; কিন্তু প্রাণের ভয়ে যে মেয়ে মুসলমান পাইকের স্ত্রী সেজে তার সঙ্গে রাত্রিবাস......

—না, না, না—আর্তনাদ করে ওঠেন জাহ্নবী—জনাবালি আমার ছেলের মতো! আমাদের মান বাঁচাতে গিয়ে লোকটা প্রাণ দিল, আর আপনি...

বাধা দিয়ে পরেশবাবু বললেন, ছেলের মতোই হোক আর জামায়ের মতোই হোক, দুনিয়াশুদ্ধ লোক আজ জানে তার সঙ্গে আপনার মেয়ে স্ত্রী সেজে তিন রাত্রি ছিল...

অভিমানী জাহ্নবী দেবী যুক্তকরে বলে ওঠেন, আমি ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি বেয়াই মশাই...

—মা!—উমা এতক্ষণে কথা বলে ওঠে। থেমে যান জাহ্নবী।—ওঁদের কাছে জনাবালির আত্মদানের কথা বলতে যাওয়া বৃথা মা! ওঁরা ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছেন—বিলেত-ফেরত ছেলের নতুন করে বিয়ে দিয়ে আবার দশহাজার টাকা ঘরে তুলবেন—তাই উনি প্রমাণ পকেটে নিয়ে ফিরছেন! কেন মিথ্যে অপমান হচ্ছ শুধু শুধু। চল—সখ মিটেছে তো?

উকিলবাবু এ সওয়ালের উপযুক্ত জবাব দিতে পারলেন না।

মায়ের হাত ধরে বেরিয়ে এল উমা।

খুঁজে খুঁজে দীপঙ্করের বাসায় এসে যখন উঠলেন ওঁরা তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর।

দীপঙ্কর বাসায় ছিল না—ছিল সুরমা, দীপঙ্করের স্ত্রী। মুখটা গম্ভীর হল তার—কিন্তু মৌখিক ভদ্রতাও করল। নিয়ে গিয়ে বসালো ঘরে।

দেড়খানি মাত্র ঘর। একটায় শোয় দীপঙ্কর, তার স্ত্রী আর ওদের তিনবছরের একটি ছেলে। পাশের ঘরটা বৈঠকখানা। একচিল্‌তে উঠোন—একপাশে রান্নাঘর, বাথরুম। এই অতি ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর মধ্যে সত্যই স্থান হয় না মা-মেয়ের। হয়তো এই জন্যেই দীপঙ্কর জবাব দেয়নি ওঁদের চিঠির।

সন্ধ্যাবেলা দীপঙ্কর বাসায় ফিরে এসে বিব্রত হল। মুখে অবশ্য স্বীকার করল না সে কথা। স্পষ্টই বলল, আপনাদের দয়াতেই যা হোক দুটো করে খাচ্ছি। যেমন করে হোক চালিয়ে নিতে হবে বইকি।

বি. কম. পাশ করেছে দীপঙ্কর। এ. জি. বেঙ্গলের আপার ডিভিশন ক্লার্ক।

মাসান্তে শ' দুয়েকের মতো ঘরে আসে। পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত তা চলে। চতুর্থ সপ্তাহ চলে বাকিতে—সেটা শোধ হয় তার পরের মাসে মাইনে পেলে। জাহ্নবী বুঝতে পারেন এখানে আসাটা ঠিক হয়নি ওঁদের। এর চেয়ে উইমেনস ক্যাম্পের ভিক্ষান্নই ভালো ছিল। দীপঙ্কর অবশ্য সাধ্যমতো আদরযত্ন করে—সুরমা নীরবে সহ্য করে। বোঝা যায় স্বামীর ছাত্রাবস্থায় যারা অর্থ সাহায্য করেছে তাদের সাহায্য করতে আপত্তি নেই সুরমার,—কিন্তু বাল্য-সহচরীর প্রতি দীপঙ্করের দরদটা সে বরদাস্ত করতে পারছে না। দেড়খানি মাত্র ঘর। ওদের দাম্পত্য আলাপও একদিন কর্ণগোচর হল জাহ্নবীর। টুকরা-টুকরা কথা। শুধু এটুকু-বুঝতে পারেন, সুরমা ওঁদের আর্থিক সাহায্য করায় আপত্তি করছে না—আধপেটা খেয়েও সে স্বামীর আশ্রয়দাতার ঋণ শোধ করতে গররাজি নয়;—কিন্তু এই ক্ষুদ্রপরিসর গৃহস্থালীর শান্তি সে ব্যাহত হ'তে দেবে না। দীপঙ্কর বলেছিল, চুপ কর—ওঁরা শুনতে পাবেন।

সুরমা অনুচ্চ কণ্ঠেই বলেছিল, পান্। চোখের উপরেই তোমরা দুজন যে কাণ্ডটা...

বাকিটা শুনতে পাননি জাহ্নবী। দীপঙ্কর বোধহয় মুখ চেপে ধরেছিল সুরমার।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল ওঁর। উমা খবরের কাগজ দেখে দেখে দরখাস্ত করতে থাকে। দীপঙ্করও খোঁজখবর এনে দেয়, আবেদনের খসড়া করে দেয়, অফিস থেকে টাইপ করে আনে। শুধু গোটা গোটা অক্ষরে সই করে উমা। কিন্তু চাকরির যা বাজার তাতে একটি নন্-ম্যাট্রিক মেয়ের আশা করবার মতো কোনও কিছুই নেই। অনেক চেষ্টার পর একটি টুইশানি জুটেছে উমার। ছোট ছোট দুটি ছেলে মেয়েকে সন্ধ্যাবেলায় পড়ানো। পাড়ারই মেয়ে। মাসে পনের টাকা দেন ওঁরা। দীপঙ্কর বলেছিল, কী হবে এভাবে শরীরপাত করে? যা পারি আমিই তো করছি।

উমা বলেছিল, শরীরপাত করবার অধিকার বুঝি একা আপনার?

—নিশ্চয়ই! তোমার তনুদেহটি যে গচ্ছিত ধন। বিলেতফেরত ব্যারিস্টার-সাহেবের সওয়ালের সামনে কী জবাব দেব?

উমা শোনেনি সে কথা। পনের টাকা পনের টাকাই সই। তবু নিজের হাতখরচটা তো হবে। যে কথাটা না জেনেও এতদিন চলেছিল জাহ্নবীর, সেই অন্তর্গূঢ় কথাটাই এখন সবিস্তারে জানতে চান মেয়ের কাছে। কী নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিল ওদের স্বামী-

স্ত্রীর। বিয়ের পর প্রথম কেমন ব্যবহার করত অমল। সে কি মিষ্টি কথা বলত না? উমাকে আদর করত না? ওদের সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য-জীবনে ওরা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল তা জানবার জন্য যেন হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন তিনি। উমার শুধু লজ্জাই করে না, কেমন যেন ঘৃণাও হয়। সে ভেবে দেখে না—কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে এ গোপন সংবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ শুনবার জন্য আজ উন্মুখ হয়ে উঠেছেন জাহ্নবী। এই যে তাঁর একমাত্র মুক্তির উপায়। তাঁর নয়, তাঁর মেয়ের। একদিন বলেও বসলেন, বিলেতের ঠিকানাটা জোগাড় করা যায় না?

উমা হেসে বলে, সেখানে চিঠি দিলেই কি তিনি ছুটে আসবেন?

—ছুটে না আসুক, একদিন তো সে ফিরে আসবেই। অন্তত তখন তো একটা হিল্লে হবে।

—দরকার নেই অমন হিল্লেয়।

—না, তাতে তোমার দরকার থাকবে কেন? তোমার মতলব কি আমি বুঝি না?

উমা গম্ভীর হয়ে বলে, কী আমার মতলব মা?

জাহ্নবী চুপ করে যান!

কিন্তু তিনি চুপ করলেও ব্যাপারটা চাপা থাকে না। সুরমার কথায়-বার্তায় সেকথা প্রকট হয়ে ওঠে। মনে মনে ছটফট করতে থাকেন জাহ্নবী।

ব্যাপারটা আরও কুৎসিত রূপ নিল কদিন পর।

দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন ওমনি করেই ঘটে। একটা প্রাইভেট ফার্ম থেকে ইন্টারভিয়ু পেল উমা। বেলা সাড়ে নটার সময়েই দীপঙ্করের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেয়ে নিল। লালপাড় একখানা সাদা সাড়ি পরেছে স্নান করে উঠে। প্রথম ইন্টারভিয়ু দিতে যাচ্ছে, মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে নিতে পারলে হত—মুখটা কেমন যেন তেলা তেলা লাগে তা না হলে। নিজের প্রসাধন-সামগ্রীর বালাই ঘুচেছে অনেকদিন, সুরমার পাউডারের কৌটা অবশ্য বাড়ন্ত নয়; কিন্তু ইদানীং সুরমার যে মেজাজ হয়েছে তাতে সাহসে কুলাল না উমার। তোয়ালে দিয়ে মুখটা রগড়ে মুছে নিল বারে বারে। মনকে বোঝাল এ একরকম ভালই হ'ল—প্রসাধন করে গেলে হয়তো নিয়োগকর্তা তার আর্থিক প্রয়োজন সম্বন্ধে ভুল ধারণা করতেন। দীপঙ্করের পাশাপাশি পিঁড়ি পেতে খেতে বসতে কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। সুরমা গম্ভীর মুখে দুজনকেই পরিবেশন করে যায়। উমা সঙ্কোচটাকে ঝেড়ে ফেলল জোর করে। চাকরি যদি পাওয়া যায়, তখন তো রোজই এমন পাশাপাশি সবার আগে বসে খেয়ে নিতে হবে।

জাহ্নবী বলেন, একা একা ঠিকানা চিনে যেতে পারবি তো?

উমার হয়ে দীপঙ্করই জবাব দেয়—একা যাবে কেন? আমার অফিসের কাছেই তো—আমি সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে অফিস যাব।

উমা ভাবে—দীপুদাটার যেমন বুদ্ধি। এ কথাটা সাত তাড়াতাড়ি বৌদির সামনে জাহির করার কী দরকার?

আহারান্তে আর এক সমস্যা। চটি পায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে আসতেই দীপঙ্কর বলে, তুমি চটি ফট্‌ফট্ করতে করতে যাবে নাকি?

—বারে! এটা পরেই তো রাজ্যজয় করে বেড়াচ্ছি। জুতো আবার কবে দেখলেন আমার পায়ে!

—তা বটে! জুতো তো কস্মিনকালে তোমার পায়ে দেখিনি আমি।

বললে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল এই একজোড়া চটি সম্বল করেই উমা এসেছে এ বাড়ি। এটা পরেই টিউশানি করতে যায় সে রোজ। কিন্তু চটি পায়ে দিয়ে ইন্টারভিয়্যু দিতে যাওয়াটা ঠিক নয়—হোক না কেন মেয়ে-সেল্‌সম্যানের চাকরি। দীপঙ্কর বললে—তোমার বৌদিরটা পরে দেখ না, হবে না পায়ে?

সুরমা দাঁড়িয়ে ছিল অদূরে—কিছু বললে না সে।

উমা রেহাই পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলে, বৌদির জুতো আমার পায়ে বড় হবে।

—আরে দেখই না চেষ্টা করে।

এত বোকা দীপুদাটা। বৌদির জুতোজোড়া টেনে এনে উমার পায়ে পরিয়ে দিতে যায়। বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে নিয়ে নিজেই পায়ে দেয় উমা। যেন ওর মাপেই কেনা! খুশি হয়ে ওঠে দীপঙ্কর, শুধু শুধু ভেবে মরছিলে তো এতক্ষণ। কই গো আমার পান?

সুরমা ভিতরে চলে গেছে ততক্ষণে। সাড়া দেয় না। পানের বাটা অবশ্য সামনেই রাখা আছে। উমা তুলে দেয় সেটা। তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়ে পথে।

বেলা পৌনে দশটার অফিসগামী ট্রামবাস! পর পর তিন-চারটে ছেড়ে দিতে হল। দীপঙ্কর বলে, ট্যাকসিই নেব নাকি একখানা?

উমা শিউরে ওঠে, ওরে বাবা, এখান থেকে ডালহৌসি পাক্কা তিনটাকা!

সেটা দীপঙ্করও জানে। মাসের প্রথম দিক হলে হয়তো তা সত্ত্বেও একটা খোকা-ট্যাক্সি ডাকত দীপঙ্কর। উমার সঙ্গে দু-একটা কথাও বলার ছিল তার। বাড়িতে সুরমার শ্যেনদৃষ্টির সামনে কোন কথাই বলার সুযোগ পায় না বেচারা। কিন্তু মাসের এ শেষ সপ্তাহে দমকা খরচা করতে সাহস হল না। অগত্যা পরের বাসটাতেই জোর করে উঠে পড়তে হল। কন্ডাকটার আইনমাফিক ওয়ার্নিং দিল, লেডিস্ সিট নাই কিন্তু।

দীপঙ্কর বলে, সেটা না বললেও দেখতে পাচ্ছি।

কী লজ্জা! প্রায় তিনটে স্টপেজ দীপঙ্করের বাহুপাশে বন্দী হয়ে, প্রায় ওর দেহের সঙ্গে লেপটে গিয়ে ঝুলতে ঝুলতে যেতে হল। চারুমার্কেটের মোড়ে কয়েকটি যাত্রী নেমে পড়ায় দীপঙ্করের বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেল উমা।

ডালহৌসিতে পৌঁছে দীপঙ্কর বললে, লাগেনি তো তোমার?

উমা শুধু মাথা নেড়ে বললে, না।

—এই জন্যেই ট্যাকসি নিতে চেয়েছিলাম তখন। বাসে শালীনতা বজায় রেখে চলাই দায়!

এ প্রসঙ্গ না উঠলেই খুশি হত উমা। বাসের পাদানিতে কাটানো সেই পাঁচটা মিনিটের কথা ভুলে থাকতে পারলেই সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো যেন। দীপুদার সম্বন্ধে কথাটা ভাবতে কেমন যেন লাগে;—কিন্তু কী-জানি কেন উমার তখন মনে হয়েছিল দীপুদার আলিঙ্গনের দৃঢ়তা বুঝি শুধু দুর্ঘটনা নিবারণের জন্যই নয়। ওর তখন মনে

হচ্ছিল একবাস লোক তাকিয়ে আছে ওদের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থার দিকে—দীপুদার দক্ষিণ বাহুর চাপ শুধু ও নয় যেন সমস্ত বাসযাত্রীই অনুভব করছে বুক দিয়ে। বাস থেকে নেমেও কেমন যেন ঝিমঝিম করছে মাথাটা—শরীরটা দুর্বল লাগছে। কদিন থেকেই রাত্রে জ্বর হচ্ছে—হয়তো সে জন্যেই এ দুর্বলতা;—কী জানি ঠিক বুঝে উঠতে পারল না উমা।

নির্দিষ্ট অফিসে পৌঁছে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। অসংখ্য মেয়ে ভিড় করে আছে অফিসের সামনে। ঘর ছাপিয়ে বারান্দা, বারান্দা ছাপিয়ে ভিড় পৌঁছেছে রাস্তায়! ওরা সবাই ইন্টারভিয়ু দিতে এসেছে! জনা আট-দশ মেয়ে-সেলস্‌ম্যান নেবে ওরা। কে জানে এদের মধ্যে কজন আই. এ. পাশ। গ্র্যাজুয়েট আছে কি না তাই বা কে জানে? দীপঙ্কর বললে; কী? অপেক্ষা করবে না ফিরে যাবে।

উৎসাহ সম্পুর্ণ নিভে গিয়েছিল উমার। শরীরটাও ভাল লাগছে না, মাথাটা এখনও ঘুরছে। ফিরে যাওয়াই মঙ্গল; বলে, কোন আশা নেই, শুধু শুধু বসে থেকে কী করব? বাড়িই ফিরে যাই বরং।

—তার চেয়ে চল বোটানিক্স বেড়িয়ে আসি দুজনে। যাবে?

—বোটানিক্স? সেকি! আপনার অফিস আছে না?

—আজ বরং ক্যাসুয়েল লিভ নিই।

একটু অবাক হল উমা। মনে পড়ল আবার বাসের সেই পাঁচটি মিনিটের কথা। দীপুদা লোকটা তো এমন ছিল না আগে।

—চল, খোলা হাওয়ায় দুপুরটা কাটিয়ে আসি।

—না, এসেছি যখন, তখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত।

—একা ফিরে যেতে পারবে তো?

—হ্যাঁ, ফেরার পথে তো আর ভিড় হবে না। দুপুরের মধ্যেই মিটে যাবে বোধ হয়।

অগত্যা দীপঙ্কর ওকে সেখানে রেখে চলে গেল অফিসে। এরপর শুরু হল ধৈর্যের পরীক্ষা,—শারীরিক সহ্যক্ষমতারও। খান-তিনেক বেঞ্চি অবশ্য পেতে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেগুলি সাত-সকালেই ভর্তি হয়ে গেছে। ডান-পায়ে, বাঁ-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বেচারির মাজা ভেরে এল। দুটো পা-ই টনটন করছে। একটু বসতে পারলে হত! কিন্তু বসবে কোথায়? লালদিঘির ধারে গিয়ে বসা যায়—কিন্তু কে জানে কখন ডাক পড়বে। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির হাতঘড়িতে কাঁটা দুটো এগিয়ে চলেছে। এগারো, সাড়ে এগারো, বারো—। উমা লক্ষ্য করতে থাকে মেয়েদের শাড়ি, সাজ-পোশাক। লক্ষ্য করে পথচারীদের। সময় যেন আর কাটে না। অবশেষে বাজল একটা; লাঞ্চ টাইম হল। কর্তারা লাঞ্চ খেতে গেলেন। অন্তত এক ঘন্টার ছুটি। খাবার জলের ব্যবস্থা আছে। বার দুই জল খেয়েছে ইতিমধ্যে; কিন্তু মেয়েদের বাথরুমটা কোথায় কিছুতেই সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারল না কাউকে। আবার দুটো থেকে শুরু হল ইন্টারভিয়ু। আবার গড়িয়ে চলে বেলা।

বেলা চারটে নাগাদ এল দীপঙ্কর। যাকে এড়িয়ে যাবার জন্য ঘন্টা পাঁচেক আগে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল তাকে দেখতে পেয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল বেচারির।

—আপনি চারটের মধ্যেই চলে এলেন যে?

—দেখতে এলাম, তুমি আছ না গেছ।

ভিড়টা অবশ্য অনেক পাতলা হয়ে গেছে। অসম্ভব গুমোট গরমও গেছে সারাদিন। ঘামে জবজব করছে উমার অন্তর্বাস। দীপঙ্কর বললে, কত নম্বর তোমার?

—নম্বর? কিসের নম্বর?

—ওমা তাও জান না এখনও? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি জেনে আসছি।

একটু পরে দীপঙ্কর ফিরে এসে বললে, তুমি আবার চাকরি করবে! বাঙাল কোথাকার! ঐ দেখ লিস্ট টাঙিয়ে দিয়েছে। আজ তোমার ডাকই পড়বে না। কাল তোমার ডেট পড়েছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন, বললে, তাহলে বাড়ি যাই চলুন।

—অন্তত এখান থেকে তো বের হই।

ওরা বেরিয়ে এল দুজনে। উমা বলে, আমাকে বাসে তুলে দিয়ে আপনি চলে যান অফিসে। আমি একাই যেতে পারব।

দীপঙ্কর বলে, আজকের মতো ওপাট চুকিয়ে এসেছি। চল একটু চা খাওয়া যাক কোথাও।

একটু ইতস্তত করে উমা। শরীরটা সত্যিই বড় কাহিল লাগছে, গরম এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হত না; কিন্তু তার আগে একবার বাথরুমে যেতে পারলে হত। ট্রামে করে ওরা চলে এল এস্প্ল্যানেডে। চায়ের দোকানে ঢুকেছে কি ঢোকেনি উঠল ধুলোর ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোঁটার কালবৈশাখী বৃষ্টি। একে পাঁচটা বাজে, তায় বৃষ্টি নেমেছে। চায়ের দোকানেও চাপ ভিড়। তবু করিতকর্মা একটা বেহারা নিয়ে গিয়ে বসালো ওদের একটা কেবিনে। দীপঙ্কর অর্ডার দিল, দুটো কোবরেজি কাটলেট আর চা!

উমা বললে, আবার কাটলেট কেন? শুধু চা হলেই হত।

দীপঙ্কর বললে, এমন সুন্দরী একটি বান্ধবী নিয়ে এসে যদি শুধু এককাপ চা খাওয়াই তাহলে বয়টা আমাকে হাড়-কেপ্পন ভাববে না?

আবার একটা ধাক্কা খেল উমা। না, প্রতিবাদ করা উচিত। এভাবে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। বললে, আমি আপনার বান্ধবী নই দীপুদা, ছোটবোন; আর সুন্দরী যে আমি নই তা আমিও জানি, আপনিও জানেন!

দীপঙ্কর লজ্জা পায় না মোটেই, উত্তরে আরও রসালো কিছু বলতে যায়,—কিন্তু তার আগেই জলের গ্লাস আর কাঁটা-চামচ নিয়ে বয় কেবিনে ঢোকে পর্দা সরিয়ে।

চায়ের কাপে তো আর গোটা বঙ্গোপসাগরের জল নেই, শেষ হল তা অবশেষে। বাইরে তখনও অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি। ঝড়বৃষ্টির দোহাই দিয়ে হয়তো আরও কিছুক্ষণ বসে থাকা চলত—কিন্তু বারে বারে উঁকি দিচ্ছে বয়টা। পর্দা ওঠালেই দেখা যাচ্ছে অনেকে প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাচ্ছে। অগত্যা ভদ্রতা রাখতে উঠে পড়তে হল ওদের। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় নেয় মেট্রোর পোর্টিকোর তলায়। এইটুকু আসতেই ভিজে একশা। শাড়িটা ভিজে লেপটে যাচ্ছে গায়ে। দীপঙ্কর বলে, যা বৃষ্টি নেমেছে, ঘণ্টা দুয়েকের আগে আর থামবে না।

উমা বলে, সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো টন্‌টন্‌ করছে।

দীপঙ্কর বলে, এক কাজ করা যাক। চল সিনেমা হলে ঢুকি। সময়টাও কাটবে, বসাও যাবে।

সিনেমা দেখার জন্য নয়, বসতে পাবার লোভেও নয়, উমা রাজি হয়ে গেল অন্য একটা কারণে। মেট্রোর পোর্টিকোর নিচে চাপ ভিড়, হাজার-বাতির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে জায়গাটা। ভিজে সাড়ি বুকে লেপটে এমন অবস্থা হয়েছে যে, এখানে এমন সদ্যোস্নাতার মতো দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। সিনেমা হলে লোক যতই থাক আলো নেই। তাই রাজি হয়ে গেল উমা। এছাড়াও আরও একটা বড় কারণ ছিল। উমা এখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছিল ঝক্‌ঝকে কাচের দরজার ওপাশে উঠে গেছে কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি আর বাঁ-দিকে নিয়ন আলোয় লেখা রয়েছে—টয়লেট—জেন্টস্—লেডিস্।

দুখানা টিকিট কেটে ওরা দুজনে ঢুকল সিনেমা-হলে।

বাইরে ঝড়ের এই মাতন—অবিশ্রান্ত বর্ষণের এই গর্জন সব স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। উঃ, কত যুগ পরে সিনেমা দেখছে উমা!

বেরিয়ে এল যখন, আশ্চর্য, তখনও বর্ষণ থামেনি। নাগাড় তিনঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। ট্রামবাস সব বন্ধ। আবার আশ্রয় নিতে হল পোর্টিকোর নিচে।

বৃষ্টি থামল রাত সাড়ে দশটায়। প্রথম বাস ছাড়ল প্রায় এগারোটায়। কিন্তু সে বাসে ওঠে কার সাধ্য? আরও পাঁচ-ছ'খানা বাস ছেড়ে দিয়ে ওরা যখন বাড়ি এসে পৌঁছাল রাত তখন একটা।

এমন দুর্যোগের দিনে কেই বা সন্ধ্যারাতে বাড়ি ফিরতে পেরেছে? ওরাও না হয় রাত করেছে। তাতে দোষের কী আছে? কিন্তু একই রিকশায় চেপে জল ভাঙতে ভাঙতে ভিজে জবজবে হয়ে যখন ওরা এসে পৌঁছাল তখন অভ্যর্থনাটা তাদের হল একটু অদ্ভুত। দরজা খুলে দিতে এলেন জাহ্নবী। সুরমা নয়। দীপঙ্কর বলে, একী! আপনি এসেছেন দরজা খুলে দিতে? ও কী করছে?

জাহ্নবী সংক্ষেপে শুধু বললেন, বৌমার শরীর ভাল নয়—সন্ধ্যা থেকেই ঘুমাচ্ছে।

দীপঙ্কর শোবার ঘরের সামনে এসে দেখল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

এর মানে কী? দীপঙ্কর সুরমার নাম ধরে ডাকল বার দুই। দরজায় কড়া নাড়ল জোরে জোরে—তবু ঘুম ভাঙলো না সুরমার। ঘরের ভিতর শিশুকণ্ঠ শোনা গেল, তারপর চপেটাঘাতের আওয়াজ এবং শিশুর আর্তকান্না। তবু ঘুম ভাঙল না সুরমার।

দীপঙ্কর চুপ করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। আর উমার মনে হচ্ছে এত বাজ পড়ল আজ, তার মাথায় নামল না কেন একটা? জাহ্নবী গিয়ে শুয়ে পড়েছেন নিজের বিছানায়। নিভিয়ে দিয়েছেন আলো। দীপুদাকে অন্ধকার বারান্দায় তার ভাগ্য, অন্ধকার আর বিচারকর্ত্রী স্ত্রীর উদ্দেশে সমর্পণ করে উমা চলে যায় পাশের ঘরে। অন্ধকারের মধ্যেই জাহ্নবীর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ দুজনে?

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে উমার। সমস্ত দিন কী ঝড়টাই না গেছে তার উপর

দিয়ে। বাড়িতে ফিরে এসে কোথায় নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে, না কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর মতো কৈফিয়ত দাও এখন। উদ্ধত ভঙ্গিতে উমা বলে,—সিনেমা দেখছিলাম!

যেন বোমা ফাটল সশব্দে। জাহ্নবী চিৎকার করে উঠলেন অন্ধকারের মধ্যে—লজ্জা করে না হারামজাদী! নিজের কপাল তো পুড়িয়েছিস্, এখন ঐ কচি বৌটার সর্বনাশ করছিস!

পাশের ঘরে ডুগরে কেঁদে ওঠে সুরমা।

মাথাটা আগে থেকেই ঘুরছিল। হঠাৎ থরথর করে কেঁপে ওঠে উমা। সব অপমান, সব যন্ত্রণাই সহ্য করে আসছিল এতক্ষণ, কিন্তু চৌধুরীবাড়ির বড়-বউয়ের মুখে এই ভাষাটা যেন সজোরে চাবুক মেরেছে ওর মস্তিষ্কে। সমস্ত কলুষ যে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর স্পর্শে অমৃত হয়ে উঠত সেই মায়ের মুখে এই কথা! এ কোন্ নরকের মধ্যে নেমে যাচ্ছে ওরা তিলতিল করে? ভরপেট খেতে না পেলেই কি মানুষ ছোটলোক হয়ে যায়? মাথা ঘুরে সজোরে আছড়ে পড়ে মেঝের উপর। জাহ্নবী তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে দেখেন মেঝের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে উমা। ভিজা মাথাটা কোলে তুলে নিতে গিয়ে দেখেন প্রবল জ্বর এসেছে তার।

ঐ জ্বরই কাল হল। ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজ্বর—কাশিটা প্রবল। আদার জল খাও, বার্লি খাও—উঠে বস। তা নয়, ঘুসঘুসে জ্বরটা আর যেতেই চায় না। বিছানায় উঠে বসতে পারে না। চাকরি করার চিন্তা তো মাথায় উঠেছে, প্রাইভেট টিউশানি দুটোও যেতে বসেছে।

কোনদিকেই আর কূলকিনারা দেখতে পাচ্ছেন না জাহ্নবী। দীপঙ্করকে বারে বারে বলেছেন জামাইয়ের একটা খবর আনতে—কবে ফিরবে সে বিলাত থেকে। দীপঙ্কর গা করে না। তাতেই সন্দেহটা জেগেছিল তাঁর। একি, যে রক্ষক সেই ভক্ষক হতে বসল নাকি? সুরমার মুখ দেখেই সন্দেহ আরও প্রবল হয়। প্রায় মাসখানেক রোগ ভোগ করেও যখন উমা মাথা তুলে উঠে বসতে পারল না তখন একদিন জাহ্নবী দীপঙ্করকে বললেন, একা তো আমি পথঘাট চিনে যেতে পারব না, তুমি আমাকে একবার কালিঘাটে নিয়ে যাবে বাবা?

দীপঙ্কর তৎক্ষণাৎ রাজি, বলে, আজই চলুন ঘুরিয়ে আনি, আজ ছুটি আছে।

উমার চিকিৎসা করার সম্বল নেই—তবু ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিল দীপঙ্কর। উমার প্রবল আপত্তিতে সেটা সম্ভব হয়নি। সুরমার মনোভাব আন্দাজ করে জাহ্নবীও নীরব ছিলেন। দীপঙ্করও আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে সাহস পায়নি। এমনিতেই সুরমা রীতিমতো খিটখিটে হয়ে উঠেছে। তাই কালিঘাটে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে খুশি হয়ে উঠল দীপঙ্কর। তবু একটা সান্ত্বনা থাকবে।

উমাকে বার্লিটা খাইয়ে জাহ্নবী স্নান সেরে তৈরি হয়ে নেন। কালিঘাটের মোড়ে এসে সওয়া পাঁচ আনার মিষ্টি কেনেন। মায়ের মন্দিরে ঢুকবার মুখে কে যেন ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ প্রণাম করল তাঁকে, মাসিমা, চিনতে পারেন?

দিবাকর! একেবারে জড়িয়ে ধরলেন জাহ্নবী। এমন একটা মানুষকেই মনে মনে খুঁজছিলেন যেন। জোর করে চেপে ধরলেন ওর হাত—ভিড়ের মধ্যে যেন হারিয়ে না

যায় আবার। পুজো দিয়ে ফিরতে ফিরতেই অনেক খবর দেওয়া-নেওয়া হল। দীপঙ্করকে নমস্কার করল দিবাকর। পরিচয় হল দুজনার। জাহ্নবী খুঁটিনাটি সব জেনে নিলেন একে একে। দিবাকর আজকাল অক্রুর দত্ত লেনের এককামরার একটি প্রেসে থাকে—প্রেসেরই প্রুফ-রীডার। আয় সামান্য—ফুরণে কাজ করতে হয়—ফর্মা পিছু রেট বাঁধা। রাত জেগে কাজ করলে আয় আরও কিছু বাড়ে। অন্যান্য সকলের খবর? হ্যাঁ, তাও জানে দিবাকর কিছু কিছু। ননীমাধব, হৃদয় ঘোষ, জগা-ডাক্তার আসামে আছে। জমি বাড়ি করেছে—সরকারি ঋণে। দ্বিজপদ কর্মকার, নবীন যুগী, মতি পাল, রতন ঘোষ ওরা আছে বর্ধমানের কাছে লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পে।

—আমাদের ঠাকুরমশাই? শিরোমণি মশাই?

—তিনি আছেন নৈহাটিতে। স্ত্রী ওখানেই। মেয়েটি মারা গেছে শুনেছেন বোধহয়।

—হ্যাঁ, শুনেছি। শিরোমণির নাকি পা-দুখানাও গেছে।

দিবাকর শুধু বললে, হুঁ!

এই ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিতটিকে কোনদিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি দিবাকর। বয়সে বড়, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাই বাহ্যিক সম্মানটা অবশ্য বজায় রাখত তাঁর—কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁর প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না। দক্ষিণার প্রতি, নৈবেদ্যের কলাটা-মূলাটার প্রতি তাঁর লোলুপতা মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে পড়ত। একে-জাতিচ্যুত ওকে একঘরে করবার ষড়যন্ত্রে রসিকলাল শিরোমণি চিরদিনই প্রধান নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতেন গ্রামে। সঙ্কীর্ণতা ছিল তাঁর ব্যবহারে—নিচুজাতের কেউ অথবা মোল্লাহাটির কেউ কেউ তাঁর বাড়িতে এলে চেঁচিয়ে উঠতেন—দাওয়ায় উঠিস্ না হারামজাদারা! ওখানেই দাঁড়া! উমার প্রসঙ্গে দিবাকরকেও একঘরে করতে তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাই এই বৃদ্ধ সঙ্কীর্ণচেতা ব্রাহ্মণটিকে দিবাকর শ্রদ্ধার চোখে দেখত না কোনদিনই।

দাঙ্গার ঘর-জ্বালানো মশালের আলোয় এই ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণটির চরিত্রের আর একদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সবাই যখন গ্রাম ত্যাগ করে গেল তখনও উনি রইলেন মায়ের মন্দির আঁকড়ে। এ নাকি তাঁর বংশানুক্রমিক দায়িত্বভার। মায়ের মূর্তি অরক্ষিত রেখে তিনি গ্রামত্যাগ করতে রাজি হলেন না। তারপর সেই হা হা-করা দুর্যোগের রাত্রে ওরা যখন এল মন্দির আক্রমণ করতে তখন উপবীত-সর্বস্ব একা ব্রাহ্মণ এসেছিলেন বাধা দিতে। ডাকাতেরা চিনত গ্রামের পুরোহিত রসিকলাল শিরোমণিকে। প্রাণে তাঁকে বধ করেনি। অনুরোধ করেছিল নিষিদ্ধ একটুকরো মাংস মুখে দিয়ে একটা মন্ত্রোচ্চারণ করতে। রাজি হতে পারেননি শিরোমণি। বাঁ পা খানা হাঁটু থেকে তারা উল্টো দিকে ভাঁজ করে দেয় শুধু। যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাতরাচ্ছিলেন যখন শিরোমণি, তখন ওরা দ্বিতীয় পা-খানা চেপে ধরে প্রশ্ন করেছিল, এখন বল্ ঠাকুরমোশাই! ধর্ম দিবি, না জান দিবি?

সবচেয়ে ট্রাজেডি হচ্ছে শিরোমণি দুখানি ভাঙা পা-নিয়ে যখন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তখন তাঁকে যে বর্ডার স্লিপ দেওয়া হয় তা নাকি শিরোমণি যত্ন করে রাখেননি। এলোভুলো মানুষ তিনি বরাবরই। ও কাগজখানার মূল্য বুঝতে পারেননি। তাই রেজিস্টার্ড রিফিউজি বলতে যা বোঝায় তিনি তা নন। ভিক্ষাই সম্বল তাঁর।

ফেরার পথে ফেলে-আসা গাঁয়ের গল্প করতে করতেই আসছিলেন দুজনে। দীপঙ্কর মাঝে মাঝে হুঁ হুঁ করে সাড়া দিচ্ছিল শুধু। উমার অসুখের কথা শুনে দিবাকর বলল, ডাক্তার দেখানো উচিত। আর দেরি করা ঠিক নয়। আজই ডাক্তার ডেকে আনব আমি।

দীপঙ্কর একটু লজ্জা পেয়ে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলে, আমিও তো তাই বলি। এঁরা মা-মেয়ে কিছুতেই রাজি নন।

দিবাকর দৃঢ়স্বরে বলে—ওঁদের কথা শুনলেই চলবে আমাদের?

জাহ্নবী ভেবে রেখেছিলেন, বাড়ি ফিরে উমাকে একেবারে চমকে দেবেন। বলবেন—কে এসেছে তোকে দেখতে, বলত?

মাস্টারমশাইয়ের প্রতি মেয়ের মনোভাব মায়ের অজানা নয়। বস্তুত কমলাপতি মাঝখানে পড়ে বাধা না দিলে তিনি এই ছেলেটির হাতেই মেয়েকে তুলে দিতে রাজি ছিলেন এককালে। নিজের ছেলে থাকলেও বোধকরি জাহ্নবী তাকে এরই মতো ভালবাসতেন।

বাড়ি ফিরে কিন্তু সে কথা বলা হল না। বাড়িতে অপেক্ষা করছিল এক নতুন বিস্ময়। সদর দরজা খোলা। ওঁরা তিনজনে ঢুকে দেখেন রোগজীর্ণ উমা বসে আছে বারান্দায়। অদুরে তিনবছরের ছেলেটিকে সবলে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে ভয়ে নীল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরমা। বিহ্বল বিস্ফারিত চোখে দেখছে উমাকে—যেন কখনও দেখেনি তাকে।

জাহ্নবী বিস্মিত হয়ে তাকেই প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে বৌমা?

সুরমা জবাব দেয় না।

উমা শুধু হাতটা বাড়িয়ে নির্দেশ করে নর্দমার দিকে।

রক্ত!

উমা কাশতে কাশতে বমি করেছে—তার সাথে উঠেছে রক্ত।

হাত পা হিম হয়ে আসে জাহ্নবীর। এর অর্থ অতি পরিষ্কার।

সুরমা ডুগ্‌রে কেঁদে ওঠে—দীপঙ্করকেই বলে, তুমি খোকনকে পাঠিয়ে দাও তার দাদুর কাছে—এক্ষুনি, এই মুহূর্তে!

দীপঙ্করও কথা খুঁজে পায় না। জাহ্নবীও নির্বাক। এতক্ষণে উমা দেখতে পেয়েছে দিবাকরকে। কী যেন বলতে চায় সে, বলতে পারে না। ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে ওঠে শুধু। তারপর দুহাতে আঁচলে মুখ ঢেকে হুহু করে কেঁদে ফেলে। জাহ্নবী দেওয়ালটা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন পাষাণ প্রতিমার মতো। এগিয়ে আসে দিবাকর। একমাত্র সেই বোধকরি একেবারে দিশাহারা হয়েপড়েনি এখনও। সুরমাকে সে চেনে না, তবু সহজ ভঙ্গিতে তাকেই উদ্দেশ করে বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন বৌদি—খোকনকে এখনই স্থানান্তরিত করা উচিত। এ ছোঁয়াচে রোগ—ওর বয়স কম—বডি-রেজিস্টেন্স কম। দীপঙ্করবাবু আজই ওকে রেখে আসবেন। আপনিও বরং দুদিনের জন্য বাপের বাড়ি ঘুরে আসুন। দিন দুয়েকের মধ্যে আমি এঁদের নিয়ে যাব।

কান্না থামিয়ে আঁচল থেকে মুখ তোলে উমা। দিবাকর বলে, যক্ষ্মা যে তোমার হয়েছে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। গলা চিরে গিয়ে কাশির ধমকেও রক্ত উঠে থাকতে পারে। তবু সাবধান হতে হবে বইকি উমা।

জাহ্নবী সম্বিত ফিরে পান যেন, বলেন, কিন্তু তোমার বাসাতেই বা কেমন করে—

—আমার বাসা নয়, মাসিমা। আমি প্রেসঘরে রাত্রে থাকি। সেখানে আপনাদের থাকা সম্ভবপর নয়। তবে বস্তি অঞ্চলে আমাকে একটা বাসা খুঁজে নিতে হবে বইকি। এঁদের সংসারেই বা কতদিন থাকবেন এভাবে?

দীপঙ্করের মনে হয়—বোধহয় প্রতিবাদ করাটা ভদ্রতা হবে—কিন্তু তবু কিছু বলতে পারে না। অন্নদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকাটা যদি তার ধর্ম হয়, তবে স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল দেখাটাও তার ধর্ম।

—আচ্ছা আজ চলি মাসিমা, চলি দীপঙ্করবাবু।

দীপঙ্কর এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করে বলে—সে কী? অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যান।

দিবাকর বলে, না আজ থাক! কাল-পরশুর মধ্যেই আমি আবার আসছি। তখন এসে এঁদের নিয়ে যাব। তখন না হয় চা খেয়ে যাব।

এতক্ষণে সুরমা কথা খুঁজে পায়। যে লোকটি তার সংসার থেকে এই অবাঞ্ছনীয় ভারকে বিতাড়িত করছে তার প্রতি হঠাৎ মমত্ব উথলে ওঠে ওর। একটু আগে এই অপরিচিত ছেলেটি তাকে বৌদি সম্বোধন করেছে। মুক্তি যখন আসন্ন তখন পরিবেশটা লঘু করতে আপত্তি কী? তাই বললে, সে কি হয় ঠাকুরপো। আপনি প্রথম এলেন এ বাড়িতে, অন্তত একটু মিষ্টিমুখ করে যান।

দিবাকর হেসে বললে, তা হয় না বৌঠান! আপনার খোকনের যেমন বাপ-মা আছে—আমারও তো তেমন বাপ-মা থাকতে পারেন। তাঁরাও হয়তো নেপথ্যে বলছেন এ বাড়িতে কিছু মুখে না দিয়েই চলে যেতে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে!

হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে দিবাকর বিদায় নেয়।

দিবাকর তার কথা রেখেছে। দিন দুই পরে এসে উমা আর জাহ্নবীকে নিয়ে গিয়েছিল দীপঙ্করের বাসা থেকে। বেলেঘাটায় এক বস্তিতে এসে উঠেছিল ওরা। বাড়িতে নয়টি কামরা, নয়জন ভাড়াটে। ভুল হল হিসাবে, পরিবার এগারটি। দুটি ঘরে একাধিক পরিবার মাথা গুঁজেছে, ভাড়া ভাগাভাগি করে। এতগুলি পরিবারের জন্য একটিমাত্র সার্বজনীন উঠান। রাস্তার কল থেকে লাইন দিয়ে জল আনতে হয়। মাটির মেঝে, খোলার চালা। চতুর্দিকে নোংরার একশেষ। বাড়ির সামনে কোমরভর নর্দমা,—সব সময়েই সবুজনীল জলকাদায় ভর্তি। উৎকট গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। প্রাণান্তকর পরিবেশ। নতুন বাসায় পৌঁছে দিবাকর প্রশ্ন করেছিল, এই আমাদের নতুন বাসা, কেমন, পছন্দ হয়?

ঠোঁট উলটিয়ে উমা বলে, স্বর্গ!

জাহ্নবী ইতস্তত করে বলেন, কিন্তু পায়খানাটা কোনদিকে?

দিবাকর বিব্রত বোধ করে। ঘরটা ভাড়া নেবার সময় এ [redacted]

নেয়নি। সন্ধান নিতে গিয়ে যা শুনে এল তাতে জবাব দেবার ভাষা জোগাল না বেচারির। জাহ্নবীও লজ্জা পেলেন। উমা সেটাকে চাপা দিতে গিয়ে বললে, ওসব ভেবে লাভ নেই! এর চেয়ে ভাল জায়গা আর পাচ্ছ কোথায়? অথচ এরই ভাড়া মাসে সওয়া সাতটাকা।

জাহ্নবী চেষ্টা করেন নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে। অদ্ভুত চাপা মানুষ তিনি। দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে সত্যই সর্বংসহা হয়ে উঠেছেন ক্রমে। উমাও মনকে তৈরি করে নেবার চেষ্টা করে। উপায় নেই—সর্বহারাদের সমতলে নেমে এসে শৈলাবাসের স্বপ্ন দেখলে চলবে না। এদের মধ্যেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া চাই। প্রতিবেশী পাল-গিন্নির সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করে। মতিমিস্ত্রির বউয়ের সাথে সখীত্ব চলে কি না চেষ্টা করে দেখে। বাল্য আর কৈশোরের অতীত ইতিহাসটাকে অস্বীকার করে এদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশতে চায়।

একটু এগিয়ে যেতেই দেখল—কাজটা সহজ নয়। 'নেই' বললেই আবাল্যের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা যায় না। পাল-গিন্নির কথোপকথনের সাধারণ ভাষাই ওর কান গরম করে তোলে। নরনারীর গোপনতম সম্পর্কের বিষয়ে এমন বিচিত্র ভাষায় এমন প্রকাশ্য আলোচনা যে কেউ করতে পারে তা যেন কল্পনাই করেনি কোনদিন। আর সবাই সেটা উপভোগ করে, মেয়ে-মহলে হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে পালগিন্নির রগড় শুনে। চুপিচুপি নিঃসাড়ে উমা উঠে যায়।

মতিমিস্ত্রির স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েও আহত হয়ে ফিরে আসে। পারুল মতিমিস্ত্রির বিবাহিতা স্ত্রী নয়। ওরা দুজনে এক সাথে থাকে—এই মাত্র সম্পর্ক। পারুলের ঘরে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা গান-বাজনার আসর বসে। ভাল গান জানে পারুল। শনিবারেই জমজমাট আসর বসে—সেদিন হপ্তাবার। উমা শিউরে উঠেছিল শুনে, যারা গান শুনতে আসে তারাও মাঝে মাঝে রাত্রিবাস করে যায় পারুলের ঘরে। মতিমিস্ত্রি আপত্তি করে না। দুজনের সংসারে এটা নাকি বাড়তি রোজগার।

সব শুনে শেষপর্যন্ত শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল উমা; দিবাকরকে কিছু জানতে দেয়নি—জাহ্নবীকেও বলেনি কিছু। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ স্বর্গসুখ বেশিদিন সহ্য হল না ওদের। প্রতিবেশী মতিমিস্ত্রিই একদিন মত্তাবস্থায় হুট করে ঢুকে পড়েছিল উমাদের ঘরে। দিবাকর তখন প্রেসের কাজে বেরিয়ে গেছে, জাহ্নবীও ঘরে ছিলেন না। হৈ-চৈ চেঁচামেচিতে কেলেঙ্কারি চরম হল। কিন্তু আশ্চর্য, আর পাঁচটা প্রতিবেশী উমাকে সমর্থন করতে এগিয়ে এল না। অপরাধটা নাকি উমারই বেশি। মতিমিস্ত্রি তো বিনাকড়িতে তেল কিনতে আসেনি। ও মেয়েমানুষটাই বা অমন ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল কেন? অত সতীপনা কিসের? আর পাঁচজনও তো ঘাসের বীজ খায় না। তারাও খবর রাখে উমা দিবাকরের বিয়ে করা বউ নয়। বস্তিতে এসে একসঙ্গে ঘর করছে মাত্র। তাহলে পারুলের সঙ্গে, চাঁপার সঙ্গে আর তার তফাত কিসের?

বাসা বদলাতে হল। তাতেও সমস্যাটার সমাধান হল না কিন্তু। দু-তিনবার বাসা বদলেও এমন পাড়া পাওয়া গেল না যেখানে কৌতূহলী প্রতিবেশিনী এসে জিজ্ঞাসা করে না, ও তোমার সোয়ামী নয় বুঝি? তোমার দাদা? তাও নয়? ও মা, সে আবার কি কথা!

অবাক হয় সবাই। এমনভাবে অবিবাহিত নরনারীকে এক ছাদের নিচে কখনও থাকতে দেখেনি বলে নয়—তা ওরা দেখেছে ইতিপূর্বেও; কিন্তু মেয়ের মা কী করে এটা সহ্য করে? অন্তত লোকের মুখ চাপা দিতে বললেই পারিস ওরা মাগ-ভাতার!

উমা শেষ পর্যন্ত একদিন দিবাকরকে বললে, এবার নতুন বাসায় গিয়ে সত্যিই আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দেব। না হলে রেহাই দেবে না এরা।

হেসে হেসেই বলেছিল কথা কটা। দিবাকর জবাব দিতে পারেনি। জাহ্নবী উপস্থিত ছিলেন সেখানে। হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠেন, সেটাই বাকি আছে!

তখন ধমক দিলেও পরে মেয়ের কথাতে তিনি চিন্তায় পড়লেন। উমা আড়ালে বললে—ঠাট্টা নয় মা, ক্ষতি কী যদি বাইরে আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দিই?

—তুই কি পাগল হলি নাকি?

—পাগল হইনি মা; কিন্তু ভেবে দেখ এ ছাড়া উপায় কী আছে? তোমার শেষ আশা যা ছিল তাও তো চুকেবুকে গেল।

দীপঙ্কর সম্প্রতি চিঠি লিখে জানিয়েছে জাহ্নবীর অনুরোধ ক্রমে সে উমার শ্বশুবাড়িতে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। উমার স্বামী অনেকদিন হল ফিরে এসেছেন এবং আবার বিবাহ করেছেন।

জাহ্নবী বললেন, তুমি আর কচি খুকিটি নও—এ কথার মানে কী দাঁড়ায় তা নিশ্চয় বোঝ। সব দিক ভেবে চিন্তে দেখেছ কি?

—আর ভাবতে পারি না মা—তবে এ ছাড়া আর পথও দেখছি না কিছু।

একটু ইতস্তত করে জাহ্নবী বললেন, হাজার হোক দিবাকর পুরুষ মানুষ। সামলে রাখতে পারবি নিজেকে?

ম্লান হেসে উমা বলেছিল, মায়ের চোখ তোমার, তাই দেখতে পাও না। এই দেহটার উপর মতিমিস্ত্রির মতো মানুষের নজর পড়তে পারে—তাও সে যখন মদ খায়। সুস্থ সবল মানুষ আমার কাছে কী পাবে মা? আর মাস্টারমশাই তো দেবতা!

জাহ্নবী তাকিয়ে দেখলেন মেয়ের দিকে। উমার এ রূপ যেন নতুন করে চোখে পড়ল আজ। কালের হিসাবে যৌবনের মধ্যাহ্নগগন বোধহয় অনতিক্রান্ত কিন্তু অকাল-আঁধিতে ম্লান হয়ে গেছে তার দীপ্তি। চোখের কোলে জমেছে কালি, চোয়াল গেছে বসে, কণ্ঠার হাড়টা উঠেছে ঠেলে। ভিতর থেকে রোগ তাকে তিলতিল করে ক্ষয় করে ফেলেছে। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল জাহ্নবীর।

উমা মাটির দিকে তাকিয়ে বসেছিল চুপ করে। ক্লান্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তাকে। ধীরে ধীরে বললে, একটা কথা বলব মা! কিছু মনে করবে না?

জিজ্ঞাসুনেত্রে জাহ্নবী তাকিয়ে থাকেন রোগজীর্ণ মেয়ের দিকে।

—তুমি তো বরাবর বলতে, আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলেই তুমি কাশী চলে যাবে। তা এখন যাও না কেন?

জাহ্নবী স্থিরদৃষ্টে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, ভারমুক্ত হতে চাস? তাড়াতে চাইছিস আমাকে?

উমা সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বলে, তাই চাইছি মা। তুমি এটা সহ্য করতে পারবে না। অনেক নিচে নেমেছি আমরা। কিন্তু নিজের মেয়েকে অপরের উপপত্নী......

উমার মুখটা চাপা দিতে হাতটা বাড়িয়েছিলেন জাহ্নবী—উমাই ভেঙে পড়ে মুখ লুকায় মায়ের বুকে। আর সংযম থাকে না জাহ্নবীরও। মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ওঠেন তিনি।

মাকে কাঁদতে কখনও দেখেনি উমা। অনেক দুঃখরাত্রি মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কেটেছে তার—ভেবেছে তার মা পাষাণে গড়া। মা কাঁদতে জানে না। চৌধুরীবাড়ির সেই বড়বউ আজ মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে এমন হুহু করে কাঁদছে, ভাবতেই অবাক হয়ে গেল উমা।

ন্যায্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কঠিন হয়েছিলেন জাহ্নবী। বাপের মৃত্যুদৃশ্য ভাল মনে নেই উমার—কিন্তু মায়ের কান্নার কথা মনে পড়ে না। কমলাপতির মর্মান্তিক মৃত্যু, শ্রীপতির মৃত্যুর দৃশ্যে জাহ্নবীকে সে দেখেছে—লক্ষ্য করেছে জনাবালি শেখের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকা পাষাণে-গড়া জাহ্নবীকে। কাঁদতে দেখেনি। আজ সেই জাহ্নবী কাঁদছেন। উমার মাথাটা বুকে চেপে ধরে জাহ্নবী বলেন, সত্যিই পারব না রে! এবার তুই আমাকে মুক্তি দে। এবার বিশ্বেশ্বরের পায়ে মাথা দেবার সময় হয়েছে আমার। কিন্তু দিবা কি সত্যিই বিয়ে করতে পারে না তোকে? আজকাল তো এমন হয়।

আহত সর্পিণীর মতো মায়ের বুক থেকে মাথা তুলে উমা বললে, পারবে সে কথা বলতে তাঁকে? লজ্জা করবে না?

জাহ্নবী অবাক হয়ে বলেন, কেন? লজ্জা করবে কেন?

—যখন সময় ছিল তখন টাকার গরমে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিলে। আজ অপরের উচ্ছিষ্ট এই যক্ষ্মা-রোগিণীকে কোন মুখে তাঁর ঘাড়ে চাপাতে চাইছ!

জাহ্নবী জবাব দিতে পারেননি মেয়ের এ উদ্ধত অভিযোগের।

অবশেষে মনস্থির করে ফেললেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই কাশী চলে গেলেন জাহ্নবী। জীবনের বাকি কটা দিন বাবা বিশ্বনাথের পায়ের তলাতেই কাটিয়ে দেবেন।

তার পরেই দিবাকর সংবাদ আনল ওদের দণ্ডকারণ্যে যাবার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পের সকলেই যাচ্ছে। উমা ক্যাম্প-ডি. পি. ছিল। পুনর্বাসন ঋণ কিছু নেয়নি। দিবাকর ক্যাম্প ডি. পি. নয়, সে পুনর্বাসন সাহায্য পেতে পারে যদি সে উমার স্বামী বলে পরিচয় দিতে পারে।

উমা বলেছিল, সেখানে গেলে কী পাব আমরা?

—নতুন করে বাঁচবার প্রতিশ্রুতি। জঙ্গল কেটে গ্রামের পত্তন হবে সেখানে। বাড়ি পাব, বিঘে-কুড়িক জমি পাব, লাঙল-গরু-বীজধান পাব।

—কিন্তু চাষের আপনি কী জানেন?

দিবাকর হেসে বলেছিল, আমি চাষার ছেলে উমা। তুমি যদি রাজি থাক তাহলে আমরা নতুন করে ঘর বাঁধতে পারি।

উমা বললে, বেশ তাই করুন। নতুন করে ভাগ্যটা পরীক্ষা করা যাক।

—কিন্তু আমাকে পুনর্বাসন তখনই দেবে, যখন আমার পরিচয় হবে তোমার স্বামী বলে। আমি ক্যাম্প ডি. পি. নই।

উমা মুখ টিপে হেসে বলে, না হয় সেই পরিচয়ই দেবেন। এ বাসায় আসার আগেই তো আপনাকে বলেছিলাম এরপর থেকে ঐ পরিচয়ই দেবেন আমার।

দিবাকর ওর শীর্ণ হাতটা তুলে নিয়ে বলেছিল, কিন্তু মিথ্যা কথা আমি বলি না উমা। নতুন ঘর যদি বাঁধি তার বনিয়াদে এ মিথ্যাকে রোপণ করতে পারব না। সত্যিই আমার ধর্মপত্নী হতে হবে তোমাকে। কেমন রাজি?

উত্তর দিতে একটু দেরি হল উমার। দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, তা হয় না মাস্টারমশাই!

—হয় না, কেন হয় না?

—আমি তাতে রাজি নই।

—রাজি নও মানে? আমার স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে তুমি রাজি আছ, অথচ আমাকে বিয়ে করতে তুমি রাজি নও?

—ঠিক তাই?

—কেন, তার কারণ?

—তার কারণ হিঁদুর মেয়ে নিকেয় বসে না। আমার স্বামী জীবিত আছেন।

দিবাকর ধমক দিয়ে বলে, ভুল ধারণা তোমার। হিন্দু মেয়ের পুনর্বিবাহের আইন হয়েছে।

—কিন্তু তার আগে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে হবে তো?

—তা তো হবেই।

—তিনি তাতে রাজি নাও হতে পারেন।

—যাতে বাধ্য হন সেই চেষ্টাই করতে হবে আমাদের। সম্ভবত দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় কন্যাপক্ষকে তোমার কথা জানানো হয়নি। সুতরাং ব্যারিস্টার-সাহেবও খুব নিশ্চিন্ত নেই। মনে হয় এ ঝামেলা থেকে মুক্তি পেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন তিনি।

—কিন্তু আমি তাতে রাজি নই মাস্টারমশাই।

উমার একগুঁয়েমিতে এবার চটে ওঠে দিবাকর, বলে, কিন্তু কেন, তা তো বলবে?

—কী লাভ?

—লাভ তোমার না থাক আমার আছে।

অদ্ভুত হেসে উমা বলেছিল, তাই বলুন। আপনিও তাহলে এই দেহটার প্রত্যাশী?

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল দিবাকর। উমা যে এতটা রূঢ় হতে পারে তা যেন আশঙ্কা করেনি। স্বপ্নেও ভাবেনি, এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে উমা। জাহ্নবী উপস্থিত থাকায় কথাটা বলতে বাধছিল এতদিন। আজ সাহস করে বলেছে কথাটা। অথচ রূঢ় ভাষায় উমা প্রস্তাবটাকে কদর্য করে তুলছে। এ মেয়েটাকে সত্যিই কোনদিন বুঝতে পারেনি দিবাকর, আজও বুঝতে পারে না। তবু দাঁতে দাঁত চেপে বলে, শুধু দেহটা কেন উমা, আমি তো তোমার সব ভার নিতে চাইছি। বিয়ে করতে চাইছি তোমাকে।

ঠোঁট বেঁকিয়ে উমা বললে, সব ভারই তো আপনার উপর একদিন দিতে চেয়েছিলাম মাস্টারমশাই—সেদিন তো আপনি সে ভার নিতে চাননি। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে!

—সেদিন আর এ দিনে যে আকাশ-পাতাল তফাত উমা।

—আমিও তো তাই বলছি, সেদিন আর এ দিনে অনেক তফাত। সেদিন আপনাকে অনায়াসে যা দিতে পারতাম আজ তা আমার অদেয়।

রোগপাণ্ডুর উমাকে বুকে টেনে নিয়ে দিবাকর বলে, না, অদেয় কিছুই নয়। আজ আমাকে অমৃতের স্বাদ দিতে না পারলে তোমার সে কার্পণ্য তোমাকেই চিরকাল বঞ্চনা করবে! তা হতে দেব না আমি!

দিবাকর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে চায় উমাকে। নত হয়ে আসে তার তৃষ্ণাতুর অধরোষ্ঠ। ছিটকে বেরিয়ে যায় উমা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে তার। অদ্ভুত ভাবে হেসে ওঠে উমা। যেন পাগলের হাসি—চোখে চিকচিক করে জল! কর্কশকণ্ঠে বলে ওঠে, আপনারও তাহলে মতি মিস্ত্রির যুক্তি?

—মতি মিস্ত্রির যুক্তি?

—বিনা কড়িতে তো তেল কিনতে আসিনি! মেয়েটাকে যদি খেতে দিই পরতে দিই তবে তার দেহটার উপর অধিকার বর্তাবে না কেন? এই তো?

ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল দিবাকর। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘুরে বলেছিল, ছি ছি ছি, উমা। তোমাকে ছি! কত নিচে নেমে গেছ তুমি তাও কি বুঝতে পার না! ছিঃ!

দিবাকর বেরিয়ে যেতেই উমা উবুড় হয়ে পড়ে বিছানায়। কান্নার জোয়ার বাঁধ ভেঙে নামে এতক্ষণে!

★ ★ ★

যেন মেলা বসেছে পদ্মদিঘির পাড়ে। লক্ষ্মীপুরের গাঁয়ের মেয়েরাও এসেছে আবার ক্যাম্পের উদ্‌বাস্তু মেয়েরোও এসেছে! আগেকার দিনে গাঁয়ের মেয়েরা যেত দামোদরে। কলমুখরিত হয়ে উঠত জলপিপির পদচিহ্নলাঞ্ছিত দামোদরের ঘাট। এখন আর কেউ নদীতে যায় না। দামোদরের বড় খাদ এখন ও পাড় ঘেঁসে চলেছে। এ পাড় ঘেঁসেও আছে একটা মরাস্রোত। তাতে ঘটি ডোবে না চৈত্রমাসে। বৎসরান্তের এই পড়ন্ত বেলায় এক ক্রোশ বালি ভেঙে কে যাবে নদীতে স্নান করতে। তার চেয়ে পদ্মদিঘিই ভাল। পদ্মদিঘির ধারে আছে ধর্মরাজের মন্দির।

চৈত্র সংক্রান্তি। গ্রাম নেই—নাই থাকল। কোলের ছানাপোনা তো আছে। উদ্‌বাস্তু শিবিরের মেয়েরাও তাই আসছে সন্ধ্যাবেলায় স্নান করতে—'নীলের কোলে' বাতি দিয়ে ঘরে গিয়ে জল খাবে।

এ জেলায় গাজন উৎসবটা বেশ জাঁকিয়ে হয় দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য, এ গাঁয়েও আছে বুড়োরাজার মন্দির। ধর্মরাজেরই আর এক নাম বুড়োরাজা। মেলা বসছে মন্দির ঘিরে। কলকোলাহল ভেসে আসছে এতদূরেও। বৈশাখী শুক্লা অষ্টমীতে 'মচ্ছোব'। পাঁচগাঁয়ের মানুষ এসে জমায়েত হবে। উৎসব সুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তি থেকেই।

গাজনের ভক্তরা তো আছেই, তাছাড়া আছে যাত্রীর ভিড়। মেলা অবশ্য এখনও বসেনি। তোড়জোড় শুরু হয়েছে মাত্র।

পদ্মদিঘির ঘাটটা মেলা-তলা থেকে দেখা যায় না। ভাঙা পাষাণ রাণার খাড়া সিঁড়ি। তারপর দিঘির উঁচু পাউড়ি। ফলে গায়ের কাপড় খুলে স্নান করতে কোন বাধা নেই। দলে দলে আসছে মেয়েরা। স্নান সেরে চলে যাচ্ছে এক একে। ঘর-কন্নার গল্প চলেছে ওরই ফাঁকে ফাঁকে। যগন্দর বউ এসেছে—গুলাবও এসেছে মনুয়ার হাত ধরে। গুলাবের স্নান আর শেষই হয় না; তার পাশ দিয়ে কত মেয়ে নামল, জল ছিটাল, স্নান সারল আবার ভিজে-আঁচল নিংড়াতে নিংড়াতে চলেও গেল। মনুয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে—তার আর ভাল লাগছিল না। দু-একবার তাগাদাও দিয়েছে—কিন্তু ঠাকুরমায়ের যেন কোন হুঁশই নেই। মনুয়া আবার উঠে পড়ে—শেয়াকুলের জঙ্গলে একটা বড় রকমের গঙ্গাফড়িঙের দিকে দৃষ্টি পড়ে তার।

নবাপালের বউ স্নান সেরে উঠে যাওয়ার সময় গুলাবের দিকে ফিরে বলে—দিদির এখনও হলনি?

—না হলনি! বছরের মধ্যে একটা দিন তো ছান করতি আসি। আমার তাড়া কিসের লা? আমার তো ঘরে ঘর-জামাই বসি নাই?

পালবউ রাগ করে না, হেসে বলে, তা যা বলিছ দিদি। আমারে আবার সকাল সকাল ফিরিতি হবে। রসময়ের এক জ্ঞাতভাইও এয়েছে পিয়ারডোবা থিকে গাজন দেখতি।

ছিনিবাসের সৎমা সর্বাণীও ছিল ঘাটে; বলে, বেশ ছেলেটি, দেখছি আমি। কাল দেখি ডাঁইড়ে আছে ডোল-অফিসে। আমি রাধারে বলি—কে রে ছেলেটি, ভিন গাঁয়ের ছেলে মনে লাগে। তা রাধাই বললে—উ রসময়ের ভাই।

গুলাব বউ সঙ্গে সঙ্গে বলে, তা তোমার রাধারানী বুঝি ভিন গাঁয়ের সব ছেলেরেই চিনে?

সর্বাণী একটু থতমত খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বলে, না, তা নয়—মানে মতি তো আবার রাধার সই হয়। তাই শুনিছে মতির কাছে।

গুলাব গায়ে মাটি ঘষতে ঘষতে বলে, তা ভাল। তবে বলছিলাম কি তাঁতিবউ, মেয়েরে একটু সামলি রেখো। সইয়ের সঙ্গে দহরম মহরম ভালো—সয়ার সঙ্গেও না হয় ফষ্টিনষ্টি চলতি পারে—তাই বলে সয়ার স্যাঙাতের সঙ্গেও—

কথাটা শেষ করে না গুলাব। অবশ্য তাতে বক্তব্য কিছু বাকি থাকে না। সর্বাণীর যেন কান্না পায়। তার দুর্বলতম স্থানে আঘাত করেছে গুলাব বউ একঘাট মেয়ের সামনে। মেয়েকে নিয়ে হয়েছে তার জ্বালা। অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে—একটু যদি হুঁশ থাকে। সারাদিন আগলে বেড়াতে হয় তাকে, লুকিয়ে রাখতে হয় তার চপলতা—তার উপর এরা যদি আবার মিথ্যা অপবাদ চাপাতে থাক রাধার ঘাড়ে তখন বেচারি আর কী করে?

ঘাটের কাছেই মতি, শেফা আর রাধা বসেছিল জলে পা ডুবিয়ে। বুকের উপর ভিজে শাড়ির আঁচল ফেলে সাবান মাখছিল দলবেঁধে। সাবানের মালিক মতিসুন্দরী,—

তবে সন্তুদের সাবানটা ব্যবহার করতে দিতে সে কার্পণ্য করেনি। মতি রাধার গা টিপে ফিসফিসিয়ে বলে বুড়ির কথা শুনলি গা জ্বালা করে। সব তাতেই মুড়লি।

রাধা জবাব দেয় না। কোন কথাই আজ আর তার কানে যাচ্ছে না। সে যেন আপনাতেই আপনি তন্ময় হয়ে আছে আজ। মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে—অদ্ভুত একটা অনুভূতি। ইচ্ছে হচ্ছে বাড়ি গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে খুব খানিকটা কাঁদে। আজকের এই চৈত্র সংক্রান্তি তার জীবনে একটা বিশেষ দিন—তার পনের বছরের জীবনে একটি বিশেষ চিহ্নিত খণ্ডকাল!

শেফা বলে ওঠে গুলাব বউকেই উদ্দেশ্য করে, ও ঠাক্‌মা—তুমি ইবার একটু তোমার নাতির দিকে লজর দাও—ঐ দ্যাখ শেয়াকুলের জঙ্গল ভাঙে কুথায় ছুটতিছে মনুয়া!

গুলাবকে এবার বাধ্য হয়েই উঠে পড়তে হয়। সত্যিই গঙ্গাফড়িঙের পিছনে পাগলের মতো ছুটেছে ছেলেটা, আরে ও পাগল ছেলে! শোন, শোন—

মতি বলে, বেশ হইছে! পড়ে বুড়ি মুখ থুবড়ি ঐ শ্যাকুলের জঙ্গলে। তো হরির লুট দিই।

যগন্দর বউ ধমক দেয়, মর মুখপুড়ি! ঘোষদিদি তোর গুরুজন লয়?

—গুরুজন না হাতি!—ঠোঁট উলটায় মতি!

যগন্দর বউ আপন মনেই বলে, এ কালের মেয়েগুলান কেমন যেন্! কই আমাদের আমলে তো এমন ছিলনি। আমরা গুরুজনের মান রেখে চলতি জানতাম!

এমনিই হয়। তোমার আচরণ দেখে আমি বিস্মিত হই—তোমাকে দোষারোপ করি। একবারও তলিয়ে দেখতে চাই না—কেন তোমার আচরণটা আজ এমন হল। যগন্দর বউ তলিয়ে দেখল না হঠাৎ কেন গুলাব বউয়ের উপর চটে গেল মতি। বুঝল না গুলাববউ বেকার উদ্‌বাস্তু রসময়কে ঘরজামাই বলেছে বলেই মেজাজ খারাপ হয়েছে মতির। আবার তেমনি মতিও তলিয়ে বুঝতে চাইল না গুলাব বউয়ের মেজাজই বা কেন হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠেছে। সারাদিন উপবাস করে ঐ যে বুড়ি সন্তানের মঙ্গল কামনায় স্নান করে নীলের পুজো দিতে এসেছে—কোথায় সেই সন্তান? নীলাম্বর? গুলাব বউয়ের মেজাজ রুক্ষ থাকাটাই বা অস্বাভাবিক কিসের?

ঘাটে এসে নামছে স্নানার্থিনীরা। গাঁয়ের মেয়েরা আর ক্যাম্পের মেয়েরা। সর্বাণীর স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। উঠবে উঠবে মনে করছে এমন সময় দেখে কামার বউ মঙ্গলা আসছে ঘাটে। সর্বাণী বলে, এতক্ষণে সময় হল দিদির?

—আর বলনি ভাই। হাড় মাস ভাজা ভাজা হয়ি গেল ছেলেটার জ্বালায়। কাল রাতে বুধিটা ঘরে আয়েনি। বুড়ো মানুষটা সারারাত ঘর-বার করিছে। ভোর রেতের বেলা সৎশেকে বললাম—গরুটা সারারাত ফিরলনি, তোর বাপের চোখে ঘুম নেই, আর তুই নিশ্চিন্তি মোষের পারা ঘুমাইছস। যা উঠে—একটু দ্যাখ আগ বাড়ায়ে। তো বললে পেত্যয় যাবেনি ভাই, সেই যে ঘুম-চোখ রগড়ি ভোর রেতে গরু খুঁজতি বেরুল আর সারাদিন তার পাত্তা নাই। না ছান, না খাওয়া।

—তারপর? ফিরিছে তো?—সর্বাণী প্রশ্ন করে।

—এই মাত্তর! বচ্ছরকার দিন, আমার তো নীলের উপস ছিলই—বাড়িসুদ্ধ কেউ কুটোটি কাটেনি দাঁতে!

জয়হরির বউ একখণ্ড ঝামা দিয়ে পা ঘষছিল পাষাণ-রাণার উপর বসে। বলে, তাই কি পারে নাকি কেউ। পাঁচটা না সাতটা না, একটি মাত্তর বংশধর! সেই কাকডাকা ভোরে বাসিমুখে বাড়ি থিকে বেইরে গেল আর ফিরলনি—অন্ন রোচে কারও মুখে?

—আর গরুর কী হল—শেফা জিজ্ঞাসা করে।

—সে তো সেই সক্কালেই ফিরে এসেছে।

—কোথায় ছিল পড়ি সারারাত?

—সিংহিদের বাগানে ঢুকিছেল বলে ওরা ধরে খোঁয়াড়ে দিইছিল।

মতি অবাক হবার অভিনয় করে বলে, ওমা কারে? সৎশেকে খোঁয়াড়ে আটকি রাখিছিল সারারাত? তা ফুলবাগানে ফুলের লোভে যাওয়া কেন্ বাপু?

—মর ছুঁড়ি!—ধমক দেয় সর্বাণী, সতীশ কেন ফুলবাগানে ঢুকবে? ঢুকছিল বুধি। কথাও বুঝিস না।

মতি অপ্রস্তুত হবার ভঙ্গি করে। আড়চোখে তাকায় রাধার দিকে। চোখে চোখে কী যেন কথা হয়। রাধা তাড়াতাড়ি মুখে সাবান দিয়ে চোখ বন্ধ করে। সাবানের ফেনার আড়ালে আত্মগোপন করতে চায়। কথাটার গূঢ় ইঙ্গিত সে ঠিকই বুঝেছে। না বোঝার কারণ নেই—মতি যে জানে কোন ফুলের সন্ধানে বেরিয়ে আটক পড়েছিল সতীশ।

সর্বাণী বলে, তা সৎশেটা সারাদিন ছিল কুথায়? জানে তো আজ নীলপুজোর দিন, ঘরে পাঁচটা কাজ আছে?

—তা কেমন করি বলব বল ভাই। জিজ্ঞাসা করলি জবাব দেয় না। আজকাল ঐ এক ঢং হয়েছে—সাত চড়ে রা নেই।

সর্বাণীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। স্বরটা নিচু করে মঙ্গলাকে বলে, তবু তো দিদি এ তোমার ছেলে—বদনামের ভয় নাই! আর আমার এই বিদ্যেধরীটিই কি কম? ইনিও সেই সাতসকালে বাড়ি থিকে বেইরে এই ভর-সন্ধ্যোবেলা ফিরে এয়েছেন!

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মঙ্গলা। সর্বাণী হেসে বলে, না দিদি, তুমি যা ভাবতিছ তা নয়।

মঙ্গলা বলে, আমি আবার কি ভাবতি গেলাম?

—দুই আর দুইয়ে চার লয়! হেসে বলে সর্বাণী—রাধা গেইছিল পালবাড়ি, মতি ওকে আটকে রেখিছিল। সিখানেই ছান-খাওয়া সারিছে। তারপর গল্প করতি করতি ঘুমিয়ে পড়িছিল। আচ্ছা বলদিনি দিদি—এ কী কাণ্ড! তোদের বয়সে যে আমরা ছেলের মা হইচি। একবার ভাবেও তো মানুষে যে বাড়ির লোক কী ভাবতিছে। উনি বাড়ি নাই—বদ্দমান গেইছেন লোন অফিসে দরবার করতি—আমি সারাদিন শুধু ঘর বার কচ্ছি। এই সনঝে বেলা মতি ওরে পৌঁছে দে গেল। বলে মাসিমা, রাধুরে বকবেন না—ও আসতি চেইছিল, আমিই জোর করি ধরি রাখিছিলাম। মা আজ মাছ-পাথুরি করিছে—তাই দুটি খাইয়ে দিইচি আমাদের ঘরেই। রাধুর কোন দোষ নাই; মারতি

হয়—এই ন্যান, পিঠ পাতি দিইচি! আচ্ছা বলতো দিদি—এসব কী কথা! পালবাড়িতে সোমত্ত ঘর-জামাই রইচে—তার বন্ধু না ভাই কে যান এইচে—ওই তো দেড়খানি মাত্তর ঘর—তুই কোন আক্কেলে ভর দিন ও বাড়ি কাট্যে এলি? ঘরে একটা খবর দেওয়ার কথাও মনে পড়লনি।

মঙ্গলা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ে।

পালবউয়ের স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। মতির জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। ঘাটের রাণার উপর থেকে তাগাদা দেয়, ও মতি, হল তোর? নে মা নক্ষ্মীটি, একটু হাত চালায়ে সারি নে।

মতি গুলাব বউয়ের কণ্ঠস্বর নকল করে বলে, বছরের মধ্যে তো একটি দিন ছান করতি আসি—অত তাড়া কিসের? আমার ঘরে তো আর জামাই বসি নাই।

মতি পাল-বউয়ের বড় আদরের মেয়ে। বস্তুত সে জন্যে রসময়কেও আটকে রেখেছে নবাপাল। কিন্তু তাই বলে মায়ের সঙ্গে এমন রসিকতা করে নাকি? কালে কালে কতই দেখব—ভাবে যগন্দর বউ, আমার টেঁপী কিন্তু অমন ছেলনি। রগড় সেও করত, তবে গুরুজনের মান রাখতি জানত। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে যগন্দর বউয়ের, আজ নীল পুজোর দিন নাতনির কথা মনে পড়ায়, মুখে মতিকে বলে—

—টুক্ সরি ছান কর তোরা—ছিটে লাগতিছে।

পালবউ মঙ্গলাকে সালিশ মানে, দেখলে দিদি! কথা বলার ছিরিটা দেখলে? তারপর মতির দিকে ফিরে কপট মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, ওলো, আমার জামাই কি তোর শত্তুর? কুটুমবাড়ি গিয়ে যখন তোর দ্যাওর পাঁচকাহন করি লাগাবি তখন কাঁন্দে ভাসাবি কে? আমি না তুই?

কুটুমবাড়ি অর্থে পিয়ারডাবা ক্যাম্প। রসময়ের বাপও উদ্‌বাস্তু—সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন সরকারী উদ্‌বাস্তু ক্যাম্পে। রসময় শুধু এদের সঙ্গে আছে আজ কয় বছর। সর্বাণী মতিকেই বলে নে মা, উঠ এবার তোরা—আর রাগাস্ নে তোর মায়েরে—শ্যাষে বচ্ছরকার দিনে ভর সনঝেবেলা কী বলতি কী বলে বসবিনে।

—এই যে হয়ি গিছে মাসিমা। টুপ টুপ করে আরও দুটো ডুব দিয়ে মতি উঠে পড়ে। রাধার দিকে ফিরে বলে, সাবানটা রইল, নে আসিস।

জল থেকে উঠে মতি ভিজা শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নেয়। তার উপর জড়ায় গামছাখানা। শ্যাওলা-ধরা পিচ্ছিল পাষাণ-রাণার উপর পা টিপে টিপে উঠে আসে। কামার বউ একটা হাত বাড়িয়ে ধরে মতিকে। হঠাৎ মঙ্গলা পালবউকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ দিদি, মতির কি—?

চোখ টিপে থামিয়ে দেয় তাকে নবাপালের বউ। একঘাট লোকের সামনে কথাটা সে প্রকাশ করতে চায় না। এই জন্যে মতিকে ঘাটে আনতেই চায়নি সে। কত লোকের চোখে কুদৃষ্টি আছে। ভর সন্ধ্যাবেলা এ অবস্থায় কেউ পথে বের হয় নাকি? কিন্তু আদরের মেয়ের আবদার শুনতে হয়েছে তাকে। ঘাটের উপর থেকে পালবউ সর্বাণীকে সম্বোধন করে বলে, রাধা আজ রেতে আমার ঘরে দুটো মাছ-ভাত খাবে যুগীবউ। ওরে পাঠায়ে দিও। মাছ-পাতুরি করছি আজ।

সর্বাণী অবাক হয়ে বলে, মানে?

—না, মানে মতি রোজই বলে সইরে একদিন খাতি বলব—তা আর হয়ে ওঠে না।

সর্বাণী আবার বলে, সে কী! তা আজ দিনের বেলা—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পালবউ বলে, হ্যাঁ, দিনের বেলা বললিই ভাল হত। তা আমি ভাবলাম আজ নীলষষ্ঠীর দিন—দিনের বেলা মায়ের হাতেই খাক কেনে। রাত্ পাঠায়ে দিও কিন্তুক। আসিস রাধু—

মেয়ে নিয়ে মতির মা রওনা দেয়।

সর্বাণী চোখ বড় বড় করে ভারী গলায় ডাকে, রাধা!

রাধার মুখে সাবান মাখা শেষ হয়েছিল। ডাকটা তার কানে গেল কি গেল না—ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে। এক ডুবে অনেকটা গিয়ে ভেসে ওঠে আবার। ভেসে উঠবার আগেই মঙ্গলা রাধার মায়ের হাতে একটা চিমটা কাটে, কানে কানে বলে পাগল হলি নাকি? একঘাট লোকের সামনে—?

সর্বাণী সম্বিত ফিরে পায়।

* * *

নীলের পুজো দিয়ে সর্বাণী আর মঙ্গলা ক্যাম্পে ফিরে আসছিল। সন্ধ্যা নেমে আসছে পদ্মদিঘির ওড়কলমি, বন ধোঁধল, আর কচু-ঝোপের কোনায় কোনায়। ধর্মরাজের মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির শঙ্খঘন্টা ধ্বনি থেমে গেল। মেলাতলায় কয়েকটা জোরালো পেট্রম্যাক্স জ্বলছে। পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ছে পথের উপর। জোনাকির চুম্‌কি-বসানো তরল অন্ধকারের জমিতে রূপালী-আলোর পাড়। একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে কোথা থেকে। আমের মুকুলের নাকি? দিঘি থেকে একটা পায়ে চলা জল-ছোপ-ছোপ সরু পথ চলে গেছে গাঁয়ের দিকে। বাঁশঝাড়ের কাছে পুবমুখো পথটা গেছে ক্যাম্পে—আউলিয়া মাঠ বরাবর। হলদে রঙের শুক্‌নো বাঁশপাতায় ছেয়ে গেছে বনপথটা। পাতা-ঝরার দিন যে। পদ্মদিঘি এখন নির্জন। অতল কালো জল থমকে আছে এই মাত্র উঠে যাওয়া কয়েকটি গ্রাম্যবধূর কলকূজনের স্মৃতি নিয়ে। রাধা, শেফা, যগন্দর বউ, গুলাব সবাই চলে গেছে অনেকক্ষণ। সর্বাণী ইচ্ছে করেই একটু দেরি করেছে মন্দিরে। মঙ্গলা সঙ্গেই আছে। কয়েকটা কথা সে বলে নিতে চায় বনপথের নির্জনতায়। প্রসঙ্গটা আলোচনা করার গরজ মঙ্গলারও বড় কম নয়। তাই সর্বাণী যখন বিনা ভূমিকায় বললে, আর তো বাড়তি দেওয়া উচিত হবেনি দিদি,—তখন বুঝতে মঙ্গলার কোন অসুবিধা হল না কিসের কথা হচ্ছে। বললে, আমি ভাবছি মতি কেন তাইলে তোমারে কতকগুলো মিছে কথা বলি গেল।

—ওরা সব এক দলের। সব কটা সমান, কেউ কম নয়। আমরাও তো একদিন ঐ বয়স পার হয়ে এইচি, কিন্তু এতটা বুকের পাটা ছেলনি আমাদের। আজ মেয়েরই একদিন কি আমারই একদিন! বচ্ছরকার দিন বলি রিয়াৎ করবনি! তুমিও শাসন করি দিও সৎশরে।

মঙ্গলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে! সর্বাণীর হাতখানা ধরে বলে, শুধু সাবধান করি দিলেই কি কিছু লাভ হবি ভাই? মনে নেই নিতাই বোরেগীর কথা?

সর্বাণী জবাব দিতে পারেনি।

সর্বাণী নবীন যুগীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ভরা যৌবনে যখন সে যুগীর ঘর করতে এল তখনই নবীন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পা বাড়িয়েছে। শক্তি তখনও ছিল দেহে—কিন্তু একটি উদ্ভিন্ন-যৌবনা নববধূকে আনন্দ দেওয়ার মতো আয়োজন ছিল না তার পরিণত মনের কোনায়। আগের পক্ষের সন্তান ছিনিবাস সর্বাণীর প্রায় সমসবয়সী। সর্বানীর বাপের অবস্থা ভালই ছিল—কিন্তু ওদের জাতে সুপাত্র নাকি দুর্লভ। অনেক টাকা কন্যাপণ দিয়ে সর্বাণীর বিয়ে দিয়েছিল তার বাপ। সে বিয়ে নাকি সুখের হয়নি। আজ এ কথা অবশ্য সবাই ভুলে গেছে—এমনকি উত্তীর্ণযৌবনা সর্বাণীর নিজেরও মনে নেই। তবু এ কথা সত্য যে, সেদিন সদ্যবিবাহিতা নববধূর মন ভরাতে পারেনি নবীন যুগী। তারপর একদিন যখন ওর বাপের বাড়ির দেশের সেই সুকান্ত সুকণ্ঠ তরুণ বৈরাগীটি একতারা বাজাতে বাজাতে এসে হাজির হল কমলপুরে—তখন সর্বাণীর কেমন যেন সব ভুল হয়ে গেল। প্রথম দিনেই ভিক্ষা দিতে গিয়ে কেঁপে গিয়েছিল ওর হাত। বৈরাগী ওর বাপের বাড়ির দেশ থেকে পথ ভুলেই আসেনি—এসেছিল পথ ভুলাতে। রক্তের মধ্যে বাঁধন-ছেঁড়ার একটা আকুল উন্মাদনা জেগেছিল সর্বানীর। কী জ্বালাময়, কী মধুর, কী অদ্ভুত সেই দিনগুলি! সারাদিন একটা চোখ পড়ে থাকত বাইরে, পথের দিকে। মনে মনে সারাদিন বলত—আজ যেন সে না আসে ঠাকুর, আমি আর পারছি না। আবার যদি সত্যই কোনদিন না আসত বৈরাগী ভিক্ষা নিতে ও পাগলের মতো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেত। যেভাবে চলছিল ঘটনার স্রোত তাতে একদিন অনিবার্য আকর্ষণে নবীনের বন্ধন ছিন্ন করে নিশ্চিত বেরিয়ে পড়ত সর্বাণী—পথে পথে মাধুকরী করে ফিরতে হত হয়তো সারাজীবন। কিন্তু সে দুর্ঘটনা—হ্যাঁ দুর্ঘটনা বইকি—বাঙলা বিভাগের চেয়েও সর্বাণীর জীবনে সেটা বড় দুর্ঘটনা হতে পারত, আর সে দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে পেরেছিল এই মঙ্গলার জন্যই। এক অসতর্ক মুহূর্তে বৈরাগীর কণ্ঠলগ্না সর্বাণীকে দেখে ফেলেছিল মঙ্গলা—বড় তাঁতঘরটার পিছনে ছাতিমতলায়। নিতাই বৈরাগী সেই যে দেশ ছেড়েছে আর কমলপুর গ্রামের ত্রিসীমানায় তাকে কেউ ভিক্ষা করতে দেখেনি। আশ্চর্য, এত বড় মুখরোচক ঘটনাটা মঙ্গলা ঘুণাক্ষরেও কখনও বলেনি কাউকে—বোধকরি দ্বিজপদকেও নয়। সর্বাণী এজন্য কৃতজ্ঞ মঙ্গলার কাছে।

আজ সর্বাণী ত্রিশের কোঠায় পা দিতে চলেছে। অনেকগুলি সন্তান হয়েছে তার ইতিমধ্যে। সংসারের রথচক্রে সে জড়িয়ে গেছে ওতপ্রোত-ভাবে। নিতাই বৈরাগীর গৌরতনু, আর তার ঘরভাঙার সুরেলা কণ্ঠের গান আজ ওর কাছে ছায়ার চেয়েও ছায়া। র‍্যাডক্লিফ সাহেব ওর ঘর-সংসার ভিটে-মাটি সব কেড়ে নিয়েছে, তবু একেবারে রিক্ত হয়ে যায়নি সর্বাণী। নিতাই বৈরাগী একেবারে নিঃস্ব করে কেড়ে নেবার উপক্রম করেছিল। তাই হঠাৎ মঙ্গলার কথায় ভুলে যাওয়া-দিনের ইঙ্গিত পেয়ে লজ্জা পায় সর্বাণী। সেটা মঙ্গলাও অনুভব করে, তাই জোনাকি-জ্বলা স্বচ্ছ অন্ধকারে সর্বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—লজ্জা পেলি নাকি? এই বুড়ো বয়সে? দূর!

সর্বাণী সামলে নেয়; বলে, তোমার কাছে আর কী লুকাব দিদি? সেদিন তুমি বাধা না দিলি কুথায় ভাসি যাতাম হয়তো!

নিজের কথায় নিজেই শিউরে ওঠে সর্বাণী। যে ভয়াবহ অবস্থা আজ থেকে দশ-পনের বছর আগে তার হতে পারত কিন্তু হয়নি, তার কল্পনাতেই যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। মঙ্গলা বলে—সে আর এ?

—নয় কেনে?

—তোর যে তখন বে হয়ে গেইছিল হতভাগী। তুই তখন একটা ধুমসো মাগী যে!

—কিন্তু রাধাই বা কোন কচি খুকি? তোমার কাছে বল্‌তি আর কি বাধা আছে—এই আষাঢ়ে যে পনেরয় পা দিবে। এত বড় ধাড়ি মেয়ে, কী বলে তুই সারাটা দিন একটা সোমত্ত ছেলের সঙ্গে কুথা কুথা কাট্যে এলি? ভয় ডর নেই! কতদূর কী করে ওরা তাই বা কে দেখতি গেছে। যদি ভালমন্দ কিছু হয়ি পড়ে? ছিছিছি। তাছাড়া বদনাম রটতি কতক্ষণ!

মঙ্গলা ধমক দিয়ে ওঠে, কী সব অলুক্ষুণে কথা বকি চলিছ ভর সন্‌ঝেবেলায়, বচ্ছরকার দিনে। তারপর [illegible] সর্বাণীর ভিজা মাথাটা কাছে টেনে এনে কানে কানে বলে, আর যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়িই পড়ে তখন লোক জানাজানির আগে আমারে বল—আমি তো আর আমার বংশধরকে [illegible]লতি পারব নি!

মঙ্গলা পছন্দ করে রাধাকে। সতীশের স্ত্রী হিসাবে তাকে ঘরে আনতে সে গররাজি নয়। শুধু তাই নয়—সে এও জানে যে সর্বাণীও স্নেহ করে সতীশকে। এ নিয়ে হাসিঠাট্টা আগেও হয়েছে। দুজনেই মনের কথা জানত। জাতের বাধা না থাকলে অথবা পার্টিশানের ডামাডোলে দুপক্ষই ডোলজীবী হয়ে না পড়লে প্রস্তাবটা হয়তো যে কোন পক্ষ থেকে উঠত—আর অপরপক্ষ থেকে সাগ্রহে গৃহীত হত। একথা জানে বলেই মঙ্গলা কথাটা বলেছে। কিন্তু কিসে যে কি হল, সর্বাণী ফোঁস করে বলে বলল, তার মানে তুমি তোমার ছেলেরে শাসন করবেনি! আশকারা দিবে?

মঙ্গলা স্পষ্টই আহত হয়, বলে, আশকারা দিবার কথা তো হতিছে না।

—হতিছে বই কি, দিদি—তোমার আশকারাতেই তো সৎশের এতটা সাহস—

বাধা দিয়ে মঙ্গলা বলে, এক হাতে তালি বাজে না তাঁতিবউ,—একটু ঝাঁজ মিশিয়ে যোগ দেয়—মনে করি দেখ, নিতাই বোরেগীও এক হাতে খঞ্জনী বাজাতনি! শাসন করতি চাও, কর না—কে বাধা দিচ্ছে। আমি শুধু বলছিলাম তেমন তেমন কিছু হলি পরে তোমার মেয়েকে গলায় দড়ি দিতি হবেনি। মায়ের মতো মেয়ের কথাও আমি চেপে যাবনে—ঘরে তুলি নেব তারে!

বারে বারে ঐ নিতাই বৈরাগীর কথা উঠে পড়ায় সর্বাণীও মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। বলে, তাহলি আর ওরে আস্ত রাখবেনি ওর বাপ! আঁশ বটিতে ফেল্যা জ্যান্ত কুটবে! জাতের বড়াইটুকু ষোলা আনা আছে বুড়োর, বলে আমরা হলাম দ্বিজ, আমাদের পৈতে আছে, আর—

রাগের মাথাতেও কথাটা শেষ করতে পারেনি সর্বাণী। মঙ্গলাই পাদপূরণ করে—

জানি। ওঁর নামটা উচ্চারণ করি বলে পায়ের সঙ্গে মাথার বে হয়? কেমন? কথাটা আমারও কানে গেইছে। তা ইবার যদি তাঁতিবুড়ো তোমারে ও কথা বলে তবে তারে বোল—কর্মকার জাত-হিসাবে হা-ঘরে বৈরিগী-বোষ্টমের চেয়ে অনেক ভাল।

সর্বাণী ভয়ে-ভাবনায় হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে যায়। শুধু মেয়ের নয়, মায়ের কলঙ্কের কথাও জানা আছে ঐ মঙ্গলার। তার হাত দুটি চেপে ধরে বলে, আমারে একথা কেন দিদি। আমি তো এ কথা বলিনি।

মঙ্গলার কিন্তু ভাল লাগে না এসব ঢঙ। বলে, যাক, চল, রাত হয়ি গেল।

চৈতালী ঘূর্ণি উঠেছে একটা। ধুলোর ঝাপটা ঝড় এল বুঝি। বোলে-ভরা আমগাছটার মগডালে বসে এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে একটা পাগলা কোকিল।

* * *

আহারাদির পর মতি নির্জনে টেনে নিয়ে গেল রাধাকে। দেড়খানি মাত্র তো ঘর। একটা শোবার ঘর, একটা মাত্র রান্নাঘর। ঐ একটি ঘরেই শুতে হয় সবাইকে। নবাপাল, জয়া, রসময়, মতি আরও ছোট ছোট ভাই বোন। রসময়ের ভাই এসেছে তার উপর, সে অবশ্য বাইরের বারান্দায় শোয়। নির্জনতা এখানে কোথায়? মতি ওর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসাল উঠানের ও প্রান্তে। গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে, এখন বল সারাটাদিন তোরা কুথায় কাটালি—কুথায় দেখা পেলি সৎশের!

রাধা মুখ লুকিয়ে বলে, ধূর!

—ধূর কী রে? আমি তো সব কথাই বলেছি তোরে।

—সে আর এ?

সত্য কথা। মতি অবশ্য তার দাম্পত্য-জীবনের প্রথম কয়েকরাত্রির গোপন ইতিহাস শুনিয়েছে। অকপটে প্রায় সব কথাই বলেছে বলে রাধার বিশ্বাস। নেহাত যদি কিছু গোপন করে থাকে তবে তা এমন কিছু যা মুখে বলা যায় না। অবশ্য এজন্যে রীতিমতো পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল তাকে। সেটাও গোপন কথা—তবু তা হল বিবাহিত দুটি নরনারীর কথা। সেটা তবু বলা যায়। কিন্তু এখানে যা ঘটেছে সেকথা কী করে বলবে রাধা?

মতি অভিমান করে বলে, বেশ দেখলাম! তোর জন্যে একগঙ্গা মিছে কথা বলি এলাম মাসিমারে। তখন তুই কথা দিইছিলি না? বলেছিলি না, যে সব কথা বলবি আমারে?

রাধা ইতস্তত করে। কিছুটা অবশ্য বলতেই হবে মতিকে। সমস্তটা দুপুর সাতরাজ্য বেরিয়ে এসে বিকালে যখন পদ্মদিঘির ধারে গো-গাড়ি থেকে নেমেছিল তখন রাধার সাহস হয়নি সোজা বাড়ি যেতে। মতির শরণ নিয়েছিল বাধ্য হয়ে! উপায় ছিল না। স্নান নেই, খাওয়া নেই, সারাদিনের এ অনুপস্থিতির, এ অভিসারের একটা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ত দিতে না পারলে সর্বাণী তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলত। কিন্তু আজকের দিনের গোটা ইতিহাস কি মতিকেই বলা যায়?

আজকের অভিজ্ঞতাটা বড় অদ্ভুত। ভালোয়-মন্দে কেমনভাবে কেটে গেল সারাটা

দিন। স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ি যেদিন প্রথম দল মেলে তাকায় সূর্যের দিকে—যেদিন তার যৌবরাজ্যে প্রথম অভিষেক—সেদিন তার জীবন সার্থক হবার সূচনা দেখে; কিন্তু যে চারাগাছ ফুল ফোটবার আগেই ঝলসে গেছে আগুনে—সে সূর্যের দিকে দল মেলে তাকাতে ভয় পায়। বোঝে না, সূর্যের আলোতেই তার জীবনীশক্তি—উত্তাপকে সে ভয় পায়, আলোকে সে এড়িয়ে চলে।

সকালবেলায় দুটি পান্তাভাত খেয়ে রাধা বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। পথে দেখা হয়ে গেল সতীশের সঙ্গে। সে চলেছিল নিরুদ্দিষ্ট বুধির সন্ধানে। 'জরু, গরু, ধান'—প্রবচনটা জানা ছিল না রাধার, তবু এ বিপদে সতীশকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে হয়েছিল কিশোরী মেয়েটির। বেশিদূর যেতে হয়নি। পায়ে পায়ে ওরা চলে আসে গ্রামপ্রান্তে—সেখানেই দেখতে পেল দামোদরের বাঁধের ওপর দিয়ে দ্বিজপদ কর্মকার বুধির গলার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলেছে।

রাধা বলে, ঐ তো বুধি। চল, তাহলে ফিরি।

সতীশের কিন্তু ইচ্ছা তা নয়। হঠাৎ বলে বসে, কুড়মুন যাবি?

অদ্ভুত প্রস্তাব। রাধা অবাক হয়ে বলে, কুড়মুন? সে কুথা?

—এই তো আউলিয়ার মাঠ পেইরে আড়াই কোশ গেলিই ইস্টিশন! সেখান থিকে রেলগাড়িতে চেপে বিশ মিনিটের পথ। কুড়মুনে জবর গাজন হতিছে—যাবি?

রাধার সাহসে কুলায় না, বলে, পয়সা কুথায় পাব?

—আছে আমার কাছে। বাবুদের সাইকেল সাইরে দেছিলাম। পয়সা আছে। কুড়মুনে আজ ভীষণ কাণ্ড হবি। জ্যান্ত মানুষের মরা মুণ্ডু নে সন্নেসীরা লোফালুফি খেলে। যাবি?

সম্ভবত 'জ্যান্ত মানুষের মরা মুণ্ডু' লোফালুফি খেলাটা খুব উপাদেয় মনে হয়নি রাধার। সে বলে, না। মা বকবি।

কিন্তু সতীশের আন্তরিক ইচ্ছার বন্যায় ভেসে গিয়েছিল রাধার আপত্তির বাঁধ। শেষপর্যন্ত ওর কথাই মেনে নিয়েছিল। সতীশ আশা দিয়েছিল বেলা দুপুর হবার অনেক আগেই ওরা ফিরে আসতে পারবে মেলা দেখে। কেউ জানতেও পারবে না। কিশোরী রাধা রাজি হয়েছিল গাজনের উৎসব নয়--রেলগাড়ি চড়াও নয়, আসলে মায়ের কঠিন শাসন-শৃঙ্খলাকে লবডঙ্কা দেখিয়ে সে যে সতীশের সঙ্গে ভিনগাঁ থেকে বেড়িয়ে আসবে এইটুকুই আকর্ষণ করেছিল তাকে।

সব মেয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে একজন অভিসারিকা। রাক্ষসপুরীর রূপার কাঠি ছোঁওয়ানো রাজকন্যার মতো সেই অভিসারিকা ঘুমিয়ে থাকে মনের মতিমহলে। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে বেজে ওঠে বাঁশি—মেয়েরা ঘর ছেড়ে পথে নামে। সব মেয়েই নামে—জীবনে অন্তত একবারও! সব মেয়েই জীবনে একবার রাধা সাজে. অবশ্য অধিকাংশই বাঁশির তানে ঘর ছেড়ে পথে নামে মনে মনেই—তাই আজও সমাজ তার শৃঙ্খলাকে জিইয়ে রাখতে পেরেছে। রাধাও উপেক্ষা করতে পারল না সে ডাক!

আউলিয়ার মাঠ পেরিয়ে ইউনিয়ন-বোর্ডের কাঁচা সড়ক। এঁকেবেঁকে চলে গেছে

দূর দিগন্তের দিকে—কোথায় তা জানে না রাধা। জানে সতীশ। সেই দিগন্ত-অনুসারী ধূসর পথে দুজনে হাত ধরাধরি করে রওনা দিয়েছিল। পথের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে প্রথমটা কেউই সচেতন হতে পারেনি গল্পেগুজবে। অবসেষে ভাঙা সাঁকো পেরিয়ে ওদের যাত্রাটা শেষ হল যেখানে কাঁচা-সড়কটা এসে মিশেছে গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের মোহনায়। রাস্তাটা দেখে অবাক হয়ে গেল রাধা। ঝক্‌ঝক্ তকতক করছে কালো-কুচকুচে রাস্তাটা। নাক বরাবর সোজা চলে গিয়ে মিশেছে একটা বিন্দুতে। দু-পাশে বড় বড় গাছ—হুহু—করে ছুটে চলেছে গাড়ি। সতীশ বুঝিয়ে দিল এমুখো চললে কলকাতা আর ও-মুখো বদ্দমান। স্টেশন কাছেই। ক্লান্ত অবসন্ন দুটি মানুষ অবশেষে এসে পৌঁছালো স্টেশনের ছাউনিতে। গ্রামের ভাষায় যাকে 'জল-খাবার-বেলা' বলে, অর্থাৎ যে সময়ে ভোরে-মাঠে-নামা কৃষাণ কাস্তে-কোদাল-লাঙল রেখে গাছতলায় একটু জিরিয়ে নিয়ে গুড়-মুড়ি খায়—তামাক খায়—সে সময়টাও অনেকক্ষণ অতিক্রম হয়ে গেছে, মনে লাগে। প্রখরা চৈতালী সূর্যের কিরণে ঝলসে যাচ্ছে সারাটা দেশ। তৃষ্ণায় রাধার বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম করছে। স্টেশনের কলে মুখ হাত ধুয়ে জল খেল ওরা, এবং দুঃসংবাদটাও পেল সেখানেই। এ বেলায় কুড়মুনে যাবার আর কোন ট্রেন নাই।

অগত্যা প্রত্যাবর্তন!

কিন্তু সূর্য উঠে এসেছে মাথার উপর। স্টেশনের কাছ-ঘেঁষে-যাওয়া গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোডে পিচ গলে যাচ্ছে। কালো রাস্তার সমান্তরাল প্রান্তদেশ দূর দিগন্তে যেখানে পরস্পরে হাত ধরেছে সেখানে যেন জল জমে আছে পথের উপর। চিকচিক করছে রাস্তাটা। গাছের ছায়া স্পষ্ট পড়েছে পথের উপর। মাঠের উপরেও উত্তাপের একটা রেখা কেঁপে কেঁপে উপরে উঠছে। রাধা বসে পড়ে স্টেশনের বেঞ্চিটাতে। ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে তার। ভারি রাগ হল সতীশের উপর। এ আবার কী সর্বনেশে খেলা? আউলিয়ার মাঠ পেরিয়ে গ্রাম ছেড়ে ইউনিয়ন-বোর্ডের কাঁচা-সড়ক বেয়ে আসবার সময় মন্দ লাগেনি। বেশ দুটিতে গল্প করতে করতে পাক্কা আড়াই ক্রোশ রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছে। ফেরার কথা তখন মনে ছিল না—বাঁধন-ছেঁড়ার আনন্দেই ওরা দুজন বিভোর ছিল। আজকাল সর্বাণী রাধার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে তুলেছিল। সতীশের সঙ্গে ওর দেখাই হত না বিশেষ। কথাবার্তা হত না একেবারেই। মতির বিয়ের পরেই রাধা ক্রমশ আত্মসচেতন হয়ে উঠছিল। মতি যখন ওকে একে একে বললে রসময়ের সঙ্গে ওর আলাপের কথা, প্রথম সঙ্কোচ-ভাঙার কথা—তখন কেমন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল রাধা। অনেক অজ্ঞাত-রহস্যের উপর থেকে যবনিকা উঠে গিয়েছিল; কিন্তু তবু মনে হয়েছিল এ রহস্যের আরও কোনও গোপনপুরী আছে, যার চাবি খুলে দেখায়নি মতি। সব কথাও সে বোঝেনি, তবু বুকের মধ্যে কেমন যেন গুড়গুড় করে উঠেছে। পরে নির্জনে মতির জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছে ওর কিশোরী তনু। শুধু মায়ের বাধা নয়—নিজের অন্তরেও সে একটা বাধা অনুভব করত সতীশের কাছে আসতে, তার সঙ্গে কথা বলতে। সতীশ যেন বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ গলার স্বরটা কেমন মোটা ঘড়ঘড়ে হয়ে উঠল।

কেমন যেন হুট করে বেড়ে গেল মাথায়। রাধা নিজেই বুঝতে শিখল—সতীশ আর তার খেলাঘরের সাথী নয় ; সে পুরুষ-মানুষ! ঐ রসময়ের মতোই একটা অসভ্য-জানোয়ার! 'অসভ্য-জানোয়ার' বিশেষণটা মতি ব্যবহার করেছিল। মতি সতীশের প্রায় সমবয়সী, রাধার চেয়ে বছরতিনেকের বড়। রাধা তাই বুঝতে পারেনি—এ বিশেষণের গূঢ় অর্থ। তাই একথাও সে তখন বুঝতে পারেনি কেন তা সত্ত্বেও মতি রসময়ের কাছে রাতে শুতে যায়—কেন আপত্তি করে না। শুধু আপত্তি নয়—তার তো আগ্রহই লক্ষ্য করেছে সে। প্রশ্ন করতে গিয়ে উল্টে ধমকই খেতে হয়েছিল মতির কাছে : ন্যাকা! বোঝ না কিছু!

ক্রমে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের মতো করে বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু আবার সব গুলিয়ে গেল দাঙ্গার সময়। পাটখেতের মধ্যে লুকিয়ে সে স্বকর্ণে শুনেছিল প্রহ্লাদ কাকার মেয়ে পদ্মর আর্তনাদ! সে দেখেছিল পুরুষমানুষ কেমন করে সত্যই অসভ্য-জানোয়ার হয়ে উঠতে পারে। ঠিকই বলেছিল মতি—ওরা জানোয়ারই। সতীশকেও ঐ দলে ফেলে মনে মনে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল রাধা। তারপর আজ রোদ ঝলমল সকালে হঠাৎ যখন সতীশ সেই পুরানো দিনের সুরে ওকে ডেকে বসল—কুড়মুন যাবো। যাবি? তখন কেমন যেন সব ভুল হয়ে গেল। কিছুতেই মনে হল না সতীশও ঐ দলের অসভ্য জানোয়ার একটা। ঘর ছেড়ে পথে নেমে পড়ল রাধা। ভুলটা বুঝতে পারছে এখন। এই প্রচণ্ড চৈত্রশেষের দুপুরে আবার আড়াই ক্রোশ পথ ভেঙে গ্রামে ফিরতে হবে মনে করতেই হাতপা অসাড় হয়ে আসছে।

—এই শুয়ে পড়লে কেনে? বা-রে, ওঠ—ফিরতি হবে না? এখন রওনা দিলি ফিরতি তিনটে বাজবে—সে খেয়াল আছে?

রাধা স্টেশনের বেঞ্চিটায় ঢলে পড়েছিল, রাগতস্বরে বলে, আমি যাবনি যাও।

—আরে আরে পা টান করি আবার শুচ্ছে! এই রাধা, খিদে পেইছে? খাবি?

—পায় নাই? কিন্তুক খাবার পাবে কুথা?—ধমকে ওঠে রাধা।

সতীশ মাথা চুলকায়। স্টেশানের ওধারে খানকয় দোকান আছে দেখে এসেছে। মুদি-দোকান, মনিহারী দোকান, খাবারের দোকানও। পয়সা সতীশের কাছে আছে—সমস্যা সেটা নয়; কিন্তু রাধাকে এখানে একলা রেখে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? কিন্তু দ্বিতীয় কোন পথ নেই। রাধা যেভাবে লম্বা হয়ে শুয়েছে ওকে উঠতে বললে আবার ধমক খেতে হবে। অথচ কিছু খাবার আনাও নিতান্ত প্রয়োজন—তার নিজের জঠরেও আগুন জ্বলছে।

—আচ্ছা তুই শুয়ি থাক। আমি খাবার নে আসতেছি দোকান থিকে।

সতীশ রওনা দেয়। খানিক গিয়ে আবার ফিরে আসে। ফিসফিসিয়ে বলে, কুথাও যেওনি জানি একা একা, আর কারও সাথে কথা বলনি। স্টিশান জাগা কিন্তুক খুব খারাপ।

রাধা চারিদিকে একবার দেখে নেয়। সেও গিন্নিপনা করতে ভোলে না, তুমি যেন বাজে কতকগুলান বাসি তেলেভাজা কিনে এননি। সামনে ডাঁইরে ভাজিয়ে আনবে। ওলাওঠার সময় কিন্তুক ইটা।

সতীশ তারপর চলে যায়। রাধা স্টেশনের বেঞ্চিতেই শুয়ে শুয়ে দেখতে থাকে চারিপাশ। একটা মালগাড়ির ইঞ্জিন গাড়িগুলোকে খামোখা একবার করে টেনে আনছে—আবার অহেতুক ঠেলে দিচ্ছে। দুপুর রোদে এ কী অদ্ভুত খেলা! অবাক হয়ে দেখে। নীল জামা পরা মাথায়-পাগড়ি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে লাইনের ধারে। দুটো হাত সে অদ্ভুতভাবে দোলাচ্ছে ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে। এক পাও নড়ছে না। এ লোকটাও পাগল নাকি ইঞ্জিন ড্রাইভারের মতো? একজন হিন্দুস্থানী লোক ওর দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। রাধা মুখ চোখে ফুটিয়ে তোলে একটা শহুরে সবজান্তা ভাব।

সতীশের ফিরতে রীতিমতো দেরি হল। গরম পুরি ভাজিয়ে এনেছে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে—আর এনেছে শক্তিগড় স্টেশনের ল্যাংচা। রাধা উঠে বসে। শালপাতার ঠোঙাটা ওর সামনে মেলে ধরে সতীশ বলে, এক্কেরে গরম। ডাঁড়িয়ে ভাজাইছি তাই টুক দেরি হয়ি গেল। নাও বসি যাও—

প্রচণ্ড ক্ষুধা আর দুরন্ত লোভ দমন করে পাকা গিন্নিটি বললে—তুমি আগে খাও!

—না তুমি খাও। আচ্ছা আস, বরং দুজনাই একসাথে খাই।

রাধার লজ্জা করছিল—কিন্তু ক্ষুধার প্রেরণাও কম নয়। আর ইতস্তত না করে একসঙ্গে দুজনে খেতে শুরু করে শালপাতা থেকে।

সতীশ বলে, এই, একটা কাণ্ড হইছে। টেরেনেই একটা ঝুমুরের দল নামিছে শক্তিগড়ে। ওরা লক্ষ্মীপুরের মেলাতেই যাতিছে। গো-গাড়ি ছাড়বে এখুনি। ওদের দলের যে মালিক—সেই বুড়োটার সাথে আলাপ হল দুকানে। আমি অরে তোমার কোথা বলিছি—বললাম আমরাও লক্ষ্মীপুরে যাব, কিন্তুক তুমি অসুস্থ হয়ি পড়িছ। তা বুড়োটা লোক ভাল—তোমারে গাড়িতে নিতি রাজি হইছে।

মুখের গ্রাসটা গিলে ফেলে রাধা বলে, বাব্বা, বাঁচালে! এই চড়া রোদে এখন যি আড়াই কোশ পথ ভাঙতি হবেনি এই রক্ষে! তোমার যেমন কাণ্ড! লাও তাড়াতাড়ি খায়ে লাও—ওরা না গো-গাড়ি ছাড়ি দেয়।

—না, দিবে না। বলিছে, তোমারে নে গেলি গাড়ি ছাড়বে।—তারপর একটু ইতস্তত করে বলে, অ্যাই একটা কাণ্ড হইছে, বুঝলে। বুড়ো মনে ভাবিছে, মানে, আমি কিছু বলি নাই—বুড়ো নিজের থেকেই মনে করিছে—মানে...তুমি চটি যাবো না তো?

রাধা অবাক হয়ে বলে, তুমি অমন করতিছ কেনে? কী ভাবিছে বুড়ো?

—ভাবিছে তুমি আমার পরিবার! —খুক খুক করে হেসে ওঠে সতীশ,—বুড়ো নিজে থিকেই বললে—তা নিয়ে এস তোমার পরিবাররে, নিব তুলি আমার গাড়িতে। রাগ করলে না তো?

রাধার মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। মুখ নিচু করে বলে, ছি ছি, তুমি ভারি ই'য়ে! তা তুমি বললে না কেনে—ও আমার পরিবার লয়, আমার...

—আমার...?

—আমার বুন!

—সেটাও তো মিছা কথা হত।

—তা হলি আমার বন্ধু?

—ধ্যাৎ, তাহলে বুড়ো রাজি হত থোড়াই। আমার বয়সী ছেলে তোমার বয়সী মেয়ের কখনও বন্ধু হয়?

—হয় না? এই তো হইছে।

সতীশ রাগ করে বলে—বেশ তো, তাইলে সেই কথাই বল গে বুড়োরে।

কিছুটা চুপচাপ। তারপর রাধাই আবার বলে, তাইলে তুমি কী করতি বল?

—আমি বলি এই দুপুর রোদে আড়াই কোশ পথ হাঁটার চাইতে মিছিমিছি না হয় দু-দণ্ড বউই সাজ আমার। ক্ষেতি কী? খেলাঘরে একদিন তো আমার বউই সাজতি—

রাধা মুখ তুলে তাকায়। চোখাচোখি হয় সতীশের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয় আবার। সতীশ ওর এঁটো হাতটাই ধরে ফেলে বলে, রাজি?

রাধার মুখটা নেমে পড়ে একেবারে বুকের উপর। বোঝা যায় সে গররাজি নয়—খেলাঘরের সেই সম্পর্কটা আরও একদিনের জন্য মেনে নিতে।

—লক্ষ্মী বউ!—বলে উঠে পড়ে সতীশ।

—যাও, অসভ্য কুথাকার!—হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়ে রাধা। হাত ধুয়ে এসে কৌতুক-আবিল কণ্ঠে বলে, অ্যাই, ঘোমটা দিতি হবি নাকি?

—দেওয়াই তো ভাল—কেউ চিনতি পারবেনি।

খেলাটা ভালই লাগছিল রাধার। পেটটাও ভরেছে। লুকোচুরি খেলায় নতুন একটা লুকোবার জায়গা হঠাৎ আবিষ্কার করে যেমন আমোদ লাগে তেমনি খুশিয়াল হয়ে উঠল রাধা। মাথার উপরে আঁচলটা তুলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে, এ রাম! লজ্জা করতিছে!

হি হি করে সতীশও হেসে ওঠে, ডাঁড়াও। আর একটা কাজ বাকি আছে। চোখ বুঁজো দিকিন!

—কেনে? —চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করে রাধা !

—যা বলছি কর কেনে। দেরি করনি।

অগত্যা রাধা চোখদুটি বন্ধ করে। একটা কিছুর প্রতীক্ষা করে। খেলার একটা নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হবে বলে আশা করে থাকে। সতীশের ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ এসে লাগে ওর সীমন্তে। চমকে এক পা পিছিয়ে যায় রাধা! শিউরে ওঠে যেন!

—ছি ছি, এ কী করলে!—নিজের হাতটা সিঁথিমূলে স্পর্শ করিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

—এটুকু না হলি ধরা পড়ি যাতাম। সব দিক ভাবি কাজ করতি হয় হে!—বিজ্ঞের মতো বলে সতীশ, মুদি দুকান থিকে এক প্যাকেট কিনি আনিছিলাম! বাঃ! কী সোন্দর দেখাইছে তোমারে এখন! দেখি দেখি—চিবুকটা তুলে ধরে রাধার।

রাধা ছিটকে সরে যায়, কোথাও কিছু নেই ঠোঁট দুটি ফুলে ওঠে ওর। থরথর করে কেঁপে ওঠে গ্রাম্য মেয়েটির সারা শরীর! যুগ-যুগান্তরের সংস্কার ঐ কিশোরী মেয়েটির চোখের কোণটা ভিজিয়ে দিয়ে যায়। এটাকে সে কিছুতেই খেলাঘরের ছেলেমানুষি বলে ধরে নিতে পারে না; অশ্রু-আর্দ্র কণ্ঠে বলে, ছি ছি, এ কী করলে সতীশ!

সতীশ তো অপ্রস্তুতের একশেষ! জবাবে কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। ভেবেছিল ভারি একটা মজা হবে বুঝি—হঠাৎ রাধার ভাবান্তরে বুঝতে পারে কাজটার গুরুত্ব। একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়! ওভারব্রিজের উপর থেকে এই সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডেকে ওঠেন, কই হে ছোকরা, তোমরা যাবে নাকি? আমরা রওনা দিচ্ছি কিন্তু এবার।

রাধা তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়। একগলা ঘোমটার আড়ালে সিন্দুর-রঞ্জিত সিঁথিমূলকে গোপন করে উঠে পড়ে। বৃদ্ধের পিছন পিছন ওরা ওভারব্রিজটা পার হয়ে এসে দাঁড়ায় গ্র্যান্ড-ট্রাংক রোডে। খানতিনেক গরুর গাড়ি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। বৃদ্ধ পিছনের গাড়ির কাকে যেন উদ্দেশ করে বলে ওঠে, ও অতসী, এই যে এসেছে—তোমার গাড়িতেই তুলে নাও ওকে।

রাধা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। অতসীর অস্তিত্বটা সে কল্পনা করেনি! ভেবেছিল বুড়োর কাছে একগলা ঘোমটা দিয়ে কাটিয়ে দেবে সময়টা। বুড়ো অতসী বলে যাকে সম্বোধন করল সেই মেয়েটি ছই-দেওয়া গাড়ির ভিতর থেকে বললে—পারবে তো ভাই উঠতে?—হাতটাও বাড়িয়ে দেয়।

আর ইতস্তত না করে রাধা উঠে পড়ে সেই গাড়িতে। অতসী মুখ বাড়িয়ে সতীশকে বলে, তোমার কিন্তু ভাই ঠাঁই হবে না এখানে। তোমাকে হেঁটে আসতে হবে। পারবে তো?

সতীশ সপ্রতিভের মতো বলে, নিশ্চয়ই। আমি তো হেঁটেই যাব।

—তা তো পারতেই হবে! মুখ টিপে হাসে অতসী। বলে, কানটিকে যখন নিয়ে চলেছি তখন মাথাটিকে যে আসতেই হবে।

এ কথার জবাব দেওয়ার ক্ষমতা নেই গ্রাম্য কিশোরের। গাড়ি চলতে শুরু করতেই অতসী রাধার ঘোমটাটা খুলে দেয়, বাব্বা এই গরমে অতবড় ঘোমটা দিয়ে রয়েছ কী করে?

ঘোমটা খুলতে পেরে রাধাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অতসীকে এতক্ষণে সে ভালো ক'রে দেখতে পায়। অবাক হয়ে যায় রাধা। কী সুন্দর দেখতে ওঁকে। বয়স অল্প নয়—ওর মায়ের বয়সীই হবে। সর্বাণী রঙিন শাড়ি পড়ে না—অন্তত রাধা পরতে দেখেনি। এ মেয়েটি কিন্তু পরিধান করেছে ধনেখালির একটা তাঁতের লাট্টুপাড় নীল শাড়ি। ওর বয়সের মেয়ের পক্ষে শাড়িটা বেমানান হওয়া উচিত—কিন্তু আশ্চর্য মানিয়েছে ওকে। দু হাতে দুই সার সোনার চুড়ি। সেগুলো যে সোনার নয়, তা বুঝবার মতো বুদ্ধি নেই রাধার। মেয়েটির চোখ দুটোতে যেন কৌতুক উপছে পড়চে। রাধার ভারি ইচ্ছা করছিল চেয়ে চেয়ে মেয়েটিকে ভালো করে দেখে—কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। যতবার সেদিকে তাকায় লক্ষ্য করে অতসী ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করছে যেন। কীদেখছে এতো অতসী। রাধা আরও জড়সড় হয়ে বসে।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে ভাই তোমাদের?

রাধা ঢোক গিলে বলে—এই আষাঢ়ে এক বছর হবে।

—কোথায় বাড়ি তোমার?

—লক্ষ্মীপুরেই।

—বাপের বাড়ি না শ্বশুরবাড়ি?

একটু ইতস্তত ক'রে রাধা বলে—শ্বশুড়বাড়ি। মনে মনে ঠিক করে রাখে বাপের বাড়িব কথা জিজ্ঞাসা করলে বলবে—বাঘ-আঁচড়া, নদে-শান্তিপুরের দেশে। ওর বাপের কাছে নামটা সে শুনেছে—নবীন যুগীর ঠাকুর্দা ছিল বাঘ-আঁচড়া গাঁয়ের নামকরা তাঁতি।

সে প্রশ্ন করে না, কিন্তু অতসী বলে, তোমাকে কী বলে ডাকব?

রাধা একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। এরাও লক্ষ্মীপুরে যাচ্ছে, থাকবে অবশ্য মাত্র দু-তিন দিন। ঝুমুর গানের দল—গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে ওদের মেলামেশার সম্ভাবনা নেই। মচ্ছোব মিটে গেলেই ওরা চলে যাবে। তবু ছোট্ট লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পে 'রাধা' নামের একটি মাত্র মেয়েই আছে—এবং তাকে ক্যাম্পের সবাই চেনে। তাই নিজের সত্য পরিচয়টা গোপন করে বলে—আমার নাম মতি পাল—আমারে মতি বলেই ডাকবেন।

—অধিকারী বলছিল তোমার নাকি শরীর খারাপ।

—অধিকারী কে?

—ঐ যে আগের গাড়ির বুড়োটা—ঐ তো এসে বল্লে এক ভদ্রলোক তাঁর অসুস্থ পরিবারকে নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছেন। তখন কি জানি ভদ্রলোক বলতে ঐ এক ফোঁটা একটা ছেলে, আর তাঁর পরিবার হচ্ছেন এই টুকটুকে একটি বউ!

হঠাৎ রাধার থুতনিটা একটু নেড়ে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে প্রশ্ন করে—শরীর খারাপ? কী হয়েছে? ভাগিদার আসছে নাকি?

প্রশ্নটা বোধগম্য হয় না কিশোরী রাধার। সরল ভাবেই সে প্রতিপ্রশ্ন ক'রে—ভাগিদার? কিসের ভাগিদার?

ওর গালটা টিপে দিয়ে অতসী বলে—আদর কুড়োবার! বলি, কোল জুড়ে কি সোনার চাঁদ খোকা আসছে বলে শরীর খারাপ?

গাল দুটো রক্তিম হয়ে ওঠে রাধার। অত জোরে কিন্তু টেপেনি অতসী। এ কী বিড়ম্বনা! কোনরকমে আমতা আমতা করে বলে—না, না!

সতীশ আসছে গরুর গাড়ির পিছন পিছন। ওদের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে না নিশ্চয়ই। তবু বারবার ওদের দিকে তাকাচ্ছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তার। ফাঁস হয়ে যাবে না তো?

এঁকেবেঁকে গাড়ি চলেছে ইউনিয়ান বোর্ডের কাঁচা সড়ক ভেঙে। নিচে খড় দেওয়া আছে প্রচুর—তার উপর অতসীর নরম বিছানা পাতা, তবু ঝাঁকানি লাগছে যথেষ্ট। একবার মাথাটাও ঠুকে গেল ছইয়ের গায়ে। অতসী সতীশকে দেখিয়ে বলে, বেচারি এই রোদে সারাটা পথ হেঁটে হেঁটে আসবে, ডেকে নেব নাকি ওকেও?

রাধা বলে—কিন্তু তিনজনের জায়গা হবি কী ক'রে?

অতসী ছড়া কাটে, হলে সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন। নেহাত জায়গা না হয়, ও না হয় তোমাকে কোলে নিয়ে বসবে? কী ডাকব ওকে?

রাধা লজ্জা পেয়ে বলে—না, না!

—না কেন? ওর কোলে বসতে লজ্জা করবে বুঝি আমার সামনে? আচ্ছা আমি না হয় চোখ বুজে থাকব। ডাকব ওকে?—কী নাম ওর?

লজ্জা পেলেও ভারি মজা লাগে রাধার। ডাকলেও নিশ্চয়ই সতীশ এসে উঠবে না গাড়িতে। রাধাকে কোলে নিয়ে বসা? সে তো বাতুলতা! রাধার মনে হল দেখাই যাক না সতীশ কী করে এ অদ্ভুত প্রস্তাবে। সে একাই কেন বিব্রত হবে অতসীর কৌতুকবাণে। সতীশও বিদ্ধ হোক না। বলে, ওর নাম সতীশ।

অতসী কিন্তু রাধাকে নিরাশ করে। নামটা জেনে চুপ করে যায়। সতীশকে ডাকে না। কেমন যেন অন্যমনস্ক উদাসী হয়ে যায়। তাপদগ্ধ দ্বিপ্রহরের আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে। রাধা লক্ষ্য করে দেখে এতক্ষণে অতসীকে। সুন্দরী সে—কিন্তু কেমন যেন বিষণ্ণ, উদাসীন চেহারা তার। যেন একছড়া বাসী মালা। হঠাৎ ঐ উপমাটাই মনে হয় রাধার। চোখ দুটো বড়, বড়,—কাজল দেওয়া আছে নিখুঁত করে। চুলগুলো খোলা পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে। চোখের তলাটা কালো। রঙটা ফর্সা, কিন্তু বড় ফ্যাকাসে—রক্তশূন্য যেন। অতসীর দিক থেকে বাইরের দিকে চোখ ফেরায় রাধা। মাঠের মাঝখানে হাওয়ায় কাঁপছে উত্তাপের রেখা। সারা মাঠে দিগন্ত-অনুসারী মরা-সোনার রঙের ন্যাড়া-গুছি। আলপথে বহু দূরে চলেছে একজন পথ-চলতি মানুষ—মাথায় টোকা, আদুড় গা। হাতে কি একটা আছে তার। পেতলের ঘটি হতে পারে—রৌদ্রকিরণে চিক্ চিক্ করছে সেটা। এছাড়া জনপ্রাণীর সাড়া নেই স্তব্ধ চরাচরে। তৈলতৃষিত গো-গাড়ির আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে নৈঃশব্দের আকাশে। একটা জলপিপি পাখি উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে, দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল তার স্বর—টি—টি—টি! পথের পাশে ধুলোয় ঢাকা ধূসর রঙের গাছের ঝোপ—আকন্দ, খেজুর চারা আর কালকাশুন্দি! বিরলপত্র একটা বাবলাঝোপ থেকে স্তব্ধ মধ্যাহ্নের মূলসুরটা শোনা যায় একটানা ঘুঘুর ঘুম-ঘুম ঝিমন্ত তানে। কেমন যেন ঝিমুনি এসে গিয়েছিল রাধার। হঠাৎ অতসীর কথায় চমক ভেঙে যায়। অতসী বলে, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট—আমার মেয়ে থাকলে তোমার চেয়ে সে বড় হত। কিছু মনে কর না ভাই—একটি সত্য কথা বলবে?

—বলুন? —দুরু দুরু বুকে জবাব দেয় রাধা।

—কতদিন ধরে ওকে চেন তুমি?

রাধা জবাব দিতে পারে না। এ আবার কী ধরনের প্রশ্ন! অতসী কিন্তু ওর জবাবের জন্য অপেক্ষা করে না। আপন মনে বলে যায়, এখনো দেখ্ ভাই—ওর সঙ্গে যাবি, না বাড়ি ফিরে যাবি? যদি বাড়ি যেতে চাস তা'হলে বল্—আমি অধিকারীকে বলে সব ব্যবস্থা করে দেব।

অনেক কষ্টে রাধা বলে, এ আপনি কী বলছেন?

—বলছি যে বিয়ে তোদের হয়নি—মিছে কথা বলেছিস আমাকে। এক বছর বিয়ে হলে কি এই ছিরি হয়? হাতে শাঁখা নেই, নোয়া নেই—সঙ্গে একটা সুটকেস পর্যন্ত নেই। এভাবে কেউ বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি আসে? গলায় হার না হোক, কানে কি একটা রুপোর ফুলও দেয়নি তোর মা আবাগী! আর অম্লানবদনে একবছরের বিয়ে করা বরের নামটা তুই বলে বসলি আমাকে? এ কি বিশ্বাস করার কথা!

কী জবাব দিতে পারে রাধা? এ সব ঘোরালো কথা তার খেয়ালই হয়নি। সাত

ঘাটের জল খাওয়া ঝুমুরের দলের এই মেয়েটি যে এত সহজেই সব ধরে ফেলবে এটা অনুমান করা শক্ত তার গ্রাম্য বুদ্ধিতে। অতসীই আবার বলে—কাল রাতেই পালিয়েছিস বাড়ি থেকে, নয়? সত্যি বল!

কাঁদো কাঁদো গলায় রাধা বলে, —না, আজ সকালে!

—যাক, তা হ'লে রাত কাটেনি! ভেবে দেখ ভাই, ওর সঙ্গে যাবি, না বাড়ি ফিরে যাবি? ওকে বিশ্বাস করতে পারছিস তো? কতদিনের জানাশোনা? বিয়েতে আপত্তি ছিল কার?

রাধার ইচ্ছে করছে এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ছুট দেয়! চুপ করে মাথা নিচু করে বসে থাকে নিস্পন্দ। এতগুলো প্রশ্নের একটারও জবাব দেয় না। অতসী তাকিয়ে ছিল দূর আগুনঝরা আকাশের শেষ সীমানায়—সেখানে তরল উত্তাপের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ক্লান্ত চিলের চিৎকার। যেন সে আপনার মনেই আবার বলতে থাকে, অত সহজে পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করিস না রে। বড় মিঠে কথা বলে ওরা—তখন সব ভুল হয়ে যায়। আমি ভুক্তভুগী কিনা—তাই জানি। তোর মতো আমিও একদিন বিশ্বাস করে বেরিয়ে এসেছিলাম ঘর থেকে পথে। আর ফিরে যেতে পারিনি। পথে পথেই জীবনটা কেটে গেল আমার। যার সঙ্গে প্রথম ঘর ছাড়ি—জানি না, সে কোথায় আছে এখন। ভালো করে মনেই পড়ে না তাকে এখন। সেদিন যদি জানতাম এমন হবে—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দিগন্ত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে সে ছইয়ে ঢাকা ছোট সীমানায়। ম্লান হাসে রাধার দিকে তাকিয়ে। সে হাসি তো হাসি নয়—সে যেন কান্নার রূপান্তর। মাথাটা আর তুলতে পারে না রাধা। বুকের উপত্যকায় এসে আশ্রয় খোঁজে ওর চিবুকটা। চোখ দুটো কী জানি কেন ছলছল করে ওঠে। অতসী ওর চিবুকটা উঁচু ক'রে ধরে, বলে, জানি তুই কী ভাবছিস। ভাবছিস ঐ ছেলেটা তোর সাদা সিঁথি রাঙিয়ে দিয়েছে—নাই বা হ'ল বিয়ে, কিন্তু আর তো ফেরার পথ নেই! আর তো কাউকে বর বলে মেনে নিতে পারবি না! তাই না?

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে রাধা। তাকে বুকে টেনে নেয় অতসী। মাথার উপর হাত বুলাতে থাকে। রাধা গৃহত্যাগ করেনি, কিছুই খোয়া যায়নি তার। অতসীর মতো পথে পথে জীবন কাটানোর সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই তার জীবনে। অতসীর আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। তাহ'লে এত কান্না আসছে কোথা থেকে? এ অশ্রুর প্লাবনের উৎস কোথায়? রাধা জানে না। তবু কী জানি কেন এই অপরিচিতা মেয়েটির অদ্ভুত গন্ধ মেশানো ব্লাউজের উপর মুখ গুঁজে অঝোর ধারায় কান্না ছাড়া যেন কোন কাজ নেই রাধার।

গ্রামে প্রবেশ করবার আগেই গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লো ওরা জগাই হালদারের ভিটের কাছাকাছি এসে। অধিকারী মশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটু ঘুরপথে ক্যাম্পের দিকে যাবার ইচ্ছে সতীশের। রাধার সিঁদুরটাও তুলতে হবে ক্যাম্পের লোকের নজরে পড়ার আগে। বেলা পড়ে আসছে। সারাদিন অগ্নিবর্ষণের পর চৈত্র-শেষের সূর্য ক্লান্ত দেহে ঢলে পড়ছেন পশ্চিম দিগ্বলয়ে। ধুলোয় ঘোলাটে হয়ে গেছে অপরাহ্ণ সূর্যের

শেষ অঙ্কের অভিনয়। অতসী সতীশকে কাছে ডেকে বলল, ওর সিঁথিতে তুমি সিঁদুর দিয়েছ। বিয়ে হোক বা না হোক ও তোমার বউ এ কথাটা ভুলো না। তোমাকে ভরসা করেই পথে পা বাড়িয়েছে এ মেয়েটি। ওর সমস্ত দায়িত্ব তোমার—ওকে অনাদর করলে ভগবান কখনও তোমায় ক্ষমা করবেন না।

সতীশ কোনও জবাব দিতে পারেনি।

অতসী ওর প্যাঁটরা খুলে এক জোড়া কাচের চুড়ি বার ক'রে পরিয়ে দিল রাধার দুহাতে। —একটু থেমে বলে, শাঁখা আমার কাছে নেই—না হলে তাই পরিয়ে দিতাম তোমায়। ঈশ্বর তোমাদের মিলন সার্থক করুন।

কী জানি কী ভেবে রাধা ওকে প্রণাম করতে গেল। বাধা দিল অতসী, বললে, দূর পাগলি! আমাকে কি প্রণাম করতে আছে?

'কেন' এ প্রশ্নটা জেগেছিল রাধার মনে—কিন্তু সেটা সে উচ্চারণ করতে পারল না। তার মনে হল—নিশ্চয়ই একটি কিছু গভীর কারণ আছে। যে কারণটা গোপন করতে মুখরা অতসীদিদিকেও মুখ লুকাতে হয়। রাধা বললে, আবার কবে দেখা পাব দিদি?

—আসছে বছর যদি আসি খোঁজ করব। কিন্তু মতি পাল কি সত্যিই তোর নাম—না সেটাও মিছে কথা? আর আসছে বছর কি তোরা থাকবি এখানে?

সতীশের ভালো লাগছিল না এসব কথা। রাধা কিন্তু তার অতসীদিদিকে ইতিমধ্যেই ভালোবেসে ফেলেছে। বলে, না। আমার নাম রাধা, আমার বাবার নাম নবীন—আমরা যুগী। আমি এ ক্যাম্পেরই মেয়ে। আর আর...

—বুঝেছি—বিয়ে তোদের হয়নি, এই তো?

—আপনি যেন কাউকে বলবেন না।

—বলব না, কিন্তু কথা দে এসব ছেলেমানুষি আর কখনও করবি না।

অধিকারী মশাই তাগাদা দেন—কই গো! হল?

রাধা আর কৌতূহল দমন করতে পারে না; হঠাৎ বলে বসে, উনি আপনার কে দিদি?

ম্লান হাসল অতসী। সামলে নিয়ে বললে, উনি আমাদের অধিকারী।

আর কিছু বলল না।

রাস্তার বাঁক ঘুরে গো-গাড়ি তিনটি চলে গেল পদ্মদিঘির দিকে। পদ্মদিঘির পারেই মেলাতলা। অস্ফুট কলরোল ভেসে আসছে এতদূর থেকেও। যতক্ষণ দেখা যায় ওরা দেখতে থাকে। মনে হ'ল অতসীদিদি তার লাট্টু পাড় শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখটা-মুখটা মুছল একবার। পথে-পাওয়া নিঃসম্পর্কীয়া অতসীদিদির জন্য মনের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল রাধার। কিছু কিছু সে বুঝতে পেরেছে। অতসীদিদি লাট্টু পাড় ডুরে শাড়ি পরে, কপালে দিয়েছে কাঁচপোকার টিপ, ওর গাল আর ঠোঁটের রঙটা ঈশ্বরদত্ত নয়—গাঁয়ের আর পাঁচটা মেয়ের মতো সে নয় এটাই মনে হয়েছিল প্রথমে। না হলে ঝুমুর দলে থাকে? অতসীদিদির আচরণেও স্পষ্ট হয়েছে সেকথা। তার প্যাঁটরায় শাঁখা নেই, হাতেও নেই—অথচ সে সধবা। সে প্রণাম নিল না; অধিকারী মশায়ের সঙ্গে

সম্পর্কটা কী জানতে চাওয়ায় সে হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। তাহলে কি অতসীদিদি ভালো নয়? পানের ছোপধরা বৃদ্ধ অধিকারী মশায়ের দাঁতাল-গন্থুর হাসির সঙ্গে অতসীদিদির ঐ ম্লান হাসির কী একটা সম্পর্ক আছে যেন। চোখটা ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে রাধার।

ঠিক সেই সময়েই সতীশ ওর কাচের চুড়িপড়া হাত দুটি টেনে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে ডাকে : রাধা! —আর কিছু বলতে পারে না।

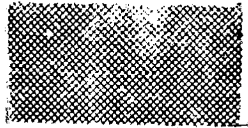
আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল রাধারও—এ আহ্বানে। হঠাৎ ভেঙে পড়ে সতীশের বুকে। ওর শার্টের বুক-পকেটে লাগল খেলাঘরের সিঁদুরের ছোপ। ফুলে ফুলে কাঁদছিল রাধা! কেন তা সে জানে না। মনে মনে বলছিল—কী তা সেই জানে। সতীশ তার চোখের জলে ভেজা মুখ দুহাতে তুলে ধরে নিজের দিকে। কী করে সান্ত্বনা দিতে হয় জানে না—কী করে কান্নায় ভেঙে-পড়া একটি কিশোরী মেয়েকে শান্ত করতে হয় শেখেনি। প্রাণধর্মের তাগিদে কাজ। রাধার কান্নায়-ফোলা অধরে আঁকা পড়ে তার নারীত্বের প্রথম স্বাক্ষর। শিউরে ওঠে রাধা! থর-থর করে কেঁপে ওঠে সারা শরীর। চোখ দুটি মুদে আসে আবেশে।

পথের ধারে নির্জন অপরাহ্ণ-বেলায় যজ্ঞ-ডুমুর গাছটা থাকে নীরব সাক্ষী।



কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

6



১৩৬৭ বঙ্গাব্দের শেষ কটা দিন। ইংরেজি ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস। অরণ্যবাসের মেয়াদ প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চলল। এবারকার নতুন আস্তানাটার নাম পারালকোট। চল্লিশহাজার একর জমি হাঁসিল করা হয়েছে এ তল্লাটে। এ পর্যন্ত পনেরটি গ্রামের পত্তন হয়েছে—আরও অনেক হবে। এখনও জঙ্গল কেটে নতুন জমি উদ্ধার করা হচ্ছে। গড়ে উঠছে উদ্‌বাস্তু গ্রাম। রায়পুর-বিশাখাপট্টম সদর-সড়ক থেকে, অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল অভ্যন্তরে। অবশ্য দণ্ডকারণ্যে রেল লাইন পাতার কাজও চালু হয়েছে। এদের বংশধরেরা অন্তত রেলগাড়ি দেখবে বাড়ি থেকে অদূরে। পারালকোট অঞ্চলে জনবসতি অত্যন্ত বিরল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। আসাম অথবা সুন্দরবনের মতো ঘন জঙ্গল নয়। সেখানে লতাগুল্মে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করাই দায়। এখানকার জঙ্গল সেরকম নয়। আট-দশ-হাত উঁচু শরগাছের বন হয়তো মাইলের পর মাইল। তারপর হয়তো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বড় গাছের সারি। শাল-মহুয়া—আমলকি আর হরতুকির বন। বাঁশগাছও আছে প্রচুর। আম জাম কাঁঠালও দেখা যায় মাঝে মাঝে। বনের যেন যৌবন এসেছে এখন—এই চৈত্রের শেষাশেষি। অশোক পলাশ শিমুল রাঙাচেলিতে মুড়েছে সর্বাঙ্গ। কচিপাতার প্রাণবন্ত সবুজে ছেয়ে গেছে নাম-না জানা হাজার গাছের দেহ। মহুয়ার গাছে ফুল ধরেছে—সকালবেলা টুসটুসে পাকা ফুলে ভরে থাকে গাছতলা। ভারি মিঠে গন্ধ তার। আর সবচেয়ে অবাক করে আমগাছের সারি। কাশ্মীরে যখন চেনার গাছে নতুন পাতা বের হয়, তখন মনে হয় পাহাড়ে আগুন লেগেছে বুঝি। এখানে চেনার গাছ নেই—কিন্তু আমগাছের পাতার লালিমাটাও কিছু কম যায় না। সিঁদুরে লাল হয় পাহাড়ের গা, আমগাছের নতুন পাতার লজ্জারুণ বধূবেশে। রাত্রে পাহাড়ে আগুন দেয় আদিবাসীরা—সার দিয়ে মালার মতো জ্বলতে থাকে ধিকিধিকি আগুন—পাহাড় বেষ্টন করে। দাউদাউ করে জ্বলে না কিন্তু—মনে হয় দীপালীর আলো। জিপে করে যেতে যেতে মাঝে মাঝে দেখা যায় অশোক-শিমূলের কাণ্ড। গাছতলা লালে-লাল হয়ে গেছে। ঋতব্রত এই পুষ্পভারনম্র বনের শোভা দেখে আর মিলিয়ে নেয় রামায়ণের বর্ণনার সঙ্গে। সীতাহরণের পর শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের বসন্তসম্ভার দেখে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন :

> পশ্য লক্ষ্মণ পুষ্পাণি নিষ্ফলানি ভবন্তি মে।
> পুষ্পভারসমৃদ্ধানাং বনানাং শিশিরাত্যয়ে ॥
> রুচিরাণ্যপি পুষ্পাণি পাদপানামতিশ্রিয়া।
> নিষ্ফলানি মহীং যান্তি সমং মধুকরোৎকরৈঃ ॥

হাজার হাজার বছর অতীত হয়ে গেছে তবু সেই দণ্ডকারণ্যের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে—কত জাতি এসেছে—গেছে, কত রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে ইতিমধ্যে। অরণ্য আজও আছে অপরিবর্তিত। আর স্থির হয়ে আছে সেই অরণ্যের শোভা নিরীক্ষণ করবার মতো দরদী চোখ, এই অরণ্যের গাম্ভীর্য উপলব্ধি করবার মতো মানুষের মন।

সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই—বাস্তুচ্যুত বনচারিণী সেই সীতাদেবী আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া। তবু নরনারীর প্রেমের আকুতি কিন্তু আজও বেঁচে আছে। সহস্রাব্দীর ব্যবধানেও নিঃশেষিত হয়নি সেই বিরহীহৃদয়ের একটি মাত্র দীর্ঘশ্বাস : লক্ষ্মণ দেখ, শীতের অবসানের এই বন ফুলের ভারে আজ সমৃদ্ধ। তবু আমার পক্ষে তা আজ নিষ্ফল। গাছের ঐ অতি সুন্দর ফুলগুলি ভ্রমরের সঙ্গে বৃথাই মাটিতে লোটাচ্ছে। আমের গাছ মুকুলের অঙ্গরাগে যেন বিলাসের সাজে সেজেছে। হায় মদনের কী প্রতিকূল আচরণ, যিনি আজ এ বনে নাই, যাঁর মিলন এখন দুর্লভ, সেই প্রিয়ভাগিনী কল্যাণী সীতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

ঋতব্রত মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করে এসব কাব্যকথা। ডুবে থাকতে চায় কাজের মধ্যে। পরিকল্পনার কাজে।

পরিকল্পনার কাজ। আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে এদিকে। বছরখানেক আগে যখন প্রথম এসেছিল, শুনেছিল উদ্‌বাস্তুদের প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়ার্কসাইট-ক্যাম্পে থাকতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সারা দণ্ডকারণ্য জুড়ে গড়ে উঠছিল অসংখ্য ওয়ার্ক-ক্যাম্প। ঋতব্রতের ভাগে পড়েছিল এ রকম দশ-বারোটা ওয়ার্ক-ক্যাম্প তৈরি করার দায়িত্ব। এক-একটা ওয়ার্ক-ক্যাম্পে পঞ্চাশটি পরিবার থাকবে—প্রতি ক্যাম্পে দুটো করে নলকূপ, একটা ইঁদারা। এখানে থেকে তারা মাটি কোপাবে ন্যাশনাল হাইওয়েতে। চিফ এঞ্জিনিয়ার সাহেব বলতেন, দশ-বারো বছর নিষ্কর্মা বসে থাকায় ওরা নাকি কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ওদের চাষের জমি দিলে তা চাষ করবার জন্য ওরা নাকি প্রস্তুত নয়। তাই ক্রমে ক্রমে ওদের কর্মক্ষম করে তোলার জন্য এই ওয়ার্ক-ক্যাম্পগুলির ব্যবস্থা শুধু কর্মক্ষম নয়, কর্মমুখীন ক'রে তোলার জন্যও। এক একটি এইরকম ওয়ার্ক-ক্যাম্প তৈরি করতে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হচ্ছিল। বছরখানেক আগে এ পরিকল্পনায় যখন প্রথম পদার্পণ করে, তখন শুনেছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই ওয়ার্ক-ক্যাম্পগুলি তৈরি করার উপরেই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে। ইঞ্জিনিয়ার দল উঠে পড়ে লেগেছিল সারা দণ্ডকারণ্যে ওয়ার্কসাইট-ক্যাম্প তৈরি করার কাজে। ক্রমে ক্রমে গোটাপঞ্চাশেক ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প তৈরি হয়ে গেল—জঙ্গলের মাঝে মাঝে—কিছু না হোক বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।

এখন শুনছে, এই ওয়ার্ক-ক্যাম্পগুলির আর প্রয়োজন নেই। স্থির হয়েছে, বাঙলা দেশ থেকে উদ্‌বাস্তুরা সরাসরি গ্রামে গিয়ে উঠবে। ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্পে ওরা উঠবে না। রাস্তার মাটিও ওরা কাটবে না। নবতম থিয়োরি হচ্ছে—বাঙলাদেশ থেকে যদি উদ্‌বাস্তুদল এসে কোন অস্থায়ী ক্যাম্পে ওঠে তাহলে ওদের মনে একটা আঘাত লাগবে। বাঙলা দেশের পি. এল. ক্যাম্প এবং দণ্ডকারণ্যের ওয়ার্ক-ক্যাম্প যদিও সম্পূর্ণ পৃথক জাতের জিনিস তবু ওদের চোখে নাকি দুটোই ক্যাম্প। ওরা সরাসরি

যদি গ্রামে যায়—নিজের জমি, নিজের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয় তবেই উৎসাহের সঙ্গে ওরা কাজ করবে।

বছরখানেক আগে এসে যে থিয়োরিটি শুনেছিল এখন সেটা ব্যাক-ডেটেড!

ফলে আদেশ এল অপ্রয়োজনীয় ওয়ার্ক-ক্যাম্পগুলি ভেঙে ফেল এইবার!

ভেঙে ফেলা হল—ভেঙে ফেলা হচ্ছে এইসব যত্নে-গড়ে তোলা ক্যাম্পগুলি।

ওয়ার্ক-ক্যাম্পগুলি ভেঙে ফেলার আদেশ যেদিন এল সেদিন ঋতব্রত বলেছিল—আদেশ টিকবে না, আবার প্রত্যাহৃত হবে।

ওর অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রীতম মেহতা বললে—কেন স্যার?

—উদ্‌বাস্তুরা এখন আসছে না—তাই মনে হচ্ছে এই ওয়ার্ক-ক্যাম্পগুলি অপ্রয়োজনীয়। যেদিন পশ্চিমবঙ্গ-সরকার জানাবেন অমুক তারিখে একটি স্পেশাল ট্রেনে দুশ' উদ্‌বাস্তু যাচ্ছে সেদিনই এঁদের টনক নড়বে।

—কেন, আমরা সরাসরি তাদের গ্রামে নিয়ে যাব?

—কী বলছ মেহতা পাগলের মতো? গ্রাম কি তোমার তৈরি আছে? আগামী বছর যে গ্রামগুলি তৈরি হবে তার ভৌগোলিক অবস্থানই তো জানা নেই—সাইট-সিলেকশনই হয়নি। একটি গ্রামের পঞ্চাশটি পরিবারকে সেই ভূখণ্ডে নিয়ে যাবার আগে অন্তত একটা টিউব-ওয়েল আর পঞ্চাশটা তাঁবু তো খাড়া করতে হবে? কে করবে সে কাজ?

সত্যকথা। অন্তত পঞ্চাশটি তাঁবু গড়তে হবে, জঙ্গল সাফা করাতে হবে ভবিষ্যতের গ্রাম যেখানে হবে। করবে কে? সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। তারা বলছে বিজন জঙ্গলে গিয়ে আমরা যে প্রাথমিক কাজ করব আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা কী হবে। সুতরাং আগে ইরিগেশান-বিভাগের লোকে একটা নলকূপ বসিয়ে দিক। ইরিগেশান-বিভাগ বলে—আমাদের আপত্তি নেই—কিন্তু যন্ত্রপাতি আমরা যে ট্রাকে করে নিয়ে যাব তার রাস্তা কোথায়? রিক্লেমেসনকে বল বুলডোজার চালিয়ে একটা ট্রাক যাওয়ার পথ করে দিক প্রথমে। রিক্লেমেসন বলেন—এ আর শক্তি কী—কিন্তু আমরা যে বিজন অরণ্যে দামী দামী গাছ উপড়ে ফেলে পথ তৈরি করব—আময়া বুঝব কী করে কোনদিকে রাস্তা চাইছ তোমরা? কোনটা হস্তান্তরিত জমি, কোনটা প্রাইভেট ল্যান্ড, কোনটা রিজার্ভ-ফরেস্ট তা জানব কী করে? সুতরাং আমরা কাজ শুরু করার আগে ল্যান্ড-অ্যাকুজিসান অফিরাসকে বল জরীপের একটা নকশা বানাতে। নকশায় দাগ দাও লাল পেন্সিলে—আর দাও হুকুম। সাতদিনে বুলডোজার চালিয়ে সড়ক তৈরি করে দিচ্ছি। কিন্তু ল্যান্ড-অফিসার তাতে রাজি নন—বলেন, জরীপ করাই আমার কাজ, করতেও রাজি আছি;—কিন্তু আমার কর্মচারীরা জঙ্গলে গিয়ে থাকবে কোথায়? কয়েকটা তাঁবু গেড়ে দিতে বল ইঞ্জিনিয়ারদের—অন্তত একটা নলকূপ বসিয়ে দিক কর্মীদলের জন্য।

ফলে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানেই ফিরে যাই আবার!

কর্তৃপক্ষ বলেন—এর একমাত্র সমাধান একটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স—জেনারেল মিটিং। সব বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা আবার ছুটে আসেন শৈলনগরীতে। দু'তিন দিন ধরে

চলে আলোচনা—সাইক্লোস্টাইল হয়ে বেরিয়ে আসে মিটিং-এর মিনিটস্। সব বিভাগে পাঠানো হয় সেগুলি। সবই হয়—কিন্তু সমাধানটা কী হল ঠিক বোঝা যায় না।

কিন্তু কোথায় চলেছে পরিকল্পনা?

এ পর্যন্ত নাকি পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়েছে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায়। এ পর্যন্ত উদ্‌বাস্তু এসেছে দুই হাজার। যন্ত্রপাতি বাড়িঘর ছেড়ে শুধু সরকারী কর্মচারীদের এই দুই তিন বছরের মাহিনাটা যদি এদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত, তাহলে প্রত্যেকে একখানা করে ব্যুইক গাড়ি কিনতে পারত। কথাটা শ্রুতিকটু—কিন্তু ভেবে দেখার অপেক্ষা রাখে।

কে যেন বলেছিলেন মিথ্যা তিনরকম হতে পারে—লাই, ড্যাম্‌নেড লাই, আর স্ট্যাটিস্‌টিক্স—

মিথ্যা, চরম মিথ্যা আর পরিসংখ্যান!

কায়দা করে প্রচার করলে পরিসংখ্যান নয়কে শুধু হয় নয়, হস্তীও করে তুলতে পারে। দামোদর ভ্যালি, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাতেও এমন একটা সময় গেছে যখন কোন বিরূপ সমালোচক বলতে পারত—এ পর্যন্ত এত কোটি টাকা খরচ হয়েছে অথচ এক ওয়াট বিদ্যুতও এখনও উৎপন্ন হয়নি, এক কিউসেক জলও পাওয়া যায়নি চাষের জন্য। দুর্গাপুর—ভিলাই—রাউরকেল্লার জীবনেও এমন একটা খণ্ডকাল এসেছিল যখন বলা চলত এত কোটি টাকা খরচ হয়েছে অথচ এখনও এক পাউন্ড লোহাও উৎপন্ন করতে পারেনি কারখানা। কিন্তু ঐ সব পরিকল্পনার সঙ্গে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের হিসাবের মানদণ্ড এক নয়। ওখানে আগে জমি চষ, বীজ ছাড়াও, আল বাঁধো,—তিন চার মাস কষ্ট কর জলে কাদায় তারপর সোনা ফলবে মাঠে। তখন হিসাব করতে বস কত ধানে কত চাল। এখানে তা নয়। এখানে বাজেট-এক্সপেন্‌ডিচারই সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়। এখানে অন্য কষ্টিপাথরে বিচার করতে হবে সাফল্যের খতিয়ান। পরিকল্পনার ব্যয় এবং উদ্‌বাস্তুর পুনর্বাসন এখানে হাতে হাত মিলিয়ে চলার কথা। অথচ তা হচ্ছে না। চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চলে যাবার, অর্থাৎ পরিকল্পনার খোল-নলচে বদলে যাবার পর, ছয় মাস কেটে গেছে। দুইশত পরিবারও আসেনি ইতিমধ্যে। নতুন উদ্‌বাস্তু আসা রীতিমতো কমে গেছে। কাগজে কাগজে বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও গতবৎসর দুহাজার পরিবার এসেছিল এ অরণ্যে—এখন কাগজে কাগজে এত উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, বিরূপ সমালোচনা একেবারে থেমে গেছে। অথচ উদ্‌বাস্তু আগমনও থেমে গেছে ঐ সঙ্গে।

ঋতব্রত ভাবে এমন কি কেউ নেই যে খতিয়ে দেখবে এইসব? গতবৎসর দুহাজার মানুষ এসেছিল স্বেচ্ছায়, তখন প্রতিদিন দণ্ডকারণ্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হত খবরের কাগজে। আর দুশটি পরিবারও এল না এ বছর! এদিকে খবরের কাগজের প্রচার আর ওদিকে ডোলবন্ধের হুমকি সত্ত্বেও। এর মানেটা কী? কেউ কি দেখবে না বিচার করে?

পারলকোটে এসেছে আটশটি পরিবার। তারা ছড়িয়ে আছে পনেরটি গ্রামে। ঋতব্রত গ্রামগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেছে। মানুষগুলোর অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য।

ওয়ার্ক-সাইট-ক্যাম্পে যারা ছিল মারমুখী জনতা তারাই উৎসাহভরে কাজ করছে নিজের নিজের জমিতে। শালের খুঁটির উপর প্রথমে গড়ে তুলছে একটা টিনের ছাউনি। তারপর নিজ-নিজ রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী সেটাকে ভাগ করছে দু-তিনটে ঘরে। দেড়ফুট চওড়া কাদার দেওয়াল তুলেছে। লাউ-কুমড়ো-শশার গাছ লাগিয়েছে। গোবর দিয়ে নিকিয়েছে উঠান। বাঁশ, মাটি অথবা 'ঝাটি-মাটির' দেওয়াল তুলে বানাচ্ছে পৃথক রান্নাঘর, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশাল। গত বছর পাকা বাড়ি তৈরি করা হচ্ছিল—এ বছর মাটির দেওয়াল তোলা হচ্ছে। প্রথম প্রথম প্রবল আপত্তি ছিল ওদের, শেষপর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

গ্রামের ছক তৈরি করে দিচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। বিশফুট চওড়া গ্রাম্য সড়ক, তার দুইধারে দুই সারি প্লট দশকাঠা করে। বাস্তুজমি বা হোমস্টেড প্লট। বাড়ি সংলগ্ন সব্জির বাগান করা চলবে। চাষের জমি এছাড়া অন্যত্র পঞ্চাশ ঘরের এক একটা ছোট গ্রাম। প্রতি গ্রামে থাকবে একটি পুকুর, একটি কুয়া, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আর চণ্ডীমণ্ডপ। কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি মাধ্যমিক স্কুল এবং চিকিৎসা কেন্দ্র। উদ্‌বাস্তুরা ট্রাকে চেপে আসে ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প ছেড়ে তাদের নতুন গাঁয়ে। তার আগেই গ্রাম্য রাস্তা চিহ্নিত করা থাকে, বাস্তুজমির চার কোনায় খুঁটি পোঁতা থাকে। ওরা এসে আশ্রয় নেয় অস্থায়ী ছোলদারী তাঁবুতে। বুড়ো কালিদাস ব্যাপারী জমিগুলো দেখে এসেছিল, বললে, আমারে ঐ পুবদুয়ারি কোনার প্লটটা দিবেন ছার!

—তা হবার উপায় নেই। প্লট সব দশকাঠা করে, কিন্তু তার ভাল-মন্দ আছে। তাই লটারি করার ব্যবস্থা আছে। তোমরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়াও, আর একে এক একখণ্ড করে লটারির কাগজ তোল। কাগজের যত নম্বর লেখা আছে, তত নম্বর প্লট তোমার!

হি হি করে হাসে ব্যাপারী, এহানেও লটারি! দেহি ভাগ্যে কী আছে!

প্লট তো সনাক্ত করা হল। এবার বাড়ি তৈরির কাজ। শালের বল্লি গাদা দেওয়া আছে, করোগেটেড টিন রয়েছে স্তূপাকৃতি করা। চার-পাঁচটি পরিবার একসঙ্গে জোট বাঁধে। একজনকে মাতব্বর মনোনীত করে—সরকারি ভাষায় তার নাম গ্রুপ-লিডার গ্রুপ-লিডার চার-পাঁচটি বাড়ি তৈরি করার ঠিকা নেয়। ঐ পাঁচজনের তরফে সেই হচ্ছে মুখপাত্র। ওদের তরফে পাঁচবাড়ির মালমশল্লা নিয়ে হাত-রসিদে টিপছাপ দেয়। শালখুঁটি, করোগেট টিন, আলকাতরা, স্ক্রু-কব্জা, জে-হুক, নাট-বল্টু সরবরাহের দায়িত্ব সরকারের। জানলা-দরজার কাঠ, ছিটকিনি সবই। তোমরা মদৎ করো, নিজেরা পরিশ্রম করে গড়ে তোলো তোমাদের বাস্তুভিটে। কষ্ট না করলে কেষ্ট পাবে কেমন করে? বিনা পয়সায় খাটতে বলছি না। এ কাজের জন্য তোমরা মজুরি পাবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদরান্নের সংস্থান কর। সেই মজুরির টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এস চাল-ডাল-নুন-তেল-কেরোসিন। এ অরণ্যে ওসব কোথায় পাবে? কেন, চলে যাও সরকারি রেশন-শপে। ঐ দেখ স্মল-ট্রেড লোন পেয়ে দোকান খুলে বসেছে, কী নাম যেন ওর, সুবল দেবনাথ না হরিপদ মণ্ডল? সব জিনিস পাবে ওখানে, মোমবাতি, দেশলাই, মায় চুলের ফিতে, মাথার কাঁটা। তা বলে হ্যারিকেন লণ্ঠন, বালতি কি লোহার কড়াই পাবে না। তা যদি নেহাত দরকার থাকে তবে চলে যাও হরবনস সিং অথবা ছগনলালের

কাছে। ওরা ট্রাক ড্রাইভার। প্রতিদিনই ওরা যাচ্ছে শহরে। প্রয়োজন হলে বাঘের দুধও এনে দিতে পারে, তবে হ্যাঁ, দামটা আগাম দিতে হবে। ড্রাইভারেরা ঠেকে শিখে এই শর্ত আরোপ করেছে।

একটু ভুল হল বর্ণনায়। ব্যবস্থাটা ঐ রকম ছিল বটে প্রথম প্রথম। এখন কার্যক্রমটা একটু বদলাতে হয়েছে। পাঁচজনের গ্রুপে কে কোন বাড়িটা পাবে তার চূড়ান্ত লটারি আজকাল আর আগে করে না ঋতব্রত। ঐ পাঁচটা বাড়ির যে কোন একটা হতে পারে তোমার। আগে শেষ করে, তারপর চূড়ান্ত অ্যালটমেন্ট। না হলে দেখা যায় গ্রুপ-লিডারের বাড়িটাই আগে ওঠে। ওরা এ ব্যবস্থাটাও প্রথমে মেনে নিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত তাও মেনে নিয়েছে। কাজ করছে মন দিয়ে।

কাজের কি আর অন্ত আছে? বাস্তুভিটা শেষ হলেই তো কাজের শেষ হবে না। এই তো সবে শুরু। ঐ দেখ তোমাদের জন্যে জমি হাঁসিল করে রাখা হয়েছে। ঐ জমি তোমাদের। ঢাউস ঢাউস কলের লাঙল প্রাথমিক কর্ষণ করে যায় কুমারী ভূমি। তোমরা এইবার আগাছা বেছে ফেল—তৈরি করে নাও জমিটা।

—তা তো করুম কিন্তু কোন জমিটা আমারে দিবান? ফিন্ লটারি করবার লাগব নাকি!

—তা তো করতেই হবে। এক লপ্তে প্রায় হাজার বিঘে জমি হাঁসিল করা হয়েছে এ গ্রামের জন্যে। সব জমি তো একরকম নয়, কোন জমি সরেশ, কোন জমি কিছু নিরেশ, কোথাও মাটি লালচে কোথাও কালো। কোনও জমি উঁচু—জল থাকবে না, আবার কোন জমি বেশ নিচু, জল বাঁধবে। সুতরাং আবার সবাই গোল হয়ে বস—লটারি হবে।

জমি বন্টন যদি হয়েও যায় তবু ভাবনা যায় না। চৈত্র গেল গেল, আর মাস দেড়-দুই-এর ভেতর এসে যাবে বর্ষা। ঠিক বর্ষা না এলেও চাষের প্রথম কর্ষণের উপযোগী কাল-বৈশাখী এল বলে। অথচ এখনও বীজধান এসে পৌঁছায়নি, বলদ আসেনি, লাঙল পাওয়া যায়নি। সবারই আসেনি তা নয়। কেউ বলদ পেয়েছে, লাঙল পায়নি—কেউ লাঙল-বলদ দুই পেয়েছে—পায়নি বীজধান। সবারই কমবেশি দোয়াত-আছে-কালি-নাই অবস্থা। কর্মকর্তারা বললেন, আরে বাপু এখন থেকেই ঘাবড়াচ্ছ কেন, চাষ-মরশুমের আগেই সকলে সবকিছু পেয়ে যাবে।

ওরা তবু শান্ত হয় না। ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। সরকারি প্রতিশ্রুতির উপর আর ওরা আস্থা রাখতে পারে না। সদ্য-চাকরি-পাওয়া এগ্রিকালচারাল অ্যাসিস্টেন্ট হয়তো ধমক দিয়ে ওঠে : কেন জমি পাওনি, বাড়ি পাওনি? মিথ্যা কথা বলেছিলাম আমরা?

—আরে মিছা কথা কওনের কথাটা ফির কই কইলাম? গোঁসা করেন ক্যান?

এরা কেমন করে বোঝাবে ঐ নবাগতকে—তাদের দ্বাদশবর্ষব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাস। হ্যাঁ, জমি-বাড়ি আজ তারা পেয়েছে বটে। হোক জমি আলহীন, বাড়ি দেওয়ালহীন, তবু পেয়েছে তো। কৃতজ্ঞ তারা। কিন্তু ইতিপূর্বে কতশতবার এই প্রতিশ্রুতি কালবৈশাখীর ঝড়ে ধুলায় উড়ে গেছে তার খতিয়ান কে রাখে? জমি-বাড়ি

পেল বটে, কিন্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল তাই বা বুঝবে কেমন করে? ঐ তো আসাম-ফেরত ননী মোদক, হৃদয় ঘোষ, জগবন্ধু ডাক্তার। সবই তো একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল আসামের গোরক্ষপুরে। জমি-বাড়ি-ডিসপেনসারি সবই হয়েছিল। মেরে ওদের ভূত ভাগিয়ে দিয়েছে না? এখন না পারে সেখানে ফিরে যেতে, না পারে এখানে থাকতে। এদের অবস্থাও যে ঐ রকম হবে না তার নিশ্চয়তা কে দিচ্ছে? এখানকার আদিবাসীরাও যে একদিন বল্লম-তীর ধনুক-টাঙ্গি নিয়ে রে রে করে তেড়ে আসবে না সেকথা জানছেন কেমন করে?

সবচেয়ে বড় সমস্যা জমির দাগ নম্বর ওরা একখণ্ড নীলচে কাগজে দেখেছে মাত্র। সত্যিকারের জমিতে গিয়ে সব তাল-গোল পাকিয়ে যায়। কোনটা দাগ নম্বর ৭৯ আর কোনটা তার উত্তর-সীমা? বনমালী হুই ছিল সেটেলমেন্ট বিভাগের ঝানু আমীন। দেশ-বিভাগের আগে জমির মাপজোক করাই ছিল তার কাজ। শুধু চেন-প্রিস্‌ম্যাটিক-কম্পাস আর প্লেন-টেবিলই নয়, থিয়োডোলাইট ব্যবহার করতে জানে। শুধু ব্যবহার নয়, পার্মানেন্ট অ্যাড্‌জাস্টমেন্ট পরীক্ষা করবার ছয়টি ব্যবস্থাই জানা আছে তার। জরীপের কাজে মাথার চুল হয়েছে সাদা, রঙ হয়েছে তামাটে। ধূর্ত লোক। দেশ বিভাগের সময় কৃষিজীবী বলে নাম লিখিয়েছিল কায়দা করে। সেও একখণ্ড জমি পেয়েছে। ও হেন আমীনকুলতিলক হুই-বুড়ো পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেল তার জমির সীমানা উদ্ধার করতে। শেষে বললে—প্ল্যানের লগে জমির মিল নাই! কোন সুম্বুন্ধির পো ছার্ভে করি প্লান আঁকিছে তারে পাঠায়ে দ্যান—সীমানা দেখায় দিক।

তা দিবাকর পণ্ডিত ভাল যুক্তি দিয়েছে, হতে পারে প্ল্যানে কিছু ভুল আছে। যদি বর্ষার আগে ওরা সীমানা দেখিয়ে না দেয় তাহলে প্রথম বছর আমরা যৌথ চাষ করব। হাজার-পঞ্চাশ বিঘে জমি চষব আমরা পঞ্চাশ ঘর চাষী। যা ফসল উঠবে সবাই সমান ভাগ করে নেব।

বুড়ো রতন ঘোষের নাতি মনুয়া বললে, তা কেন হবি? আমি যতটা খাটতি পারব ঐ বুড়ো যগন্দ ঘোষ পারবে ততটা খাটতি?

দিবাকর বলেছিল, ঝগড়া করে তো লাভ নেই—তোমার দেহে শক্তি আছে, যগন্দের আছে অভিজ্ঞতা। সমান ভাগ না হলে চলবে কেন? আর তোমরা যদি চাও তবে বেশ, এস আমরা একটা কর্মীপরিষদ গড়ে তুলি। সেই কমিটিই বন্টন ব্যবস্থা করে দেবে।

অ্যাডমিনিস্ট্রের মিস্টার দত্তও সেই যুক্তি দিলেন। প্রথম বছর যৌথ চাষ হোক। মাতব্বর কয়েকজন চাষী থাকবে এই যৌথ-খামারের পরিচালক। ভোট হয়ে গেল মহা উৎসাহে। যগন্দ, রাখহরি আর ছিদাম বৈরাগী হল কমিটির মেম্বার। তারাপ্রসন্নকে ওরা প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি বললেন চাষের অভিজ্ঞতা তাঁর নেই, আর এসব বৈষয়িক হিসাবপত্র তিনি রাখতে নারাজ। তখন সবাই মিলে বুড়ো রতন ঘোষকেই নির্বাচিত করল 'পিসিডেন্টরূপে'।

অনশন ধর্মঘট করে রত্নাকর এ অরণ্যেও মোড়ল হয়েছে।

এই গ্রামের দিকে তাকালে তবু মনে হয় কিছু কাজ হচ্ছে। [illegible] পায়

একমাত্র এই গ্রামে এলেই। মনে হয়, এতদিনের পরিশ্রমটা বোধহয় একেবারে বৃথা হয়নি। এই তো হাসি ফুটেছে এতগুলি মানুষের মুখে। এরা বাঁচবে, নিশ্চিত বাঁচবে, নিশ্চিত বাঁচবে—পরিকল্পনা রসাতলে গেলেও এরা আর মরবে না। শক্ত কব্জিতে এরা খুঁটি চেপে ধরেছে। এরা আর কোনদিন ফিরে যাবে না শেয়ালদা স্টেশানে। দীর্ঘ বারো বছর ধরে যে কাওয়ালি গান গাইছিল এই মানুষগুলি তার ধুয়োটা ছিল শেয়ালদা স্টেশান। ট্রানসিট ক্যাম্প—পি. এল. ক্যাম্প...শেয়ালদ' স্টেশন; তাহেরপুর-অশোকনগর-প্রফুল্লনগর-গয়েশপুর...শেয়ালদ' স্টেশন; বিহার-উড়িষ্যা-বেতিয়া-গোরক্ষপুর...শেয়ালদ' স্টেশন। এতদিনে আশা হচ্ছে গানটা থামলো বুঝি। আর শেয়ালদ' স্টেশনের ধুয়োয় ফিরে যাবে না এরা। এইটুকুই একমাত্র সান্ত্বনা, এইটুকুই সাফল্য। তাই অবসর পেলেই ঋতব্রত চলে আসে গ্রামে। নির্মীয়মাণ উদবাস্তু উপনিবেশে। পুকুর-কাটা হচ্ছে, কুয়ো-কাটা হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে সারি সারি বাড়ি। ঋতব্রত বসে বসে দেখে। কখনও গল্প করে কারও দাওয়ায় বসে। সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। তার মধ্যে দিবাকর পণ্ডিত আর তারাপ্রসন্নের সঙ্গে পরিচয়টা নিবিড় হয়েছে। চাষী হলেও দিবাকরকে আদর্শবাদী মনে হয়, ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। ঋতব্রত ঠাট্টা করে বলে, কী দিবাকরবাবু? আপনার পরবর্তী বিবাহ-বার্ষিক কবে?

দিবাকর লজ্জা পায়, কেন ও কথা বলে লজ্জা দেন স্যার? মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।

—কেমন বুঝছেন সব—এখানে চিরকাল থাকতে পারবে এরা?

—আমার তো খুবই আশা হয়। ইচ্ছে করে এবার চলে যাই পশ্চিম বাঙলায়। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বলি—কেন পড়ে আছ এ নরকে? চল আমার সঙ্গে, গিয়ে দেখবে, আমরা কেমন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গড়ে তুলছি নতুন জনপদ।

ঋতব্রত বলে, বেশ তো, তাই চলুন না। আপনি দেশ-সেবক ছিলেন, বক্তৃতাও করতে পারেন ভাল, লেখাপড়াও শিখেছেন। আমি কর্তৃপক্ষকে বলব আপনার কথা?

—না-না-না! বাধা দেয় দিবাকর। আমার স্ত্রী অসুস্থা।

ঠিক কথা। মনে ছিল না ঋতব্রতের। রোগজীর্ণা স্ত্রীর বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় দিবাকরকে। ইচ্ছামতো সে বাড়ি ছেড়ে বেশি দূরে যেতে পারে না।

এ অঞ্চলে আদিবাসীদের বসতি অত্যন্ত বিরল। দশ-বিশ মাইলের মধ্যে গ্রাম আছে কি নেই। অথচ অবস্থা তাদের বেশ সচ্ছল। কোণ্ডাগাঁওয়ের আশেপাশে যেসব আদিবাসী মুরিয়াদের দেখা যেত তাদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভালো। জমির উর্বরতা এবং জমির উপর জনবসতির চাপ অল্প বলেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আরও একটা কারণ আছে—সভ্যজগত থেকে আরও অভ্যন্তরে বাস করে এরা—তাই এদের অভাববোধ আরও কম। উদ্‌বাস্তুদের সঙ্গে এদের দিব্যি সদ্ভাব। আদিবাসী গাঁয়ে উৎসব হলে এরা দল বেঁধে যায়। ওরা ঘুরে ঘুরে নাচে। ছেলেরা মাদল বাজায়, শিঙা বাজায়, মাথায় কড়ির মালা অথবা ময়ূরের পালক গুঁজে। মেয়েরা হাত ধরাধরি করে নাচে ঘুরে ঘুরে। অদ্ভুত তালে তালে পা ফেলে তারা। কখনও ঝুমুর-লাগানো হাতের লাঠিতে তাল দেয়, কখনও মাথায় বাঁধা ঘন্টায় তোলে ঠুন্‌ঠুন্ ঝংকার। উদ্‌বাস্তুরা হাসে

হি হি করে ওদের কাণ্ড দেখে। আবার ওরাও আসে দল বেঁধে উদ্‌বাস্তু উপনিবেশে। এরা যখন অষ্টপ্রহর—করে। শ্রীখোল-খঞ্জনী নিয়ে দোল-মঞ্চ গড়ে এরা যখন নাচে 'হরে রামো হরে রামো' করে, তখন তারাও হাসে খিল খিল করে, দুহাত কানে দিয়ে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। আজ পর্যন্ত কোন আদিবাসীগ্রামের সঙ্গে উদ্‌বাস্তুদের গণ্ডগোল বাধেনি। উমরকোটেও উদ্‌বাস্তু গ্রামের পত্তন হচ্ছে অনেকগুলি—সেটা এ অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। ভিন্ন রাজ্যে। সেখানে দু-একটা ছোটখাট সংঘর্ষ হয়েছে বলে শোনা যায়—এখানে কিন্তু কোনকিছুই হয়নি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দত্ত-সাহেবের কড়া দৃষ্টি আছে এদিকে। কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন যদি কোন উদ্‌বাস্তু আদিবাসীদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র দুর্ব্যবহার করে তবে কঠোর শাস্তি হবে তার। তিনি বলেন, ও বিষ একবার ঢুকলে সব বানচাল হয়ে যাবে।

কথাটা তারাপ্রসন্নও বলেছিলেন একদিন। তারাপ্রসন্ন গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। বৃদ্ধ উদ্‌বাস্তু একজন। মনটা সরল। নিজে খেতে পান না—এক বিধবা প্রৌঢ়া পুত্রবধূকে নিয়ে এসেছেন এখানে, তবু তাঁর সংসারে আশ্রয় দিয়েছিলেন আর এক পঙ্গু ব্রাহ্মণকে। তিনি নাকি ভিক্ষা করতেন নৈহাটি স্টেশনে। তিনি আবার একা আসেননি। এসেছিলেন সস্ত্রীক। ব্রাহ্মণের দুটি পাই খোঁড়া। ক্রাচের উপর ভর দিয়ে ঘোরাফেরা করত বুড়োটা। কী যেন নাম লোকটার? ঠিক মনে পড়ছে না ঋতব্রতের, রসিকরাজ না রসলাল? লোকটা নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়! কথাবার্তায় তারাপ্রসন্নকে একেবারে অশিক্ষিত গাঁওয়ার বলে মনে হয় না। ঋতব্রত মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে বসে গল্প শোনে। প্রাক্-বিভাগ জীবনের গল্প। সে গ্রাম কোনদিন দেখেনি ঋতব্রত, কোনদিন দেখবে না—তবু বৃদ্ধের বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে কী এক নদীর ধারে, কোন এক কমলপুর গ্রাম।

সেই তারাপ্রসন্নকে একদিন ঋতব্রত বলেছিল, আমার ভয় হয় এইসব অশিক্ষিত আদিবাসীরা না একদিন উদ্‌বাস্তুদের উপর গায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে বসে।

তারাপ্রসন্ন বলেছিলেন, সে আশঙ্কা আমি করি না। ওরা সরল বন্য মানুষ, আমরা আগে ওদের ক্ষতি করতে না চাইলে ওরা আমাদের ক্ষতি করবে না।

ঋতব্রত বলেছিল, ইতিহাস কিন্তু সে কথা বলে না। একদিন অযোধ্যা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র এই বনে এসে পুনর্বসতি চেয়েছিসেন। রাক্ষসরাজ রাবণ এসে অতর্কিত আক্রমণ করেছিল সেই পর্ণকুটীর।

—কিন্তু তার আগে শূর্পনখার একটা উপাখ্যান আছে। প্রথম অন্যায় অনার্য রাক্ষস করেনি, করেছিল আর্য-সন্তান।

—আমি মানতে রাজি নই,—তর্ক করেছিল ঋতব্রত—শূর্পনখা লক্ষ্মণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল তার আগে।

তারাপ্রসন্ন হেসে বলেছিলেন, আমিও মানতে রাজি নই ইঞ্জিনিয়ার-সাহেব, আপনার যুক্তি। মূল রামায়ণ আমার স্বপক্ষে—

তারপর গড়গড় করে বৃদ্ধ পণ্ডিত মুখস্থ বলে গিয়েছিলেন অরণ্যকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গ, যেখানে শূর্পনখা প্রথম এসেছে শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণকুটীরে। ঋতব্রত স্তম্ভিত হয়ে

গিয়েছিল বৃদ্ধের পাণ্ডিত্যে। শুধু বাল্মীকি রামায়ণ মুখস্থ বলে যাওয়াই নয়, 'য' এবং 'জ', 'ন' এবং 'ণ'-য়ের পৃথক উচ্চারণ বুঝিয়ে দেয় কতবড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তিনি। বিস্মিত ঋতব্রত বলেছিল, এর অর্থ?

তারাপ্রসন্ন মুখে মুখে অনুবাদ করে গেলেন মূল-রামায়ণের শ্লোকগুলি :

গোদাবরীতে স্নান সেরে সীতা আর লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম আশ্রমে ফিরে এলেন এবং পর্ণকুটীরে উপবিষ্ট হয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলেন। এমন সময়ে একটি রাক্ষসী বেড়াতে বেড়াতে তাঁদের কাছে এল। দেবতুল্য রূপবান জটামণ্ডলধারী কন্দর্পকান্তি রামকে দেখে তাম্রকেশা রাক্ষসী বললে—তুমি তপস্বীর বেশে ধনুর্বাণহস্তে ভার্যার সঙ্গে কেন এই রাক্ষসবেষ্টিত অরণ্যে এসেছ? রাম নিজের সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? তোমাকে রাক্ষসী মনে হচ্ছে, এখানে কেন এসেছ?

রাক্ষসী বললে—আমি রাক্ষসী শূর্পনখা, এই দণ্ডকারণ্যে সকলে আমাকে ভয় করে। রাবণের নাম শুনে থাকবে, তিনি আমার ভ্রাতা। তোমাকে দেখেই আমি মোহিত হয়েছি। আমি প্রভাবশালিনী, সর্বত্র ইচ্ছামতো যেতে পারি। তুমি আমার ভর্তা হও। সীতাকে নিয়ে কি করবে? ও বিকৃতা কুরূপা, তোমার যোগ্য নয়। আমিই তোমার অনুরূপ ভার্যা। এই কুৎসিত অসতী কৃশোদরী সীতাকে আর তোমার ভ্রাতাকে আমি ভক্ষণ করব। তুমি আমার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করবে।

রাম একটু হেসে বললেন, আমি কৃতদার, ইনি আমার প্রিয়া পত্নী। তোমার মত নারীদের পক্ষে সপত্নীর সঙ্গে থাকা কষ্টকর হবে। আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সচ্চরিত্র ও প্রিয়দর্শন, ইনি অবিবাহিত, রূপে তোমারই তুল্য। বিশালাক্ষী, তুমি এঁকেই ভজনা কর।

ঋতব্রত বাধা দিয়ে বললে—বলেন কী! শ্রীরামচন্দ্র সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বললেন?

তারাপ্রসন্ন হেসে বললেন—তাই তো বলছিলাম ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। দেখুন, রাক্ষসীর কথার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই—সে যা চায় তা সোজা করে চায়, সে যা বলে তা সরল করে বলে। অথচ আর্যসন্তান শ্রীরামচন্দ্র মিথ্যাকথা বলে রাক্ষসীর মন লক্ষ্মণের দিকে আকৃষ্ট করলেন। বড় ভাইয়ের অনুমতি পেয়ে, তাঁর অবিবাহিত অনুজের কাছে প্রার্থীরূপে আসা কি অনার্য মেয়েটির অন্যায় হয়েছিল মনে করেন আপনি? শ্রীরামচন্দ্র স্পষ্ট বললেন—তাঁর ভাই অবিবাহিত, বললেন রূপে ইনি তোমারই তুল্য; এ অরণ্যের সরল আদিম সেই আদিবাসী রাজকন্যা যদি আর্য-রসিকতা না বুঝতে পেরে থাকে সেটা কি তার অপরাধ? তার মন যে কত সরল তা বোঝা যায় পরবর্তী শ্লোকে। যে লক্ষ্মণকে পূর্বমুহূর্তেই ভক্ষণ করবার কথা উচ্চারণ করেছিল রাক্ষসী, তাকেই বললে অতঃপর—তুমিই আমার যোগ্য। তুমি আমাকে বিবাহ করে এই দণ্ডকারণ্যে বসবাস কর।

লক্ষ্মণ সহাস্যে বললেন, আমি আমার অগ্রজের দাস, তুমি দাসী-ভার্যা হতে চাইছ কেন? তুমি রামেরই কনিষ্ঠা পত্নী হও। রাম এই কুরূপা অসতী করালদর্শনা বৃদ্ধা সীতাকে পরিত্যাগ করে তোমারই ভজনা করবেন।

ঋতব্রত আবার বলে ওঠে, বলেন কী? লক্ষ্মণ পরিহাসছলেও মাতৃস্বরূপিণী সীতাদেবীকে অসতী বললেন?

—তাই তো লিখছেন বাল্মীকি। শুধু তাই নয়, পরবর্তী শ্লোকটা হচ্ছে 'লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝতে না পেরে শূর্পনখা বললে'—লক্ষ্য করে দেখুন, বাল্মীকি পরিষ্কার করে বলে গেছেন, শূর্পনখা লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝতে পারেনি।

—হ্যাঁ, শূর্পনখা কী বললে?

—শূর্পনখা শ্রীরামচন্দ্রকে বললে—তুমি তোমার এই কুরূপা ভার্যাকে পরিত্যাগ করে কেন আমাকে আদর করছ না? দেখ আমি এখনই একে ভক্ষণ করছি? এই বলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে সীতার দিকে ধাবমান হল, যেন মহা উল্কা রোহিণী নক্ষত্রের দিকে যাচ্ছে। তখন রাম বললেন—সৌমিত্রী, এই ক্রুর প্রকৃতি অনার্যার সঙ্গে পরিহাস করা উচিত নয়, দেখ সীতা যেন মৃতপ্রায় হয়েছেন। তুমি এই প্রমত্তা অসতীকে বিরূপ করে দাও। লক্ষ্মণ তখনই খড়্গাঘাতে শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করলেন। রুধিরাক্ত শূর্পনখা আর্তনাদ করতে করতে ফিরে গেল।

তারাপ্রসন্ন বললেন, আপনাকেই সালিশ মানছি আমি, শূর্পনখার তরফ থেকে। রামচন্দ্র বললেন শূর্পনখা 'প্রমত্তা অসতী'। প্রমত্তা সে হতে পারে, কিন্তু সেই গান্ধর্ব বিবাহের যুগে সে অসতী হল কোন বিচারে? রামচন্দ্র বললেন—এই অনার্যার সঙ্গে পরিহাস করা উচিত নয়। অথচ সেই অনুচিত কাজ তাঁরা দুই ভাই নির্বিচারে করেছেন ইতিপূর্বে—আর সেই ভুলের মাশুল দিতে হল শূর্পনখাকে। রাম মিথ্যাভাষণ করে বললেন লক্ষ্মণ অকৃতদার, বললেন শূর্পনখাকে তিনি উপযুক্ত ভ্রাতৃজায়া বলে মনে করেন—এর ফলে অনূঢ়া শূর্পনখা উৎসাহিত হয়েছিল। এদিকে লক্ষ্মণও বললেন—সীতা 'বিরূপা-অসতী-করালদর্শনা-বৃদ্ধা'। স্বতঃই শূর্পনখা মনে করলে, এই অসতী মেয়েটি দুই ভাইয়ের পথের কাঁটা। অনার্য-রীতিতে সে রামলক্ষ্মণকে কণ্টকমুক্ত করতে উদ্যত হল। আপনিই বলুন, শূর্পনখার অন্যায়টা কোথায়?

আর্বিট্রেসান অ্যাক্ট যাই বলুক, ঋতব্রতকে স্বীকার করতে হল শূর্পনখার অন্যায় সে দেখতে পাচ্ছে না।

—আমার ভয় হয় ইঞ্জিনিয়ার-সাহেব, আমরা এই সরল আদিবাসীদের সঙ্গে যেন আর্য-রসিকতার বাড়াবাড়ি না করে বসি! আমরা যে সভ্যতার টর্চবাতি সঙ্গে করে এনেছি এতে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ওরা আমাদের তুলনায় অসভ্য কি না সেটাও ভেবে দেখার অপেক্ষা রাখে।

এ কথা ঋতব্রতেরও মনে হয়েছে। ঐ আদিবাসীদের দেখে ওর বারে বারে মনে পড়ে যায় টলস্টয়ের একটি বিখ্যাত ছোট গল্প :

একদল খ্রীস্টান পাদরি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। বহুদূর গিয়ে একটা ছোট্ট দ্বীপ তাঁদের নজরে পড়ল। দূরবীন দিয়ে পাদরিসাহেব দেখতে পেলেন দ্বীপের উপর তিনটি উলঙ্গ বৃদ্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাদরি তাঁর সহকর্মীদের বললেন—হায়, এরা এখনও সভ্যতার বিন্দুমাত্র আলোক পায়নি, আদিম অসভ্য রয়ে গেছে। চল, ওদের কাছে আমরা প্রভু যীশুখৃস্টের বাণী প্রচার করে আসি।

জাহাজ থামানো হল। নৌকা করে ওঁরা সেই দ্বীপে গিয়ে নামলেন। তিনটি বৃদ্ধ তাঁদের মহাসমাদরে নামিয়ে নিল। তারা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। পাদরি তাদের ধর্মোপদেশ দিলেন—ওরা খুব উৎসাহ নিয়ে শুনল! মুশার প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বরের দশটি প্রত্যাদেশ ওরা মুখস্থ করল। অবশেষে এই মহান বাণী তাদের দ্বীপে পৌঁছে দেবার জন্য পাদরি সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাল তখন এঁরা জাহাজে ফিরে এলেন। জাহাজ ছাড়ল—ওরা তিন বৃদ্ধ যুক্তকরে দ্বীপে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে টেন কমান্ডমেন্টস্ আওড়াতে থাকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক জাহাজ চালাবার পর হঠাৎ পাদরিসাহেব 'ডেক্'-এ একটা হট্টগোল শুনে বেরিয়ে এলেন কেবিন থেকে। দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দ্বীপের দিকে চাইলেন। অদ্ভুত দৃশ্য। সেই তিনটি উলঙ্গ বৃদ্ধ সমুদ্রের উপর দিয়ে সোজা ছুটতে ছুটতে আসছে আর চিৎকার করে জাহাজ থামাতে বলছে। কী আশ্চর্য, ঢেউয়ের মাথায় লঘু চরণ ছুঁইয়ে ওরা লাফাতে লাফাতে আসছে জলের উপর দিয়ে! জাহাজ থামানো হল। ওরা ঢেউয়ের মাথা থেকে লাফ দিয়ে জাহাজে উঠল। পাদরি সাহেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল—প্রভু, আপনি যে মন্ত্রগুলি আমাদের এইমাত্র শিখিয়ে এলেন, আমরা তা সব ভুলে গেছি। আপনি আবার বলুন।

পাদরি বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমরা সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটে এলে কেমন করে? তোমরা আসলে কে?

ওরা বললে, ও কিছু নয়। আমরা শ'তিনেক বছর আগে এই দ্বীপে নির্জনে সাধন চর্চা করতে এসেছিলাম। তা সাধনমার্গের প্রথম যুগেই আমাদের স্থূলদেহ এত লঘু হয়ে যায় যে, জলের উপর হেঁটে বেড়াতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। সে যাক্, আপনি আপনার সেই অমূল্য উপদেশগুলি আবার বলুন—আপনার মত মহাসাধকের দেখা আবার কবে পাব কে জানে?

ঋতব্রত এই উলঙ্গ হিল-মুরিয়াদের দেখে আর টলস্টয় বর্ণিত সেই তিন বৃদ্ধের কথা ভাবে। ওরা আদিম অসভ্য বলে বাতিল করতে মন সরে না। আমাদের ঘড়ি-কলম-ট্রানসিস্টর রেডিও দেখে ওদের চোখ বড় বড় হয়ে যায় ; কিন্তু তাতে কী? হুডিনি অথবা গণপতির খেলা দেখে ব্রজেন শীল মহাশয়ের চোখ বিস্ফারিত হত কি না কে জানে? কৈলাস-মানসের পথে কি এমন সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া যাবে না যিনি অক্সিজেন-সিলিন্ডার দেখে অবাক হয়ে যাবেন? এরা সবাই যে ব্রজেন শীলের মত পণ্ডিত অথবা হিমালয়ের গুহাবাসী সন্ন্যাসীর মত প্রাজ্ঞ তা বলতে চায় না ঋতব্রত—কিন্তু দহিকুণ্ডার হাটের কাছে সেই অভিজ্ঞতাটাও ভুলতে পারে না।

একবার জিপে করে কাজ দেখতে যাচ্ছিল কোণ্ডাগাঁওয়ে থাকতে। একটা কাঠের সাঁকো মেরামত করছে কয়েকজন উদ্বাস্তু ছুতার। ঋতব্রত গাড়ি থামিয়ে কাজ তদারক করল। তারপর লক্ষ্য হল রাস্তার ধারে আমগাছে অসংখ্য আম ফলে আছে। সরকারী সড়কের ধারে আমগাছের ফলকরের মালিকানা নিয়ে ভারি একটা মজার কাহিনী আছে। কাহিনী নয়, সত্য ঘটনা। বাঙলাদেশে, শুধু বাঙলাদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে সরকারী রাস্তার ধারে যেসব ফলবান গাছ আছে তার মালিকানা সরকারি পূর্ত-

বিভাগের। বাৎসরিক ডাক হয়। সর্বোচ্চদরে ডেকে নেয় কোন নিকারী। সে-বছরের জন্য সেই ফলকরের মালিক। দণ্ডকারণ্যে কিন্তু ব্যবস্থাটা অন্যরকম। এখানে এ অধিকার সরকারের নেই। আদিবাসীরা এ আইন মানতে রাজি নয়। তাদের মতে গাছের ফল পথচারীর সম্পত্তি। অর্থাৎ যে পেড়ে খেতে চায় মালিকানা যখন তার। তুমি সরকারি কর্মচারী? খেতে চাও খাও, আমি বাধা দেব না। তবে আমি যখন খেতে চাইব, তুমিও বাধা দিতে আসবে না। গাছে ফল কি সরকার ফলিয়েছেন? গাছে ফল দিয়েছেন 'মাটি-মাল', অর্থাৎ দেবী ধরিত্রী। ওর উপর সকলের সমান অধিকার! সরকার আইনের মাথায় সঙ্গীন চড়িয়ে তেড়ে এলেন, ওরাও ওদের সরল-বুদ্ধির মাথায় বল্লমের ফলা চড়িয়ে বাধা দিতে এল। সে যুগে যাঁরা রাষ্ট্রশাসন করতেন তাঁরা নির্বোধ ছিলেন না—সেই ব্রিটিশ-বুরোক্রেসির বুড়ো ঝানুর দল সুতরাং আইনটা বদলে নিলেন। সরকারি সড়কে তাই ফলকরের ডাক হয় না দণ্ডকারণ্যে। ক্ষুধার উদ্রেকই হচ্ছে এ আরণ্যক আইনে মালিকানার ছাড়পত্র।

ঋতব্রত উদ্‌বাস্তু ছুতারটিকে বলেছিল কিছু আম পেড়ে রাখতে। ফেরার পথে পরদিন এসে সে নিয়ে যাবে। ফিরতে তার দেরি হয়ে গেল। দিন তিনেক পর সন্ধ্যার মুখে জায়গাটায় এসে দেখে উদ্‌বাস্তুদের কেউ নেই সে তল্লাটে। কাছেই কোথাও হাট হচ্ছে—পথচলতি অর্ধ উলঙ্গ আদিবাসীরা চলেছে হাট-ফেরত। মাটির হাঁড়ি, মুরগি, লাউ-কুমড়ো-আলু-বেগুন সওদা নিয়ে যাচ্ছে যে যার গাঁয়ে। সন্ধ্যার আগেই গাঁয়ে পৌঁছাতে হবে। ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। পথের ধারেই উদ্‌বাস্তু ছুতারদের তাঁবু। গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ভিজা ধুতি-গামছা শুখাতে দিয়েছে। বাইরে কাপড় মেলা আছে যখন, তখন নিশ্চয়ই এরা তাঁবুতে আছে। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। তাঁবুর দড়ি খোলাই আছে। ভিতরে জনমানব নেই। ঘরের ভিতর রয়েছে সেই উদ্‌বাস্তু কয়জনের যথাসম্পত্তি। রেদ্যাঁ-তুরপুন, বাটালি, রয়েছে স্যুটকেস-বিছানা-হারিকেন, ওপাশে চাল-ডাল-তেল-নুন। কৌতূহলবশত স্যুটকেশটায় হাত দিয়ে দেখে—তালা লাগানো নেই। ডালাটা খুলে দেখে জামা কাপড় রয়েছে তার ভিতর। একটা হাত-আয়না, চিরুনি, সস্তা ফাউন্টেন পেন, খানকয় পোস্টকার্ড—মায় একটা খামে খানকয়েক পাঁচটাকার নোট।

তাঁবুর কোনায় একটা সিমেন্টের বোরায় একছালা আম। বুঝতে অসুবিধা হয় না এটা তারই জন্য সংরক্ষিত। ছালাটা জিপে উঠিয়ে চলে এসেছিল ঋতব্রত।

দিন পনের পরে সেই পথেই যাবার সময় ছুতারদের কাজ করতে দেখে গাড়ি থামিয়ে প্রশ্ন করেছিল, আগের দিন কোথায় গিয়েছিলে তোমরা, কাকেও দেখলাম না।

বিনয়াবনত যুক্তকরে প্রণাম করে একজন বৃদ্ধ সূত্রধর বললে, দহিকুণ্ডার হাটে গেছিলাম স্যার। ফিরি আস্যে দেখলাম আপনি আম নে গেছেন।

—আমিই যে এসে নিয়ে গেছি তা কী করে বুঝলে?

—আর কে নিবে?

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঋতব্রত বললে—অমন সব খুলে রেখে চলে গিয়েছিলে তোমরা? যদি চুরি হয়ে যেত সব?

বৃদ্ধ জবাব না দিয়ে হাসল শুধু। জবাব দিল তার পাশ থেকে একটি তরুণ ছুতার। বলিষ্ঠগঠন সুদর্শন চেহারা তার, বছর পঁচিশেক বয়স। বড় দামী কথাটা বলেছিল সে, এরা এখনও বড্ড অসভ্য স্যার—এখনও চুরি করতি শিখে নাই।

ধমক দিয়ে বুড়োটা তাকে থামিয়ে দিয়েছিল, হতভাগা, এখনও কথা কইতি শিখলিনি সাহেবসুবোর সঙ্গে।

ঋতব্রত তরুণ ছুতারটিকেই পুনরায় প্রশ্ন করেছিল, তোমার নামটি কী?

জবাব দেয়নি সে। বাপের ধমক খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল একপাশে মাথা নিচু করে। বৃদ্ধই তার হয়ে জবাব দিয়েছিল। আমার বেটা, সতীশ।

—আর তোমার নাম?

—দ্বিজপদ কর্মকার আজ্ঞে।

বড় দামী রসিকতা করেছিল সতীশ কর্মকার। এই আদিবাসী লোকগুলো সত্যিই অত্যন্ত অসভ্য—পরের দ্রব্য 'না বলিয়া গ্রহণের' যে সরল প্রক্রিয়া তা পর্যন্ত শিখে উঠতে পারেনি আজও। মনে-মুখে এখনও ওরা এক। রসিকতা বোঝে না—ঘোর-প্যাঁচ-রাজনীতি বোঝে না। যা ভাবে তা অকপটে প্রকাশ করে ফেলে। এদের সরলতার জন্য পরিকল্পনার কোথায় যেন এক ওভারসিয়ারের চাকরি যেতে বসেছিল। মাস্টার-রোলে বারোজন লোক কাজ করে, ওভারসিয়ার হাজরির খাতায় লেখে বাইশ জনের নাম। বলাবাহুল্য বাকি দশজনের নামকরণ এবং তাদের পিতার নামকরণ সম্ভব হয়েছিল ওভারসিয়ারবাবুর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে, দৈনিক পনের টাকা উপরিলাভের আশায়। গোপন খবর পেয়ে যখন উপরওয়ালা তদন্তে এলেন রাতারাতি ওভারসিয়ারবাবু জনা-দশেক বাড়তি লোক জোগাড় করলেন। পাখিপড়া করে শেখালেন তোর নাম মুংরি, বাপ আয়েতু, তোর নাম চয়ন, বাপের নাম টুডু। তোরা সবাই এখানে মাসখানেক কাজ করছিস, বুঝলি? ওরা মাথা নেড়ে বললে 'হয়'।

তারপর তদন্তকারী অফিসার দু-একটা উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করতেই আয়েতু হয়ে গেল টুডুর বাপ, মুংরি আর চয়ন কে কার বাপ তা গুলিয়ে গেল!

এই মারিয়া-মুরিয়া-পরজা-গোণ্ডদের মধ্যে নতুন বসতি গড়ে তুলছে উদ্‌বাস্তুরা। কালে হয়তো ওরাও বদলে যাবে। চুরি করতে শিখবে, মিথ্যা কথা বলতে শিখবে, অর্থাৎ সভ্য হয়ে উঠবে আমাদের মতো। উঠবে কেন উঠছে ইতিমধ্যেই। জগদলপুরে এই সেদিন একজন আদিবাসীকে সেলুনে বসে দাড়ি কামাতে দেখেছে ঋতব্রত!

কিন্তু ভবিষ্যৎ চুলোয় যাক, আজ এখন এদের সঙ্গে উদ্‌বাস্তুদের সম্পর্কটার উপর কড়া নজর রাখা দরকার। প্রতিপদে আমাদের মনে রাখা উচিত ওদের আইন-কানুন সমাজ ব্যবস্থা আমাদের মতো নয়। ওদের বিচার করতে বসলে ওদের নিজস্ব 'ল-অফ-দি-ল্যান্ড' জেনে নিয়ে, মেনে নিয়ে করতে হবে। এই সেদিন একটা প্রাচীন রিপোর্টে পড়ছিল এক বিচারকের দিনপঞ্জি। চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত একটি খুনী আসামীকে বিচারক ফাঁসী না দিয়ে কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। সমালোচনা হয়েছিল এ নিয়ে বার-লাইব্রেরিতে। এমন নৃশংস খুনের কেসে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত আসামীকে নাকি ফাঁসিই দেওয়া উচিত ছিল বিচারকের। বিচারক তাঁর দিনলিপিতে লিখছেন—ব্রিটিশ আইন, যা নাকি আমরা

ভারতবর্ষে মেনে চলি তার মানদণ্ডে এ আসামীকে ফাঁসিকাঠেই ঝোলান উচিত। কিন্তু আমি আর একটি দিক না ভেবে পারিনি। ওদের আজন্ম বিশ্বাস—নতুন জমিতে প্রথম কর্ষণ করার আগে কুমারী ভূমিকে নররক্ত পান করাতে হয়, না হলে ধরিত্রীদেবী ক্ষুণ্ণ হন। ওদের প্যাটেল বা গাঁও-বুড়ো তাই শিখিয়েছে ওদের। এতে সে কোন পাপের ইঙ্গিত পায়নি। ওদের প্রচলিত নিয়ম ও মেনে চলেছিল মাত্র। তাই চরমদণ্ড ওকে আমি দিতে পারলাম না।

চল্লিশবছর আগেকার নরবলির একটা ঘটনা। এখনও নতুন জমিতে কর্ষণের আগে মারিয়া গোণ্ডরা বলি দেয়—তবে মুরগি, মানুষ নয়।

চল্লিশবছর আগে একজন ইংরেজ বিচারক যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছিলেন, সকলেই তা করে না। ওদের অদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থার কথা যাঁর কাছেই শুনেছে, লক্ষ্য করেছে তাঁরা সকলেই ঘৃণা-অনুকম্পা মিশ্রিত ভাষায় বলেছেন তা। আবুজমাড় পাহাড়ে থাকে যেসব হিল-মারিয়া তাদের মেয়েরা বুকে কোন কাপড় দেয় না, কটিদেশে জড়ানো থাকে একখণ্ড বস্ত্র। উন্মুক্তবক্ষা তরুণীর দল যখন দলবেঁধে হাটে আসে তখন এঁরা ছি-ছি করে ওঠেন—তবু আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে ভোলেন না ওদের দিকে। ওদের নির্লজ্জতা নিয়ে আলোচনা হয়; কিন্তু ওঁরা একবারও ভেবে দেখেন না নির্লজ্জ কে? যারা ওঁদের বাঁকা-চাউনির অর্থ বুঝতে না পেরে বন্যহরিণীর মতো তাকিয়ে থাকল তারা, না ওঁরা ? মুরিয়াদের ঘটুল একটা আলোচ্যবস্তু। অবিবাহিত তরুণ-তরুণী চেলিক-মেটিয়ারী ঘটুলগৃহে রাত্রিবাস করে—খানা-পিনা হয়, নাচ, গান-বাজনা হয়—এর চেয়ে নৈতিক অবনতি আর কী হতে পারে? কিন্তু কেউ তলিয়ে দেখে না ওদের ঘটুল-রীতির নিয়মাবলী কী কঠোর। সতীত্বের সংজ্ঞাটা ওদের কাছে ভিন্নরকমের... কিন্তু যে সংজ্ঞা ওরা মেনে নিয়েছে তার একচুল বিচ্যুতি হলে ওরা কী কঠোর শাস্তি দেয় তা জানা নেই এইসব সমালোচনাকারীর। নিজের নিজের আজন্ম-শিক্ষার মানদণ্ডে আমরা ওদের বিচার করি—আর ওদের অপরাধী করি—একবারও জানতে চাই না ওদের 'ল-অফ-দি-ল্যান্ড' কী বলে!

তারাপ্রসন্নও একদিন শুনিয়েছিলেন, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড থেকে বালিবধের উপাখ্যান। রাজা বালি ছিলেন শবর, এই দণ্ডকারণ্যেরই অধিবাসী শরাহত বালি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিল, কেন তুমি অতর্কিত আক্রমণে আমাকে বধ করলে? আমি পঞ্চনখ হলেও আমার মাংস অভক্ষ্য, আমার চর্ম-লোম অস্থি কিছুই তোমার কাজে লাগবে না। তাহলে কেন তুমি আমাকে বৃথা হত্যা করলে?

হতভাগা অনার্য অসভ্য বালি পোলিটিকাল-মার্ডার কাকে বলে জানত না।

রামচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন—

তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্বর্তসি ভার্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্মং সনাতনম্ ॥
অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ
রুমায়াং বর্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্মকৃৎ ॥

—কেন তোমাকে বধ করেছি তার কারণ শ্রবণ কর। তুমি সনাতন [illegible]

তোমার ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করেছে। তুমি পাপাচারী, মহাত্মা সুগ্রীবের পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূস্থানীয়া, কামবশে তুমি তাকে অধিকার করেছ!

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সনাতন ধর্ম বলতে কোন ধর্মকে বুঝিয়ে ছিলেন? সেই সনাতন ধর্ম কি অনার্য বালি কোনদিন গ্রহণ করেছিল যে তা ত্যাগ করার কথা উঠছে? এ কাহিনীতে রুমার কী ভূমিকা, সুগ্রীবের অনুপস্থিতিকালে সে বালির প্রতি কী আচরণ করেছিল তা কী যাচাই করে দেখেছিলেন তিনি? এ উক্তি করার সময় কি ত্রিকালজ্ঞ রামচন্দ্র জানতেন না যে, বালির বিধবা পত্নী তারাকে সুগ্রীব ভবিষ্যতে যখন বিবাহ করবে তখন কি সনাতন ধর্ম নতুন সুরে বলবে না—'তারা' পঞ্চকন্যার একজন!—যাঁকে স্মরণ করলে মহাপাপ স্খলন হয়! এ যেন 'গ্লিমসেস অফ দি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'তে লেখা জওয়াহরলালের বাণী "পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় ক্ষমতালাভের পর, গদি পাওয়ার পর, মানুষ তার সংগ্রামকালীন পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে যায়।"

'ল-অফ-দি-ল্যান্ড' অনুধাবন করেননি ন্যায়বিচারক শ্রীরামচন্দ্র। এই যে হাজার হাজার উদ্‌বাস্তু এসে বসছে আদিবাসী গ্রামের আশেপাশে এরাও রামচন্দ্রের মতো ভুল করবে না তো—ওদের আচরণের মূল্যায়নের সময়?

ভয় উদ্বাস্তুদের তরফেও নয়, আদিবাসীদের তরফেও নয়। দু'পক্ষই সরল, স্বাভাবিক। কিন্তু এ অরণ্যেও আছে স্বার্থান্বেষীর দল। অপপ্রচার শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। অঙ্কুরেই সে বিষ নষ্ট করে ফেলতে না পারলে আসামের ঘটনা আবার ঘটে যেতে পারে এখানে, দশ-বিশ বছর পরে।

দণ্ডকারণ্যের আদ্যন্তই শুধু অরণ্য নয়। এখানে গ্রাম আছে, ছোট বড় শহর আছে। এই বিশাল ভূখণ্ডে যে সরল বন্য মানুষগুলি আবহমানকাল ধরে বাস করে আসছে তাদের শোষণ করার লোকের অভাব হয়নি কোনদিন। যাঁরা এদের শোষণ করে এসেছেন হাজার বছর ধরে, তাঁরা সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত হতে বসেছেন। সমাজসেবীদের প্রচার কার্যে, জমিদারী প্রথার বিলোপ-সাধনে গণভোটের প্রবর্তনায়—নানা কারণে তাঁরা আজ নেপথ্যে সরে যেতে বসেছেন। ফলে এঁরা দণ্ডকারণ্য সংস্থার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেছেন—উদ্‌বাস্তুদের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদিবাসীদের প্ররোচিত করছেন। না হলে তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি হয় না। এঁরা প্রচার করছেন—দণ্ডকারণ্য সংস্থা আদিবাসীদের রোগে চিকিৎসা করে না, আদিবাসী গ্রামের উন্নয়নের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নেই—তাঁরা আদিবাসীদের চেয়ে উদ্‌বাস্তুদের বেশি আপন করে দেখেন।

পরিকল্পনার কঠোরতম সমালোচককেও স্বীকার করতে হবে—এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। আদিবাসী গ্রামের আশপাশ থেকে ম্যালেরিয়া আজ বিতাড়িত, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে আদিবাসীরা যথেষ্ট সুবিধা পাচ্ছে। আদিবাসী গ্রামে কূপখনন, রাস্তা তৈয়ারীর জন্যও ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে যত জমি হাসিল করা হচ্ছে তার বারো-আনা অংশ দেওয়া হচ্ছে উদ্‌বাস্তুদের আর বাকি চার-আনা অংশ দেওয়া হচ্ছে ভূমিহীন আদিম অধিবাসীদের। আদিবাসীদেরও পরিবারপিছু দেওয়া হচ্ছে একুশ বিঘে চাষের জমি আর বসতবাড়ির লাগাও প্রায় একবিঘা জমি। বাড়ি-তোলা, লাঙল-বলদ খরিদ করা, বীজধান প্রভৃতি কেনার জন্য পরিবারপিছু খরচ করা হচ্ছে তেরশ'

টাকা। অপপ্রচারে উন্মুখ স্বার্থান্বেষীর দল বলছেন—প্রজেক্ট-কর্তৃপক্ষ বন কেটে শেষ করে ফেলছেন, আদিবাসীদের সর্বনাশ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য, কেবল উদ্‌বাস্তুদের তোষণ করাই এঁদের কাজ, আদিবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি হলেও এঁদের কিছু করণীয় নেই। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা আদিবাসীদের বলছেন—'এই দেখ না তোদের জন্য বাড়ি-লাঙল-বলদ-বীজধান ইত্যাদি মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে মাত্র তেরশ, টাকা আর উদ্‌বাস্তুদের বাড়ির পিছনেই খরচ হচ্ছে আঠারশ' টাকা!

অথচ তাঁরা একবারও বলছেন না যে উদ্‌বাস্তুদের যা কিছু দেওয়া হচ্ছে তা ঋণ হিসাবেই দেওয়া হচ্ছে। সুদসমেত এ ঋণ শোধ দিতে হবে তাদের। এই ঋণ যতদিন না শোধ হবে ততদিন পর্যন্ত ঘর-বাড়ি-জমিজমা সমস্তই বাঁধা থাকবে সরকারের কাছে। অপরপক্ষে আদিবাসীদের সবকিছুই দেওয়া হচ্ছে দান হিসাবে। কিছুই শোধ করতে হবে না তাদের। এই গোড়ার কথাটার উল্লেখ করেন না ওঁরা কায়দা করে। অপপ্রচারের অস্ত্র হিসাবে ওঁরা মিথ্যা বলেন না, চরম মিথ্যা বলেন না—বলেন স্ট্যাটিস্‌টিক্স, পরিসংখ্যান—এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করেন দুটি সংখ্যা—তেরশ' আর আঠারশ'

কিছুদিন আগেই উমরকোট এলাকায় পত্তন করা হল 'বিন্ধ্যবাসিনী' গ্রাম। হাঁসিল-করা জমির অংশ নিয়ে প্রথম আদিবাসী গ্রাম। প্রায় হাজার দুই গোণ্ড আর ভাতরা আদিবাসী সমবেত হয়েছিল উদ্বোধন-উৎসবে। চেয়ারম্যান সুকুমার সেন স্বয়ং এসে গ্রামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতাতেই আভাস পাওয়া গেল গোপনে গোপনে কী প্রচণ্ড অপপ্রচার চলেছে কোন কোন এলাকায় প্রজেক্ট এবং উদ্‌বাস্তুদের বিরুদ্ধে। আদিবাসীদের তথাকথিত হিতৈষীরাও উপস্থিত ছিলেন মিটিংএ চেয়ারম্যান সেন-সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বললেন, আমি ভাবি, আমাদের কাজের অপপ্রচার যাঁরা করেন, সেই ভদ্রলোকদের আপনারা কি জিজ্ঞাসা করতে পারেন না—তাঁরা বা তাঁদের পূর্বপুরুষরা আপনাদের জন্য বিগত সহস্র বর্ষ ধরে কী করেছেন? ভোটযুদ্ধের বেশি দেরি নেই। আমি জানি—ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থে এঁরা আপনাদের দরদী বন্ধু সেজে আমাদের বিরুদ্ধে, আপনাদের উদ্‌বাস্তু ভাইদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অপপ্রচার করে যাবেন। নানা মিথ্যা রটিয়ে আপনাদের ভোটটি করায়ত্ত করে এঁরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবেন। এঁরা যখন সে কথা বলতে আসবেন তখন আপনারা কি তাঁদের একটা প্রশ্ন করতে পারেন না—বলি বাছা, তোমরা বাপপিতেমোর কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের জন্য কী করেছ?

কে-জানে সে প্রশ্ন করবার মত সাহস-শিক্ষা এবং মনোবল ওদের হবে কি না। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেবের বক্তৃতা থেকে এ কথা বোঝা গেল যে বিষবৃক্ষের রোপণের কাজ সারা হয়েছে। জলসেচের কাজও চলছে। সুতরাং কর্তৃপক্ষকেও এ বিষয়ে তৎপর হতে হবে। দণ্ডকারণ্যে যেন আসামের নাটক আবার না মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয় ও-পক্ষের তরফে।

কাজ হচ্ছে। কখন ধীরগতিতে, কখনও দ্রুত। গড়ে উঠছে গ্রাম—উদ্‌বাস্তুর, আদিবাসীর। দু-পক্ষই সর্বহারা। দু-পক্ষই শোষিত। রিক্লেমেশান য়ুনিট সাফা করছে

জঙ্গল। বড় বড় মহীরুহ বুলডোজারের আক্রমণে লুটাচ্ছে ধুলায়। তারপর শুরু হচ্ছে জমি বণ্টনের কাজ—গৃহনির্মাণের কাজ। স্বীকার করতে বাধ্য ঋতব্রত—যত দ্রুতহারে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কাজ হওয়া উচিত ছিল, তত দ্রুতহারে হচ্ছে না। তার অনেক কারণ। জায়গা দুর্গম, কিছু পাওয়া যায় না। একটা স্ক্রু কম পড়লে ছুটতে হয় একশ মাইল। একটা বাটালির দাঁত পড়ে গেলেও যেতে হয় অতদূরে। শুধু তাই নয়, মাথার উপরে চিফ ইঞ্জিনিয়ার নেই—দুঃখের কথা জানাবে কাকে? কর্মীদের জন্য গৃহনির্মাণের যে ব্যবস্থা ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ওয়ার্ক-সরকার, ওভারসিয়ার, ড্রাইভার, মেকানিক, ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, বিভিন্ন বিভাগের কেরানিকুল—যাদের চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হয় এ অরণ্যে তাদের জন্য গৃহ-নির্মাণ করা হবে না আর। তাঁবুতেই থাক তোমরা। প্রথম যুগে পরিকল্পনা বলেছিল, কর্মীদের জন্য পাকা বাড়ি হবে—হচ্ছিলও কাজ এখানে ওখানে। তারপর আদেশনামা এসেছে—বন্ধ কর এ অপব্যয়। মানুষ তুলনা করতে ভালবাসে। কেন্দ্রীয় শৈল-নগরীতে ফ্রিজেডিয়ার, ডানলপিলো আর নিয়নবাতির টিউব ক্রয় যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্যে চারটে পাকা দেওয়ালকে কি অপব্যয় বলে ধরা উচিত—এই রকম অদ্ভুত ওদের যুক্তি!

তবু মুখ বুজে ওরা কাজ করে যায়। প্রতিবাদ করে না। চাকরির বাজার বড় গরম। কিন্তু মনের গহনে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয় তাতে কাজে ক্ষতি হয়। তবু হয়তো কাজ হত—কিন্তু নানান অবস্থায় আশানুরূপ কাজ করা যাচ্ছে না। মনে মনে অস্বস্তি লেগেই থাকে। কর্তৃপক্ষ অনবরত মত বদলাচ্ছেন। সব কাজই টপ-প্রায়রিটি। অথচ কাজ মধ্যপথে পৌঁছবার পর হয়তো শোনা যায়—ওটার প্রয়োজন নেই! এ অরণ্যে কাজ করতে হলে অন্তত এক বছর পরে কোথায় কী কাজ হবে তা ছকে রাখার দরকার। কিন্তু দু-মাস পরের কাজের প্রোগ্রামও অগ্রিম জানার উপায় নেই। তাছাড়া কাজ করবার যে পদ্ধতি তাও কাজের অনুকূল নয়। রাস্তা বানাও, বাড়ি বানাও—টপ প্রায়রিটি কাজ সব—কিন্তু মালপত্র কিনবার অধিকার তোমার নেই—তার জন্য আছেন ক্রয়-বিভাগের ডিরেকটর। তিনি অ্যাহেড ইনডেন্ট চান—না হলে বাজার যাচাই করবার সময় হয় না। মাল যদিও বা কেনা হল তা পরিবহন করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব অন্য আর একটি বিভাগের—পরিবহন যাঁর এক্তিয়ারে। মায় ঠিকাদারের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার অধিকারও নেই ইঞ্জিনিয়ারদের—তাঁরা বিল করে পাঠিয়ে দেবেন কেন্দ্রীয় অর্থ উপদেষ্টার অফিসে। বিল-সংক্রান্ত তাঁদের যদি কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহলে বিল পেতে মাস ঘুরে যায়। ইতিমধ্যে মেহনতি মানুষেরা বিদ্রোহ করে বসে হয়তো ঠিকাদারের বিরুদ্ধে, টাকা না পেয়ে।

এত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও কিন্তু কাজ হচ্ছে। গড়ে উঠছে গ্রাম। হাঁসিল হচ্ছে অরণ্যভূমি। পুকুর কাটা হচ্ছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, কুয়ো কাটার কাজ চলছে এগিয়ে। মেডিক্যাল বিভাগের রিপোর্টও ভাল। বাঙলাদেশের উদবাস্তুদের চেয়ে দণ্ডকারণ্যে অসুখ-বিসুখ রীতিমতো কম। ম্যালেরিয়া ছিল এ অরণ্যে একটা ব্যাপক ব্যাধি; প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দিত কোন কোন অঞ্চলে। প্রজেক্টের ম্যালেরিয়া-নিবারণী বিভাগ তা নির্মূল করেছে বলা চলে। কেউ পরিসংখ্যান রাখেনি—রাখলেও

হয়তো দুর্জনেরা সেটা বিশ্বাস করত না; কিন্তু ঋতব্রতের দৃঢ় বিশ্বাস যদি উদ্‌বাস্তুদের ট্রেনে চড়বার আগে ওজন করা হত তাহলে আজ দেখা যেত এই দু-তিন বছরেই ওরা ওজনে বেশ বেড়েছে। ওজনে বাড়ুক, চাই না বাড়ুক, বেড়েছে মনে—আশায় উদ্দীপনায়। আলোর সন্ধান ওরা দেখতে পেয়েছে দণ্ডকারণ্যে এসে। কৃষিজীবী গ্রামগুলো তার সাক্ষী। সত্যিই ঐ গ্রামগুলোর দিকে তাকালে মনে তবু সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায়। একেবারে নিষ্ফলা হয়নি এতদিনের পরিশ্রম।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা এক নাগাড়ে কাজ করে চলেছে—অক্লান্ত। নিথর আরণ্যক স্তব্ধতার বুক দীর্ণ করে অহরহ হাতুড়ির শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। গত দশ-বারো বছর যাঁরা ভিক্ষার পাত্র হাতে অকর্মণ্য জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরাই আজ কাজ করে যাচ্ছেন অনলস কর্মব্যস্ততায়।

মানুষটির নাম কালিদাস বেপারী। বয়স ষাটের উপর তো হবেই। বাড়ি ছিল পাকিস্তানে মাদারীপুর মহকুমায়। ওঁকে নায়ক করে একটা সার্থক উপন্যাস লেখা যায়। ঘরে আছেন স্ত্রী আর একটি ছোট ছেলে। বড় ছেলে কয়টি বাপের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি—চলে গেছে মৃত্যুর ডাকে সংসারের মায়া কাটিয়ে। যমে নিল সন্তান—যমদূতে নিল ধানের জমি, মাথা গোঁজার বাস্তু। অথচ মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। আজও দেহের বাঁধ অটুট। আজ যদি তোমার গাঁয়ে সীতাহরণ যাত্রা কর—তাহলে সাজপোশাকের জোগাড় করতে হবে না—কালিদাস বেপারী ঈশ্বরদত্ত চেহারায় বশিষ্ঠমুনির পার্টটা অনায়াসে উৎরে দেবে। নিজের হাতে বাস্তু বাঁধছে। সারাদিন কাজ করছে আপন মনে, আর গুন গুন করে গাইছে গান—গান নয়, তাঁর নাম নিচ্ছে আর কি! খাটছে না হয় জোয়ান মরদের মতো, কিন্তু মেঘে মেঘে বেলা তো অনেক হল, পারে যাবার সময়ও যে ঘনিয়ে এল ওদিকে। এ বয়সে বানপ্রস্থ নেবার বিধান আছে শাস্ত্রে—বিশ্বাস না হয় শুধিয়ে এস গিয়ে তারাঠাকুরকে। তা বনেই এসেছে বেপারী—কিন্তু ভাগ্যবিপাকে তাঁর নাম নেবার অবসরই পাচ্ছে না। ছোট ছেলেটির মুখ চেয়ে বনে এসেও সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে সে। তাই বাঁশের বাতার ঠাস বুনানি দেওয়াল বাঁধতে বাঁধতে কালিদাস গুন্ গুন্ করে মায়ের নাম নেয় : মা আমায় ঘুরাবি কত?

ঋতব্রত অবাক হয়ে গিয়েছিল এই বৃদ্ধ-যুবকটির অনলস পরিশ্রম দেখে। ওর বারে বারে মনে হয়েছিল ঐ বৃদ্ধ মানুষটির কাছে তুমি-আমি অধোমর্ণ;—আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে যখন তুমি-আমি স্বাধীনতার আনন্দশঙ্খ বাজিয়েছি তখন বেয়াল্লিশ লক্ষ কালিদাস বেপারী নেপথ্যে তার মূল্য যুগিয়েছিল। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জনতার মতো রাত্রির অন্ধকারে ওরা গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে—যা কিছু আপন তা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে। আর তারই বিনিময়ে আমরা ওর কপালে 'আনসার্ভিসেবল' লেবেল এঁটে ওকে স্ট্যাক দিয়ে রেখেছিলাম বাতিল-মানুষের মালগুদামে—পি. এল. ক্যাম্পে। বাপের কথার দাম দিতে শ্রীরামচন্দ্রকে যতদিন বনবাস করতে হয়েছিল—পিতৃতুল্য দেশনেতাদের কথার দাম দিতে কালিদাস বেপারীকেও ঠিক ততদিনই আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল সেই নরকে। বছরের পর বছর ঐ নীল-শিরে-

ওঠা সাদা লোমে ভর্তি হাত দুটি পেতে ভিক্ষা নিতে হয়েছিল। ঋতব্রত ভুলতে পারে না আজও প্রায় দু লক্ষ কালিদাস বেপারী পচে মরছে পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পে! আজও তারা আনসার্ভিসেবল, ভিক্ষাজীবী!

আজও পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পগুলোতে যে দুই লক্ষ শরণার্থী রয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই কৃষিজীবী ছিলেন। অপরিসীম গ্লানিময় এঁদের জীবন আজ। জীবনে কষ্ট থাকে, দুঃখ থাকে, অভাব-অনটন থাকে—তার অভিজ্ঞতা এঁদের আছে; কিন্তু যেখানে ভবিষ্যত নেই, প্রতি পদক্ষেপে যেখানে অনিবার্য উঞ্ছবৃত্তি এঁদের কইমাছের মতো জিইয়ে রাখছে আমৃত্যু, সেখানে কেন তাঁরা পড়ে থাকবেন? কয়েদী আসামীর আছে একটা অনাগত মুক্তিদিবস, যুদ্ধবন্দীর আছে যুদ্ধ-বিরতির ঘোষণার প্রত্যাশা—কিন্তু এঁদের? এঁদের অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ নেই। নৈরাশ্যের জগদ্দল পাথর তাই এঁদের দেহ-মনকে অবিরাম পঙ্গু করে তুলছে। তার পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়ছে জাতির সামগ্রিক দেহে। যে কারণেই হোক, সরকার এতদিনে এ সত্য উপলব্ধি করেছেন—ওদের উপর নোটিস-জারি করা হয়েছে, নির্দিষ্ট দিনের ভিতর দণ্ডকারণ্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত না হলে ছয়মাসের ডোল একসঙ্গে নিয়ে ওদের ক্যাম্প ত্যাগ করে যেতে হবে। সবচেয়ে মজার কথা এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার দল তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানালেন। ক্যাম্প তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের সক্রিয় বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। তাঁরা অনশন ধর্মঘটের ব্যবস্থা করছেন, অ্যাসেম্ব্লি অভিযানের পরামর্শ দিচ্ছেন। অথচ তাঁদের যদি বলা যায়,—দয়া করে, দণ্ডকারণ্যে গিয়ে একবার নিজের চোখে দেখে আসবেন কী? অমনি তাঁরা বললেন—দেখার কী আছে? ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো ওদের দণ্ডকারণ্য পাঠানো চলে না। মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব তো আর নেই—এরা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক। এদের স্বাধীন ইচ্ছাই সবচেয়ে বড় কথা!

তা বটে! তা বটে! মহম্মদ তোগলকের হুকুমে দিল্লি থেকে কাতারে কাতারে হতভাগ্য মানুষকে যেতে হয়েছিল তোগলকাবাদে। কিন্তু মনার্কিকাল রাষ্ট্রের নির্দেশের দিন গত হয়েছে! এখন গণতন্ত্রের যুগ। জনগণের ইচ্ছা, মতামত না জেনে তাদের জোর করে স্থানান্তরিত করা যায় না! এ যুগে যখন দেখবে লোকে কাতারে কাতারে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে তখন বুঝবে তারা স্বেচ্ছায় যাচ্ছে—রাষ্ট্র তাদের জোর করে এখান থেকে ওখানে পাঠাচ্ছে না। দেখছ না, বেরুবাড়ির লোকগুলো চলে এল এ পারে স্বেচ্ছায়, এল আসাম থেকে হাজার হাজার মানুষ পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। এরাই যে পাকিস্তান থেকে প্রথমে ভারতবর্ষে এল তা কি আমরা জোর করে এনেছি? এরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে এসেছে—জোর-জবরদস্তি-জুলুম আমরা কোনদিন করিনি। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আমরা ওদের অনুরোধই করতে পারি, জুলুম করব না। স্বাধীন নাগরিকের ধ্বজাধারীরা দেখে নেবেন যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওদের স্থানান্তরিত না করা হয়!

ঋতব্রত কালিদাস বেপারীকে বলেছিল, আপনার কাজ করা দেখলে আজকের ছোকরারাও লজ্জা পাবে।

উত্তরে কালিদাস বললে, আইগ্যা কত্তা, বড় বড় পোলাগুলান মইরা গেল, দ্যাশ

গেল, জমি-জমা-পুকুর-গোয়াইল সব গেল গিয়া। তবু বাঁইচা যখন আছি তখন সংসারডা দাড় করাইতে অইব তো। নাইলে ঐ মহাজন ছাড়ব ক্যান?—উপরের দিকে আঙুল তুলে বুঝিয়ে দেয় মহাজন বলতে কোন অন্তরীক্ষবাসীর কথা সে বলতে চায়। তারপর মিষ্টি হেসে বলে, শরীলটা এক্কেরে ভাইঙ্গা গেছে গা কত্তা, দ্যাশেঘরে থাকতি খাইতাম খালি দুধ আর মাছ। এইহানে তো কিছু পাই না; তবে আম্মো ছাড়ি না, বোঝলেন। রোজ সন্ধ্যার পর নালায় যাই জাল লইয়া। দুই চারিটা মাছ যা পাই, আইনা দেই বুড়িরে। বুড়ি রান্ধে যান অমর্ত, বোঝলেন না—ঐ মাছের ঝোলটুকুই চিত্ত ঠাণ্ডা রাখে!

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড উদ্‌বাস্তু আগমন একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। গতবছর কঠোর সমালোচনা করা হত দৈনিকে-সাপ্তাহিকে, এই পরিকল্পনার গলদ দেখিয়ে। তবু তখন ঐসব কালিদাস বেপারীরা এসেছে, প্রতি মাসেই দুশো-একশ পরিবার। এক বছরে প্রায় দু হাজার পরিবার এসেছিল। তখন শোনা যেত উদ্‌বাস্তু না আসার দুটি কারণ—এক নম্বর দণ্ডকারণ্যে পানীয় জলের অভাব। আর দু-নম্বর, এখানে ওদের ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্পে থাকতে দেওয়া হত, রাস্তায় কাজ করানো হত। এখন তো এ দুটি অভিযোগের একটিও বর্তমান নেই। প্রতি গাঁয়ে পুকুর হচ্ছে, নলকূপ তৈয়ারী শেষ না হলে ওদের গ্রামে আনা হয় না। যত লোক ক্যাম্পে ছিল সব তা সত্ত্বেও স্থানান্তরিত হয়েছে ক্যাম্প থেকে গ্রামে। এটা কম সাফল্যের কথা নয়। তাহলে নতুন উদ্‌বাস্তু দল আসছে না কেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি অনেকগুলি ক্যাম্পে নোটিস জারি করেছেন—হয় ছয়মাসের ক্যাশ ডোল নিয়ে ক্যাম্প ত্যাগ কর, নয় চল দন্ডকারণ্যে। পি. এল. ক্যাম্পে আর রাখা হবে না। হয় নগদ টাকা নিয়ে তোমরা নিজের নিজের ব্যবস্থা কর—অথবা আমরা সুযোগ দিচ্ছি তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা কর। আমরা জমি দেব, বাড়ি দেব, লাঙল-বলদ, বীজধান দেব—দৈব-দুর্বিপাকে প্রথম বছর ভাল ফসল না হলে ডোল দেব। এস তোমরা!

ওদের অধিকাংশই দণ্ডকারণ্যে আসেনি। অনেক পরিবার ছয়মাসের ডোল নিয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করেছিল। কে ওদের এ পরামর্শ দিল—এ অরণ্যে বসে ঋতব্রতের জানার কথা নয়; কিন্তু কার্যত দেখা গেল ছয়মাসের ডোল একলপ্তে পাওয়ার দিকেই ওদের ঝোঁকটা বেশি। ছয়মাস আগে যারা চলে গিয়েছিল তারা আবার গুটিগুটি ফিরে আসছে। আজ নাকি তাদের অনেকে আসতে চায় এ অরণ্যে; কিন্তু এখন তো আর তাদের নেওয়া যায় না।

নতুন উদ্‌বাস্তু কেন আসছে না জানতে কৌতূহল হয়েছিল। সংবাদ নিয়ে যা জেনেছে তাতে স্তম্ভিত হতে হয়েছে ঋতব্রতকে।

এমন একদল লোক আছেন পশ্চিমবঙ্গে, যাঁরা চান না ওরা ক্যাম্প ছেড়ে এ অরণ্যে এসে শুরু করুক নতুন জীবন। ক্যাম্প উঠে গেলে অনেক লোক নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা ঐ ক্যাম্পের পরিচালনা-ব্যবস্থায় কাজ করে তারা আজও, এই দশ-বারো বছর পরেও, অস্থায়ী কর্মচারী। এক একটি ক্যাম্পে আছে পাঁচশ-হাজার দু'

হাজার সলিড ভোট। ওদের ভোটের দাম নাকি অল্প নয়। আগামী নির্বাচনের আগে ক্ষমতাশালী কেউ কেউ চান না ওরা ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়।

বিশ্বাস হয়নি প্রথমটায়। এমন অদ্ভুত কথা কি বিশ্বাস করা যায়? মানুষ কি এতদূর স্বার্থপর হতে পারে? তারপর একদিন গল্প শুনল এই পারানি-কোটের উদ্বাস্তু মানুষগুলির কাছে। পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থ কেন শুধু শুধু মিছে কথা বলবেন? রতন ঘোষ রাজনীতির কী বোঝে? সে কেন গাল-গল্প করবে ওর কাছে বানিয়ে বানিয়ে?

ওদের কাছে শুনেছিল, লক্ষ্মীপুর ক্যাম্প ছেড়ে এই মানুষগুলির প্রথম দণ্ডকারণ্যে আসার কাহিনী। বছর দেড়েক আগেকার কথা। তখন ওরা বর্ধমানের কাছে লক্ষ্মীপুর পি. এল. ক্যাম্পে থাকত। বছর-দশেক ছিল ওরা ঐ ক্যাম্পে, বাতিল-করা উদ্বাস্তু হিসাবে—সরকারের স্থায়ী পোষ্য হিসাবে।

লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পের স্কুলের প্লটে একদিন সন্ধ্যায় মস্ত মিটিং হল। কলকাতা থেকে পুনর্বাসন-বিভাগের বড়কর্তারা এলেন। ধুলোর ঝড় তুলে এল মোটরগাড়ির সারি। এল মাইক। ক্যাম্প কমান্ডান্ট মল্লিকসাহেব সমস্ত আয়োজন করলেন। গাড়ি থেকে অতিথিরা নামতেই যুক্তকরে আপ্যায়ন করে নিয়ে গেলেন প্যান্ডেলে। কলোনিবাসীদের খবর দেওয়াই ছিল। দলে দলে ওরা জমায়েত হল স্কুলের মাঠে। রতন, যগন্দ, ছিদাম, দ্বিজপদ, নবীন, নবা, তারাপ্রসন্ন, রসিকলাল ততদিনে তারাপ্রসন্নের পরিবারভুক্ত হয়ে গেছেন। মল্লিকসাহেব প্রথমে বক্তৃতা দিলেন। ওদের বললেন, বাঙলাদেশে আর চাষের উপযুক্ত জমি নেই। যাও বা পাওয়া যায়—তাতে ফলন হবে না। আউলিয়া মাঠে এরাই তো চেষ্টা করে দেখেছে—কিছুই ফসল ফলেনি। পরিশ্রমই সার। তাই ভারত সরকার ওদের জন্যে নতুন জমি হাঁসিল করার বন্দোবস্ত করেছেন। বাঙলাদেশে নয়—দণ্ডকারণ্যে। উদ্বাস্তুদের উদাত্ত আহ্বান জানালেন মল্লিকসাহেব—যদি বাঁচতে চাও, যদি মনুষ্যত্বের এতটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তোমরা দলে দলে চল দণ্ডকারণ্যে। এ ভিক্ষালব্ধ অন্নে, ডোলে, সাময়িক বাঁচা যায়—ওটা কোন সমাধান নয়। এবার ওদের নিজেদের পায়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। হয় দণ্ডকারণ্য যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, না হলে ছয়মাসের ডোল একসঙ্গে নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাও। মনে রেখ, ছয়মাসের ডোল যদি একসঙ্গে নিতেই মনস্থ কর, তাহলে তোমাদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব এখানেই শেষ!

এদের মধ্যে কে একজন বলে, দণ্ডকারণ্য জাগাডা কুথা? আপনে দেখছেন?

মল্লিকসাহেব বলেন, না, আমি নিজে দেখিনি—শুনেছি ভাল জায়গা। যাঁরা নিজে চোখে দেখেছেন তাঁরা তোমাদের সে কথা বললেন এবার।

এরপর কলকাতা থেকে আসা একজন উঠে বললেন—আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি দণ্ডকারণ্য। আট-দশ-দিন ছিলাম সেখানে। এখান থেকে পাঁচ-ছয় শ' মাইল দূরে। জমি বেশ সরেস মনে হল। বছরে পঞ্চাশ থেকে ষাট ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, মানে বাঙলাদেশের মতোই। জল-হাওয়া স্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়া নাই। পানীয় জলের অবশ্য অভাব আছে কোন কোন জায়গায়—তবে আমাদের বীরভূম-বাঁকুড়া-আসানসোলের

চেয়ে খারাপ অবস্থা নয়। বছরে যেখানে পঞ্চাশ-ষাট ইঞ্চি বৃষ্টি হয় সেখানে জলের অভাবে চাষের ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। জলটা নষ্ট না হতে দিলেই হল। আমরা সেচের নানা পরিকল্পনায় হাত দিয়েছি। জঙ্গল যখন আছে, তখন বাঘ-ভালুক নেই বলি কেমন করে—

শ্রীনাথ মালাকার টপ করে উঠে দাঁড়ায়—হাত দুটি জোড় করে বলে, আজ্ঞে দ্যাবতা, বাঘ-ভালুকরে ডরাই না, সিংহ নাই তো?

সাহেব বলেন, না না, সিংহ নেই সে জঙ্গলে।

—বাস্ বাস্, তবে আর ভয়ডা কী? লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পে আস্যে বুঝছি, যে-জঙ্গলে সিংহ আছে সিখানে মরণ নিশ্চিত!

চুপ, চুপ—ধমক দিয়ে ওঠেন মল্লিকসাহেব।

সাহেব রহস্যটা বুঝতে পারেন না। ওরা মুখ লুকিয়ে হাসে। সাহেবের পাশে বসেছিলেন স্থানীয় এম. এল. এ. এবং সমাজসেবী ত্রিদিবেশ সিংহ। মুখটা কালো হয়ে ওঠে তাঁর।

সাহেব দণ্ডকারণ্যের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিলেন। ওদের বুঝিয়ে দিলেন যারা মানুষের মতো বাঁচতে চায়, তাদের পক্ষে এই হচ্ছে শেষ সুযোগ। মিটিং ভেঙে গেলে ওরা নিজেদের মধ্যে জটলা করে। গ্রামে থাকতে যাকে বলত ষোল-আনার-ডাক—এখানে এসে শুনেছে তাকে বলে জেনারেল মিটিং—তা সেই মিটিং বসল ওদের। নানাজনে নানা প্রশ্ন তোলে। নানান দিক আলোচনা করা হল। ছয় মাসের ডোল অথবা দণ্ডাকারণ্যের আহ্বান। আহা এ সময়ে যদি দিবা-পণ্ডিত থাকত তাহলে পরামর্শ দেবার একটা লোক পেত ওরা—নিঃস্বার্থ পরামর্শ। তবু তারাঠাকুর আছেন—পণ্ডিত মানুষ—তাঁর পরামর্শই শুনল ওরা মন দিয়ে। তিনি দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার পরামর্শই দিলেন ওদের। ষোল-আনার ডাকে সাব্যস্ত হল—ওরা যাবে। স্থির হল, পরদিন সকালে দলবেঁধে ওরা মল্লিকসাহেবের কাছে যাবে—জানাবে ওদের সিদ্ধান্ত। ছয় মাসের ডোল ওরা নেবে না—তার বদলে নেবে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের সুযোগ।

মিটিং থেকে ফিরতে অনেক রাত হল। গুলাব বসেছিল জেগে, বললে—কী ঠিক হল শেষমেশ?

রতন গম্ভীর হয়ে বলল, যাব, দণ্ডকারণ্যে যাবনে সবাই।

—সবাই?

—তাই তো বুলছে সব।

হঠাৎ বাইরে থেকে চাপা গলায় কে যেন ডাকে, রতন!

চমকে উঠল রত্নাকর। এত রাতে-আবার কে এল? তাছাড়া এমন চাপা গলায় ডাকে কে তাকে? মনে পড়ে গেল অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। যখন সে দল নিয়ে আঁধার রাতে 'কাজে' বের হত। তখন দরকার হলে ওর দলের লোকে এসে এমনিভাবে চাপা গলায় ডাকত।

—রতন জেগে আছ নাকি হে?

—কে?—দরজা খুলে দিয়ে রীতিমতো অবাক হয়ে যায় রত্নাকর। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় করে সারা গা আলোয়ানে ঢেকে যে লোকটা তাকে মধ্যরাত্রে ডাকতে এসেছে সে বীরু গুপ্ত!

—আপনে? এত রেতে?

—কথা আছে, চল ভিতরে গিয়ে বসি।

গুলাব ঘোমটা টেনে উঠে যায় পিছনের বারান্দায়, ফুলটুসীর কাছে। বীরু গুপ্ত বসে পড়ে মাদুরের উপরেই। বীরু গুপ্ত হচ্ছে ক্যাম্প কমান্ডান্ট মল্লিক-সাহেবের ডানহাত। এর হাত থেকেই নিতে হয় সরকারি অনুগ্রহ। অফিসে বীরু গুপ্ত যে ডেকে না পাঠিয়ে নিজে কোনও উদ্‌বাস্তুর বাড়ি আসবে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে—এ যেন ভাবতেই পারা যায় না।

পকেট থেকে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বার করে বীরু। নিজে একটা ধরায় আর একটা রতনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, নে ধর্! কী ঠিক করলি তোরা?

বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও কাটেনি; রতন বলে, স্থির করনের ফির আছেডা কী? যাব, তাড়ায়ে যখন দিতেছ্যান তয় জঙ্গলেই যাবনে।

—ছয় মাসের ডোল একসঙ্গে দিচ্ছে, তা নিবি না? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবি?

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় রতনের কাছে। হো-হো করে হেসে ওঠে সে।

—এই আস্তে!—ধমক দেয় বীরু গুপ্ত!

ওর ধমকে সংযত হয় না রতন। সে বুঝে ফেলেছে কেন এই মধ্যরাত্রে বীরু গুপ্ত এসেছে ওর দরবারে। মাথাপিছু প্রত্যেককে যদি ছয়মাসের ডোল বিতরণ করা হয় তাহলে লক্ষটাকার নোট গুনবার সুযোগ পাবে বীরু গুপ্ত! তাকে চিনতে তো আর বাকি নেই! তাই এবার সুর বদলে বলে, না, আমরা দণ্ডকবনেই যাবনে। সব্বাই!

চোখ দুটো ছোট করে বীরু বলে, এখানে পায়ের উপর পা তুলে বসে বসে খাচ্ছিলি তা বুঝি সহ্য হল না? অ্যাঁ? বাঘের চুমু খাবার সাধ হয়েছে?

রতনও উত্তরে শুনিয়ে দেয়, আজ্ঞে হ! সিংহের চুমু খায়ে অরুচি ধরিছে—মাঝরাতে সাপের চুমু খাওয়ারও আর সখ নাই। টুক্ বাঘের চুমু চাখ্যে দেখি!

বীরু গম্ভীর হয়ে বলে, রতন! মাঝরাত্রে তোমার সঙ্গে রসিকতা করতে আসিনি আমি। কাজের কথাই বলতে এসেছি—তোমার মঙ্গলের জন্যেই এসেছি।

রতনও এবার গম্ভীর হয়ে বলে, তাহলে ইটা কী কন? যাতে রাজি না হলি ছ'মাসের ডুল দে ক্যাম্প থিকে তো তাড়ায়ে দিবেন। সে টাকা ফুরালি কই যাব?

চাপা গলায় ধমক দিয়ে ওঠে বীরু, দূর গাধা! তোরা ক্যাম্প ছাড়তে রাজি না হলে কে তাড়ায় তোদের? দেশ স্বাধীন হয়েছে না? তোরা ধর্মঘট করবি, অনশন করবি—দল বেঁধে অ্যাসেম্ব্লি অভিযান করবি। আমরা তো পিছনে আছি।

রতন হেসে বলে, ও! আপনেরা তো কত আছেন আমাদের পিছনি। মল্লিকসাহেব পুলিশ ডাকি ক্যাম্প ভাঙ্গে দেবি নে?

বীরু স্বরটা একেবারে নামিয়ে বলে, সাধে কি আর চাষা বলে তোদের? কিছুই বুঝিস না তোরা—শুধু শুধু হাঁকপাক করিস—শোন বলি।

সবকথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় রতন! বীরু গুপ্ত বলে কী? ঠিক বলছে তো? অবিশ্বাসই বা করে কী করে? বীরু গুপ্ত হচ্ছে মল্লিকসাহেবের ডান হাত। সব কথা অবশ্য ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারে না। এর মধ্যে ভোটের কথা আসে কোত্থেকে? মোটকথা এটুকু বুঝতে পারে যে, মল্লিকসাহেব খুশি হবেন—যদি ওরা দণ্ডকারণ্যে যাব না বলে ঘুরে দাঁড়ায়। খুশি হবেন ত্রিদিবেশ সিংহ-মশাই। ডোল বন্ধ করে দেওয়ার পর ওরা যদি ধর্মঘট করে, তবে সিংহমশাই এই মেষশাবকদের সমর্থন করবেন। গোপন সমর্থন থাকবে ক্যাম্প কমান্ডান্ট মল্লিকসাহেবেরও।

রতন গোয়ালার সব গুলিয়ে যায়, বলে, কিন্তুক ওরা দুজনা মিটিঙে আমাদের দণ্ডকারণ্য যাতেই তো বুললে?

—কী গাধারে তুই! প্রকাশ্যে তা না বলে পারে? কলকাতা থেকে বড়সাহেবরা এসেছিলেন, তাঁদের সামনে আর কী বলতে পারতেন আমাদের সাহেব? চাকরিটা তো বাঁচাতে হবে?

—কিন্তুক আমরা হেথায় থাকলি ওঁর কী লাভ?

—লাভ নয়? তোরা আছিস বলেই অকল্যান্ড অফিসটা টিকে আছে। তোরা সবাই যদি দণ্ডকারণ্যে চলে যাস তাহলে এ ক্যাম্প উঠে যাবে। আমাদের সবার চাকরিও সঙ্গে সঙ্গে খতম। মল্লিকসাহেব, জানিস তো, আগে ছিল ফুড-ডিপার্টমেন্টে। সেটা উঠে গেলে কোনক্রমে চাকরি জুটিয়েছে রিলিফ রিহ্যাবিলিটেশনে। এবার আবার চাকরি গেলে যাবে কোন চুলোয়? আমরা এতদিন তোদের দেখাশোনা করলাম—তোদের সুখে-দুঃখে পাশে পাশে থাকলাম, আর তোরা এভাবে আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবি?

—মল্লিক-সাহেবের সাথে কথা বলিছিলে?

—দূর গাধা। তিনিই তো পাঠিয়েছেন আমাকে তোর কাছে। বললেন, রতন ঘোষকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে এস বীরু—সেই ভেস্তে দেবে যাওয়ার প্রোগ্রাম।

রতন মাথা চুলকায়। এটুকু সে বোঝে, যে এই মুহূর্তে সে সকলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছে—তার একার নয়। তাই সব সম্ভাবনাই ভেবে দেখা উচিত তার; বললে—কিন্তু মল্লিকসাহেবের উপরেও সাহেব আছে; তারা তো তাড়াবে।

বীরু বলে, কথাটা তুই বুঝছিস না। আরে এ ব্যাপারে সবাই আমরা সমান। তোরা চলে গেলে যেমন আমার চাকরি যাবে, তেমনি যাবে মল্লিকের—তেমনি যাবে তাঁর উপরআলার। গোটা বিভাগটাই তো উঠে যাবে। উদ্‌বাস্তু যদি না থাকে বাঙলাদেশে, তাহলে কি উদ্‌বাস্তু বিভাগ থাকবে নাকি? একেবারে উপর-মহলে কিছু পার্মানেন্ট-সার্ভিসের লোককে হয়তো এ বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে নিয়ে যাওয়া হবে—কিন্তু তাঁরাও যেসব ভাইপো-ভাইঝি-ভাগ্নেকে চাকরি দিয়ে ঢুকিয়েছেন তাদের কী হবে? আমরা সবাই চাই যাতে তোদের দেশত্যাগী না হতে হয়। এই বাঙলাদেশেই পুনর্বসতি দিতে হবে তোদের! তোরা শুধু বল—বাঙলার বাইরে যাব না আমরা। তোরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। ভয়টা কিসের?

রতন বললে—কিন্তুক বাঙলাদ্যাশে নাকি চাষের জমি নাই।

—না থাকে তোদের বছরের পর বছর ডোল দিক! তোদের ভয় কী?

—কিন্তুক সিংহমশায়ের স্বার্থডা কী? তাঁর তো চাকরি বাঁচানোর কথা উঠে না?

—বুঝলি না? ক্যাম্পের এতগুলো সলিড ভোট কে ছাড়তে চায়? তোরাই তো ভোট দিয়ে ওঁকে বিধানসভায় পাঠিয়েছিস। ইলেকশান এসে গেল বলে—এখন কি তোদের ছাড়তে উনি রাজি হন?

বেচারি রতন আবার মাথা চুলকায়। লাঠি-হাতে শির-তমেচার লড়াইটাই শিখেছিল যৌবনে—ভোট যুদ্ধের আইন-কানুন কায়দা-কসরত শেখেনি। বেচারি জানে না নিরন্ন ডোল-জীবী উদ্‌বাস্তুদের ভোটের দাম অল্প। সিংহমশাই সেই সস্তা-দামের ভোটধারীদের বেহাত হতে দেবেন না। ভোটার-লিস্ট যখন তৈরি হয় তখন তিনি এত যত্ন করে যে প্রত্যেকটি নাম নিখুঁতভাবে লিখিয়েছেন তার ফলশ্রুতি হওয়ার আগেই কি উনি ছেড়ে দিতে পারেন এই অর্ধ-উলঙ্গ মানুষগুলোকে? থাক না ওরা আরও দু-দশ বছর পি. এল. ক্যাম্পেই। বীরু গুপ্ত শেষ দিকে প্রায় কানে কানে বলে—দণ্ডকারণ্য যাওয়া যদি ভেস্তে দিতে পারিস তাহলে সিংহমশাই তোকে কিছু নগদ বিদায়ও দেবেন। বুঝলি? তোকে বলতে বলেছেন আমাকে।

সারারাত ঘুম হল না রতনের। আকাশ-পাতাল কত কী ভাবে! গুলাব বলে, অমন উশখুস করতিছ কেনে? ঘুম আসে না?

রতন জবাব দেয় না। তার মনে এখন যে জাতীয় চিন্তা জাগছে তা যে বিশ্বাস করে গুলাবকেও বলা চলে না! বুঝেছে, মল্লিকসাহেব আর বীরু গুপ্তের পরিকল্পনা সে বুঝতে পেরেছে। এখন যদি সে ঘুরে দাঁড়ায়—দণ্ডকারণ্য যাব না বলে, তাহলে মানুষগুলোর যাই হোক ওর নিজের একটা হিল্লে হয়ে যাবে! লোভ! লেলিহান শিখায় একটা নিদারুণ লোভ জেগেছে রতন ঘোষের সেই কবাট-বুকে।

না! কবাটবক্ষের অধিকারী আর সে নয়। কমলপুরের সেই দুর্দান্ত লাঠিয়াল, বেপোরোয়া রতন ঘোষ বেঁচে নেই, তা আর পেশল বুকটা থাকবে কী করে? এ কয় বছর ক্রমান্বয়ে ট্রানজিট ক্যাম্প, পি. এল. ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে জীবনের অবক্ষয়ী রূপটা সে দেখেছে। দারিদ্র্য যে না চেনা ছিল তা নয়, কিন্তু ভিক্ষান্নজীবীর এই নীরন্ধ্র হাহাকারে ভরা জীবনটাকে যে নতুন করে চিনেছে। চোখের উপরেই দেখেছে—উপরি রোজগারে দোষ ধরে না কেউ, ঘুষ খাওয়াটা অপরাধ নয়, যতক্ষণ না ধরা পড়ছ। তাই সারারাত ছটফট করল রতন ঘোষ। সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

ভোর রাতে রতন উঠে গেল তারাপ্রসন্ন ঠাকুরের কাছে। সব কথা খুলে বলল তাঁকে। তারাপ্রসন্ন সব শুনে বললেন, কী, জানতে এসেছিস আমার কাছে?

—আপনি কয়ে দ্যান আমি করবডা কী? রুখে দাঁড়াব? দণ্ডকবনে যাব না বলি?

—তোর মন কী বলে?

—বুঝতে পারতেছি না, ঠাকুর।

তারাঠাকুর বললেন, বুঝতে ঠিকই পারছিস। তুই লোভে পড়েছিস রতন! এতগুলো মানুষের ভরাডুবি করে, এদের মাথায় পা দিয়ে তুই বাঁচবি কি বাঁচবি না তা আমি কেমন করে বলব? সিদ্ধান্ত তোকেই নিতে হবে!

ধরা পড়ে গিয়ে খেপে ওঠে রতন। বলে, কুনটা ভালো তাই শুধু ক'ন! দণ্ডক বনে যাব, না ছয়মাসের ডোল নিব।

তারাঠাকুর বললেন, এর জবাব তুই জানিস! ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ! আসলে তুই জানতে এসেছিস অন্য জিনিস। ঘুষ নিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে ভীমা ঘোষের ভাইপোকে খুন করবি, না—

কথাটা তাঁর শেষ হয়নি। রতন রাগ করে ফিরে এসেছিল নিজের ব্যারাকে।

পরদিন সকালে ওরা সদলবলে এল ক্যাম্প অফিসে। ওরা সবাই দণ্ডকবনে যাবে বলে নাম লেখাতে এসেছে। মুখটা কালো হয়ে ওঠে মল্লিকসাহেবের। বীরু গুপ্ত রতনকে আড়ালে ডাকে, বলে, রতন, এদিকে একবার শুনে যাও তো।

রতন রুখে ওঠে, উখানে কেনে? যা বলবার সবার সামনে বলেন কেনে!

মল্লিকসাহেবের সঙ্গে বীরু গুপ্তের চোখে চোখে কথা হয়ে যায়। বীরু গুপ্ত সামলে নেয় নিজেকে। মল্লিকসাহেব চেষ্টা করে হাসেন, অভিনন্দন জানান ওদের।

কদিন পরেই ওদের নিয়ে আসা হল হাওড়া স্টেশনে। স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথম যাত্রীদল চলেছে নবজীবনের আহ্বানে—দণ্ডকারণ্যে! শুধু লক্ষ্মীপুর নয়, আরও অনেক ক্যাম্প থেকে এসেছে অনেক মানুষ। অজানা অচেনা মানুষ। বহু ঘাটে জল খেয়ে ওরা হতাশ হয়ে পড়েছিল। পড়েছিল বাঙলাদেশের অসংখ্য ছোট-বড় পি. এল. ক্যাম্পে, পথে ফুটপাতে। অনেকে ইতিপূর্বে ঘুরেও নানান দেশ—বিহার-উড়িষ্যা-আসাম। কাওয়ালি গানের ধুয়োর মতো ফিরে ফিরে এসেছে সেই একই জায়গায়—হাওড়া স্টেশন, শেয়ালদ', স্ট্র্যান্ড রোড। আজ আবার চলেছে নূতন জীবনের সন্ধানে।

কমলপুর গাঁয়ের ভূতপূর্ব-বাসিন্দা অর্থাৎ লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পের উদ্‌বাস্তুরাও এল ঐ দলে। বাঙলাদেশের অযুত উদ্‌বাস্তুদলের একটা অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সমবেত হয়েছে হাওড়া স্টেশনের তের নম্বর প্ল্যাটফর্মে। সরকারি প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখবার মতো শ-দুই রবার্টব্রুস। স্টেশনে সে কী হৈ-চৈ! বড়কর্তারা অনেকেই এসেছেন। ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হল উদ্‌বাস্তু যাত্রীদের। ফটো নিল চিরিক্-চিরিক্, হাজার বাতির ঝিলিক হেনে। ওরা যেন ধর্মযুদ্ধের প্রথম সৈনিক দল।

স্পেশাল ট্রেন থামল রায়পুরে। সেখান থেকে মানা শিবির মাইল আষ্টেক। মানা রিসেপশান সেন্টারে থাকল দুচার দশদিন। ওরা বলল, জুমি কই গো? চারধারেই তো উড়ো-জাহাজের কাঁকর-মাটির ফাঁকা মাঠ দ্যাখতাছি।

কর্মকর্তারা বললেন, আরে ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সবুরে মেওয়া ফলে। এটা দণ্ডকারণ্য নয়। দুদিন পরেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাদের।

—সবুর তো আজ দশ বছর ধরিই করতাছি দ্যাবতা—বলে শ্রীনাথ।

আবার আসে আদশনামা। আবার প্যাঁটরা-পুঁটলি বেঁধে নিয়ে ওঠে ট্রাকে। রাঙামাটির ধুলোর ঝড় পিছনে ফেলে ছুটে চলে ঘেরাটোপ ট্রাক। দুধারে শাল, আমলকি, হরিতকি আর মহুয়ার বন। আঁকা-বাঁকা বিসর্পিল পথ। চলেইছে, চলেইছে। মাঝে একবার থামলো চামরায়। চামরা ফিডিং সেন্টার। বেলা দ্বিপ্রহরে এখানে আসে যাত্রী বোঝাই

ট্রাক। এখানে ওদের জন্যে রান্না করে রাখা হয়েছে আগে থেকে। ভাত ডাল ট্যাঁড়সের চচ্চড়ি—আলুবেগুনের ঝোল। ক্ষুধার মুখে অমৃত। গোগ্রাসে গিলতে থাকে বুভুক্ষু মানুষগুলো। স্নান করে নিতে পারলে হত। কালিদাস ব্যাপারী ক্যাম্প-কমান্ডেন্টকে শুধায়—ইধার নদী, অর্থাৎ কিনা দরিয়া থাকতে পারতা? ইসে হইছে, মানে টুকু ছান করতি পারলি তবিয়ৎ কিঞ্চিৎ সুস্থির লাগতে পারতা! বুঝলা না?

হেসে চামরা ক্যাম্পের কমান্ডান্ট বলেন, আমিও বাঙালি ভাই—কিন্তু নদী এখানে কোথায় পাবে? ঐ কুয়োর জলেই মুখ হাত ধুয়ে নাও।

একগাল হাসে ব্যাপারী, হ্যাই দ্যাহেন! আমি ভাবতেছি আপনেও—

চামরায় মধ্যাহ্ন আহারের পর আবার যাত্রা। পথ, পথ আর পথ! ফুরায় না যেন। নবাপালের আট বছরের নাতি তার মা মতিকে শুধায়, দণ্ডকবন আর কদ্দুর মা?

ট্রাক এসে থামে মাকরেল ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্পে। সারি সারি ছোলদারী তাঁবু। আমবাগানের ঘন ছায়ার তলায়। মাকরেল ওয়ার্ক-সাইট-ক্যাম্প। পলাশীপ্রান্তরে রণক্লান্ত নবাবী শিবির যেন! প্রত্যেকটি তাঁবুর পিছনে দরমায় ছাওয়া রান্নাঘর। গোটা দুই নলকূপ, একটা কুয়ো। সামনের দিকে একসার টিনের চালা—পথের উপর। মুদিখানা, ওভারসিয়ারবাবুর ডেরা, প্রাইমারি স্কুলঘর, কম্পাউন্ডারবাবুর আস্তানা আর সরকারি মুদিখানা। চাল-ডাল-কেরোসিন, মোমবাতি, দেশলাই, মসলাপাতি সব পাবে ওখানে। তা বলে হারিকেন পাবে না, বালতি পাবে না—সানলাইট সাবান পাবে, কাঁচি সিগ্রেট পাবে, বিড়ি পাবে। বুড়ো রতন ঘোষ এদিক ওদিক চেয়ে দেখে। পিচুটি-ভরা চোখ দুটোয় ছানি পড়েছে। হাতটা কপালের উপর রেখে ইতিউতি চায়। হাঁসিল জমি—কই নজরে তো পড়ে না। আম, হরতুকি আর শালের জঙ্গল শুধু। বলে, এই মনুয়া, চাষের জুমি নজরে পড়ে?

রতন ঘোষের বিশ-বছুর বয়সের জোয়ান নাতির মেজাজটাও খিঁচড়ে ছিল, বললে, মেলা বক্‌বক্ না করি, চুপ করি বস দিনি টুক্।

ঘোষবুড়ো কিন্তু চুপ করে না। আপন মনেই গজগজ করতে থাকে।

মনুয়ার মেজাজ খারাপ হবারই কথা। পাকাবাড়ি পাবে শুনেছিল দণ্ডকারণ্যে—তাঁবু দেখেই তার মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। তাঁবুর উপর তার বড় বিতৃষ্ণা। তার উপর বুড়োর বউ, অর্থাৎ ওর ঠাকুরমা গুলাব, সারাটা পথ বমি করতে করতে এসেছে ট্রাকে। এখানে নেমেই গট্‌গট করে গিয়েছিল ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে। পাকাবাড়ির বদলে তাঁবু কেন দেওয়া হল তার কৈফিয়ত তলপ করতে। কিন্তু কমান্ডার-সাহেব কেরালার মানুষ—হিন্দি অথবা বাঙলা বোঝেন না।—আমতা আমতা করে ফিরে এল মনুয়া, কিছুই না বুঝে! ফুলটুসী বললে—হ্যাঁরে মনুয়া, কী বুললে রে সাহেব? তাঁবু দিচ্ছে কেনে?

মনুয়া একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সাহেবের কথা বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারেনি এটা স্বীকার করতে লজ্জা পায়। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো বলে—সাহেব বুললে, পাকাবাড়ি এখনও হয়ি উঠেনি। পরে বানাই দিবে।

তারপরেই রতনবুড়োর জমি-সংক্রান্ত এই দ্বিতীয় প্রশ্নে খিঁচিয়ে উঠেছে মনুয়া। সে মনে মনে গজরাতে থাকে। যাক, রাতটা যাক—দেখাই যাক না শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।

ব্যাপারটা বোঝা গেল পরদিন সকালে। এটা মাকরেল ক্যাম্প। ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প এখানে এরা পুনর্বাসনের জন্য আসেনি আদৌ। ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প? সেটা আবার কোন দিশি বিমারি? বুঝিয়ে দিতে এলেন ওভারসিয়ার রঙ্গনাথন পিল্লাই। আন্দাজে যেটুকুও বা বুঝেছিল ওরা, ফলে তাও গেল গুলিয়ে। রঙ্গনাথন হিন্দি জানেন না—এরা বোঝে না ইংরেজি। আকারে ইঙ্গিতে এইটুকু মাত্র বুঝল যে জমি-বাড়ি-খেত-খামার এ তল্লাটে পাওয়ার আশা নেই। আরও বুঝলে যে, ঝুড়ি-গাঁইতি-কোদালের স্তূপটা আমদানি করা হয়েছে ওদের জন্য।

চরণ মণ্ডল বলে, ও দাদু, বলি বোঝছটা কী? আমাগো হালারা শেষমেশ মাটিকাটা কুলি ঠাওরাইল নাকি? অ্যার থিকা লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পেই তো ভাল আছিলাম। বস্যা বস্যা ডুল পাতাম, মাটি কুপান লাগত না!

ছিদাম বৈরাগী বিজ্ঞের মতো বলে, নিচ্চয় ভুল হইছে! কনে আন্‌তি আমাগো কনে আন্‌ছে।

বুড়ো রতন ঘোষ বলে, দেবু মাস্টের থাকলি বুঝা যেত।

ঝুড়ি-গাঁইতিতে ওরা হাত দিল না আদপে। এ কেমন বিচার? ওরা এসেছে চাষ করতে—পুনর্বাসন নিতে। জমি-বাড়ি-লাঙল-গরুর নামে খোঁজ নেই—এখন বলে মাটি কোপাও, রাস্তা বানাও! ওরা দীন হতে পারে—দিন-মজুর নয়। কমলপুরে ওরা ভাগচাষী ছিল, অনেকের নিজস্ব জমিই ছিল চাযের।

রঙ্গনাথন অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করে। ইংরেজিতে কি যেন বলতে থাকে ইণ্ডির-মিণ্ডির করে। বিন্দু-বিসর্গও বোঝা যায় না। এরা চুপচাপ বসে থাকে দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। রঙ্গনাথন ওদের পিঠে হাত বুলায়—গাঁইতিটা তুলে দিতে যায় ওদের হাতে। কেউ নেয় না সেটা। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে রতনের। এ কী কাণ্ড। মনের কথা বুঝতে পারে এমন একটা মানুষ নেই এই বিজন বনে?

শেষ পর্যন্ত রতন ঘোষ উঠে আসে তার পাঁজরা-সর্বস্ব দেহখানা নিয়ে। পিল্লাইয়ের হাত থেকে গাঁইতাটা কেড়ে নিয়ে বলে, ঠাকুর, জানের মায়া থাকলি পথ দ্যাখসে, নাইলে এক্কেরে শ্যাষ করি দুব কিন্তুক!

রঙ্গনাথন একগাল হেসে বলে, দ্যাট্‌সে গুডবয়। আফটার অল য়ু হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দি পিক্যাক্স!

কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে নিজের ভুলটা। মাটিকাটার জন্য গাঁইতায় হাত দেয়নি রতন—দিয়েছে মাথাকাটার জন্য।

কেউ কাজে গেল না ওরা।

পরদিন এল বীরেন মৈত্র। ও. এস. ডি। বললে, কী ব্যাপার? আপনারা নাকি মাটি কাটতে রাজি নন?

চরণ মণ্ডল এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এবার একজন লোক পাওয়া গেছে যাকে দুটো মনের কথা বুঝিয়ে বলা যায়। হাত দুটি জোড় করে বলে, বাবুমশয়, আপনে আসছেন, বাঁচছি আমরায়। ব্যাবারডা কী কন বুঝায়্যা। আমরায় আসছি চাষ করনের লগে। আমাগো ব্যাবাক্‌ মাটিকাটা কুলি ঠাওরাইল ক্যান অ্যারা?

বীরেন মৈত্র তখন খোলসা করে বলতে থাকে সব কথা। অর্থাৎ সে যুগে পরিকল্পনার কর্মকর্তাদের যে থিয়োরি চালু ছিল। উদ্‌বাস্তুরা প্রথমে এসে উঠবে ওয়ার্ক-সাইট-ক্যাম্পে। সেখানে থাকবে দু-চার-ছয় মাস। দশবারো বছর অকর্মণ্য বসে থেকে যে গ্লানি জন্মেছে দেহে মনে তার স্খলন হবে এই ওয়ার্ক-ক্যাম্পে। চিফ-ইঞ্জিনিয়ার বলতেন, এই ওয়ার্ক-সাইট-ক্যাম্পগুলি হচ্ছে আসলে ডিস্টিলেটার। এই বকযন্ত্রে চোলাই হয়ে উদ্‌বাস্তুরা হয়ে উঠবে পুনর্মানব। তাদের পাঠানো হবে নিজের নিজের জমিতে।

হায়রে থিয়োরি! এখন এ থিয়োরির রিপোর্টগুলি স্থানলাভ করেছে ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে। গত বছর যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র সরজমিনে দণ্ডকারণ্য পরিদর্শন করতে আসেন, তখন উদ্‌বাস্তুরা প্রতিবাদ জানায়। বড়কর্তাদের গাড়ি আটকে ওরা বলেছিল—ওরা মাটিকাটা কুলি নয়! মাটি ওরা কাটতে ওরা আসেনি। সর্বভারতীয় জননেতা বিধানচন্দ্র সর্বসমক্ষে বলে গেলেন—ঠিক কথাই তো, এদের দিয়ে রাস্তায় কাজ করানো হচ্ছে কেন? এরা কুলি নয়, চাষী!

ওঁরাও চলে গেলেন, রাস্তার কাজও বন্ধ হল! সার্কুলার জারি হয়ে গেল—এই ফরমান-জারির পর থেকে আর উদ্‌বাস্তুরা রাস্তার মাটি কাটবে না। ওদের বরং ক্যাম্পে বসিয়ে ডোল দাও!

হুকুম তামিল করা হল। ক্যাম্পে ক্যাম্পে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল উদ্‌বাস্তুরা। বাথ্‌না ক্যাম্পের উদ্‌বাস্তু যুবকটি, যে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে হাতের ফোস্কা দেখাতে গিয়ে ধমক খেয়েছিল, সে এসে একদিন আযাচিত ক'টা কড়া কথা বলে গেল ঋতব্রতকে। যুদ্ধে ওরা জিতেছে—কড়া কথা বলবে বইকি!

কিন্তু প্রহসনের এখানেই শেষ নয়। যেসব মহারথী সরজমিনে এখানে কাজ দেখতে এসেছিলেন তাঁরা মাসখানেক পরে সম্মিলিত হলেন দিল্লিতে।

সব কথা শুনে ভারতরাষ্ট্রের প্রধানতম নেতা নেহেরুজী ফরমান জারি করলেন—উদ্‌বাস্তুরা রাস্তায় কাজ করবে, পুকুর কাটবে, কুয়ো কাটবে—বসে বসে শুধু ডোল খাবে না।

ফলে আবার বের হল নতুন সার্কুলার—এই ফরমান জারির পর থেকে আবার উদ্‌বাস্তুরা রাস্তার মাটি কাটবে। না কাজ করলে ডোল বন্ধ!

শুধু একটা ছোট্ট কথা কারও খেয়াল হল না। দণ্ডকারণ্যে যাদের আনা হয়েছে তারা 'রোবো' নয়, মানুষ!

কিন্তু এসব হচ্ছে অতীতের কথা। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রথম গর্ভাঙ্কের অভিনয়। এখন সেই মানুষগুলো এসে পৌঁছেছে পারলকোটে। ওরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে গ্রাম গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

ঋতব্রত ঐ গ্রামগুলির দিকে তাকায় আর ভাবে এখানে যদি কিছু কাজ হয়ে থাকে তবে তা করেছে ঐ পাঁজরাসর্বস্ব মানুষগুলোই। এই প্রতিকূল পরিবেশেও ওরা আছে অদমিত। বিভ্রান্তিকর সার্কুলারে ওদের বিভ্রান্ত করা যায়নি। মাটি কামড়ে পড়ে আছে এখনও। পুনর্বাসন ওদের নিতেই হবে। এই গ্রামের পত্তন ছাড়া আর কী করতে পেরেছি আমরা, ভাবে সে। পরিকল্পনার অন্যান্য চিত্রের মধ্যে সান্ত্বনা কোথায়?

যেমন ধরা যাক শিল্পোন্নয়নের কথা।

এ বিভাগটির সাঙ্গোপাঙ্গ বড় কম নয়। দেড়-হাজারি মনসবদার থেকে শুরু করে চুনোপুঁটির অভাব নেই। কী কাজ হয়েছে এ কয় বছরে—বাগাড়ম্বর ছাড়া? কতগুলি উদ্‌বাস্তু পরিবার শিল্প-নির্ভর?. কতজন গ্রাসাচ্ছাদন করছে শিল্প থেকে? এ বিভাগে যতগুলি কর্মী আছেন নিঃসন্দেহে তার চেয়ে কম! তবু এ বিভাগের কোথায় গলদ কর্তৃপক্ষের তা তলিয়ে দেখার আজও সময় হয়নি। পরিকল্পনার নিজস্ব পত্রিকায় চিফ ইন্ডাসট্রিয়াল অফিসারকে মাঝে মাঝে চিফ ইন্ডাসট্রিয়স অফিসার বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। রেপিটেশান প্রমাণ করে পাবলিসিটি অফিসারের অনবধানতাজনিত এটা ছাপাখানার দৌরাত্ম্য নয়—এটা তাঁর অতি নৈপুণ্যেরই পরিচায়ক। পাবলিসিটি গুণে তিনি 'নয়'কে 'হয়' নয়, একেবারে হস্তী করে তুলতে চান। দূরে আছে যারা তারা না বুঝুক কিন্তু কাছের মানুষ তা সত্ত্বেও প্রশ্ন করে—নগদ বিদায় কী পেলাম?

কোথায় বুঝি বসানো হয়েছিল হাতে-চালা তাঁত—গোটা কুড়িক। তারজন্য কারখানা শেড হল, স্টাফ কোয়ার্টার্স হল। যন্ত্রপাতি এল, তাঁত এল—মহা আড়ম্বরে উদ্বোধন হল কারখানার। পরিকল্পনা দেখতে বাহিরাগত কেউ যখন আসতেন—খবরের কাগজের রিপোর্টার, অথবা বিশিষ্ট অতিথিরা যখন পুনর্বাসনের কাজ দেখতে আসতেন—তাঁদের নিয়ে গিয়ে দেখানো হত সেই কুড়িটি তাঁত। ট্রেনার এসে কষে শিক্ষা দিলেন হবু-তাঁতিদের। 'ইন্ডাসট্রিয়াস' বিভাগের বড়কর্তারা প্রচার করলেন উদ্‌বাস্তুদের তাঁতে-বোনা ধুতি-শাড়ি আমদানি-করা বস্ত্রের চেয়ে সস্তা হবে—স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটাবে। কার্যত তা হয়নি কিন্তু। তা বলে বাতিলও হয়নি সব। ধুতি শাড়ির নামে যে বস্ত্রখণ্ডগুলি বেরিয়ে এল তাঁত থেকে সেগুলি ফেলে দেবার জিনিস নয়; বিভিন্ন বিভাগের অফিসে ডাস্টার হিসাবে সেগুলি ব্যবহার করা চলে। ময়লা তো কম জমেনি এসব অফিসে...ডাস্টারের প্রয়োজন হবেই!

কিন্তু কেন এমন হল? পূর্ববঙ্গ থেকে কি তাঁতি পরিবার আসেনি? তাঁতে কাজ কি করেনি টাঙ্গাইল-পাবনা-যশোর-খুলনার মানুষগুলি কোনদিন? না কি ট্রেনিং-এর গুঁতোয় টানা-পোড়েন গুলিয়ে গেল সব? কে-দেখবে তলিয়ে?

মোট কথা বোঝা গেল নতুন কিছু করতে হবে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের আর তাঁতের কারখানা দেখানো চলে না। শুধু তাঁত দেখেই খুশি হয়ে রিপোর্ট লেখে—তা নয়, ওরা তাঁতে বোনা কাপড় দেখতে চায়? কী অন্যায়! দু বছর যখন চলেছে, তখন তার লাভ-লোকসানের খতিয়ান জানতে চায়। ফলে স্থির হল নতুন কোন শিল্পে হাত দেওয়া যাক এবার! তাঁত-শিল্পের অধ্যায় ঐখানেই থাক!

তেল-কল করলে কেমন হয়?

যে কথা সেই কাজ! কেনা হল পাহাড়-প্রমাণ সরিষার বীজ, নিগার সিড্‌স। তৈরি হল নতুন কারখানা। কে যেন বললে—তেলের কল তৈরি না করে উদ্‌বাস্তুদের দিয়ে ছোট ছোট ঘানি চালালে কেমন হয়? এঁরা হাসলেন। মারি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার। কুটির-শিল্প? ছোঃ! ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ! পাওয়ার-ড্রিভন্ অয়েল-ক্রাশার বসাও—সেন্ট্রালাইজড অয়েল-এক্সট্রাকসন ফ্যাকটারি।

তাই হল। বহুদূর থেকে টেনে আনা হল কে-ভি-লাইন। বসল ট্রান্সফর্মার, এল যন্ত্রপাতি—তৈরি হল শেড। তারপর? তারপর দিন আসে, দিন যায়! গল্পের ওখানেই শেষ। কে যেন বললে বছর দুই আগে যে সরিষার বীজ কেনা হয়েছিল সেগুলি থেকে গুদামে গাছ গজিয়েছে। সে কথায় কেউ কান দেয়নি অবশ্য—গুদাম খুলেও কেউ দেখেনি। গুদামের তালা নাকি আর খোলা যায় না—জং ধরে তালা অকেজো হয়ে গেছে।

তৈল নিষ্কাশনের পরিকল্পনাটিকে গুদামজাত করে এবার স্থির করা হল এসব ছোটখাটো শিল্প প্রচেষ্টায় কোন লাভ নেই। বড় করে কিছু করা যাক এবার। বিরাট একটি এলাকায় জঙ্গল সাফ করানো হল। মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল স্বয়ং এসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেলেন। শাঁখ-ফুলের মালা-পুষ্পতোরণ—পাবলিসিটি ফটোগ্রাফারের চিরিক-চিরিক—বাদ গেল না কিছু। এবার তৈরি হবে কেন্দ্রীয় কারখানা—সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ। আর সেইসঙ্গে মালটিপারপাস ট্রেনিং সেন্টার। সব রকম ব্যবস্থা থাকবে সেখানে। কাঠের কাজ, টিনের কাজ, লোহার কাজ, চর্মশিল্প—কী নয়? এখানে কাজ শিখে গ্রাসাচ্ছাদন করবে উদ্‌বাস্তু দল। প্রায় ত্রিশলক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর হল। পুর্ণোদ্যমে শুরু হল কাজ—ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মীরা এলেন কারখানা তৈরি করতে।

কিন্তু কারা কাজ করবে ওখানে? সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ থেকে নিকটতম উদ্‌বাস্তু গ্রাম একশ' মাইলের উপর। অবশ্য সেন্ট্রাল-ওয়ার্কশপ হলে কর্মীর অভাব হবে না। উদ্‌বাস্তুরা না আসে স্থানীয় লোক আছে। তা আছে। গাড়ি কিনলে চড়বার লোকের অভাব হয় না।

রায়পুরের কাছে কোথায় যেন হাঁস-মুরগি পালনের জন্য একটা পোলট্রি তৈরি করা হল। হাজার কয়েক পাখি আনা হয়েছে ইতিমধ্যে। এখান থেকেও নিকটতম উদ্‌বাস্তু পল্লী একশ মাইলের বেশি। তার মাঝে কোন জমি প্রাদেশিক সরকার দেননি পরিকল্পনা সংস্থাকে। একশ মাইল দূরে কে যাবে ওখানে কাজ শিখতে? কে আনবে ওখান থেকে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী? অবশ্য খরিদ্দারের অভাব নেই। রায়পুর বিখ্যাত রেল স্টেশন। প্রাদেশিক সরকারের বিরাট চাহিদা আছে রায়পুরের বাজারে।

দুটি স্থানীয় কলেজকে তিন লক্ষ টাকা দান করা হল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাত থেকে। দুটি কলেজের একটিতেও কিন্তু একজন উদ্বাস্তু ছাত্র নেই।

স্থানীয় রাজ্য-সরকার অর্থাভাবে যেসব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় হাত দিতে পারছিলেন না—গৌরী সেনের ভূমিকায় পরিকল্পনা সেখানে এগিয়ে আসছে মদত দিতে। উন্নতি হচ্ছে দেশের, এ কথা অনস্বীকার্য—এবং তাতে কারও দুঃখিত হবার কারণ নেই। ঋতব্রতও দুঃখিত নয়—তার আপত্তি শুধু বুক-কিপিংএ। দধি উপাদেয় খাদ্য, তোমরা খাও—আয়ুবৃদ্ধি হবে; কিন্তু আমাদের মুখে দই-মাখিয়ে ও কাজটা কি না করলেই নয়? আপত্তিটা শুধু বুক-কিপিংএরও নয় ঠিক। এর ফলাফলটা সুদূর-প্রসারী। একটু তলিয়ে দেখতে ভালোবাসে ঋতব্রত :

বেসরকারি হিসাবে পুববাঙলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্‌বাস্তুদের সংখ্যা লাখ পঞ্চাশেক।

সরকারি হিসাবে একচল্লিশ লক্ষের কিছু বেশি। অপরপক্ষে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে উদ্‌বাস্তু এসেছেন সাতচল্লিশ লক্ষ। অর্থাৎ প্রায় সমান-সমান। পাকিস্তানে ফেলে আসা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সমতে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্‌বাস্তুদের জন্য সরকার খরচ করেছেন 328 কোটি টাকার কাছাকাছি। তুলনায় পুর্ব-পাকিস্তানের উদ্‌বাস্তুদের পিছনে খরচ হয়েছে 163 কোটি টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ প্রায় আধাআধি! এই তুলনামূলক সমালোচনা যারা করে তারা বড় লজ্জা দেয়। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় যে হারে খরচ হচ্ছে তাতে পূর্ববঙ্গের উদ্‌বাস্তুদের পিছনেও খরচ বেড়ে চলেছে। তাই ঋতব্রত দেখতে চায় এখানে ব্যয়িত প্রতিটি কপর্দক যেন সত্যিই উদ্‌বাস্তুদের উপকারে লাগে। এজন্যেই ওর আপত্তি পুনর্বাসনের খাতে প্রাদেশিক সরকারের উন্নয়ন ব্যবস্থা।

গতবছরের প্রথমদিকে পশ্চিমবঙ্গের একানব্বইটি শিবিরে উদ্‌বাস্তু ছিল একলক্ষ আটত্রিশ হাজার। গত বছরে উনিশটি ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই উনিশটি শিবিরের 48 হাজার উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে বিভিন্ন উন্নয়নী কেন্দ্রে। আজও 72টি শিবির টিকে আছে পশ্চিমবঙ্গে। এই যে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় কারখানা তৈরী হবে এতে ওদের মাথাপিছু ত্রিশ টাকা করে খরচ ধরা হচ্ছে হিসাবের খতিয়ানে! অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যে কেন্দ্রীয় কারখানা তৈরি করার সঙ্গে বাগজোলা ক্যাম্পের সতীশ কৈবর্তের স্বার্থ জড়িত। এ কারখানা তৈরি হলে ধরা হবে বাগজোলার সতীশ কৈবর্ত ত্রিশটাকা পেল!

এক পাঞ্জাবি অফিসার সেদিন বললেন, আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো? আপনি তো বাঙালি, আপনার কি মনে হয়? পুববাঙালার উদ্‌বাস্তুদের এতদিনেও একটা হিল্লে হল না কেন? এরা কি চিরদিনই এমন পরনির্ভর, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মতো আত্মমর্যাদাশীল নয়, কর্মক্ষম নয়?

জবাব দিইনি এ কথার—কিন্তু তুলনা করে দেখেছি মনে মনে। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলা বনাম পাঞ্জাব-সিন্ধু। খতিয়ে দেখেছি হিসাব।

পূর্ববাঙলা থেকে একচল্লিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ একদিন পশ্চিম বাঙলার কুলে এসে ভিড়িয়েছিল জীবনতরী। সর্বস্বান্ত ছিন্নমূল মানুষগুলি এসেছিল আশ্রয়ের খোঁজে। ঐ একচল্লিশ লক্ষের মধ্যে আট লক্ষ মানুষ সরকারের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য নেননি। একচল্লিশ লক্ষ সংখ্যাটা সরকার সমর্থিত; সুতরাং তার বাইরে কার্ড না করিয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কথা ধর্তব্যের বাইরে। সরকারি সাহায্য পাওয়ার হকই তো নেই তাঁদের। বাদ বাকি প্রায় তেত্রিশ লক্ষ উদ্‌বাস্তু ছড়িয়ে পড়েছিল উদ্‌বাস্তু-ক্যাম্পে, আর্বান, রুরাল আর জবর-দখল কলোনিতে। আজও, এই উনিশ শ' একষট্টি সালের এপ্রিল মাসেও, বাঙলাদেশে আছে 70টি উদ্‌বাস্তু ক্যাম্প, 223টি আধাশহর (আর্বান), 22টি গ্রাম্য (রুরাল) এবং 147টি জবর-দখল কলোনি। 70টি উদ্‌বাস্তু ক্যাম্পের দু লক্ষ মানুষের কথা ছেড়ে দিলে বাকি 392টি কলোনির মধ্যে মাত্র 69টিতে আজ পর্যন্ত উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। যাঁরা বাকিগুলির জীবনযাত্রা দেখেননি তাঁদের বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না—যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সে কথা উল্লেখ করা নিরর্থক। অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্‌বাস্তুরা যেখানে জনপদ গড়ে তুলেছে সেখানকার উন্নয়নের সব

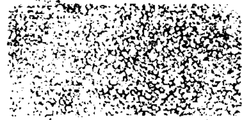
কাজ শেষ হয়ে গেছে পাঁচ-সাত বছর আগেই। তাদের পিছনে যা কিছু খরচ করা হল, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে করা হল তা। দুটি শিশুই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে বসেছিল ডিপ্‌থিরিয়ায়—দুজনকেই দেওয়া হল পঞ্চাশ লাখ সিরাম—একজনকে বাহাত্তর ঘণ্টায়, আর একজনকে দীর্ঘদিন ধরে। দ্বিতীয় রোগীটির জীবনীশক্তির অভাবই কি তার মৃত্যুর জন্য দায়ী?

পুববাঙলা থেকে বাস্তুহারার দল এদেশে এসে পেয়েছে আঠারো হাজার একর পরিমিতি জমি। অপর পক্ষে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আসা বাস্তুহারার দল পেয়েছে দশ হাজার বর্গমাইল—অর্থাৎ প্রায় চৌষট্টি লক্ষ একর জমি। তার কারণ, আমরা দ্বিজাতি-তত্ত্ব মেনে নিইনি—দেশনেতাদের আদেশ আমরা পালন করেছিলাম অক্ষরে অক্ষরে। পশ্চিমবাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে জমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করিনি।

পাঞ্জাবী অফিসারটিকে বলিনি—বুকে হাত দিয়ে একবার বলুন, সেটা আমাদের অপরাধ!



উত্তরকাণ্ড



১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শুরু—বৈশাখের মাঝামাঝি।

কালবৈশাখী বৃষ্টি হয়ে গেছে পূর্বরাত্রে মাটি ভিজল। যগন্দ, গোবর্ধন, রতন, ভিজামাটি পরীক্ষা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু। প্রথম লাঙল দেবার মতো অবস্থা হয়েছে জমির—কিন্তু পারালকোট এলাকায় আজও এসে পৌঁছায়নি একজোড়া বলদ, একবোরা বীজধান অথবা একখানিও লাঙল। পনেরটি গাঁয়ের সাড়ে সাতশ' পরিবার রুদ্ধনিঃশ্বাসে এখনও দিন গুনছে। অনেকেরই মাথার উপর উঠেছে আচ্ছাদন, থাকবার যাহোক একটা ব্যবস্থা হয়েছে। কুয়োও খোঁড়া শেষ হয়েছে কোন কোন গাঁয়ে। পুকুর কাটা হচ্ছে। কিন্তু চাষ? এ মরশুমটাও বৃথা যাবে নাকি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দত্ত-সাহেব নতুন এসেছেন। অকৃতদার অমায়িক উৎসাহী অফিসার। অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। ছোটাছুটির অন্ত নেই ভদ্রলোকের—ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠাচ্ছেন কেন্দ্রীয় অফিসে একের পর এক। মনে মনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছেন তিনিও—মুখে কিন্তু ওদের ভরসা দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই। সময়ে সবই এসে যাবে চাষের সরঞ্জাম। ওরা বিশ্বাসস্থাপন করেছে তাঁর কথায়। নির্দেশমতো ওরা এখনও ঢালু জমিতে এড়ো-বাঁধ দিয়ে চলেছে। জল যেন সরে না যায় মাটি না ভিজিয়ে। এড়ো বাঁধের কী জানি একটা বিলাতী নামও আছে—কী যেন কথাটা? হ্যাঁ কন্টুর বান্ডিং। তা সেই কন্টুর বান্ডিংও দেওয়া শেষ করেছে অনেকে। এখন লাঙল, বলদ আর বীজধান এলেই হয়।

পারালকোট এলাকায় এ পর্যন্ত পনেরটি গ্রামের পত্তন হয়েছে। আরও হবে। চল্লিশ হাজার একর জমি এখানে পাওয়া যাবে। জমি সরেস—আবাদ করলে সোনা ফলবে নিশ্চিত—পরখ করে বলছে রতন, যগন্দ, ছিদাম, গোবর্ধন। পারালকোট এলাকার কেন্দ্রস্থল ছোট কোৎরি। এখানেই একটা কুটিরে আশ্রয় নিয়েছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দত্ত-সাহেব। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ঋতব্রত বসুর অফিসও এখানে। আছেন সদ্য-পাশকরা উৎসাহী তরুণ ডাক্তার সাহা—মোবাইল-মেডিক্যাল-য়ুনিটের কর্মকর্তা। আছেন ওভারসিয়ার বাবুরা, কেরানিকুল, দুজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। চারিদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল—সপ্তাহে একদিন ট্রাক যায় সভ্যজগতে। হাট করে নিয়ে আসে। জঙ্গলে পাতিলেবুর গাছ আছে, মহুয়া আছে। অচেনা গাছের ভিড়ই যেন বেশি।

ঋতব্রত জনান্তিকে দত্ত-সাহেবকে বললে, কী বুঝছেন? লাঙল বলদ এসে যাবে মাসখানেকের ভিতর?

দত্ত-সাহেব বলেন—কী জানি মশাই! এঁদের ভাবগতিক কিছুই বুঝছি না। এই তো গত সপ্তাহে মিটিংএ গিয়াছিলাম কোরাপুটে। তামাম পরিকল্পনার মহারথীরা একত্র হয়েছিলেন। আমি তিনবার এ প্রসঙ্গটা তুললাম—তিনবারই অন্যান্য জরুরি কথায় চাপা পড়ে গেল আমার প্রশ্ন।

—সেই জরুরি বিষয়বস্তুটা কী?

—রি-অরগ্যানিজেশন। কে কার অধীনে কাজ করবে, কার কতটা ক্ষমতা থাকবে, কে প্রমোশন পাবে আর কে রিভার্ট হবে।

ঋতব্রত বললে—এটাই সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল?

—হল না? আমার পোস্টটা নতুন তৈরি করা হল—সুতরাং আমি কাকে কাকে ক্যাজুয়েল লিভ দিতে পারব, কার কার সি. সি. আর. এ আমার কলমের ছোঁয়া থাকবে সেটা আগেই স্থির করা উচিত নয়?

একটা কথা। একটা কেন, অনেক কথাই ভাবে ঋতব্রত। তার মধ্যে একটা। কৃষিদপ্তর আবহমানকাল ধরে গেয়ে আসছেন আমাদের দেশে 'ফ্রাগমেন্টেশান-অফ-ল্যান্ড' হচ্ছে কৃষির পথে মস্তবড় একটা অন্তরায়। ছোট ছোট টুকরায় জমি আগে থেকেই ভাগ করা আছে বলে এদেশে ট্রাকটার দিয়ে চাষ করানো যায় না। একজন ভুম্যধিকারী মারা গেলে তার সন্তানেরা সে জমি ভাগ করে নেয়—আরও আল বেঁধে ছোট জমি আরও ছোট করে ফেলে। ট্রাকটার তো দূরের কথা লাঙলও ঘুরতে চায় না। ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় একর-প্রতি আমাদের ফলন অনেক কম। কৃষিদপ্তরের কর্মকর্তারা, রাশিয়া, আমেরিকা, লালচীনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাদের দেখান তুলনামূলক পরিসংখ্যান। কৃষি প্রদর্শনীতে বড় বড় পোস্টারে দেখা যায় ওই সব দেশের বড় বড় খামারের সাফল্যময় খতিয়ান। সরকার তাই সমবায় চাষের পরামর্শ দিচ্ছেন। গ্রামে গ্রামে পাবলিসিটি অফিসারেরা ছবি দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে এই সরকারি-বন্দোবস্তে হাঁসিল-করা জমিতে যৌথ খামার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হচ্ছে না কেন? পারালকোট এলাকায় এযাবৎ আসা সাড়ে সাতশ' পরিবারের জন্যে কেন কেনা হচ্ছে পনের শ' জোড়া বলদ? কেন প্রতি একুশ বিঘা জমি অন্তর আল দেওয়ানো হচ্ছে ওদের দিয়ে? কৃষি-অভিজ্ঞ অফিসারের তো অভাব নেই—তাঁরা কেন ট্রাকটার কেনার সুপারিশ করছেন না? সরকারি প্রচেষ্টায় এখানে যৌথ খামার গড়ে তোলা যেত না? প্রতি পরিবারকে একুশ বিঘে জমি, একজোড়া বলদ ও লাঙল না দিয়ে একখণ্ড শেয়ারের কাগজ দেওয়া অসম্ভব কেন? ওরা এ হিসাব বুঝবে না? খুব বুঝবে। অন্তত কোন কোন এলাকায় চেষ্টা করে দেখতে আর দোষ কী? অন্তত সি. ডি. পি-র হাফ-প্লট-ডিমন্সট্রেসানের মতো কিছু বুদ্ধিমান ও প্রগতিশীল চাষীদের নিয়ে একটা সমবায় গড়ে তুলে তার সুফল পাশাপাশি দেখাবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?

কথাটা আলোচনা করেছিল একজন অতি উচ্চমহলের অফিসারের সঙ্গে। তিনি হেসে বললেন, আপনাদের সবটাতেই বাড়াবাড়ি। পূর্ব-বাঙলায় এরা ট্রাকটার চোখে দেখেছে কোনদিন?

তা ঠিক। এ যুক্তি শুধু ওঁর কাছে নয়, আরও অনেকের কাছেই শুনেছে অনেক প্রসঙ্গে। ওয়ার্ধাগ্রামে মগনলাল গান্ধীর প্রচেষ্টার যে স্বল্পমূল্যের ধূমহীন চুল্লি প্রবর্তিত হয়েছে, উদ্‌বাস্তুদের গ্রামের বাড়িতে সে রকম চুল্লি তৈরি করার প্রস্তাবে, প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে বোর-হোল ল্যাট্রিন দেওয়ার কথায়, জ্বালানি কাঠ, ঘুঁটে রাখবার জন্য স্থান সংরক্ষণের প্রস্তাবে শুনতে হয়েছে ঐ একই জবাব। এসব করার কী দরকার।

পূর্ববাঙলার গ্রামে এসব ছিল কি? সেখানে শতকরা কয়জনের পায়খানাঘর ছিল, কয়জনের ধূমহীন চুল্লি ছিল? যেন ওদের সেই ফেলে আসা পূর্ববাঙলার গ্রাম্য-বাস্তুই আমাদের আদর্শ, যেন এই একযুগ ধরে আদর্শ-গ্রাম গঠনের বিষয়ে কেউ কোন চিন্তা করেননি। পূর্ববাঙলার গ্রামে যা ছিল না তা যেন এখানে থাকলে সেটার একমাত্র সংজ্ঞা হবে 'ইনফ্রাকচুয়াস্-এক্সপেন্ডিচার!'

এ অকাট্য যুক্তি শুনে চুপ করেই থেকেছে। জবাব দেয়নি। জবাব নেই বলে নয়—সেটা অপরপক্ষের জানা আছে বলে এবং শ্রুতিকটু বলে। ওর জবাবে বলা চলত, পূর্ববাঙলার গ্রামে এসব ছিল না, সত্য কথা,—কিন্তু সে সব গ্রামের পরিকল্পনা, সে গ্রামের পত্তন করেছিল নিরক্ষর চাষীরাই। চার অঙ্কের বেতনসেবী অফিসারবৃন্দ ছিল না সে গ্রামের পরিকল্পনার নেপথ্যে।

কর্মকর্তারা চিন্তা না করলেও গ্রামের মানুষ একথা ভেবেছে। দিবাকর পণ্ডিত এটাকে রূপান্তরিত করতে চায়—অন্তত তার গ্রামের ক্ষুদ্র পরিসরে। একবার সে চেষ্টা করেছিল এই বঞ্চিত ব্যর্থ মানুষগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে ঐ সঞ্চিত-অর্থ মুষ্টিমেয়র বিরুদ্ধে। তার পরিকল্পনার ক্ষেত্র সীমায়িত করেছিল তার অতি আপন ছোট্ট কমলপুর গ্রামেই। ভেবেছিল তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি জোট বাঁধে আর পাঁচটা গ্রাম—রায়না, মধ্যমগ্রাম, মোল্লাহাটি—আর কালে সে বার্তা ছড়িয়ে পড়ে পঞ্চগ্রাম থেকে সপ্তগ্রামে, বিংশতিগ্রামে—ছড়িয়ে পড়ে লক্ষগ্রামে গাঁথা ভারতবর্ষের প্রতি কোনায় তবে সে তো তার আশাতীত-সৌভাগ্য। দিবাকরের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। লঙ্কাকাণ্ডের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়েছিল ওর শুভেচ্ছা। তাই আজ আবার সে নতুন করে পরীক্ষা করতে চায়। এখানে জমি নতুন—প্রতিকূল পরিবেশ এখনও গড়ে ওঠেনি। এখানে নেই মজা-পুকুর আর কুসংস্কারে ভরা প্রাচীনপন্থীদল, এখানে নেই জমিদার আর জোতদার। শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়নি এখনও এ আরণ্যক জীবনে—সেই নিম্নে নেমে এসে ওরা আজ দাঁড়িয়েছে সার্বজনীন সমতলে, যেখানে সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে অন্নপান খেতে হবে।

অভিজ্ঞতা তো আর অল্প নয়। সামন্ততন্ত্রের শেষ স্তম্ভ কমলাপতির পতন সে দেখেছে নিজের চোখে, দেখেছে লক্ষ্মীপুরের সামন্ত-ব্যবসায়ী রাজনীতিক ত্রিদিবেশ সিংহকে। জোতদার-আড়তদার-মহাজনদেরও না দেখেছে তা নয়, কমলপুরের রায়মশায় আর মোল্লাহাটির দর্পণে তাঁরই প্রতিচ্ছায়া খালেক সাহেবের বন্দোবস্ত হাড়ে হাড়ে জানা আছে তার। পিয়ারিলাল আর ইদরিস্ পাইকারকে সে ভোলেনি। পাঁচ হাটে ধানের দরের সাথে চাষীর ভাগ্যকে যারা বেঁধে রাখত নাগপাশে। বন কেটে বসত করার ঊষা মুহূর্তে তাই সে নতুন সমাজব্যবস্থার পত্তন করতে চাইল। বাইরের চাপ এসে পড়বার আগে এদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। জনে জনে সে বুঝিয়েছে তার পরিকল্পনার কথা! না হয় নাই হল ট্রাক্টর—ওরা লাঙল দিয়েই যৌথ চাষ করবে। সৌভাগ্যক্রমে সরকারি গয়ংগচ্ছতায় এখনও হাঁসিল করা জমি বণ্টন করা হয়নি। যদি সফল করে তুলতে পারে তার স্বপ্নের সাধ তাহলে নতুন অধ্যায় রচিত হবে এই অরণ্যের অন্তরালে। শক্তিশালী যৌথ খামার যদি গড়ে তোলা যায় তবেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বজায় থাকবে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য নির্দেশ করবে তারাই—মহাজনী

কারবার সে গড়ে উঠতে দেবে না। অনেকেই অবশ্য বুঝে উঠতে পারেনি দিবাকর পণ্ডিতের আসল উদ্দেশ্য। তবু তারা এটুকু বুঝেছে যে, চাষ মরশুমের আগে প্রত্যেকটি পরিবারের পৃথক জমির সীমানা নির্দেশিত হয়ে উঠবে না। বনমালী শুইয়ের মতো ঝানু আমীন পর্যন্ত বলেছে নকশায় গলদ আছে। জমি বাঁটোয়ারা করতে বসলে বোঝা যাবে ভুলটা। তা মরুগ গে যাক নকশার গলদ। জমিটা তো চোখের উপরেই দেখা যাচ্ছে। কম-বেশি হাজার বিঘে হবেই। সারা জমিটা এক লপ্তে চাষ করায় কোনও বাধা নেই। দত্তসাহেবের প্রতিশ্রুতির উপর ওরা ভরসা রেখেছে এখনও—লাঙল, বলদ, বীজধান এসে যাবে বর্ষার আগে। তাহলে আর ভাবনা কী?

চাষের তো কত রকম ব্যবস্থা আছে—সবই জানো তোমরা। ভাগ-চাষ, মালিক-চাষ, খাই-খালাসী, নগদ-বন্দি। দেশঘর ছাড়ার আগেই এ সব চিনেছ হাড়ে হাড়ে। এবার তোমাদের নতুন বন্দোবস্ত। নতুন দেশে এসেছ নতুন বন্দোবস্ত হবে না? দিবাকর পণ্ডিত ব্যবস্থা দিয়েছে। জমির মালিক কে তা ভাগবান জানেন। হয় প্রাদেশিক সরকার, নয় দণ্ডকারণ্য সংস্থা;—অথবা জমির মালিক হয়তো আজও 'মাটি-মাল'। তা সে যাই হোক, আমরা পঞ্চাশ-ঘর কৃষক—আমরা ঐ হাজার বিঘে হাঁসিল ভুঁইয়ে চাষ করব। আড়াই-কুড়ি লাঙল নামবে মাঠে—আমরা আড়াই কুড়ি চাষীভাই এক লপ্তে চষে ফেলব গোটা জমিটা। ঐ দিগন্ত ছুঁই-ছুঁই বনের ও প্রান্ত পর্যন্ত। মাঠে আল আছে, আমরাই দিয়েছি—কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়। ও আল তোমার-আমার জমির সীমানা নির্দেশ করছে না। ও বাঁধ হচ্ছে এড়ো-বাঁধ, কন্টুর-বান্ডিং। কন্টুর-বান্ডিং কাকে বলে? শুধিয়ে এস গে যাও বাবুদিকে। একি তোমার খুলনে-যশোর-বরশ্যাল-পাবনা? এ হল গিয়ে দণ্ডকারণ্য। 'এড়ো-বাঁধ না থাকলি ঢালু জমির সব জল নিচে সরি যাবি যে'। পাতা-পচা সারে তর হয়ে থাকা মাটি—যাকে বাবুরা বলে 'টপ-সয়েল' তা ধুয়ে মুছে উপরের জমিকে ফর্সা করে দিয়ে যাবে না? তাই তো ঐ বাঁধ দিয়েছি। এড়োবাঁধ—কন্টুর বান্ডিং! না হলে গোটা জমিটাই হচ্ছে তোমার আমার এবং ওদের সকলের। লাঙল ঘুরবে ঐ আলের সীমানায় এসে। ফসল যা উঠবে? তাও তোমার, আমার এবং আর সকলের। গাঁও-বুড়ো রতন ঘোষ পিসিডেন্ট হয়েছে। মোড়ল নয়, পিসিডেন্ট;—অথবা বলতে পার প্যাটেল—আদিবাসীরা যেমন বলে। যগন্দ, ছিদেম আর রাখহরি হয়েছে ওদের সাগরেদ—কী বলে যেন, মেম্বর! ওরা আপোষে ভাগ করি দিবে ফসল। এমন অদ্ভুত চাষের কথা শুনিছ তোমরা? ভাগ-চাষ নয়, খাই-খালাসি নয়, মালিক চাষ নয়, নগদ-বন্দিও নয়—এরও একটা ভুতুড়ে নাম আছে—বাপের জন্মে শুনিনি কথাডো। দিবা পণ্ডিত প্রায়ই বলে সিটা। কি যেন লব্‌জটা? ডাঁড়াও মনে করি—হ্যাঁ, যৌথচাষ!

তা যৌথচাষই করে দেখবে ওরা একটা বছর। ষোলো-আনার ডাকে সবাই মেনে নিয়েছে পণ্ডিতের পরামর্শ। আর কিছু নয়, না হলে একটি বছর বরবাদ হয়ে যাবে যে। এক বছরের ফসল কি কম? বিঘে প্রতি ফলন কী রকম আশা করছ? জিজ্ঞাসা কর রতনকে, যগন্দকে, গোবর্ধনকে—ওরা জাত চাষী, ঘাঘি, জমি চেনে। ওরাই জমি পরখ করে বলেছে বিঘে-প্রতি সাত-আট মণ ফলন হবেই। তা হবে, হাজার বছরের পাতা-

পচা সার খেয়ে জমি তর্ হয়ে আছে। তাহলে এক কুড়ি এক বিঘেয় কত দাঁড়ালো? দেড়শ মণের কাছাকাছি, কেমন? প্রত্যেকটি পরিবার ঐ দেড়শ মণ ধান তো পাবে?

সবচেয়ে আনন্দ হয়েছে বুড়ো রতন ঘোষের। খুশিতে ডগমগ করছে। সাড়ে তিন কুড়ি বয়েস কবে পার হয়ে গেছে বুড়োর, জমি চষে মাথায় টাক পড়ে গেল, কিন্তু এমন বুদ্ধিটা তো তার মাথাতেও আসেনি। বড় জবর সলাটা দিয়েছে দিবা পণ্ডিত। লেখাপড়ার গুণই আলাদা। রাতে বুড়োর আর ঘুমই হয় না। না, দাঙ্গার দুঃস্বপ্ন নয়—আগামীদিনের সোনালী স্বপ্নেই রাতে ঘুম আসে না তার। মনে পড়ে বহুযুগ আগেকার কথা। একদিন মনের খেদে জনাবালি শেখকে বলেছিল, চল ভিন গাঁয়ে গে বন্দোবস্ত নিই আমরা দুজন। জঙলা-জমি—অল্পেই পাবনে। এমন গাঁয়ে যাব যিখানে চৌধুরী জমিদারের নাগাল পৌঁছবি না, যিখানে ইরসাদ-পিয়ারিলাল-রায়-খালেক ছাহেবরা নাই। তোমার কব্জিতে জোর আছে। তুমি রাজি থাকলি আমি গাঁ ছাড়ে যাতি রাজি আছি। শালার গাঁয়ে আর ভালো লাগে না।

সেই দেশান্তরেই এসেছে আজ ঘোষের পো, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। এখানে জমিদার নেই, মহাজন নেই, পাইকার নেই। আজব এ দেশ! গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে ওরা। সুতরাং গোড়া বেঁধে কাজ করতে হবে। মোষের পাল যখন জোট বেঁধে চলে তখন 'বড়-শেয়াল'ও তাকে আক্রমণ করে না জোট বাঁধতে হবে। পণ্ডিতের পরামর্শটা ভালো। সবাই একজোট হলে বাইরে থেকে লুঠেরাগুলো আসতে সাহস পাবে না এখানে। জন্যবালি শেখ নেই, রতনও বুড়ো হয়েছে—তা হোক, তবু নতুন যুগের নতুন চাষীরা তো আছে। মনুয়া, রসময়, দুলাল, ট্যানা, আনন্দ—এরা তো আছে। যে দুর্দশা, যে অপমান রতন সয়ে এসেছে তার কালে—জমিদারের কাছে, মহাজনের কাছে, পাইকারের কাছে—সে দুর্দশা যেন ওদের না হয়। নতুন যুগের মানুষেরা যেন রতনের অভিজ্ঞতায় গোড়াতেই সাবধান হয়—ও বিষ যেন ঢুকতে না দেয় গাঁয়ে। রতনের কালে রতন কেঁদেছে—ওদের কালে ওরা যেন শুধু হেসে যায়—হে শিবঅ, হে বুড়োরাজা তুমি দেখ ওদের!

শুধু রতনবুড়ো একা নয়, সারা গাঁয়ের মানুষ বসে বসে স্বপ্ন দেখছে। আর তাই কি এই একখানা গাঁ—যাও না চলে পাঁচ-ছয়-সাত নম্বর গাঁয়ে—হুই নীলপাহাড়ের কোল পর্যন্ত আছে ওদের বসতি। ষোল-নম্বর গাঁয়ে কাজ করছে রিক্লামেসান য়ুনিট। ইয়া ঢাউস ঢাউস কলের গাড়ি এক লহমায় উপড়ে ফেলছে বড় বড় গাছ। লোহার শিকলে বাঁধা পেল্লায় ওজনের একটা লোহার-গোলা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে আর প্রকাণ্ড গাছগুলি শুয়ে পড়ে প্রণাম করছে তাকে। তাকে নয় মানুষকে। ঐ ষোলো নম্বরে আছে বুলডোজার। তার আগে পনের নম্বর পর্যন্ত ভরে গেছে মানুষ; খুঁটি পুঁতেছে, চাল ছাইছে, আল বাঁধছে জমিতে। যে কোন গাঁয়ে তুমি চলে যাও—শুধোওগে ওদিগে; ওরা বলবে ওরা সবাই স্বপ্ন দেখেছে আগামী দিনের। ফসল ঘরে তোলার পরের পরিচ্ছেদটা ওরা সোনালী আখরে এখনি লিখে রাখছে মনের মণিকোঠায়, মনে মনে স্থির করে রাখছে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। ধান ঘরে উঠলে হাতে আসবে কাঁচা পয়সা। কী করে খরচ করবে তা, সেটাই যেন একমাত্র সমস্যা!

এ গাঁয়েও ঘরে ঘরে চলেছে ঐ জল্পনা। দ্বিজপদ কর্মকার নাছোড়বান্দা। সে ঐ টাকা দিয়ে একটা কামারশালা খুলবে ঠিক করছে। চাষী বলে নাম লিখিয়েছিল দেশ ভাগাভাগির পরে। কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছে কর্মকার। নাঃ, জাত ব্যবসাতেই ফিরে যাবে শেষ পর্যন্ত। গ্রুপ-লিডারের কাছে কাঠের ব্রিজ মেরামতির কাজ করে বাপ-বেটায় কিছুটা পুঁজি জমিয়েছে। অতি সামান্যই অবশ্য। সৎশেটা নেই—কুলধর্ম তার সইল না। না থাক, দ্বিজপদ ডরায় না। এমনি কী বয়স হয়েছে তার? কত হবে? তিন কুড়ি? তা হক হাম্বর-পেটা হাতদুখানা তার অকেজো হয়ে যায়নি। কামারশালাই খুলবে একটা। জমিটা রতনকে বেচে দেবে। বেচা যাবে তো? কেনা-বেচার অধিকার থাকবে তো ওদের? যদি বাধা না থাকে তবে রতনকেই জমিটা বিক্রি করবে। রতন অবশ্য আজও ঠিক রাজি হয়নি। উৎসাহটা হচ্ছে গুলাব-বউয়ের। যেভাবেই হক কিছু মুলধন সঞ্চয় করবে কর্মকার। পাশাপাশি দশ-পনেরোটা গ্রামের পত্তন হচ্ছে। এর মধ্যে কোন কামারশালা নেই। শুধু চাষী আর চাষী। যেন কামারের কোন কাজ নেই এখানে। যেন ও দেশে লাঙলের ফলা কোনদিন ভাঙবে না। এখানে গরুরগাড়ির চাকায় পাটি পরাবার দিন কখনও আসবে না। কাঁচা পয়সা একবার হাতে আসুক না ঐ পুববাঙলার মানুষগুলোর—তখন কত সখ হবে বাবুদের! চৌকি চাই, জলচৌকি চাই, পিঁড়ি গড়তে পারবে হে কম্মোকার খান কয়েক? হাতা-খুন্তি-চিমটে সাঁড়াশি কী না চাই সংসার করতে গেলে? হাতের কাছেই যদি যোগান দিতে পারে কর্মকার, তাহলে কাঁকের বাজারে কেন ছুটবে ওরা? আর শহরে যাওয়াও চাট্টিখানি কথা নাকি? আজ না হয় হুস্ হুস্ ছুটছে সরকারি ট্রাক। এর পর বল্-বলতে তড়ি-ঘড়ি শহরে যাওয়া সহজ হবে মনে ভেবেছ? মোটেও নয়। আজ যদি সৎশেটা থাকত! ছেলেটা থাকলে আর কোন ভাবনাই ছিল না। বড় মাথা ছেলেটার, বড় এলেম! তা না হলে এতবড় কাণ্ডটা করে বসতে পারে কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে?

মঙ্গলা কিন্তু খুব খুশি হয়েছে সতীশের সাফল্যে। একদিন হঠাৎ দ্বিজপদকে ঢিপ করে প্রণাম করলে সতীশ, বললে, কাল আমি চলি যাব বাবা, একটা চাকরি পায়ে গেছি।

—চাকরি? কিসের চাকরি?

একখণ্ড টাইপ করা কাগজ দ্বিজপদর চোখের সামনে মেলে ধরে সতীশ বলে, ডাইভারের। জিপ চালাবনে কাল থিকে।

অবাক কাণ্ড। ইতিমধ্যে লুকিয়ে গাড়ি চালানো শিখে ফেলেছে সতীশ, ছগনলালকে খোশামোদ করে। লুকিয়ে লুকিয়ে ড্রাইভারি লাইসেন্স করিয়েছে। চাকরির ইন্টারভিয়ু দিয়েছে! লাইসেন্সের তারিখ দেখে প্রথমে নিতে রাজি হননি পরিবহন বিভাগের কর্মকর্তা। কিন্তু সতীশও ছোড়নেওয়ালা নয়, এঁকে ধরে, ওঁকে ধরে সুপারিশ করিয়েছে। পরীক্ষাও দিয়েছে নির্ভুল! উদ্‌বাস্তু সে—তাই চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হয়েছে তার।

সব শুনে গুম হয়ে রইল দ্বিজপদ। মঙ্গলা খুব খুশি হয়েছে কিন্তু। গাঁয়ে তো এতঘর লোক আছে, কই কার ছেলে এমন সম্মানজনক চাকরি করছে বল? তাছাড়া সতীশ গাঁ-ছাড়া হয়ে একপক্ষে ভালই হয়েছে। না হলে নবীন যুগীর ঐ ধিঙ্গি মেয়েটার সঙ্গে সতীশের নাম জড়িয়ে যেসব কুৎসা রটতে শুরু করেছিল, মঙ্গলার ভয় হয় তার সমাপ্তি হয়তো হত একটা খুনোখুনিতে। মঙ্গলা খুশি হওয়ায় আরও চটে উঠেছিল

বুড়ো। ভাল করে কথাই বলেনি কিছুদিন। তারপর তার রাগও জল হয়ে গেল একদিন। খাঁকি ফুলপ্যান্ট পরে সতীশ একদিন এল বাড়িতে—বুড়োর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলে একটা খাম।

—উতে কী?—প্রশ্ন করলে বুড়ো।

—এ মাসের মাইনে।

রাগ জল হয়ে গেল বুড়োর।

নবীন যুগীর পরিকল্পনা একটু অন্যরকম। উদ্‌বৃত্ত অর্থ হাতে এলে আর যাই করুক তাঁত সে কিনবে না। ঠিকই বলেছিল ছিনিবাস। তাঁতে পেট ভরে না। তাছাড়া এ অঞ্চলে কে জোগান দেবে সুতো? কেই বা বেচবে পাঁচ হাট ফিরি করে? উদ্‌বৃত্ত অর্থ সত্যিই যদি হাতে আসে তাহলে আর একখানা ঘর তুলবে নবীন। দিন দিন সংসার যেন চারদিক থেকে চেপে ধরছে তাঁতি বুড়োকে। দেশঘর ছাড়ার আগেই মা ষষ্ঠীর কৃপায় ঘরে তার নিঃশ্বাস ফেলার ঠাঁই ছিল না। ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা বেড়েছে আরও চারটি। নবীনের সর্বনাশের মূল ঐ সর্বাণী। একের পর একটি সন্তান উপহার দিয়ে চলেছে ওকে। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তার উপর জুটেছে ছিনিবাসের সংসারের দায়িত্ব। ছিনিবাস তেজ দেখিয়ে বাপের সঙ্গে পৃথগন্ন হয়েছিল। সেই ছিনিবাসও দাঙ্গায় ফৌত হল! তাই বলে তো পুত্রবধূকে ফেলে দিতে পারে না? একা বুড়ো আর কতদূর সামলাবে? অবশ্য বড় ছেলেটা বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। আনন্দ ছেলেটাও ভাল—ছিনিবাসের মতো স্বার্থপর নয়। বেশ দশাসই চেহারাটা বাগিয়েছে পেটে না খেয়েও। বছর আঠারো বয়স হল আনন্দের। হ্যাঁ, তা হল; রাধার চেয়ে মাত্র চার বছরের ছোট। মাঝে একটা ছিল, মারা গেছে। নবীনের বাসনা—ভাল ফসল হলে আর একখানা ঘর তুলবে। ওর রাবণের গুষ্টির মাপে তো সরকারি বাড়ির নকশা তৈরি হয়নি। তাও তো ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। দণ্ডকারণ্যে পদার্পণ করেই মানা শিবিরে সর্বাণীর শেষ অবদানটি মারা গেছে। মাত্র কদিনের শিশু।

সমস্যা হয়েছে রত্নাকরের ঘরে। পরিবারে কুল্লে তো চারটি প্রাণী। চার-জনের চাররকম মত। এ মরশুমে ভাল ফসল হলে বাড়তি টাকাটা নিয়ে ওরা কী করবে কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারে না। গুলাব বউয়ের ইচ্ছে আরও জমি কেনে, কর্মকার তো বেচতেই রাজী। মনুয়া বলে, আরও জমি নিয়ে কী হবি? চষবেটা কে? আমি তো একামানুষ। বেতো দাদু তো আর লাঙল ধরতি পারবেনি, আমার একার তরে একুশ বিঘিই ঢের।

গুলাব জবাব দেয় না। তার মনের কথা মনেই থাকে। সে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে, তার মন বলছে...না, মনের কথা সে কাউকে বলবে না। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়, যদি গোপন রাখতে পার তুমি।

রতন নাতির কথা শুনে খেপে যায়। বলে, বটেরে তেজার বেটা মহাতেজা! বড় লায়েক হইছিস তুই, নয়? ধরতো আমার পাঞ্জা।

মনুয়া এসে চেপে ধরে ঘোষবুড়োর বাঘের থাবার মত পাঞ্জা।

আশ্চর্য! নীলচে শিরওঠা সাদা লোমে ভর্তি হাতটা নেমে এল ধীরে ধীরে। অনায়াসে মনুয়া বাঁকিয়ে দিল রত্নাকর ঘোষের পাঞ্জা!

অবাক হয়ে রতন বলে, তাজ্জব!

—তাজ্জব কিছুই লয়, তোমার বয়েস আর আমার বয়স, একবার হিসেব করি দেখ কেনে।

হায় শিব! হায় বুড়োরাজা! রত্নাকর ঘোষ কি বুড়ো হয়ি গেল এতদিনে?

না, আর জমি নয়, আর লাঙলের মুঠ সত্যিই ধরবে না রতন। যা পারে নাতিই করুক। রতনের ইচ্ছে এ মরশুমে ভাল ধান হলে সে বড় করে একটা ঢেঁকিশাল তুলবে। পাঁচবাড়ির মেয়েরা এসে ধান ভেনে যাবে সেখানে। রতন বুড়ো বাইরে বসে তামুক খাবে আর শুনবে ঢকাঢাঁই ঢকাঢাঁই।

মনুয়ার মা প্রতিবাদ করে, ঢেঁকিশাল হলি কি ভাগ্য বাড়বি মোদের?

রতন জবাব দেয় না। গুলাব হাসে বলে, সে তুমি বুঝবা না বউ।

রতন গুলাব বউয়ের দিকে চেয়ে হাসে। গুলাব বউ ছাড়া কে বুঝবে তার মনের কথা?

নবাপালের ইচ্ছাটাও দ্বিজপদের অনুরূপ। সেও বলছে শেষ পর্যন্ত চাষের জমি সে রাখবে না। চাষবাস তার আসেও না। এ বছরটা শ্বশুর-জামাই দুজনে মিলে খাটবে জমিতে—যৌথখামারের কালে। দু ভাগ ফসল পাবে তাহলে। তারপর ফসল ঘরে উঠলে সে ছেড়ে দেবে চাষের কাজ। খুলে বসবে তার সাতপুরুষের পৈত্রিক ব্যবসা। কুম্ভকারের কারবার। পাঁচগাঁয়ে মাটির তৈজস সরবরাহ করবে। তার ছেলেও লায়েক হয়ে উঠেছে এতদিনে। শুধু ছেলে নয়, জামাই রসময়ও আছে। রসময় এই সংসারেই থেকে গেছে বরাবর। বছর ত্রিশেক বয়স হল তারও।

যগন্দ, ছিদাম, হরিহর, রাখহরি, গোবর্ধন এদেরও আছে নিজ নিজ পরিকল্পনা। কেউ তুলবে একটা গোয়ালঘর, কেউ রান্নাঘর, কেউ বা স্থির করেছে করোগেট টিনের উপর টালি টাপাবে আগামী মরশুমে, কেউ বলছে মেঝেটা পাকা করে নেবে, পারলে। চাষ শুরু হয়নি, চাষের সরঞ্জামও এসে পৌঁছায়নি এখনও—তবু ওরা মনে মনে সোনালী স্বপ্ন দেখছে—ফসল-তোলার পরের কথা চিন্তা করছে।

একমাত্র ব্যতিক্রম দিবাকর পণ্ডিত।

অথচ যৌথ চাষের পরিকল্পনাটা তারই মাথায় এসেছিল প্রথম।

দিবাকর কোন চিন্তা করে না। চিন্তা করে—সে শুধু অতীতমুখী স্মৃতি-চারণ, ভবিষ্যতের কথা আর ভাবে না। যৌথচাষের পরিকল্পনাটা রূপায়িত করতে যা কিছু করা উচিত তা কিন্তু করে যাচ্ছে ঠিকই—নিরাসক্তভাবে। নিজের বলতে কী বাকি রইল তার? শূন্যঘরের দিকে তাকিয়ে সে যেন সব, আশা, সব প্রত্যাশা হারিয়ে ফেলেছে। যাকে ঘিরে তার সোনালী স্বপ্ন গড়ে উঠছিল তিল তিল করে সে নেই। উমা নেই ঘরে।

উমা আর দিবাকর। স্বামী-স্ত্রী! ভাবতেও অবাক লাগে। তবু তা মেনে নিয়েছিল কমলপুর গাঁয়ের প্রাক্তন অধিবাসীরা। কী নাকি আইন হয়ে গেছে। এমন বিবাহ নাকি আজকাল আইনসম্মত। খিস্টানি বিয়ে নয়, হিঁদু-বিয়ে। আসলে তাও শুধু নয়, ওরা আপত্তি করেনি—কারণ ওরা দিবাকরকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে উমাকে। তাই কোন অসুবিধা হয়নি সেদিক থেকে। বরং আপত্তি ছিল সরকারি দপ্তরখানায়। যেহেতু ক্যাম্পবাসী নয়, তাই প্রথমে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন দিতে রাজি ছিলেন না তাঁরা। অবশ্য

জাহ্নবী এবং উমা ক্যাম্প-ডি.পি.। ইতিপূর্বে কোনও পুনর্বাসন ঋণ ওঁরা নেননি। তাই শেষ পর্যন্ত ওদেরও পাঠান হল এখানে। জাহ্নবী কিন্তু আসেননি। তিনি বেলেঘাটা বস্তি থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন। কাশীধামে চলে গিয়েছিলেন বাকি জীবনটা সেখানেই বিকিয়ে দেবেন বলে।

রায়পুরে নেমে মানা শিবির। সেখান থেকে মাকরেল ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প। লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পের উদ্‌বাস্তু দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল সেখানে। কমলপুরের প্রাক্তন অধিবাসীরা আপত্তি করেনি। রসিকলাল শিরোমণি, যিনি ছিলেন কমলপুরের সমাজের মধ্যমণি, তিনিও মেনে নিলেন ওদের এ সম্পর্ক। দিবাকর আর উমা, স্বামী-স্ত্রী। দুনিয়া মেনে নিল—নিল না শুধু উমা।

আজও অবাক হয়ে ভাবে দিবাকর, কেন উমা ধরা দিল না শেষ পর্যন্ত। এক তাঁবুতে থাকত ওরা—পাশাপাশি ঘুমাত রাত্রে পৃথক শয্যায়। দণ্ডকারণ্যে এসে একটু উন্নতি হয়েছিল উমার স্বাস্থ্যের। জ্বরটা বন্ধ হয়েছিল। এক আধটু ওঠা-হাঁটাও করতে পারত। হয়তো নতুন জল-আবহাওয়ায় এই পরিবর্তন। গ্রুপ-লিডারি করে কিছু পয়সাও এসেছিল হাতে। চিকিৎসা না করালেও দুধ-ডিম-ফল-মূল খাওয়াবার চেষ্টা করত। বেশ উন্নতি হয়েছিল উমার। রান্নাটা সেই করত—বাসনও মাজত—ঘরের টুকিটাকি কাজ সারত ধীরে ধীরে। তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল দুজনের ছোট্ট তাঁবুর সংসার। বাইরে থেকে দেখলে কে বলবে রাত্রে দুজনের শয্যার মধ্যে দু হাতের ব্যবধান থাকে।

সদ্য বিবাহিত দম্পতির সংসারে বাইরে থেকে যা কিছু দেখা যায় তার সবই নজরে পড়ত। গল্প করত দুজনে সুযোগ পেলেই, হাসি-কান্না-মান-অভিমান সবই ছিল। অথচ যে বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠে নবদম্পতির প্রেমসৌধ, সেই রাত্রের আড়াল-করা গোপন জীবনের কোন স্বাদ পায়নি ওরা দুজন। সে কথার কোন ইঙ্গিত দিলেই যেন খেপে উঠত উমা। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করে তুলত দিবাকরকে।

কোনদিনই বোঝা যায়নি মেয়েটাকে—কিন্তু জাহ্নবী চলে যাওয়ার পর সে যেন একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। কেন এত আপত্তি উমার? দিবাকর তো তাকে অনুষ্ঠান মতো বিয়েই করতে চায়। হিন্দু-বিবাহ বল তাই, রেজিস্ট্রি-বিবাহ বল তাতেও রাজি। অথচ সে প্রসঙ্গ তুললেই জ্বলে উঠত উমা।

হয়তো এভাবেই কেটে যেত ওদের জীবন—কিন্তু তা গেল না। মাকরেল ক্যাম্প থেকে যেদিন ওদের পারালিকোট আসার কথা সেদিনই হঠাৎ কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ল উমা। বাধ্য হয়ে মোবাইল য়ুনিটের ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনল দিবাকর। দণ্ডকারণ্যে এসে এই প্রথম ডাক্তার দেখান হল তাকে। পরীক্ষা করে বিব্রত হয়ে পড়লেন ডাক্তারবাবু। হঠাৎ সরকারিভাবে জানাজানি হয়ে গেল এই চিররুগ্না মেয়েটি যে রোগে ভুগছে—তার নাম যক্ষ্মা। সরকারি আইনে যক্ষ্মা রোগীর স্থান নেই নতুন-পত্তন-করা গ্রামে। উমার যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। গ্রামে তার যাওয়া হল না। গ্রামে তো যাবে না, ক্যাম্পও খালি হয়ে গেল—তাহলে মেয়েটি যায় কোন চুলোয়?

শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান সাহেবের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একটা ফয়সালা হল। কাঁকেতে একটি প্রাচীন মিশনারি হাসপাতাল আছে। তাঁদের একটি পৃথক টি. বি. ওয়ার্ড আছে।

চেয়ারম্যান সাহেব ব্যক্তিগত চিঠি দিলেন ফাদার মার্লোকে—কাঁকের হাসপাতালের মিশনারি কর্মকর্তাকে। তাঁরা রাজি হলেন রোগীটিকে গ্রহণ করতে।

উমা চলে যাবে। যাক। তাই বলে এমন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ছে কেন জীবন? উৎসাহ পাচ্ছে না কেন কাজে? রোগজীর্ণ উমাকে খরচের খাতায় লিখেই তো এসেছিল এ অরণ্যবাসে। নতুন করে গ্রাম গড়ে তুলবার সংকল্প করেছিল মনে মনে। কমলপুর গাঁয়ে যে স্বপ্ন ওর সার্থক হয়নি, আশা করেছিল সেই স্বপ্ন ওর সার্থক হয়ে উঠবে এই নতুন পরিবেশে। নিদাগ শ্লেটে লিখবে নবজীবনের বাণী। মনে পড়ে নিশীথদার কথা, জেলে বসে বসে যা বলতেন তিনি। ভারতবর্ষ সেই স্বাধীন হল, কিন্তু কই নিশীথদার ভবিষ্যদ্বাণী তো সফল হল না। নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে কই উদ্‌বন্ধনে অন্তিমগতি হল না তো দেশের সর্বনাশের। শাসনব্যবস্থায় এমন কিছু পরিবর্তন তো লক্ষ্য করা যাচ্ছে না—উচ্চকোটির মানুষ উঠছে আরও উঁচুতে, মিলিওনেয়ার হচ্ছে মাল্‌টিমিলিওনেয়ার, লক্ষপতি—কোটিপতি; কিন্তু সাধারণ মানুষের কী হাল? মনে পড়ে মোল্লাহাটির বরকতুল্লার সেই গেঁয়ো প্রশ্নটা 'ইংরেজ আর মোর কী ক্ষেতি করিছে কন? যা ক্ষেতি করলে তা তো আপনকার রায়চৌধুরী আর আমাগো খালেক ছাহেব। অ্যাদের হাত থিকে দ্যাশটা কবে আজাদী পাবে তাই কন ক্যানে।' জমিদার আজ নেই কিন্তু অস্তিদল ও নাস্তিদল আছে—হ্যাভ আর হ্যাভ-নট দলের ফারাকটা আরও বেড়ে যাচ্ছে! স্বাধীনতার উষা-মুহূর্তেই অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে বাঙলার—এবং তারপর সেই পঙ্গু অঙ্গহীন রাজ্যের উপর পড়েছে এলোপাতাড়ি মার—ডাইনে বাঁয়ে, আজ দশ-পনের বছর ধরে।

তারাপ্রসন্ন একদিন বলেছিলেন : ইংরেজি শিক্ষা প্রথমে গ্রহণ করে গত দুই শতাব্দী আমরা ভারতবর্ষের বাজারে নেতৃত্ব করেছি। রামমোহন থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত আমরা আজ যা চিন্তা করেছি বাকি ভারতবর্ষ তা চিন্তা করেছে তার পরের দিন। সত্য সে কথা। কিন্তু আমরা খেয়াল করছি না—এ দুশো বছরে আমাদের প্রতিবেশীরাও এগিয়ে এসেছে—আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছি। এখন আমরা সমানসমান চলেছি; কিন্তু জাত্যভিমানটুকু তেমনিই আছে। নেতৃত্ব ছেড়ে মোড়লি ধরেছি আমরা। ডাইনে ছাতুখোর খোট্টা—মেড়ো, বাঁয়ে অজ বাঙাল, নিচে উড়ে ভূত—আর মাঝখানে অমৃতের সন্তান আমরা বাঙালি। হয়তো সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার দিনই এসেছে এবার।

দিবাকর সেদিন ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু পুববাঙলা কি সত্যিই আলাদা হয়ে যাবে? মার খেতে হবে আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে?

তারাপ্রসন্ন এড়িয়ে গিয়েছিলেন সে আলোচনা। বলেছিলেন—আমরা ইতিহাস আলোচনা করছি দিবাকর—জ্যোতিষ নয়।

সেদিন এ প্রশ্ন ছিল ভবিষ্যৎ চর্চা আজ তা নয়। আজ তা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। তাই তারাপ্রসন্নের কাছে আবার এসে বলেছিল একদিন : বাঙালি জাতটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

তারাপ্রসন্ন আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। দুটি চোখেই ছানি পড়তে শুরু করেছে। শাস্ত্রপাঠ—যা নাকি তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল—তা-ও বন্ধ হয়ে গেছে। চোখে কিছু

কম দেখেন। সাদা ধপধপে চুল দাড়ি—মুনিঋষিদের মতো চেহারা হয়েছে এখন। প্রসন্ন হেসে তিনি বললেন : গোটা বাঙালি জাতটার কথা না হয় নাই ভাবতে বসলে দিবা। এখানে আমরা যে হাজার তিন-চার নিরীহ প্রাণী এসেছি, তাদের কথাই চিন্তা করা যাক বরং।

—কিন্তু কাগজে দেখছেন তো আসাম থেকে বাঙালিদের কীভাবে মেরে তাড়াচ্ছে? পুববাঙলায় বাস্তু হারিয়ে যারা এসে আশ্রয় নিয়েছিল ভারত-রাষ্ট্রেরই একাংশে তাদের সুপরিকল্পিতভাবে আবার বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে।

বিচলিত হয়ে পড়েন বৃদ্ধ, আমি তো কিছু জানি না বাবা। খবরের কাগজ তো আর পড়তে পারি না।

দিবাকর তখন আসামের সাম্প্রতিক ঘটনার একটা বিবরণ দেয়। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষা করতে এগারোজন শহিদের প্রাণদানের কাহিনী। নির্বিচারে একপক্ষের গুলিচালনার ঘটনা, অত্যাচারের বিবরণ, এবং ভারত-রাষ্ট্রের শাসনদণ্ড যাদের হাতে তাদের নির্বিকার ঔদাসিন্যের কথা!

স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন বৃদ্ধ পণ্ডিত।

প্রসঙ্গ বদলে দিবাকর বললে : বেশ, গোটা বাঙালি জাতটার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। পারালকোটে যে সাত-আটশ পরিবার এসেছে এদের ভবিষ্যৎ কেমন বুঝছেন?

তারাপ্রসন্ন আত্মস্থ হয়ে বলেন, সে কথাই ভাবছি কদিন ধরে। আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। কথাটা তুমি বড়-কর্তাদের কানে পৌঁছে দিতে পার দিবাকর?

উৎসাহ বোধ করে দিবাকর ঘনিয়ে আসে, কী কথা?

—তুমি তো জান, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় স্থির হয়েছে যত জমি হাঁসিল করা হবে তার চতুর্থাংশ দেওয়া হবে ভূমিহীন আদিবাসীদের। সেই অনুপাতে পারালকোটে বিরলবসতি আদিবাসী গ্রামগুলির প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সাহায্য পাওয়ার কথা। কারণ এখানকার আদিবাসীর সংখ্যা উদ্‌বাস্তুদের চতুর্থাংশের অনেক অনেক কম। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। এখানে যত জমি হাঁসিল করা হচ্ছে তা শুধু উদ্‌বাস্তুদের মধ্যেই বণ্টন করা হচ্ছে। হিসাব মিলিয়ে তার চতুর্থাংশ জমি নাকি দেওয়া হচ্ছে নারাণগাঁও না কোথায়। এখান থেকে শ'খানেক মাইল দূরে। প্রাদেশিক সরকার নাকি তাই চান। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।

—কেন?

—বুঝছ না? আমরা যেখানে উদ্‌বাস্তু গ্রামের পত্তন করছি তার আশে-পাশে আছে অতি নগণ্য কয়েকঘর আদিবাসী। আমাদের এই হারাণগাঁওয়ে আছে মাত্র ছয়ঘর মুরিয়া আদিবাসিন্দা। তাদের অবস্থাটা একবার নিজের চোখে দেখেছ দিবাকর? আমাদের এই পঞ্চাশঘর মানুষের পিছনে যদি দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করা যায়, তাহলে ঐ ছয়ঘর মুরিয়ার জন্য আর কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করা যায় না? নারাণগাঁওয়ে কী হচ্ছে তাতে আমাদের কী আসে যায়? আমরা চাইছি প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে; কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আমাদের নতুন গরু আসছে, চাষের বলদ আসছে,

বীজধান আসছে, কলমের আমগাছ আসছে, আর ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছে শুধু। ফলে ভেদাভেদের বীজ, ঈর্ষার বীজ রোপিত হয়ে চলেছে এখানে। যে স্বার্থান্বেষীর দল পরিকল্পনাকে বানচাল করতে চায় তাদের সুযোগ বেড়ে যাচ্ছে। ঐ আদিবাসীরা কিছুতেই আমাদের ভালো চোখে দেখতে পারে না। আজও আমরা নিঃস্ব, কিন্তু দুই এক বছর পরেই আমরা ওদের ডাকব আমাদের খেতে চাষ করতে—আমরা হব ভূম্যধিকারী আর ওরা মজুর। আবার দেখা দেবে শ্রেণীসংগ্রাম—একপক্ষে বিত্তশালী বিদেশি বাঙালি, অপরপক্ষে নিঃস্ব স্থানীয় আদিবাসী। এটা আমরা চাই না। আমরা উদ্‌বাস্তুরা চাই আমাদের নতুন জীবনের শুরুতে পড়ুক প্রতিবেশীর শুভেচ্ছাদৃষ্টি—ওদের নিচে ফেলে উপরে উঠতে চাই না—কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের দিয়ে তাই করাচ্ছেন। এর ফল কখনও ভালো হতে পারে দিবাকর?

দিবাকর বলে, আমি আর একটা কথা ভাবছিলাম। আমরা কি বাঙালি থাকব ভবিষ্যতে?

তারাপ্রসন্ন হেসে বলেন, তা কি বাঙলাদশেই থাকব আমরা? দু-তিন শ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় আর আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল যে ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অভিযাত্রী তাদের উত্তর-পুরুষ কি আজ কাঁদছে পা-ছড়িয়ে তারা অস্ট্রেলিয়ান কিংবা আমেরিকান হয়ে গেছে বলে? আর ইংল্যান্ডের মাটি কামড়ে পড়ে রইল যে অ্যাঙ্গল্‌স, স্যাক্সন্স, কেল্ট, ব্রিটন তারা আমেরিকান হয়নি বটে কিন্তু তাদের আদিসত্তা কি বজায় রাখতে পেরেছে তারা? ওরা সবাই মিলে আজ ইংরেজ—এরা সবাই মিলে আমেরিকান। তেমনি ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালি আর দণ্ডকারণ্যের বাঙালি কে কী হয়ে উঠবে তা কে জানে?

দিবাকর বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু...

তারাপ্রসন্নও বাধা দিয়ে বললেন, না, কোন 'কিন্তু' নেই এর ভিতর। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। সক্রেটিসকে বলা হয়েছিল—হয় আপনি আপনার মতবাদ ত্যাগ করুন, না হলে বিষপানে মৃত্যুবরণ করুন। জবাবে সক্রেটিস বলেছিলেন, মৃত্যু কী তা আমি জানি না, কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করা অন্যায় বলে জানি—তাই আমি অজ্ঞাত মৃত্যুকেই বরণ করে নেব, সজ্ঞানে মিথ্যাচরণ করব না। আমিও তাই বলি দিবাকর, দণ্ডকারণ্যের নতুন বাসিন্দারা তাদের বাঙালিত্ব হারাবে কি না তা আমি জানি না, কিন্তু ভিক্ষাপুষ্ট ক্যাম্পজীবন আঁকড়ে পড়ে থাকাকে আমি আত্মাবমাননা বলে মনে করি; তাই আমি অজ্ঞাত আরণ্যক জীবনকেই বরণ করে নেব, সজ্ঞানে আত্মার অবমাননা করব না!

★ ★ ★

চেয়ারম্যান সুকুমার সেন এসেছেন ওদের গ্রাম পরিদর্শনে। গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সবাই জমায়েত হয়েছে তাঁকে দেখতে। চেয়ারম্যান সাহেব ওদের সুখ-দুঃখের হিসাব-হদিস নিলেন। কাজকর্ম কেমন চলছে, জমি দেখে ওদের কী ধারণা হচ্ছে, কী কী অসুবিধা আছে এখনও। এরাও সবিনয়ে জবাব দিল একে একে। সব শেষে উনি প্রশ্ন করলেন, কী মনে হয় তোমাদের, বাঙলাদেশ থেকে আরও উদ্‌বাস্তু আসবে?

এরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। জবাব দিতে সাহস পায় না। চেয়ারম্যানসাহেব বাঙালি, সেদিকে অসুবিধা নেই; কিন্তু হাজার হোক উনি হলেন গিয়ে চেয়ারম্যান। এটুকু এরা শুনেছে—যত পাঞ্জাবি-মাদ্রাজি এমনকি খাস সাহেবও মাঝে মাঝে কাজ তদারক করতে আসেন এই বৃদ্ধ বাঙালি ভদ্রলোকটি তাঁদের সবার উপর বড়-সাহেব। জবাবটা একটু ভেবে-চিন্তে দিতে হবে বইকি।

চরণ মণ্ডল সবিনয়ে বলল, আজ্ঞে আসব। ডুল যখন বন্ধ করিছেন আপনেরা তখন আসব, নইলে যাব কই?

এ জবাবে চেয়ারম্যান সাহেব খুশি হলেন না সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল; তিনি বললেন—অর্থাৎ তোমরা বলতে চাও ক্যাশ-ডোল বন্ধ করে নানাভাবে পীড়ন না করলে ক্যাম্প ডি. পি.-রা এখানে আসবে না। জায়গাটা এতই খারাপ!

এ কী কথা! এ কথা তো বলতে চায়নি চরণ। সে যা বলল তার কি ঐ রকম অর্থ হয় নাকি? কী কেলেঙ্কারি! আরও গুছিয়ে কীভাবে বলবে বুঝ উঠতে পারে না। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে পিছন থেকে আর একজন। পোড়া আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রঙ, গলায় কণ্ঠী, একমাথা কাঁচাপাকা চুল। চার হাত লম্বা লোকটা হাত দুটি জোড় করে বলে, আজ্ঞে নির্ভয়ে নিবেদন করব দ্যাবতা?

—হ্যাঁ নির্ভয়ে বলবে বইকি—যা মনে আসছে বল, শুনতেই তো এসেছি।

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, আজ্ঞে পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয় তখন ভ্রমরকে আমন্ত্রণ করা লাগে না!

চেয়ারম্যান-সাহেব তাকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন : তোমার নামটি কী? দেশে-ঘরে কী করতে?

—আজ্ঞে ঠাকুর আমার নাম দিয়েছিল ছিনাথ। ছিনাথ মালাকার আজ্ঞে। দ্যাশে থাকতি মায়ের গায়ে অলঙ্কার গড়তাম দ্যাবতা।

সাহেব হেসে বললেন, বুঝেছি, এখানে মা নেই, তাই বাক্যবিন্যাসে অলঙ্কার প্রয়োগ করে অভ্যাসটা বজায় রাখছ!

অর্থ গ্রহণ হয় না শ্রীনাথ মালাকারের, বলে, আজ্ঞে?

—বলছিলাম কি, তোমার কথায় খুশি হয়েছি আমি।

একগাল হাসে মালাকার। যেন ভালুকে শাঁকালু খাচ্ছে। ঘাড়টি কাত করে আবদারের ভঙ্গিতে বলে, তাহলে আরও একটি বার্তা নিবেদন করি আজ্ঞে?

—বল।

—দ্যাখেন দ্যাবতা—গাঁয়ে কুয়া হল, পুকুর হল, মায় ইস্কুলও হল—অখন টুক কালীবাড়ি নাইলে গাঁ কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে। তাই বলতিছিলাম...

—কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তুমি মনের সুখে মায়ের গহনা গড়তে পার, কেমন?

—আজ্ঞে আমার অন্তরের গুপন কথাডা বলিছেন দ্যাবতা!

—তা বেশ তো—তোমরা সবাই যদি হাত লাগাও আমরাও খরচ দেব। কর, একটা কালীবাড়িই কর তোমরা।

খুশিতে উথলে উঠল লোকগুলো।

পরদিনই উঠে পড়ে লাগল ওরা! উৎসাহের অন্ত নেই ওদের। ঋতব্রত প্রমাদ গুনলে। উনি তো বলে খালাশ, কিন্তু এই সেক্যুলার সরকার মন্দির করার ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করবে তো? কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল চেয়ারম্যানসাহেব অত ভুলো মানুষ নন। তথ্যটা শুধু জানা নয়, খেয়ালও আছে তাঁর। তিনি হয়তো আন্দাজ করেছিলেন, একটা ঠাকুরবাড়ি না হলে ওদের গ্রাম্য জীবন দানা বেঁধে উঠবে না। বেসরকারি দানের মাধ্যমে কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি।

পাকা মন্দির হতে সময় লাগবে। উৎসাহী মানুষগুলো কিন্তু সবুর করতে নারাজ। শুভকার্যে বিলম্ব করতে নেই। হাতে হাত লাগিয়ে রাতারাতি ওরা তুলে ফেলল একটা খড়ো-চালা। কালীপ্রতিমা আনতে হবে—সেটাও সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু না, ওরা দেরি করতে নারাজ। মা কালীর একটি পট এনে প্রতিষ্ঠা করা হল মাটির বেদির উপর। কমলপুরের ফেলে আসা অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামে মায়ের নামকরণ হল—আনন্দময়ী!

শ্রীনাথ মালাকার ভারি খুশি। সরমা-চুমকি মোমভিরাজের পুঁটলি বার করে অনেকদিন পর স্বামী-স্ত্রীতে ওরা গহনা গড়তে বসে। কিন্তু তার চেয়েও খুশি হয়ে উঠলেন তারাপ্রসন্নের আশ্রিত শিরোমণি মশায়। ঠাকুর হলে পূজারী লাগে। কেউ তাঁকে কিছু বলেনি, উনি নিজেই নিজেকে মনে মনে নিযুক্ত করলেন মায়ের পূজারী পদে। দুটি পাই খোঁড়া হয়ে গেছে শিরোমণির। কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়েছে একেবারে। এতদিনে একটা মনের মত কাজ পাওয়া গেল। তিন পুরুষের পূজারী তিনি আনন্দময়ী মায়ের—এতদিন পরে মা সন্তানের মুখ চেয়েছেন। আবার ফিরে এসেছেন তিনি সন্তানের কাছে।

রাতারাতি তৈরি হয়ে গেল এক মন্দির কমিটি। মন্দিরের আদায়-পত্র হিসাব রাখবে তারা। মন্দির গঠনের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে।

ব্রাহ্মণী শিরোমণিকে বললেন, কই, তোমাকে তো নিল না কমিটিতে?

শিরোমণি সত্যিই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এজন্য; কিন্তু কী জানি কেন গৃহিণীর কাছেও সেটা স্বীকার করতে লজ্জা হল। তাই বললেন, আরে আমি হ্য পুরোহিত, বুঝলে না। পূজারীর পক্ষে কি মন্দির-কমিটির মেম্বার হওয়া ভাল দেখায়? যেমন হেডমাস্টার, সে কি কখনও ইস্কুল-কমিটির মেম্বার হয়? অথচ সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তো হেডমাস্টারেরই।

শিরোমণি-গৃহিণী যুক্তিটা ঠিক অনুধাবন করলেন না। বলেন, তা নয়, তোমাকে ওরা পাত্তা দিতে চায় না। খোঁড়া মানুষ তো?

রসিকলাল চুপ করে যান। এ বড় ব্যথার স্থান তাঁর। হ্যাঁ, তিনি পঙ্গু। আজন্ম পঙ্গ ছিলেন না—তাই অঙ্গহানিজনিত অবহেলাটা বড় বাজে আজও। এই পরনির্ভরশীল জীবন যেন সত্যিই অসহ্য তাঁর পক্ষে। তারাপ্রসন্ন নিজেই সরকারের পোষ্য; অথচ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তিনি তাঁর পোষ্য। তারাপ্রসন্ন অবশ্য মাটির মানুষ; তাঁর পুত্রবধূটিও ভারি সরল। শিরোমণিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করে; কিন্তু তবুও যেন কেমন কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন রসিকলাল। বর্ডার স্লিপটা যদি খোয়া না যেত তাহলে তিনিও পুনর্বাসন ঋণ পেতে পারতেন। না, চাষ-আবাদ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—নিজে হাতে চাষ করেননি তিনি কোনদিন। তবু লোন পেলে একটা দোকান খুলেও তো বসতে পারতেন গাঁয়ে। গাঁয়ে না হলে আদিবাসী গাঁয়েও বসতে পারতেন দোকান খুলে। ঐ তো অমূল্য সাহা।

বাড়ুগাঁও ওয়ার্ক-সেন্টারে দোকান খুলে বসেছিল। ক্যাম্পের সব লোক একদিন পুনর্বসতি পেয়ে চলে গেল ক্যাম্প ছেড়ে। অনেক রক্ত জল করে অমূল্য যে দোকান খুলে বসেছিল তার মায়া কাটাতে পারল না বেচারি। শুধু ক্যাম্পের বাসিন্দরাই তো নয়, আশপাশের পাঁচ-গাঁয়ের আদিবাসীরাও যে ওর খরিদ্দার। গোণ্ড আর ভাত্রা আদিবাসীরা। অমূল্য সাহা দোকান আঁকড়ে পড়ে আছে। বাড়ুগাঁওয়ে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে। হাটের দিন তিনশ সাড়ে তিনশ টাকার সওদা বিক্রি হয়। হপ্তার বাকি ক'দিন প্রায় শতখানেক টাকার। দিব্যি চলে যাচ্ছে ওর সংসার। শুধু কি অমূল্য সাহা? দণ্ডাপলিতে সদাশিব মিস্ত্রিও দু পয়সা করে খাচ্ছে। তারও খরিদ্দার সব আদিবাসী গাঁয়ের মানুষ। বর্ডার স্লিপটা থাকলে স্মল ট্রেডার্স লোন নিয়ে রসিকলালও অমনি একটা দোকান খুলে বসতে পারতেন। এমন পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত না তাঁকে।

পরদিন—ষোলো আনার ডাকে সবার আগে গিয়ে হাজিরা দিলেন রসিকলাল শিরোমণি। কপালে রক্তচন্দনের একটি ফোঁটা দিয়েছেন, কাঁধে ফেলে এসেছেন একটি এণ্ডির চাদর। চৌধুরী কর্তা দিয়েছিলেন এটি। মায়ের চালাঘরের সামনে মিটিং হবে স্থির ছিল। মন্দির কমিটির মেম্বারদের নাম আপোষে ঠিক করা হয়েছিল—ষোলো-আনার ডাকে সেটা পাকা করে নিতে হবে। তাছাড়া গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। চাষের বিষয়েও কথাবার্তা হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দত্ত-সাহেব বলেছিলেন তিনি নিজে আসবেন। তাই সকাল সকাল উৎসাহী রসিকলাল সবার আগে এসে হাজিরা দিলেন একটা রামপ্রসাদী ভাঁজতে ভাঁজতে—'মন তুমি কৃষি কাজ জান না; মানবজীবন রইল পতিত—'

প্রজেক্টের পাবলিসিটি ভ্যানটা আগেই এসে পৌঁছেছে : সিনেমা দেখানো হবে মিটিং -এর পরে। মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই একটা কর্কশ শব্দে গান থেমে গেল শিরোমণির। লাউড-স্পিকারে হিন্দি গান হচ্ছে। লোক জড়ো করবার উদ্দেশ্যে সূর্যাস্তের আগে থেকেই এভাবে সস্তা সিনেমার গান বাজানো হয়। ক্রাচদুটো নামিয়ে রেখে বসতে বসতে শিরোমণি বললেন, কী তখন থেকে 'হাম ভি দেখেঙ্গে হাম ভি দেখেঙ্গে' বাজাচ্ছ হে ছোকরা? বলি দেখবেটা কী? অ্যাঁ? কালীকীর্তন নেই তোমাদের? মায়ের নাম হোক না একখানা?

পাবলিসিটি অ্যাসিস্টেন্ট ছোকরা ছোট হাতচিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, কালীকেত্তন কোথায় পাব দাদু? ঠাকুরমশায় তা আপনি যদি একখানা গান—তবে ফিউচারের জন্যে রেকর্ড করে রেখে দিতে পারি।

শিরোমণি বলেন, ফিউচারের কথা তোমায় ভাবতে হবে না ছোকরা। ফিউচারে এ গাঁয়ে এলে আমিই তোমাকে অষ্টপ্রহর কালীকীর্তন শুনিয়ে দেব! মন্দির প্রতিষ্ঠা একবার হয়ে যাক না আজ!

একে একে লোক জমায়েত হয়। তারাপ্রসন্ন, দিবাকর, রতন, যগন্দ, ছিদাম এসে বসে।

একটু পরেই এসে গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেবের জিপ। উনি এসে বসলেন সভার মাঝখানে। থেমে গেল রেকর্ডের গান। ওরা গোল হয়ে ঘনিয়ে বসে। পারালকোটের এই সুদর্শন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরটিকে ওরা শুধু শ্রদ্ধাই করে না, ভালোবাসে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-সাহেব আলোচনার সূত্রপাত করেন। দিবাকর সকলের মুখপাত্র হিসাবে নানান অসুবিধার কথা বলল। টিনের ছাউনি করতে যে জে-হুক লাগে, বিটুমেন ওয়াশার লাগে তা কম পড়েছে। কাঠ ফুটো করবার যে অগার-যন্ত্র ছুতারেরা ব্যবহার করে—তা অনেকের বিকল হয়ে পড়েছে। সেগুলি মেরামত করানো দরকার। কুয়োর জলটায় কিছু পটাশ দেওয়ার প্রয়োজন। জমিবণ্টনের ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত। আর, গ্রামবাসী জানতে চায় লাঙল-বলদ-বীজধানের কী হল।

সাহেব একে একে প্রশ্নগুলির জবাব দিতে থাকেন।

আলোচনা এগিয়ে চলে নানা বিষয়ে। ক্রমে এল মন্দিরের প্রসঙ্গ। দত্তসাহেব বললেন, মায়ের পট তো প্রতিষ্ঠা করলেন আপনারা, এবার নিত্যপূজার একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

—আজ্ঞে তা তো করনই লাগে।

—তাহলে নিত্য-পূজারী নির্বচন করুন আপনারা।

শিরোমণি উসখুস করে ওঠেন। নিজে থেকে কথাটা বলা ভালো দেখায় না।

নেতাই বললে, পুজো করবেন আমাদের তারাপ্রসন্ন ঠাকুর। ওঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক আর পাব কই?

দত্ত-সাহেব বলেন, সে কথা ঠিক। আশা করি সকলেরই সায় আছে এতে?

গ্রামবাসী একবাক্যে সায় দিয়ে ওঠে। শিরোমণির মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি।

আপত্তি করলেন তারাপ্রসন্ন নিজেই, না আমি নই; নিত্যপূজার দায়িত্বভার নেবেন শিরোমণি মশায়।

—শিরোমণি? কোন শিরোমণি?

—রসিকলাল শিরোমণি। আমারই আশ্রিত খঞ্জ ব্রাহ্মণ!

দত্ত-সাহেব বললেন—না, না, সে হবে না। আপনার মতো সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত থাকতে এ দায়িত্ব অন্য কাউকে দেওয়া যায় না।

রাখহরি, নেতাই, যগন্দ এরাও সায় দিল। তারাপ্রসন্নই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তারাপ্রসন্নের একমাত্র পুত্রটি মারা গেছে। এ ছাড়া বৃদ্ধের অর্থাগমের আর কোন পথ নেই! আর রসিকলাল? সে তো তারাপ্রসন্নেরই আশ্রিত। সুতরাং সেও বঞ্চিত হবে না একেবারে। খোঁড়া মানুষ, বসে খাওয়া ছাড়া তার আর উপায় কী। ভগবান মেরে রেখেছেন বেচারিকে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরে যাবার প্রয়োজনই বা কী আছে তাঁর?

দত্তসাহেব প্রশ্ন করেন রসিকলালকে, আপনি নিজে কী বলেন এ বিষয়ে? আপনার পক্ষে রোজ পূজা করতে আসা সম্ভবপর হবে?

শিরোমণি গম্ভীর ভাবে বললেন, সে প্রশ্ন অবান্তর। ঠাকুরমশায় আমার বয়োঃজ্যেষ্ঠ, আমার আশ্রয়দাতা, পাণ্ডিত্যে তিনি আমার গুরুস্থানীয়—তাছাড়া সত্যিই আমি খোঁড়া মানুষ...

কথাটা শিরোমণির তখনও শেষ হয়নি, সবাই হৈ-হৈ করে উঠল, ঐ তো শিরোমণি মশায় নিজেই পুরোহিত হতে চাইছেন না।

—কেন বাবা খোঁড়া-মানুষকে কষ্ট দেওয়া?

—না, না, ন্যায়তীর্থমশায় পুরোহিত হবেন।

চোখ ফেটে জল ঝেরিয়ে আসে রসিকলালের। হ্যাঁ, তিনি খোঁড়া, তারাপ্রসন্ন ঠাকুরের মতো সংস্কৃত জানেন না—কিন্তু...

দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলেন শিরোমণি।

আলোচনা এগিয়ে চলে অন্যান্য বিষয়ে।

সভা শেষ হল। শুরু হল ডকুমেন্টারি সিনেমা! রসিকলাল ক্রাচ দুটি তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে সিনেমা দেখতে। শিরোমণি বাড়িতে পা দিতেই ব্রাহ্মণী ছুটে এসে বললেন, কেমন, হল তো? নাকে ঝামা ঘসে দিলে তো সবাই?

শিরোমণি কোন জবাব দেন না। লণ্ঠনের আলোটা তুলে ধরে ব্রাহ্মণীও অবাক হয়ে যান। হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে যায় তাঁর, কী হয়েছে গো? শরীর খারাপ হয়নি তো?

—হ্যাঁ, বিছানাটা পেতে দাও, শোব।

—সে কী, এখনও সন্ধ্যা-আহ্নিকই তো হয়নি তোমার।

ক্রাচ দুটো দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে শিরোমণি বলেন, আজ সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি।

বুকের মধ্যে গুর গুর করে ওঠে শিরোমণি-গৃহিণীর।

তারাপ্রসন্ন বাড়ি ফিরে খোঁজ করেছিলেন রসিকলালের। শুনলেন, শরীরটা অসুস্থ বোধ করায় শুয়ে পড়েছেন তিনি।

* *

ডায়েরি লিখছিল ঋতব্রত তার ক্যাম্পে বসে :

মৈমনসিং কি ঢাকা, যশোর কি বরিশাল কোথায় ঠিক জানি না আজ থেকে ত্রিশ- চল্লিশ বছর আগে একটি ছেলে মায়ের কোল ঘেঁষে আধো-আধো বোলে আবৃত্তি করত—

বাবা যদি রামের মতো পাঠায় আমায় বনে,
যেতে আমি পারিনে কি ভাবছ তুমি মনে?
চোদ্দ বছর কদিনে হয় জানিনে মা ঠিক,
দণ্ডকবন আছে কোথায় ঐ মাঠে কোন দিক;
কিন্তু আমি পারি যেতে ভয় করিনে তাতে
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে॥

বাবা পাঠাননি, পাঠালেন পিতৃতুল্য দেশনায়কেরা। বলা যেতে পারে, শিশুর স্বপ্ন সম্ভব হয়েছে। বনের মধ্যে গাছের ছায়ায় ওরা ঘর বেঁধে নিচ্ছে, সন্ধ্যাবেলায় আগুন জ্বেলে ওরা গোল হয়ে বসছে আঁধার রাত ঘনিয়ে এলে; আর শুধু মায়ের কথাই নয়, ছেড়ে-আসা মাতৃভূমির কথাও ওদের মনে পড়ে জোনাকজ্বলা সান্ধ্য স্মৃতিচারণে। হাজার হাজার লক্ষ্মণভাই সাথে নিয়ে ঐ যে পরিণত শিশুটি এখানে বনবাসে এসেছে

ওকে দেখবার জন্য আমিও এসেছিলাম। আজ থেকে একবছর আগে। অরণ্যবাসের একটি বছর পূর্ণ হল আজ, এই উনিশ শ' একষট্টি সালের আঠারই এপ্রিল। অনেক আশা-উদ্দীপনা নিয়ে এসেছিলাম এখানে; কিন্তু ক্রমশই যেন খেই হারিয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম, আর কিছু না পারি এদের সংগ্রামের কথাটা অন্তত লিখে যাব আমি। যাদের দেখেছি এখানে এসে। লিখে গেছি পাতার পরে পাতা—আজ সে পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টাতে বসে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। না হয়েছে ইতিহাস, না উপন্যাস। হাজার হাজার,—তাই বা কেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের হাসিকান্নার ইতিকথা এক নিঃশ্বাসে লিখতে বসে আমার এই দুর্দশা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল্য চুকিয়ে দিতে পুববাঙলার এই মানুষগুলি দেউলিয়া হয়ে গেছে। ওরা হারিয়েছে বাস্তু, আমরা পেয়েছি আজাদী। ওদের শান্তির নীড় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে;—দুঃখের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পুববাঙলা থেকে কাতারে কাতারে মানুষ একদিন এসেছিল আশ্রয়ের খোঁজে। হৃতসর্বস্ব, দেহে মনে লাঞ্ছিত, শ্রান্ত মানুষগুলি পালিয়ে এসেছিল কন্যা-জায়া-জননীর সম্মান বাঁচাতে। আমরা খেয়াল করিনি, আমরা তখন ব্যস্ত ছিলাম মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব আর আলোকমালায় গৃহদ্বার সাজাতে!

কাজের অবসরে যখনই সময় পেয়েছি গিয়ে বসেছি এদের কাছে। যেসব গ্রামের লোকে আমাকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বলে সনাক্ত করতে পারবে না সেখানে গিয়ে ওদের ঘরে রাত কাটিয়েছি ধুতি-পাঞ্জাবি চড়িয়ে—ওদের দাওয়ায় মুড়ির মোয়া চিবোতে চিবোতে ভাগ নেবার চেষ্টা করেছি ওদের সুখের, ওদের দুঃখের। এই ছন্নছাড়া মানুষগুলোর ছেড়ে-আসা গাঁয়ের কথা, ওদের ক্যাম্প-জীবনের কথা, ওদের দণ্ডকবনে ছুটে আসার কাহিনী শুনেছি আগ্রহভরে। যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। তবু আজ কী জানি কেন মনে হচ্ছে ওদের সব কথা জানা হয়নি—ঐ বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোর হৃদয়ের একেবারে ভিতর মহলে প্রবেশ করতে পারিনি। বৈঠখানায় বসে শুনেছি অন্দর-মহলের অস্ফুট গুঞ্জন। ফেলে আসা এক চিল্‌তে জমি, একটা সজনের গাছ, কিংবা পানা-ঢাকা ওড়-কলমির লতা দিয়ে ঘেরা একটা মজা-পুকুরের কী মূল্য তা আমি বুঝব কেমন করে? আমি তো ওদের সে জীবনের ভাগিদার নই, শরিক নই। ওই পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন, দিবাকর, রত্নাকর, দ্বিজপদ, নবীন, শ্রীনাথ মালাকার—কতটুকু চিনতে পেরেছি ওদের? কেমন করে ওদের মনের কথা লিখব আমি? বিলাতী উপন্যাসে পড়েছি—যুদ্ধ-ফেরত সৈনিকের মানসিক বিপর্যয়ের কথা। এরাও সবাই অমনি যুদ্ধ-ফেরত সৈনিক। মানুষের জীবনের মূল্য ওদের কাছে বদলে গিয়েছিল রাতারাতি। বীভৎস দাঙ্গার রাত্রে ওরা মানুষকে পিশাচ হয়ে উঠতে দেখেছে।

সেটাও বড় কথা নয়। মনে হয় তার চেয়েও বড় ক্ষতি হয়েছে পরের অধ্যায়ে। দীর্ঘ ক্যাম্প-জীবনের অস্বাভাবিকতায়। সেখানেই সমাজবোধের বনিয়াদ ধ্বংস যেতে দেখেছে ওরা। নিদারুণ অর্থাভাবে তিলে তিলে শুভবুদ্ধি বেচে প্রাণধারণ করেছে। সততার অর্থ হয়েছে—ধরা না পড়া; সতীত্বের সংজ্ঞা হয়েছে—অর্থাগমের পন্থাটা পাঁচকানে না ওঠা! বারো বছর একজন নির্দোষীকে কয়েদ করে রাখলে পাকা ক্রিমিনাল

হয়ে বেরিয়ে আসে সে। আর বারো বছর পি. এল. ক্যাম্পে ভিক্ষাঅন্নে জীবনধারণ করলে—থাক ও কথা!

এক ধরনের নিষ্ঠুর ভিক্ষুক সম্প্রদায় আছে যারা অসহায় পিতামাতার ক্রোড়চ্যুত, বাস্তুচ্যুত শিশুদের মাটির হাঁড়িতে আবদ্ধ রেখে পঙ্গু করে দেয়—তাদের বাড়তে দেয় না, বিকলাঙ্গ করে রাখে! ধরা পড়লে সেই ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের বিচার হয়, শাস্তি হয়! কিন্তু 'লিগালাইজড' পদ্ধতিতে যদি অমনিভাবে লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত শিশুকে দেহে-মনে কেউ বিকলাঙ্গ করে রাখে, বাড়তে না দেয়—তার বিচারকর্তা কোথায়? তার আসামী কারা?

বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পে দেখেছিলাম হাঁড়ির মধ্যে আটকে পড়া সেই হতভাগ্য মানুষগুলিকে। সার্ভে-রিপোর্টেড হিউম্যানিটিকে! তফাদারসাহেব একদিন বলেছিলেন : কোনও 'গেইনফুল অকুপেশনে' ওদের রাজি করাতে পারবেন না মশায়। সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম সেদিন। খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করেছিলাম তিন-চার ঘর লোককে। নিজের গ্রামে তারা ঘরামির কাজ করত। বেতের কাজ, বাঁশের কাজ করতে জানে, জানে টিনের চাল ছাইতেও। ক্যাম্পে টিনের ছাদ মেরামতির কাজ চলছিল তখন। কিন্তু কিছুতেই ওদের রাজি করাতে পারিনি। তিনটাকার জায়গার পৌনে সাতটাকা দৈনিক মজুরি কবুল করেও রাজি করাতে পারিনি। তফাদারসাহেব শুনে হেসেছিলেন : আরে মশায় ছ'টাকা বারো আনা কেন—দশ টাকা করে আগাম মজুরি মিটিয়ে দিলেও ওরা কাজে নামবে না! বুঝছেন না, আপনি যত টাকাই দিন না—আপনি তো দেবেন তিন-চার মাস। তারপর?

বোকার মত প্রশ্ন করেছিলাম, তারপর কী?

—তারপর তো আর তাকে পি. এল. রাখব না আমি। রোজগার করবার ক্ষমতা আছে প্রমাণিত হয়ে গেলে 'স্থায়ী পোষ্য' হবে কী করে? ডোলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা কেউ অত সহজে খোয়াতে চায়? পাঁচ-সাত বছরেই আমরা এদের করে তুলেছি এক সৃষ্টিছাড়া জীব। জানি না পৃথিবীর ইতিহাসে এমন শ্রেণীর জীব কোন যুগে কখনও ছিল কি না। দে আর এ ক্লাস অফ পারপিচুয়াল প্রফেশনাল লিগালাইজড বেগারস।

সেদিন মনে হয়েছিল হাঁড়ির বন্ধনী ভেঙে ওরা আর কোনদিন মানবিকতার মালভূমিতে উঠে আসতে পারবে না। যদি কোনদিন ওরা ওদের পঙ্গু দেহ-মন নিয়ে বেরিয়ে আসে তবে বসে পড়বে ফুটপাতে ন্যাকড়া বিছিয়ে—ভিক্ষায়!

তফাদার-সাহেব আজ কোথায় জানি না। জানলে তাঁকে ডেকে এনে দেখাতাম, বলতাম দেখুন, সেই মানুষগুলো আজ কেমন রাস্তায় মাটি কোপাচ্ছে, ঘর তুলছে, জমিতে আল বাঁধছে। অমানুষ ওরা হয়ে যায়নি আজও। যাদের উপর ওদের ভাগ্য নির্ভর করত তাদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে পি. এল. ক্যাম্পের মানুষগুলো আজ এক যুগ পরে প্রমাণ দিল, যে, তারা 'ভূতপূর্ব' মানুষ নয়,—'অভূতপূর্ব' মরদ!

★ ★ ★

মন্দির কমিটির মিটিং-এর পরদিন থেকেই রসিকলাল শিরোমণি নিরুদ্দেশ! চমকে উঠেছিল গাঁয়ের মানুষ। সেকী? কেন? অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত

আত্মঘাতী হল নাকি বিকলাঙ্গ মানুষটা? না, তা নয়। খবর পাওয়া গেল ছগলনালের ট্রাকে চেপে তাকে শহরের দিকে যেতে দেখেছে নেতাই। কিন্তু এমন কাউকে না বলে কেন গেল লোকটা? না, না-বলেও নয়। তারাপ্রসন্নের উদ্দেশে একখানি চিঠি লিখে রেখে গেছেন শিরোমণি।

—পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার অন্নে জীবনধারণ করিতে কোন কুণ্ঠা এতদিন বোধ করি নাই। আপনি মহৎ—আপনার দান গ্রহণ করিতে আর লজ্জা কী? কিন্তু কী জানি কেন, আর সহ্য করিতে পারিলাম না। গ্রামসুদ্ধ আমরা সকলেই দেশ-বিভাগের পর ভিক্ষু হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ সকলেই সেই ভিক্ষুকের জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চলিয়াছে—শুধু একমাত্র আমিই ব্যতিক্রম। আমার জন্য এখনও ভিক্ষা-অন্নেরই ব্যবস্থা দিলেন আপনারা। সে ব্যবস্থা আমি মানিয়া লইতে পারিলাম না। গ্রামে আমার স্থান হইল না—তাই গ্রামান্তরে যাইতেছি। ব্রাহ্মণীকে আপনার চরণাশ্রয়ে রাখিয়া গেলাম। স্বাবলম্বী হইতে পারিলে তাঁহাকে লইয়া যাইব! ইতি—

ভাগ্যহত রসিকলাল।

তারাপ্রসন্ন ঋতব্রতকে প্রশ্ন করেছিলেন, আন্দাজ করতে পারেন কেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল শিরোমণি ভায়া?

—সে কথা তো চিঠিতেই লিখে গেছেন উনি।

—না, লেখেনি। আসল কথাটা লেখেনি। একথা শিরোমণি লেখেনি যে, আমরা গ্রামসুদ্ধ লোক তার প্রতি অবিচার করেছি, অপমান করেছি তাকে। সেইজন্যেই তীব্র অভিমানে রাত্রের অন্ধকারে গ্রাম ত্যাগ করে গেছে রসিকলাল। মায়ের মন্দিরে পৌরোহিত্য করবার সেই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।

ঋতব্রত প্রতিবাদ করেছিল, এটা কী বলছেন আপনি? গ্রামে তারাপ্রসন্ন ঠাকুর উপস্থিত থাকতে?

দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিলেন তারাপ্রসন্ন, ঠিক তাই। মাতৃপূজার অগ্রাধিকার পাবে সবচেয়ে বড় ভক্ত, সবচেয়ে বড় পণ্ডিত নয়। তবে শুনুন ওর পুরো ইতিহাস—

অবাক বিস্ময়ে সে উপাখ্যান শুনেছিল ঋতব্রত। ধর্মান্ধ খোঁড়া ব্রাহ্মণের নির্যাতনের ইতিকথা। আবার ওর মনে হয়েছিল—এই মানুষগুলির বিচার করবার অধিকার তার নেই। ওদের জীবনের ভাগীদার না হতে পারলে শুধু উপর-উপর দেখে ওদের বিচার করতে পারত না সে। নবীন যুগীর বড় মেয়ের সঙ্গে ঐ কী যেন কর্মকারের ছেলের বিবাহ-প্রস্তাবে এই খোঁড়া মানুষটাই ঘোঁট পাকিয়েছিল। ঘরে ঘরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরে সকলকে বুঝিয়েছিল গ্রাম-পত্তনের মুখেই এমন অশাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে! এই গোঁড়া-খোঁড়া মানুষটার উপর কেমন যেন ঘৃণাই হয়েছিল হয়েছিল ঋতব্রতের। আজ তারাপ্রসন্নের কথা শুনে মনে হচ্ছে মানুষটাকে পুরোপুরি জানা হয়নি। শুধু রসিকলালই নয়,—ঐ যগন্দ, নেতাই, রাখহরি, হারান ওদেরও কি ঠিক মতো বুঝতে পেরেছে? ঐ বাক্যবাগীশ ছিনাথ মালাকার কেন এত কথা বলে তা কি ভেবে দেখেছে? ঐ হাড়-পাঁজরা সর্বস্ব বুড়োটার কথায় সেদিন ছেলেগুলো হাসাহাসি করছিল।

জীর্ণ মানুষটার আস্ফালন দেখে ঋতব্রতও হেসে ফেলেছিল প্রায়। হয়তো ঐ বুড়ো ঘোষের পিছনে পড়ে আছে তার অজানা দীর্ঘ ইতিহাস। দাওয়ায় বসে ছানিপড়া চোখদুটোর ওপর হাতের আড়াল করে বুড়ো হাঁকে, কে যায় রে? আনন্দ নাকি?

পথচারী ভ্রূক্ষেপও করে না। চলতে থাকে আপন মনে। বুড়ো মনে মনেই গজগজ করে, ইস্, কথা কইতে জান্ ট্যাসকো লাগে! মোড়ল নামটা শুধাল, তা বল্ কেনে?

লোকটা এতক্ষণে পিছন ফিরে চলতে চলতে দূর থেকে বলে, চোখে ছানি, দ্যাখতি পাওনি,—কিন্তুক্ মুড়লি টুক্ সবটাই আছে?

বুড়ো রতন ঘোষ খেপে যায়, বলে, মনুয়া, বৌমা—দ্যাখ তো হারামজাদাটা কার পোলা?

ঘরের ভিতর থেকেই ধমক দেয় ওর বউ, চুপ যাও না কেনে? বুড়ো হয়ি মরত্তি চল্‌লে, সবার কথায় টিক্‌টিক্ ক্যানরে বাপু!

বুড়ো আপনমনে, গজগজ করে। তার আস্ফালন দেখে হাসে সবাই।

ঋতব্রত ভাবে—কে জানে, ঐ বুড়ো রত্নাকর ঘোষের পিছনেও হয়তো পড়ে আছে বিরাট ইতিহাস। সেসব কথা জানলে আজকের ছোকরাগুলো হয়তো ঐ গলিত-নখদন্ত সিংহকে অমন খোঁচা দিতে পারত না!

না! এমন উপর-উপর আল্‌তো করে দেখে এদের কথা লেখা চলে না। ওদের নিবিড় করে জানতে হলে জীবনে জীবন যোগ করেই জানতে হবে—না হলে ব্যর্থ হতে বাধ্য তার গানের পশরা।

★ ★ ★

আহারান্তে বাইরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে চিত হয়ে শুয়েছিল সতীশ। রীতিমতো গুরুভোজন হয়েছে তার। মা যেন কী! টিপে টিপে একগাদা না খাওয়ালে স্বস্তি পায় না। দশ-পনের-বিশ দিন পরে সে বাড়ি আসে—আর মঙ্গলা যেন দশদিনের খাওয়া তাকে একদিনে খাওয়াবে। কিন্তু মাছ-পাতুরিটা সত্যিই বড় গ্র্যান্ড হয়েছিল আজ। কাপ্‌সি-নদীর টাটকা মাছ।

মঙ্গলাও একটা হাতপাখা নিয়ে এসে বসল মাদুরের একপ্রান্তে।

—বাবা ভাত খেয়েছে?—প্রশ্ন করে সতীশ।

—ও তো রেতে ভাত খায় না।

—ভাত খায় না? তো খায় কী?

—খই মুড়ি, যা জোটে। রেতে ভাত খেলি অম্বল হয়। বুড়ো হয়ি গেছে না?

একটু চুপ করে থাকে সতীশ। সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছে দ্বিজপদ। লোহাপেটা শরীর, কাঠামোটা শক্ত আছে তেমনি—কিন্তু পাকযন্ত্র জানান দিয়েছে বার্ধক্যের আগমন। তা হবে না? অতবড় দশাসই রত্নাকর ঘোষ—সেও শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল এতদিনে। চোখে দেখতে পায় না। কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে থাকে মেটে দাওয়ায়, পথ দিয়ে যেই যাক—ছানিপড়া চোখের উপর হাতের আড়াল করে বলে, কে যায়? রসময় নাকি রে?

সতীশ বলে, না জেঠা, আমি সতীশ।

—ও কম্মোকার! নাকি ডেরাইভার-সাহেব বলব, অ্যাঁ—বলেই হা-হা-করা হাসি।

ঘোষ মোড়লের আর সব গেলেও দরাজ বুকের হাসিটা ঠিকই আছে। ঘোষ ডাকে—তা চল্‌লে কুথা হে ডেরাইভার-সাহাব—শোন কেনে?

—না চলি জেঠা, কাজ আছে।

জ্বর গায়ে বুড়ো নড়াচড়া করতে পারে না—মানুষের সঙ্গ খোঁজে। অথচ কেউই এসে বসে না তার কাছে—সবাই কাজের মানুষ। তা অমন জাঁদরেল জোয়ান রত্নাকর যদি এমন হয়ে যায় তাহলে কর্মকারের আর বুড়ো হওয়া আশ্চর্য কী?

মঙ্গলা সতীশের চুলের মধ্যে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, তোরে টুক্ কথা বলব সৎশে?

একটা হাতের উপর ভর দিয়ে কাত হয়ে মাথাটা তোলে সতীশ, বলে, এত ভনিতা কেনে মা? একটা ছেড়্যা একশটা কথা কওনা, মানা করে কে?

মঙ্গলা হাসে, বলে, একটা কথা কইতেই সাহস পাই না, তার একশটা।

—কী বলবা বল?

—হ্যাঁরে, বুড়ো হয়ি মরতি চললম, তা আমারে দেখ-ভাল করে কে?

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। সতীশ উঠে বসে। মায়ের সামনে হাত দুটি নেড়ে বলে, অ্যা—অ্যাই! বিয়া দেবা, অ্যাই তো! সে গুড়ে বালি। বাবা বুড়ো হইছে, বুললে মেনে নিলম। কিন্তু তোর বুড়ো হওয়া এখনও ঢের বাকি।

—ও মা, কী পাগল রে তু! আমারও আড়াই কুড়ি বয়স হলনি?

—ইশ! আড়াই কুড়ি কখনও নয়। আমার চলছে তিশ—তোর তাইলে পঁয়তাল্লিশ।

—তা আড়াই কুড়ি আর পঁয়তাল্লিশ তো একই কথা। আমার একটা সখ-আহ্লাদ হবেনি? বল কেনে?

—সখ-আহ্লাদ?—একটু চুপ করে থাকে সতীশ, তারপর বলে, তু তো সবই জানিস মা।

এবার মঙ্গলাকেও একটু চুপ করে থাকতে হয়। জানে বইকি, সবই জানে। মায়ের প্রাণ, না-বোঝে কী? এতটুকু বেলা থেকে দুটিতে মানুষ হয়েছে। খেলাঘরের বর-বউ ওরা। আজও ভুলতে পারেনি সে কথা। সর্বাণী তো রাজিই ছিল—কিন্তু নবীন যুগী যে একেবারে খড়্গহস্ত। তাছাড়া দ্বিজপদও এখন বেঁকে বসেছে। নবীনের কথায় খেপে গেছে কর্মকার—অত জাতের বড়াই কিসের? গলায় পৈতে চড়িয়ে বুড়োটা কি নিজেকে বামুন ভাবে নাকি? দেবে না ছেলের বিয়ে ওখানে। নবীনের ঐ ধিঙ্গি মেয়েটা থাক খুবড়ো হয়ে। শেষমেশ বাপের গলার ঐ পৈতে-গাছি নিজের গলায় জড়িয়ে ঝুলে পড়বে একদিন। সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে দ্বিজপদ। তাছাড়া শিরোমণি মশায় উপর-পড়া হয়ে বলে গেছেন এসব অনাচার চলবে না! নতুন পত্তন হচ্ছে গাঁয়ের। শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হচ্ছে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে। প্রতিদিনই বাস্তুপূজো হচ্ছে প্রায়। ঈশান কোণের শালখুঁটিতে মন্ত্রপূত ধনুক বেঁধে দিচ্ছে তেল সিঁদুর মাখিয়ে। নতুন হাটের পত্তন হল ছোট-কোৎরিতে। পাঁচগ্রামের আদিবাসী প্যাটেল এসে মায়ের পূজা চড়াল। পাঁচটা নারকেল ফাটিয়ে অনুমতি চাইল দেবীর। দেবী খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন প্রতি রবিবার

হাট বসবে কোৎরিতে। মন্দিরের পত্তন হল। পট বসানো বেদিতে আনন্দময়ী মায়ের মূর্তিগড়ার অর্ডার দেওয়া হয়েছে. নতুন ইস্কুলবাড়ি প্রতিষ্ঠা হল এই সেদিন। পুকুর এবং কুয়াও দেবতার নামে উৎসর্গ করা হবে শেষ হলেই। তারাপ্রসন্ন ব্যবস্থা দিয়ে যান, পঞ্জিকা হাতড়ে দিন স্থির করেন। শিরোমণি মশায় তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখতেন কোথা দিয়েও যেন কোন অনাচার প্রবেশ না করতে পারে গ্রামপত্তনের এই শুভ মুহূর্তে। শনি তো এইসব ছিদ্রই খোঁজেন চিরকাল। কোথায় কে বাসি কাপড়ে মায়ের মন্দিরে ঢুকল, কোথায় কোন জল-অচল জাত উঠে এল ব্রাহ্মণের দাওয়ায় অমনি গাঁয়ের দিকে একটা পা এগিয়ে এলেন শনিঠাকুর। তাই শিরোমণি সদা সতর্ক। ঠিক এই সময় তাঁর জবাফুল-গোঁজা কানে সংবাদ এসে পৌঁছাল কর্মকারের ছেলের সঙ্গে তাঁতি মেয়ের একটা সম্বন্ধ পাকছে। অসবর্ণ বিবাহ! হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন শিরোমণি। ক্রাচে ভর দিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এলেন জনে জনে, শুধু তোমাকেই বলছি ভায়া। কর্মকার আর যুগীকে বারণ করে দিও। এ অনাচার ধর্ম সইবে না।

সে সব কথা অজানা নয় সতীশের। আজ অবশ্য শিরোমণি নিরুদ্দেশ—কিন্তু সর্বনাশ যা করবার তা তিনি করে দিয়ে গেছেন। মঙ্গলাও তাই সবই জানে, বললে, সবই তো জানি সৎশে। তাই বলি তুই আইবুড়ো থাকবি চেরটাকাল?

সতীশ একটু বিরক্ত হয়ে বলে, আগে উর একটা হিল্লে হক!

মঙ্গলা বলল, কেনে, শুনিস নাই? রাধার বে তো ঠিক হয়ি গিছে।

—কী বললি? ঠিক হয়ে গিছে? কুথায়, কার সাথে?

তা হয়েছে। সতীশ গাঁয়ে থাকে না, তাই খবর রাখে না। দু-তিন সপ্তাহ বাদ দিয়ে সে বাড়ি আসে শুক্রবারের ছুটিতে। দণ্ডকারণ্যের সব অফিসে রবিবারে ছুটি নয়। যেখানে যে বারে হাট, সেখানে সেই বারেই ছুটি। এ-মুখো কোন লরি পেলে তবে সাহেবের অনুমতি নিয়ে আসতে পায়। দু-তিন হাট বাদ না দিয়ে উপায় নেই।

মঙ্গলা বললে, তুই চিনবি না—ভিন গাঁয়ে।

—ক' নম্বর গাঁয়, তাই বল না?

—ছ' নম্বরে।

—ছ' নম্বর গাঁ? ওর তো সবাইকেই চিনি। নাম কর।

—কী জানি নাম আমার মনে নাই।

আবার শুয়ে পড়ে সতীশ, তু ভুল শুন্‌ছিস। ছ লম্বর নয়। ও গাঁয় তো একঘর মাত্তর যুগী আছে—দশরথ বুড়ো। তার তো ব্যাটা নাই—পাঁচটাই মেয়ে। বড় মেয়ের ব্যাটা আছে, কিন্তুক সে তো রাধার হেঁটোর বয়সী।

মঙ্গলা চুপ করে থাকে।

—দূর, ভুল শুন্‌ছিস তু। ছ' নম্বর নয়, আরও দূরের কোন গাঁ মনে লগে।

অস্বোয়াস্তি বোধ করে মঙ্গলা। উঠে পড়ে চট করে। হঠাৎ সতীশও উঠে বসে ফের, আঁচলটা চেপে ধরে মঙ্গলার, বলে, তু লুকাইছিস্! সত্যি কুথাটা বল দিকিনে।

আহার সহ্য হয় না মঙ্গলার। রাধাকে সেও ভালবাসে। রুদ্ধশ্বাসে স্বীকার করে বসে, ছ' নম্বরই। ঐ বাড়িই।

স্তম্ভিত হয়ে যায় সতীশ। ধীরে ধীরে একটা ক্ষীণ সম্ভাবনার কথা জাগে তার মনে। কিন্তু কেমন করে তা হবে?

—শেষ বয়সে দশরথের ভয় ধরিছে। পাঁচটাই ম্যায়ে, পিত্যিপুরুষ জল পাবে ক্যামনে?

বজ্রাহতের মতো বসে থাকে সতীশ। রাধা, তার খেলাঘরের ছোট্ট রাধার এই পরিণাম হল শেষ পর্যন্ত! ঐ বৃদ্ধ দশরথ যুগীর নিদন্ত মুখের করাল গহ্বরে গিয়ে পড়বে সে? অনেক, অনেক দিনের ছোটখাটো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আজ। সেই কমলপুর গাঁয়ের কথা। পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালায় পড়তে যেত দুজনে পাততাড়ি বগলে। মশায় কত গল্প বলত ওদের—দেশ-বিদেশের কথা। ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজত পুজো ঘরে, পণ্ডিতমশায়ের মা ডাকতেন, কইরে বালগোপালের দল!—ওরা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ত—সত্যিই লুট হয়ে যেত হরির লুট। মনে পড়ছে পৌষ-পার্বণে চড়ুইভাতির কথা। ঘরে ঘরে গিয়ে 'হোল-বোল ঠ্যাঙা-ঠোল' করে আদায় করত চাল-ডাল-আলু-কলা। তারপর সবাই মিলে নদীর ধারে গিয়ে পৌষালী বনভোজন আর টুসু গান। সতীশ আর রাধা থাকত পাশাপাশি। মনে পড়ছে কুড়মুন অভিযানের কাহিনী—বাল্য ছেড়ে কৈশোরে পদার্পণ করেছে তখন রাধা। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে, মাথায় ঘোমটা তুলে অতসী দিদির কোল ঘেঁষে বসেছিল সতীশের বউ! দৃশ্যটা ভুলবার নয়। আর মনে পড়ছে যজ্ঞডুমুর গাছের তলায় সেই ক'টা আশ্চর্য মুহূর্তের কথা। রাধা সেদিন নারীত্ব লাভ করেছিল, থর থর করে কেঁপে উঠেছিল সতীশের বাহুপাশের আবেষ্টনীতে।

দেশঘর গেল, ভেঙে পড়ল সমাজ—তবু মানুষের গোঁ গেল না, ভাবে সতীশ। কামারের ছেলের গলায় পৈতা নাই, তাই বলে যুগীরাই বামুন নাকি? তবু তাঁতি বুড়োর তেজ দেখ না। হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেবে তবু জাতের অভিমানকে ছাড়বে না। চেষ্টার ত্রুটি করেনি সতীশ, কিন্তু ওকে দেখলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে তাঁতি-বুড়ো। আরও কতকগুলো বাচ্চা হওয়ায় বুড়োর মেজাজ যেন আরও খিটখিটে হয়ে গেছে। দাওয়ায় বসে খকখক্ করে কাশে, আর ছেলেমেয়েগুলোকে হুকুম চালায়। তাছাড়া ঐ শিরোমণি ঠাকুর। খোঁড়া মানুষ, দুব্‌লা চেহারা—সতীশ যদি চেপে ধরে একখানা হাত তাহলে গুঁড়িয়ে যাবে বোধহয়—তোর এত মাথা-ব্যথা কেনরে বাপু! মেরে ঠ্যাঙ ভেঙে দিল তবু বুড়োর ভীমরতি ঘুচল না। এখন অবশ্য শিরোমণি গাঁয়ে নেই—কোথায় বুঝি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। গেছে না আপদ গেছে, কিন্তু যাবার আগে সতীশের সর্বনাশের আর কিছু বাকি রেখে যায়নি। শিরোমণি নেই, কিন্তু তার চেলা-চামুণ্ডা আছে গাঁয়ে। তারা বাধা দিতে এগিয়ে আসবে। ওদের মতে সতীশ নাকি রাধার কেউ নয়, রাধার ভালমন্দ বুঝবে তার বাপ ঐ কসাই-বুড়ো।

সারারাত ঘুম হল না বেচারির।

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেরি হল। আলো ফুটে গেছে বেশ। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে খটাখট আওয়াজ উঠছে। মানুষগুলো ঘর তৈরির কাজে লেগে গেছে। কেউ শাল খুঁটিতে গজাল বসাচ্ছে, কেউ টিন চাপাচ্ছে চালে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেয় সতীশ। আটটার সময় ছগনলালের ট্রাক যাবে শহরে। সেই ট্রাকেই যেতে হবে তাকে। আজ তার ছুটি নেই।

ছগনলাল তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। সতীশ আসতেই বলে, কি রে, এত দেরি?

সতীশ কোন কথা না বলে ট্যাক থেকে একটা বিড়ি বার করে দেয়। নিজেও ধরায়।

পথে যেতে যেতে সব কথা খুলে বলল সতীশ। রাধার ব্যাপারটা মোটামুটি জানা ছিল ওস্তাদের। সতীশ ছগনলালকে ওস্তাদ বলে ডাকে। ওর কাছেই গাড়ি চালানোর হাতেখড়ি হয়েছে যে। সব শুনে ছগনলাল বলে, শালা দশরথকে এক রোজ লপ্‌টে দেনা। শালা বুড্ডা, পাঁচ-লেড়কির বাপ, শালার সখ দেখ না!

সতীশ বলে, সে তো পরের কথা। এখন কী করব একটা শলা দাও ওস্তাদ? এক চিলতে একটা হলদে কাগজ বার করে ওস্তাদের হাতে দেয়।

একটা হাত স্টিয়ারিঙে রেখে অপর হাতটা বাড়িয়ে দেয় ওস্তাদ। এক নজর দেখে নিয়ে ফেরত দেয় আবার। বাঙলা বলতে পারলেও বাঙলা হরফ চেনে না সে। বললে, কী লেখা আছে ওতে?

সতীশ খুলে বলে সব কথা।

আঁকাবাঁকা হরফে পেনসিলে লেখা চিঠিখানি রাধার। সকালবেলা সেটা পৌঁছে দিয়ে গেছে রাধার ছোট ভাই। কোন ঝগাড়ম্বর নেই তাতে। কয়েকটি সোজা কথা সরলভাবে বলেছে রাধা—দিয়েছে কয়েকটি সহজ নির্দেশ। দশরথ যুগীকে সে বিয়ে করবে না। পালাবে বাড়ি থেকে। সতীশ যেন আজ সন্ধ্যা ছয়টার সময় তিন নম্বর গাঁয়ের কুয়োপাড়ে অপেক্ষা করে, গাড়ি নিয়ে। রাধা লুকিয়ে আসবে। দুজনে পালাবে গাঁ ছেড়ে।

—তিন নম্বর গাঁও? উ তো পাঁচ মাইল রাস্তা। উ আসবে কেমন করে?

—কী জানি। তা আমি কী করব বলে দাও ওস্তাদ।

—তুমি শালা আর কী করবে, যা করবে হামিই করবে।

ছগনলালই বুদ্ধি বাতলায়। ওভারসিয়ারবাবুর নির্দেশ ছিল তিন নম্বরে এক লরি শালবল্লা পৌঁছে দিতে হবে। স্টোর থেকে বেলা পাঁচটা নাগাদ মাল লাদ করে চলে যাবে তিন নম্বরে। সতীশ থাকবে গাড়িতে। তারপর মাল নামিয়ে বলবে স্টার্ট হচ্ছে না। মেরামত করতে বসবে। ক্লিনারটাকে ছুতানাতা করে সরাতে হবে, বেটাকে আজ ছুটি দিলেই চলবে। পাঁচটা বেজে গেলে কুলিগুলোও ছুটি পাবার জন্য উসখুস করতে থাকবে। বুদ্ধি করে তিন নম্বর গাঁয়েরই মজুর নেবে সে আজ। যাতে গাড়ি খারাপ হলে ওরা হেঁটেই যে যার বাড়ি চলে যায়। তারপর সোজা রাধাকে তুলে নিয়ে ভাগবে।

—কিন্তু পেট্রোলের হিসাব?

—সে তুর কী রে শালা? হিসাব ওস্তাদ বুঝবে।

—কিন্তুক আমার ছুটি নাই যে।

হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে আস্তিন গোটায় ছগনলাল, শালা হারামি। মহব্বৎ করব, প্যার করব, আবার চাকরির মায়াও ছাড়ব না।

সতীশ লজ্জা পেয়ে বলে, গাড়ি থামালে কেন, চল না।

ছগনলাল অ্যাকসিলারেটারে ডান পায়ের চাপ দিয়ে বলে, তু কিস্যু ঘাবড়াস না। বিলকুল সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোন শলাপরামর্শই কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল না। পরিকল্পনা মতো সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওরা এসে পৌঁছাল তিন নম্বর গাঁয়ে। ছগনলালের গাড়ি যথারীতি খারাপ হল। বনেট খুলে ফেলে ঠুকঠাক শুরু করল ছগনলাল। ক্লিনারটাকে আগেই ছুটি দিয়েছিল। মজুরেরাও চলে গেল। সতীশ গিয়ে বসে থাকল কুয়োপাড়ে। ছটা বাজল, সাতটা বাজল—নিশুতি হয়ে এল রাত। রাধার দেখা নেই। শেষে ছগনলাল বললে, চল শালা। খুব হয়েছে। ঔরতের কথায় বিশওয়াস করলে এই হালৎই হয়।

যেন একা সতীশই বিশ্বাস করেছিল রাধার প্রতিশ্রুতিতে।

* * *

রতন ঘোষ বসেছিল তার বাইরের দাওয়ায়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বুড়োর। কদিন থেকেই ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে। ঘোষ মোড়লের জীবনে এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। জ্বর-জ্বারি কখনও হয় না ওর। গুলাব বউ ঘরের ভিতর বসে খই বাছছে। রাতে বুড়ো খাবে। বুদ্ধিটা নবীন যুগীর। নবীন বলে—রেতে ভাত খেওনি ঘোষ, খই-মুড়ি চাবায়ে রাতটা কাটান দিও। বয়স হলেন তো। সহ্যি হবে কেন আর?

দুদিন আগে হলে হা-হা করে হেসে উঠত রত্নাকর। আজকাল-আর হাসে না। মনুয়ার কাছে পাঞ্জা কষতে গিয়ে রতন উপলব্ধি করেছে তার যুগ গত হয়েছে, বুড়ো হয়ে গেছে সে। তা বুড়ো হয়েছে বইকি। নজর চলে না বেশীদূর! মানুষজন নাকের ডগায় না এলে ঠাওর হয় না। কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা লাগে সব। কদিন ধরে জ্বরও হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায়। একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে তাই বসেছিল রতন শাল খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। ফুলটুসী বাড়ি নেই, জল আনতে গেছে। মনুয়া বেড়া বাঁধছিল বাগানের চৌহদ্দিতে। এই একটা ভাল কাজ করছেন সরকার। আগে নিয়ম ছিল দশকাঠা জমিতে হবে বাস্তু আর একুশ বিঘে জমিতে হবে চাষ। প্রথম কয়েকটা গাঁয় এই হিসাবেই জমি বিলি হয়েছে। এখন সে আইন পালটে গেছে। এখন দেড়বিঘে জমি দেওয়া হচ্ছে বাস্তুভিটের সঙ্গে একলপ্তে। আর বিশবিঘা চাষের জমি। হিসেব করে দেখ, হরে-দরে একই কথা। কিন্তু এতে অনেক সুবিধা। প্রথমত গ্রামটা ঘিঞ্জি হয়ে পড়বে না, তাছাড়া বাড়ির লাগাও জমিতে সবাই মিলে সকাল সন্ধ্যা হাত লাগাতে পারে। বাড়ির মেয়েরাও। লাউ, কুমড়ো, শশা, বেগুন, মায় আলু,-পেঁয়াজ-টমেটো-কপি সবই ফলতে পারে। শেয়ালে খাবে না, চুরি যাবে না। নজরের উপর থাকবে সব।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আনন্দময়ীর মন্দিরে শঙ্খধ্বনি হল। কাঁসর-ঘণ্টা এখনও কেনা হয়নি। এলোমেলো একটা হাওয়া উঠেছে, রাতে বৃষ্টি হবে নাকি? করোগেটেড টিন বোজাই একটা লরি চলে গেল ছ নম্বর গাঁয়ের দিকে। ধুলোর ঝড়টা ছুটেছে লরির পিছু পিছু, নাগাল ধরে ধরে। দূর পাহাড়ের গায়ে আগুন দিয়েছে কারা—এলোমেলো হাওয়ায় পোড়া ছাই এসে পড়ছে এতদূরেও। পড়ু-চাষের ব্যাপার আর কি।

হঠাৎ রতনের নজর হল কে একটা ভিখারির মতো লোক এসে দাঁড়িয়েছে বেড়া-

দেওয়া গেটের কাছে। আবছা দেখা যাচ্ছে মানুষটাকে। খালি পা, হেঁটো পর্যন্ত খাটো ধুতি, গায়ে একটা ছেঁড়া হাফশার্ট—এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, এক বুক কাঁচা-পাকা দাড়ি। ভিন গাঁয়ের মানুষ মনে লাগে, পাগল নাকি?

মনুয়া বাঁশের কঞ্চি চাঁছতে চাঁছতেই মুখ তুলে একনজর দেখে নিল মানুষটাকে। বিরক্ত হল মনুয়া। গ্রামে এখনও ভিখারির উপদ্রব হয়নি। লোকটা নড়ে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মনুয়া বলে, এগুয়ে দেখ বাপ, ইখানে হবেনি।

লোকটা মনুয়ার দিকে একবার তাকাল শুধু, জবাবে কিছু বলল না। বাঁশের গেটটা খুলে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল রতনের দিকে। রতন অভ্যাসমতো একটা হাত কপালের উপর তুলে ভুরু কুঁচকে বলে : কে? কারে চাও?

মনুয়াও উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। কী চায় লোকটা?

কাঁকালে একঘড়া জল নিয়ে ততক্ষণে মনুয়ার মা ফুলটুসীও এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

একমাথা-চুল মানুষটা নত হয়ে প্রণাম করল রতনকে। রতন ধরে ফেলেছে লোকটার প্রসারিত হাতখানা। গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কী অনুভব করছে যেন। কাঁপছে বুড়োর শরীরটা। উত্তেজনায় না জ্বরের তাড়সে? চিনতে পেরেছে নাকি বুড়ো? হ্যাঁ পেরেছে, চোখ ভুল করলেও স্পর্শেন্দ্রিয় ভুল করেনি। গলা দিয়ে স্বর বার না হলেও ছানিপড়া দু-চোখ বেয়ে নেমেছে দুটি জলের ধারা। লোকটার ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে বুড়োর হাত।

মনুয়া কী যেন বলতে যায়। পিছন থেকে ফুলটুসী বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কী। জলের ঘড়া কাঁকালে নিয়ে অপেক্ষা করে কখন এই উটকো লোকটা পথ নেবে। হঠাৎ চিৎকার করে রতন ডাকে, গুলাব! গুলাববউ!

ছুটে বেরিয়ে আসে গুলাব। মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না তার চিনতে। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে তার! আনন্দময়ী মা এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। সে যে দিন গুনছিল বসে বসে। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে লোকটাকে! হু হু করে কেঁদে ফেলে বুড়ি, নীলু! নীলাম্বর!

জলভরা মাটির ঘড়াটা সশব্দে পড়ে যায় মনুয়ার মায়ের কাঁকাল থেকে।

সে চিৎকারে ছুটে এসেছে এ পাশ থেকে যগন্দ, রাখহরি।

নীলুর বউ দ্রুতপদে ঘরে উঠে যায় পাশ কাটিয়ে, বুকটা তার তখনও ওঠানামা করছে উত্তেজনায়। ঘরের কোণে মুখ লুকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বেচারি।

ভিড়ে ভিড়ে লোকারণ্য হয়ে যায় ঘোষ-মোড়লের প্রাঙ্গণ।

মনুয়া সলজ্জে এগিয়ে এগিয়ে এসে প্রণাম করে।

যগন্দের বউ ঘরে উঠে গিয়ে—কোথাও কিছু নেই—সজোরে শাঁখে পাড়ে ফুঁ!

* * *

আনন্দের জোয়ার এসে লেগেছে নতুন-গড়া গাঁয়ের ঘাটে। শুভ-সূচনা। ঘোষ-মোড়লের হারানো ছেলে ফিরে এসেছে। বুড়োর আর ভাবনা নেই—ছেলে আর নাতিই দেখাশোনা করবে তাকে। নীলাম্বরের নিত্য নিমন্ত্রণ। আজ নেতায়ের বাড়ি, কাল

মাধোর বাড়ি। যগন্দের বউ গুলাবকে বলে, আমি কিন্তুক্ তোমার বেটারে খাওয়াবনি। আমি এয়োস্ত্রী করব মনুয়ার মায়েরে। সেইতো ফিরায়ে আনছে সোয়ামীরে তার নোয়া-সিঁদুরের জোরে।

রাঙা হয়ে ওঠে ফুলটুসী। তার যেন নতুন যৌবন এসেছে এই দেড়-কুড়ি বয়সে। যেন অতবড় ছেলের মা নয় সে, যেন আবার নতুন করে বিয়ে হয়েছে তার। প্রথম রাত্রে ঐ দাড়ি-আলা লোকটার কাছে শুতে যেতে সত্যিই কেমন বাধো বাধো ঠেকেছিল তার। তাও যদি চুপিসাড়ে মিটে যেত ব্যাপারটা, তবু হয়। তা নয়, প্রতিবেশীরা এল উপরপড়া হয়ে। আপত্তি শুনল না, জোর করে মাথা ঘষে দিল, আলতা পরিয়ে দিল—রাঙাপাড় পাট-ভাঙা শাড়ি পরিয়ে দিল ওকে। ফুলটুসী বেচারি লজ্জায় মরে। ছেলে বড় হয়ে গেছে—এখন এসব কী? কিন্তু কে শোনে সে কথা? সবাই যেন মজা পেয়ে গেছে। এমন যে রাশভারি বুড়ো শ্বশুর, সেও বলে বসল, না গুলাব, ঢেঁকিশাল নয়, এবার ঘরই একখান তুলবার লাগে, কী বল?

ফুলটুসী লজ্জায়-রাঙা মুখখানা কোথায় লুকাবে ভেবে পায় না। পিছন থেকে সত্যিই সে চিনতে পারেনি নীলাম্বরকে। সামনে থেকে দেখলে নিশ্চয়ই পারত, না হয় একমুখ দাড়িই গজিয়েছে—তাই বলে চাহনিটা তো দাড়িতে ঢাকা পড়েনি।

ঘরে ঘরে শুধু ঐ গল্প। তিল তিল করে নীলাম্বর সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের ইতিহাস। চৌধুরীকর্তার মৃত্যু, জনাবালি শেখ, পেল্লাদ বায়েনের মৃত্যুর কথা শুনেছে। দাঙ্গার কথা, দেশত্যাগের কাহিনী। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ওদের যে জীবন ক্ষয়ে গেছে—শুনছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিকথা। সেও শুনিয়েছে তার গল্প। তার দীর্ঘ কারাজীবনের কাহিনী। ছাড়া পাওয়ার পর কেমন করে সন্ধান নিতে নিতে অবশেষে এসে পৌঁছেছে। গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই পড়ে নবা পালের ঘর। নবা পালকে দেখেই চিনতে পেরেছিল নীলু, কিন্তু পরিচয় দেয়নি। পালবুড়ো তাকে চিনতে পারেনি। ঘোষ-মোড়লের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, কন্‌থে আসা হচ্ছে?

নীলু চল্‌তে চল্‌তে বলেছিল, কলকেতা!

নবা পাল এখন বলে, আমার তখনই কেমন যেন সন্দ নেগেছিল, বুঝলা ঘোষ, কিন্তু হক কথা বলব—নিয্যস্ চিনতে পারি নাই।

রতন বলে, আরে তুমি তো ছার—আমার লাতি পর্যন্ত পেরথমে খেদিয়ে দিতে চেইছিল, বলে—আগ্ বাড়িয়ে দেখ বাপ্, ইখানে হবে নাই।

মনুয়া লজ্জায় যেন একেবারে মাটিতে মিশে যায়।

যগন্দ বলে, তুর আবার সরম কী রে হতভাগা? যারে তারে তো আর 'বাপ্' বলিস নাই।

মনুয়া বেগতিক দেখে সরে পড়ে।

* * *

আনন্দের সেই ঢেউ এসে লাগে যুগীর বাড়িতেও। এতদিনে একটা হিল্লে হয়েছে অরক্ষণীয়া মেয়েটির। পাত্রের বয়স হয়েছে, তা হক, নবীন মনকে বুঝিয়েছে—তার

মেয়েও কিছু কচি খুকিটি নয়। বিয়ে দিলে এতদিনে সেও তিন ছেলের মা হত। এতদিন পরে স্ব-ঘরে একটি সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। দশরথের দাবিও কিছু নেই। শুধু শাঁখা আর শাড়ি। যুগীর ঘরে এক কাঁড়ি টাকা না ঢাললে বর জোটে না মেয়ের। দশরথ বিপত্নীক। সতীনের ঘর করতে হবে না রাধাকে। ওর বড় মেয়ে অবশ্য রাধার সমবয়সী। তা হক, তবু সুখে থাকবে রাধা। দশরথ মানুষ ভাল। কাছাকাছি গ্রাম। বল বলতে হুট করে বাপের বাড়ি চলে আসতে পারবে ইচ্ছে হলেই। এত সুবিধা পাবে কোথায় নবীন?

কিন্তু সে কথা বোঝায় কার সাধ্যি—ঐ মুখ-ভার-করা মেয়েমানুষ দুটোকে। মা আর মেয়েকে। সর্বাণী আর রাধাকে। দুজনেরই মুখ যেন পোড়া হাঁড়ি। নবীনের অবশ্য অন্যায় হয়েছিল অতবড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা। কিন্তু অপরাধের গুরুত্বটাও তোমরা বিবেচনা করে দেখ। হঠাৎ ছোট ছেলের কাছে খবরটা শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। ঠেঙিয়েছে ছেলেকেও—দূত অবধ্য বলে রেয়াৎ করেনি, বেটা বিন্দে-দূতী হইছ তুমি, এ্যাঁ?

ভাগ্যে সময়মতো সন্দেহ জেগেছিল তার। ছোটপুত্রকে জেরা করে জেনে ফেলেছিল ব্যাপারটা। হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল রাধাকে। একবার ইচ্ছে হয়েছিল লাঠিগাছখান হাতে নিয়ে তিন নম্বর গাঁয়ের কুয়োতলায় হাজিরা দেয়। তারপর মতটা বদলে ফেলে। লাঠিগাছখান হাতে তুলে নিয়েছিল ঠিকই—তবে বাড়ির বাইরে যায়নি। বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছিল বজ্জাত মেয়েটার পিঠে। রাগের মাথায় না হয় একটু জোরেই বসিয়েছে লাঠিটা, তাই বলে এমন কী অন্যায় হয়েছে তার, যে মা-মেয়ে কথা বলবে না? বাপ হয়ে শাসন করবে না দুর্বিনীত মেয়েকে?

রাধা একেবারে মূক হয়ে গেছে সেদিন থেকে। বলির পশুর মতো পড়ে আছে চুপ করে ঘরের কোণে। শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে তার। সতীশ নিশ্চয়ই এসেছিল কুয়োপাড়ে—ওকে না দেখতে পেয়ে চলে গেছে। কী ভেবেছে সে তা সেই জানে। সর্বাণীও তাঁতিবুড়োর রকমসকম দেখে ঘাবড়ে গেছে। সাহস পায়নি প্রতিবাদ করতে। তবু মায়ের প্রাণ—গুম্‌রে মরে নিজের মনে। মেয়েটার দিকে যেন আর তাকান যায় না।

শুক্রবার আশীর্বাদ করতে আসছে দশরথ বুড়ো। নিজেই আসছে। আর কে আসবে? আশীর্বাদ করে বরের বাপ-খুড়ো-জ্যাঠা। তা দশরথের আর কে আছে? তাই সে নিজেই আসবে। আসলে দশরথ এখনও নিজের চোখে দেখেনি রাধাকে। লোকের মুখে শুনেছে নবীন যুগীর মেয়েটি বেশ গতরে-সতরে, ডাগর-ডোগর। তার বেশি কিছু শোনেনি। খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়েছে বেচারির। মেয়ে দেখতে আসার সাহস ছিল না তার। সে অভিজ্ঞতা আগেই সঞ্চয় করেছে। দুধকুণ্ডি ক্যাম্পে থাকতেই একবার নাস্তানাবুদের চূড়ান্ত হয়ে গেছে তার। মেয়ে দেখতে গিয়ে কী হেনস্তা! পাড়ার ছেলেরা ঠাউরেছিল সে ছেলের বাপ-জেঠা। যখন তারা শুনল এই বর, তখন তার কাছা খুলে দিয়েছে, মাথায় গোবর-গোলা জল ঢেলে দিয়েছে। তাই মেয়ে দেখতে আসায় আর তার সাহস নেই। আশীর্বাদের ছুতো করে একবার

নিজের চোখে দেখে যেতে চায়। নবীন তাকে বুঝিয়েছে—ভয়ের কিছু নেই। গাঁয়ের লোকে দশরথকে কিছু বলবে না। তবে হ্যাঁ, সোনা দিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করতে হবে। প্রথমটা আঁৎকে উঠেছিল দশরথ। সোনা? ঐ যে হলদে মতন দেখতে—রোদ পড়লে চিক্‌চিক্ করে—সেই জিনিস? ভাবখানা ওর সেই রকম। শেষ পর্যন্ত নরম হয়েছে। বেশ, মরা-বউয়ের একজোড়া কানের ফুল দিয়েই না হয় মুখ দেখবে নতুন বউয়ের।

গণ্ডগোলটা বাধলো সেই শুক্রবারেই।

সারাটা সপ্তাহ সতীশ মন দিয়ে কাজ করতে পারেনি। হল কী রাধার? কেন আসতে পারল না সে সময়মতো। ছগনলাল আর এক খেপ্ মাল ফেলে এসেছে কোৎরিতে। তার মুখেই খবরটা পেল সতীশ। দশরথ বুড়ো পাকা দেখা দেখতে আসছে রাধাকে, শুক্রবার সন্ধ্যায়। স্থির থাকতে পারল না সতীশ। সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে একদিনের ছুটি নিল। ছগনলালের গাড়িতেই আবার ফিরে এল গাঁয়ে। গ্রামে ঢুকতে মহুয়াগাছের তলায় বাঁ-হাতি প্রথম বাড়িটা পালমশায়ের। তার পরেরখানা নেতাইয়ের—তার পরের খানা নবীন যুগীর। গ্রামে ঢুকবার মুখেই জোরে ব্রেক কষল ছগনলাল। নবীন যুগীর বাড়ির সামনেটায় রীতিমতো একটা জটলা। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ছগনলাল ক্লিনারটাকে বলে, মদনা, দেখ রে বেটা ক্যা হুয়া।

লাফ দিয়ে নেমে পড়ে পিলে-সর্বস্ব মদন-ক্লীনার। সতীশ মাথাটা নিচু করে ঘাপটি মেরে বসে। নবীন বুড়ো যেন না দেখতে পায় তাকে। ক্লীনারটা ফিরে এসে বল্‌লে, একঠো ঔরৎ মর গিয়া।

মর গিয়া! মারা গেছে? কে?—মাথা তুলে উঠে বসে সতীশ।

ছগনলাল ওর মাথায় একটা থাবড়া মেরে ফের নিচু করে দেয়, তু বৈঠ্ রহ্ চুপ্‌সে! হামি দেখছে।—নেমে পড়ে ছগনলাল।

ভিড়ের মাঝখানে পড়ে আছে মেয়েটা। মাথা মুখ জলে ভেজা। জ্ঞান নেই। বিষ খেয়েছে।

—জৌহর? কৌন সা জৌহর?

—কী বিষ তা কে জানে? গ্যাঁজলা বের হচ্ছে শুধু মুখ দিয়ে।

—ডাগডর সা'ব কো খবর ভেজা?

সে তো লোক ছুটেছে কখন। কিন্তু কে জানে ডাক্তারবাবু কোৎরিতেই আছেন, না মেডিক্যাল ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে গেছেন অন্য কোন গ্রামে। ছগনলাল পরিস্থিতিটা বুঝে নিল চট করে। লরি তার খালি। মাল আনলোড করেছে দুনম্বরে। একবার চেয়ে দেখল আলুলায়িত মেয়েটাকে। ঐ বোধহয় রাধা—না হলে বিষ খাবে কেন? ওর শিয়রের কাছে বসে আছে একজন বয়স্কা মেয়েছেলে—ওর মা হবে বোধহয়। উদ্‌ভ্রান্ত পাগলির মতো দেখতে। কাঁদছে না কিন্তু। কাঁদছে একপাল ছোট ছেলেমেয়ে। বোধহয় মেয়েটার ছোট ভাই-বোন। ছগনলাল বলে, এর বাপ কে? কী নাম?

সামনে-বসা উন্মাদ-প্রায় লোকটা বলে। কেন বাবা? আমি। নবীন।

—চল হামারা সাথ লরিমে। হামি লিয়ে যাব ওকে ডাগডর সাহেবের ঘরে। ডগডর-সা'ব না থাকলে সিধা লিয়ে যাব কাঁকের—মিশনারী হাসপাতাল।

নবীন ডুগরে কেঁদে ওঠে; আর হাসপাতালে কী হবি? মরি গিছে রাধা।

ছগনলাল দু-হাতে তুলে নেয় জ্ঞানহীন মেয়েটাকে। নবীনকে ধমক দিয়ে বলে, মরে গেছে কি জিন্দা আছে সে ডাগডর-সা'ব বুঝবে। আ যাও!

দিবাকর বলে, ঠিকই বলছে লোকটা। নবীন তুমি গাড়িতে ওঠ।

ভিড়টা সরে দাঁড়ায়। ছগনলাল কোলপাঁজা করে নিয়ে আসে রাধাকে। সতীশ দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল এতক্ষণ। সরে গিয়ে বসেছিল ড্রাইভারের সিটে। দরজাটা খুলে দিতেই ছগনলাল রাধার সংজ্ঞাহীন দেহটা নামিয়ে দিল ড্রাইভারের সিটের পাশে।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে নবীন : ঐ-ঐ ডাকাত বেটাই সব্বোনাশ করেছে আমার। মার শালাকে।

বাপের আদেশেই হোক অথবা নিজ বুদ্ধি বিবেচনামতোই হক, নবীনের বেটা আনন্দ হঠাৎ গাড়ির বনেটে বসিয়ে দেয় হাতের ডাণ্ডাটা। সঙ্গে সঙ্গে ছগনলাল বসিয়ে দেয় আনন্দের গালে এক বিরাশী-সিক্কা চড়। আরও পাঁচজন হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে—তারা আনন্দকে বাধা দিতে আসছে অথবা সতীশকে আক্রমণ করতে আসছে তা বোঝবার সময় নেই। ঠিক ঐ মুহূর্তেই নবীন চিৎকার করে ওঠে, রাধাকে নামিয়ে নে গাড়ি থিকে—শালা সৎশে পালাবে!

বিদ্যুৎ-চমকের মতো বুদ্ধিটা খেলে গেল মাথায়। নবীনই বুদ্ধিটা দিয়েছে ওকে! প্রাণ-ধর্মের তাগিদে কাজ। ভাববার অবকাশ কোথা? গাড়ি স্টার্ট দেওয়াই ছিল নিউট্রালে। চাপ পড়ল বাঁ পায়ে, গিয়ারটা ঘরঘর করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হল ডান-পা। তারপর নক্ষত্রবেগে ছুটল খালি ট্রাকটা সামনের দিকে। দু চারটে ঢিল এসে পড়ে ট্রাকের উপর, ভ্রূক্ষেপ নেই সতীশের। প্রায় মিনিটদশেক খানাখন্দ জমির আল উপেক্ষা করে মাঠ ভেঙে সে এসে উঠল একটা বন্য সড়কে। থামালো গাড়ি। কই, ছগনলাল কই, মদন? কেউই উঠতে পারেনি লরিতে। কিন্তু আর ফেরা চলে না। দু একবার ঝাঁকানি দিল রাধাকে—কোন সাড়া নেই তার। মুখের দু পাশ দিয়ে সাদা ফেনা পড়ছে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে। বুকে হাত দিয়ে দেখল—না, হৃদস্পন্দন আছে এখনও। ওর মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে আবার স্টার্ট দিল সতীশ। গাড়ি ছুটল কোণ্ডরির দিকে। পারালকোটের হেড-কোয়ার্টার্স ছোট-কোণ্ডরি। সেখানে থাকেন মোবাইল মেডিক্যাল য়ুনিটের ডাক্তার সাহা।

কিন্তু ভাগ্য বিপরীত। ডাক্তারবাবু তাঁবুতে নেই। কোথায় সাপে কামড়ের কেসে বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন কেউ জানে না। সতীশ ভাবে এখন কী করবে সে। বোধহয় এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটার দত্ত-সাহেব অথবা ইঞ্জিনিয়ার বোস-সাহেবের কাছে যাওয়া উচিত; কিন্তু তাঁরাই বা কী করবেন? তার চেয়ে সময় নষ্ট না করে কাঁকের চলে যাওয়াই ভাল। ফুলস্পিডে লরি হাঁকাল সতীশ কাঁকের বাজারের দিকে। সেখানে ক্রিশ্চান মিশনারি হাসপাতাল আছে। একবারও মনে হল না আর কোন একজন লোক লরিতে তুলে নেওয়া উচিত কি না। একবারও মনে পড়ল না—হেভি ভেহিক্ল

লাইসেন্স ওর নেই—আইনত ট্রাক চালাতে পারে না সে। একবারও চিন্তা করে দেখল না মুভমেন্ট অর্ডার ছাড়া আপন ইচ্ছায় সে অপরের নামে লেখা সরকারি লরি চালাতে পারে কি না। বাঁ হাতে রাধার মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে পুরাদমে গাড়ি ছোটাল শহরের দিকে।

ঘণ্টাদেড়েক বাদে লরিটা এসে থামল হাসপাতালের গেটে।

আর সেখানেই সতীশ দেখা পেল এমন একজনের যাকে সে মোটেই আশা করেনি এখানে। আশা না আশঙ্কা? কী বলা উচিত?

কাঠের ক্রাচ বগলে এগিয়ে এলেন রসিকলাল, সতীশ, তুই এখানে? ও কে?

সতীশ বিস্ময় প্রকাশ করল না। তার মাথা অন্যান্য চিন্তায় এত ভারী ছিল যে, রসিকলালের উপস্থিতিতে সে কোন অসঙ্গতি লক্ষ্য করল না। যেন খুব স্বাভাবিকভাবেই পরিচিত একজনের দেখা পেয়েছে সে। শিরোমণি মশায় যে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন গ্রাম থেকে—তাঁর সন্ধান কেউ পায়নি—এসব কথা এখন মনেই পড়ল না তার, বললে, রাধা বিষ খেয়েছে!

—রাধা? নবীন যুগীর মেয়ে? কেন?

—কেন সে সব পরে হবে নে—এখন জানে বাঁচবে কি না দেখেন কেনে।

—দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে রসিকলাল হাঁকলেন, ইমানুল!

আউট-হাউস থেকে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল ওয়ার্ড-অ্যাটেন্ডেন্ট ইম্যানুয়েল। ধরাধরি করে রাধাকে নিয়ে গেল ওরা এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের দিকে। রসিকলালও গেলেন পিছু পিছু ক্রাচে ভর দিয়ে। সাহেব ডাক্তার দু'একটি প্রশ্ন করলেন সতীশকে। কী বিষ, কখন খেয়েছে। যতটুকু জানত, বললে সতীশ। বিশেষ কিছুই জানতে না সে। সাহেব দ্রুত ঢুকে গেলেন এমার্জেন্সি বিবাগে। সতীশ পিছন থেকে বলে, বাঁচব তো সাহেব?

চলতে চলতেই সাহেব বললেন, ডরো মৎ বেটা। ডেভিড—!

রসিকলালও এগিয়ে গেলেন।

হাসপাতালের সামনের চাতালটায় এতক্ষণে সতীশ এসে বসে। ব্যস, আর তার কোন দায় নেই। এখন মরা বাঁচা মা আনন্দময়ীর ইচ্ছে। বুড়োরাজার কৃপা। আর হাতযশ ঐ সাদা আলখাল্লা পরা সাহেব ডাক্তারের। অদ্ভুত পোশাকটা ওঁর! সাহেবরা যেমন কোট-প্যান্ট-টাই পরে, তেমন নয়। পা পর্যন্ত একটা সাদা আলখাল্লা—অনেকটা বাউলদের মতো—মাজায় একটা রশি বাঁধা। গলায় ঝুলছে বুক দেখার চোঙ নল। একবুক সাদা ধবধবে দাড়ি। চোখে চশমা।

এতক্ষণে রাজ্যের চিন্তা এসে জুটেছে ওর মাথায়। যদি রাধা না বাঁচে? যাক, শিরোমণিমশায় আছেন। তিনি যা হয় করবেন। কিন্তু বাঁচবে নাই বা কেন? শুনেছে সাহেব ডাক্তারে মরা বাঁচাতে পারে—রাধার তো এখনও বুকধুকপুক করছে। নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে রাধা। মরতে রাধা চায়নি—মাত্র বাইশ-তেইশ বছরের মধ্যেই দুনিয়া পুরানো হয়ে যায়নি তার কাছে। সে শুধু নিষ্কৃতি চেয়েছিল দুরন্ত অভিমানে। সতীশ জানে, রাধা কী চায়। যদি সে সুস্থ হয়ে ওঠে তবে তাকে নিয়ে এখান থেকেই পালাবে। আর গাঁয়ে ফিরবে না। ড্রাইভারি লাইসেন্সটা সঙ্গেই আছে।

এতবড় পৃথিবীতে এত গাড়ি আছে, কেউ না কেউ তাকে কাজ দেবেই। না পায় চাকরি, তাহলে ছুতারের কাজ করবে সতীশ, কামারের কাজ করবে। অনেক কিছুই পারে সে। নিজের উপর আস্থা আছে তার। ছোট এক-কামরা একটি ঘর ভাড়া নেবে প্রথমে। সেখানে থাকবে সে আর রাধা—স্বামী-স্ত্রী। কাউকে জানাবে না তার ঠিকানা। না, ওস্তাদকে জানাতে হবে। গোপনে। ছগনলাল যদি বলে গাঁয়ে ফিরে আসতে, গাঁয়ের লোকে মেনে নেবে ওদের নিবিড় সম্পর্ক, তাহলে গ্রামেই ফিরে আসবে সে। মঙ্গলাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছা তার নেই। তাছাড়া দ্বিজপদও সত্যি বুড়ো হয়ে পড়েছে। সতীশের উপর নির্ভর করে সে। সতীশ তো আর ছিনিবাস নয়। বুড়ো বাপের উপর তার কর্তব্য সে অস্বীকার করে না। ভগবানও এ অপরাধ ক্ষমা করেন না। ছিনিবাসের উদাহরণ তো চোখের উপর। একবার বিয়ে হয়ে গেলে তাঁতিবুড়ো আর কী করতে পারে?

বিরাট হাতাওয়ালা হাসপাতালের প্রাঙ্গণ। মস্ত বড় বাগান। ঢালু টালি ছাওয়া বাঙলো মতন বাড়ি। সামনে চওড়া বারান্দা। কিছু দূরে দূরে ছবির মতো সাজানো ঘর। বাগানের ওপাশে একটি গির্জা—নিরেট পাথরের তৈরি। তারও ওপাশে ইস্কুলঘর আর অনাথাশ্রম। বাপ-মা-মরা আদিবাসী বাচ্চাদের মানুষ করেন এঁরা। বহুদিন ধরে ক্রিশ্চান মিশনারিরা গড়ে তুলেছেন এ প্রতিষ্ঠান। সকাল-সন্ধ্যা গির্জায় ঘন্টা বাজে—বিচিত্র সুরে ঈশ্বরের প্রার্থনা-মন্ত্র শোনা যায়।

ফাদার মার্লো শুধু হিন্দি নয়, হালবি এবং গোণ্ড ভাষাও জানেন। আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারেন। আদিবাসীরা তাঁকে দেবতা জ্ঞানে সম্মান করে। আশপাশে ক্রিশ্চান পল্লী। যাদের লিখিত বর্ণমালা নেই সেই সব জাতের মেয়েকে করে তুলেছেন পারদর্শী নার্স, সেই জাতের ছেলেকে কলেজে পড়িয়ে করেছেন ডাক্তার। আদিবাসীদের মধ্যে সদ্ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন ওঁরা। সেবা করছেন ওদের, মানুষ করে তুলছেন। পাহাড়ের কোলে এমন আদিবাসী জাতি আছে যারা সভ্যতার স্পর্শ এখনও পায়নি একটুও। মেয়েরা সেখানে মাজায় একটু করা বাকল জড়ায় মাত্র, উর্ধ্বাঙ্গে কোন কাপড় দেয় না। বড় রাস্তার ধারে যে সব গ্রাম সেসব গ্রামের আদিবাসীরা আর একটু সভ্যতার আলো পেয়েছে। অথচ হাসপাতালের আশেপাশে যেসব ক্রিশ্চান পল্লী তার আদিবাসীরা বেশ পরিষ্কার, সভ্য। মনেই হয় না, এদের জাতভাইরা ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে উলঙ্গ হয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সতীশ ঘুরে ঘুরে দেখছিল হাসপাতালটা। সকালবেলাতেই একজন নার্স, সেও আদিবাসী বোধ হয়, ওকে বলে গেছে কাল রাত্রেই জ্ঞান হয়েছে রাধার। ও ধুতুরার বীজ খেয়েছিল—সবটা বিষ বার করে ফেলা হয়েছে। রাধা বেঁচে গেছে। সকাল আটটা বাজলেই সতীশ গিয়ে দেখা করতে পারবে রোগিণীর সঙ্গে। ট্রাকটা হাসপাতালের চৌহদ্দিতেই রেখেছে। অল্প পেট্রল আছে ওতে—আধ গ্যালনও হবে না। বড় জোর মাইল পাঁচ-সাত চলতে পারে। আনন্দময়ী মা রক্ষা করেছেন। কাল যদি রাস্তায় পেট্রল ফুরিয়ে যেত?

বারে বারে হাসপাতালের অফিস টাইমপিসটায় সময় দেখে আসছে। এখনও আটটা বাজেনি। পারালকোটে ওদের গাঁয়ে বোধহয় এতক্ষণে হৈ-হৈ পড়ে গেছে। নবীন বুড়ো হয়তো পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে—থানায় যাব ডায়েরি করতে। যা না! থানা কি তোর হাতার মধ্যে? পাক্কা পঁয়ত্রিশ মাইল হাঁটা সারতে হবে। ওস্তাদ রাগ করেনি তো? না, সে ও রকম মানুষ নয়। এতক্ষণে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দত্তসাহেবের কানেও খবর পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। সতীশ এখন ফেরারী আসামী। সরকারি ট্রাক নিয়ে সে পালিয়েছে বিনা লাইসেন্সে।

হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এসে ঢোকে একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান। একি, এ যে প্রজেক্ট ভ্যান! বীর সিং চালিয়ে আসছে। চেনা লোক দেখে সতীশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বীর সিং-এর পাশে বসে আছেন লেডি ওয়েল-ফেয়ার অফিসার—কী নাম যেন, হ্যাঁ, রেখা মিত্তির।

সতীশ ছুটে যায় ওদিকে। বীর সিং বলে, ক্যারে সতীশ? তু ইহা?

সতীশ ওকে আড়ালে ডাকে। কালকের ব্যাপারটা জানায়! বীর সিং পরামর্শ দেয় সব কথা মিস্ মিত্রকে খুলে বলতে। ঘটনাচক্রে বে-আইনি কাজ করে ফেলেছে—তখন তাছাড়া উপায় ছিল না। একটি মানুষের জান বাঁচাতে সে যা করেছে—সরকারি আইন যাই বলুক—তার একটা যৌক্তিকতা আছেই। হয়তো শাস্তি হবে না সতীশের। ওয়ার্নিং পাবে মামুলি, লিখিত ধমক একটা আর কি। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে সতীশের কর্তব্য হল মিস্ মিত্রের কাছে সব অপরাধ স্বীকার করা। হাজার হোক উনি প্রজেক্টের একজন অফিসার। আসামী যদি প্রথম সুযোগেই এগিয়ে এসে তার অপরাধ স্বীকার করে তবে সরকারি আইনে তার অন্যায়ের গুরুত্ব কমে যায়। দীর্ঘদিনের সরকারি চাকুরে প্রৌঢ় বীর সিং-এর এ উপদেশ মনে লাগে সতীশের। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। বীর সিংকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ এগিয়ে যায় রেখা মিত্রের কাছে। তিনি বলেন, দাঁড়াও, শুনছি তোমার কথা। আগে আমার রুগীর একটা ব্যবস্থা করি।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো হল রোগিণীকে।

—আরে ই যে উমাদি—সতীশ চমকে ওঠে।

—তুমি চেন না কি এঁকে?—মিস্ মিত্র প্রশ্ন করেন।

—চিনব নি? আমাদের জমিদারের মেয়ে যে, উমাদি।

এবার চমকে ওঠেন রেখা মিত্র। এ পরিচয় তারও অজানা। জমিদারের মেয়ে!

—হ্যাঁ, পণ্ডিতমশায়ের ইস্ত্রি!

উমাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যায় দুজন বাহক। রেখা সতীশকে প্রশ্ন করে সংগ্রহ করে আরও কয়েকটি তথ্য। দিবাকর পণ্ডিতমশায়ের স্ত্রী, ঐ রোগপাণ্ডুর মেয়েটি ছিল সতীশদের গাঁয়ের জমিদারের মেয়ে। না, ভুল হয়নি—ভুল হবার উপায় নেই। ছেলেবেলা থেকে সতীশ চেনে যে ওঁকে! হ্যাঁ রীতিমত জমিদার—মস্ত দালান, ঝাড়-লণ্ঠন, ঠাকুর-দালান, নাট-মণ্ডপ রঙমহাল—কী ছিল না? দোল-দুর্গোৎসব লেগেই থাকত। উমাদি মাস্টারমশায়ের কাছে পড়তেন—পরে কলকাতায় বিয়ে হয়ে চলে যান শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু কী জানি কী সব গণ্ডগোল হয়, সতীশ ঠিক জানে না। উমাদি গ্রামে ফিরে আসেন, বাপের বাড়ি। তারপরেই লাগল দাঙ্গা। কে কোথায় ছিটকে পড়ল।

রেখা প্রশ্ন করে, তারপর তোমার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কবে বিয়ে হল?

—সে সব জানি না আমি। এবার আমার কথাটা—

—হ্যাঁ বল।

সতীশ সংক্ষেপে বর্ণনা করে গতকালের অভিযানের কথা। রাধার পূর্ব ইতিহাসটাও বলে। দশরথের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ, দশরথের বয়স, সবই বলে। রেখা সব শুনে বলল, তুমি ট্রান্সপোর্ট অফিসারকে এখান থেকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। জানাও যে, দুর্ঘটনায়-পড়া একটি মেয়েকে এত নম্বর ট্রাকে তুলে নিয়ে তুমি কাঁকের হাসপাতালে এসেছ। ট্রাক অক্ষত আছে। আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে। আমিই লিখে দিচ্ছি টেলিগ্রাফ।

রেখার পিছন পিছন সতীশ চলে আসে হাসপাতালের আউটডোর অফিসে।

অনাড়ম্বর কিন্তু সুন্দর আয়োজন—ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে চারিদিক। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে দুজন। ছোট ঘরটিতে চেয়ারে বসে আছেন একজন বৃদ্ধ বাঙালি ভদ্রলোক। টেবিলের উপর বড় বড় রেজিস্টার খাতা, ফাইলপত্র, দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। সামনের কাঠের বেঞ্চিটায় গিয়ে বসলেন রেখা দেবী। সতীশ বসার জায়গা থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধ চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে রেখা দেবীকে বললেন, আপনাকেই খুঁজছিলাম। এই খাতায় রোগীর নাম-ধাম-বিবরণ সব লিখে দিন।

রেখা বলল, আপনি লিখে নিন—বলুন কী কী জানাতে হবে।

ভদ্রলোক কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, আপনিই লিখে দিন। ইংরেজি হাতের লেখাটা আবার ভাল নয় আমার। বাঙলা খাতা লিখতাম কিনা।

খাতাখানা তিনি বাড়িয়ে দেন রেখার দিকে। লিখতে লিখতে রেখা মিত্র বলে, সাহেবের হাসপাতালে কাজ করেন অথচ ইংরেজি লিখতে পারেন না?

বৃদ্ধ অধোবদনে লজ্জিতভাবে বসে থাকেন।

—কত বছর কাজ করছেন এখানে?

—আজ্ঞে বছর নয়, মাত্র বারো দিন।

—বারো দিন—অবাক হয় রেখা মিত্তির, এর আগে কী করতেন?

—আমিও উদ্‌বাস্তু—এসেছিলাম এই সতীশদের সঙ্গেই।

—আপনার নাম?

—ক্রিস্টফার যোসেফ ডেভিড।

সতীশ আর্তনাদ করে ওঠে, শিরোমণিমশায়! কী, কী বললেন?

রসিকলাল শিরোমণি আবার অধোবদন হলেন ঐ একফোঁটা একটা কালকের ছোঁড়ার প্রশ্নে। রেখা সতীশকে বলে, শিরোমণিমশায় মানে? তুমি চেন ওঁকে?

—কেন চিনবনি? আমাদের গাঁয়ে পুরুত ছিলেন উনি—আনন্দময়ী মায়ের নিত্য-সেবাইত—রসিকলাল শিরোমণি ঠাকুর—দাঙ্গায় দুটি পা-ই খোঁড়া হয়ি যায়।

এতক্ষণে লক্ষ্য হয় রেখা মিত্রের—টেবিলের পাশে দুটি ক্রাচ দেওয়ালে ঠেকানো আছে। কেমন যেন প্রচণ্ড ঘৃণা হয় ঐ খোঁড়া অর্থগৃধ্নু মানুষটার উপর। এরা কী?

ভিখারির অধম। দেশঘর ছেড়েছে বলে কি মনুষ্যত্বকেও ছেড়ে এসেছে পাকিস্তানে? এক মুষ্টি অন্নের লোভে নিজের ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত নয় এরা? অথচও সামান্য চাষী-জোলা-তাঁতি নয়! হিন্দু সমাজ ওকে যথোচিত সম্মান দিয়েছিল একদিন। দু পাতা সংস্কৃত পড়তে জানে বলে ওকে সমাজের শিরোমণি করেছিল। এমন একটা শিক্ষিত মানুষই যদি এত লোভী হয়, এত সহজেই মনুষ্যত্ব-ধর্ম-নীতিকে বিসর্জন দেয়, তবে ঐ অশিক্ষিত পাকিস্তানি উদ্‌বাস্তুদের নিয়ে কী নতুন গ্রাম গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে সে?

প্রশ্নটা না করে পারে না রেখা, একটা কথা, মিস্টার ডেভিড। ধর্ম বিসর্জন দিতেই যদি প্রস্তুত ছিলেন তবে দেশঘর ছেড়ে মরতে ভারতবর্ষে এলেন কেন? ধর্মত্যাগ করে পাকিস্তানেও তো স্বচ্ছন্দে থেকে যেতে পারতেন আপনি। খ্রীস্টান না হয়ে মুসলমান হলেই পারতেন। ওরাও আপনাকে দু মুঠো খেতে দিত নিশ্চয়!

অবনতমস্তক উঁচু করল লোকটা। দুটো শীর্ণ চুপসে-যাওয়া গাল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। বললে, আরও কঠোর ভাষা জানা নেই আপনার?

চম্‌কে গেল রেখা মিত্তির। ঠিক এর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তির দিকে অশ্রু-আর্দ্র দৃষ্টি মেলে লোকটা বলে, আজ বারোদিন ধরে প্রতিনিয়ত নিজেকেই এই প্রশ্ন করে চলেছি আমি। সঠিক উত্তর পাইনি। বারো বছর আগে একটা লোককে দেখেছিলাম—রোজ সকালে উঠে সে গীতাপাঠ করত, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরোধর্ম ভয়াবহ। আজ সে মানুষটাকে আবছা মনে পড়ে মাত্র। বারো বছর আগেকার সেই রসিকলাল শিরোমণি আর বারো বছর পরেকার এই ক্রিস্টফার ডেভিড এক লোক নয়। এ ছাড়া আর কোন কৈফিয়ৎ নেই আমার বিবেকের কাছে।

সতীশ টেলিগ্রাফ করে দিয়েছে। রেখা মিত্তির ওকে ভরসা দিয়েছে, তার চাকরি যাবে না। যেতে পারে না। অবস্থাগতিকে উপস্থিত বুদ্ধিমতো সে যা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য নয়। মেয়েটি বেঁচে গেছে। রেখা তার সঙ্গে কথা বলেছে। সতীশের জবানবন্দীতে ইতিকথার যেটুকু অনুক্ত ছিল—সেই মূলকথাটি সংগ্রহ করেছে রাধার কাছে। রাধা আর সতীশ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। ছেলেবেলা থেকেই। সুতরাং সতীশ যা কিছু করেছে তা শুধু মুমূর্ষু একটা রোগীকে বাঁচাবার জন্যেই নয়—তার পিছনে ছিল গভীরতর কোন অনুপ্রেরণা। তাই রেখা মিত্রের হাত দুটি ধরে যখন ভেঙে পড়ল রাধা, আপনি দেখবেন উর যেন চাকরির কুন ক্ষেতি না হয়—তখন রেখা মিত্রকেও বলতে হয়েছিল, তা তো দেখতেই হবে। এতদিন মানুষটা একা ছিল—এবার তো ওকে বউ নিয়ে ফিরতে হবে—চাকরি গেলে চলবে কেন?

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল রাধা।

ফাদার মার্লো বললেন, রাধাকে পরীক্ষা করে দেখেছি—সে বয়ঃপ্রাপ্তা। ওরা দুজনে যদি স্বেচ্ছায় পুণ্যধর্ম গ্রহণ করে তবে আমি নিজ দায়িত্বে এখানেই ওদের বিবাহ দিতে পারি।

রুখে উঠেছিল রেখা মিত্র, থ্যাঙ্কস্! তার প্রয়োজন হবে না। আপনি যদি একটা

সার্টিফিকেট লিখে দেন যে, রাধা বয়ঃপ্রাপ্তা তাহলে আমিই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারব। তার জন্য ধর্মত্যাগের প্রয়োজন হবে না।

ফাদার মার্লো অমায়িক হেসে বলেন, সে তো আরও আনন্দের কথা।

আর সহ্য হয়নি রেখার। আঘাত দেবার লোভ সামলাতে পারেনি। ক্রিস্টফার ডেভিডের কথাটা সে ভুলতে পারেনি তখনও, বললে, মুখে তা বলছেন বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই দুঃখিত হচ্ছেন শিকার ফস্‌কে যাওয়ায়।

ভ্রূ-দুটো কুঁচকে ওঠে বৃদ্ধ রেভারেন্ড-সাহেবের। সাদা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, এ কথা অনুমান করবার হেতু?

রেখা একই সুরে বলে, ধর্মত্যাগ না করলে আপনারা তো কারও উপকার করেন না।

ডাক্তার মার্লো বললেন, আমার হাসপাতালে আজ বাইশজন ইনডোর পেসেন্ট আছে; প্রতিদিন একশ'র উপর রোগী অ্যাটেন্ড করছি আউটডোরে। ওরা সবাই তো ক্রিশ্চান নয়। উই হ্যাভ কাম হিয়ার টু সার্ভ এইলিং হিউম্যানিটি, নট্ ক্রিশ্চান্‌স এলোন!

—কিন্তু ঐ যে আপনার অফিসে আলাপ হল ক্রিস্টফার ডেভিডের সঙ্গে— ধর্মান্তরিত না করে তো ওকে চাকরি দেননি আপনি।

বৃদ্ধ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, ইট্‌স্ স্ট্রেঞ্জ! দ্য সেভিয়ার নাউ স্ট্যান্ডস্ অ্যাকিউস্‌ড।

—তার মানে?

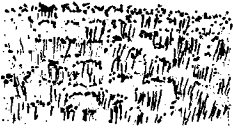
—এক্সকিউস্ মি মিস্ মিত্রা, আপনি কি একবারও জানতে চেয়েছেন কেন ঐ লোকটি ধর্মত্যাগ করেছে? আমরা ওর গ্রামে প্রিচ করতে যাইনি—ও স্বেচ্ছায় মেষশাবকের মতো নিজেই এসেছে প্রভুর এই আশ্রয়ে। আপনি শুধু ওকে ধমকই দিলেন, একবারও দরদভরে জানতে চাইলেন না কী মর্মান্তিক অভিমানে ও লোকটা ধর্মত্যাগ করে চলে এল আমার আশ্রমে। জানতে চাইলেন না—কেন ঐ লোকটা যাপন করছে এমন পরনির্ভরশীল বিকলাঙ্গের জীবন।

—কেন? কী হয়েছিল ওর পায়ে?

—বেটার আস্ক দ্যাট এক্স-হিন্দু!—উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন বৃদ্ধ। মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে তাঁর। চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলে বলেন, যদি কোন ক্রিশ্চান ধর্মের জন্য এমন উদাত্ত প্রাণের পরিচয় দিত, তাহলে আমরা তাকে মাথায় তুলে রাখতাম—আমরা তাকে আর্চ-বিশপ করে দেবার চেষ্টা করতাম! আর আপনারা? য়ু হ্যাভ মেড এ ডেস্টিচ্যুড অফ এ ক্রুসেডিয়ার। ঘৃণা করবার অধিকারই যেন আছে মানুষের, ভালবাসার কোন অধিকার নেই!

হঠাৎ থেমে যান ধর্মযাজক। আঙুল দিয়ে বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকেন। আবেগকম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, এক্সকিউস্ মি। আমি সংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম। আই হ্যাভ নো ইন্টেনশান্ টু উন্ড ইয়ার রিলিজন—আপনার ধর্মকে আঘাত দিবার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

হন্ হন্ করে চলে যান বৃদ্ধ রেভারেন্ড আউটডোরের দিকে।



৪

সুন্দরকাণ্ড

কেমন একটা অবসাদে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেবু পণ্ডিত মিটিং থেকে ফিরে এল। নতুন-পত্তন গাঁয়ের ঘরে ঘরে আজ উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার—অনেক-অনেকদিন পরে আজ আবার ওরা আশার আলো দেখতে পেয়েছে। এতদিনে ঘর হয়েছে, জমি হয়েছে, যৌথ-চাষের আয়োজন সম্পূর্ণ। গাঁয়ে কূপ হয়েছে, প্রাইমারি-স্কুল হয়েছে, মায়ের পট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। আজ ষোলো-আনার ডাকটা ছিল সেই উপলক্ষেই। মন্দিরের সামনে হরীতকী গাছতলায় বসেছিল মজলিস। জিপে চেপে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেব স্বয়ং এবং লেডি-ওয়েলফেয়ার অফিসার রেখা মিত্র এসেছিলেন। ওঁরা বললেন, ডেসপ্যাচ অর্ডার এসে গেছে, দু-চার দিনের মধ্যেই বীজধান গ্রামে পৌঁছে যাবে।

বলদ আর লাঙল তো ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। বিলি করা হয়নি—ষোলো-আনার ডাকে স্থির হয়েছে : আপাতত ঐ বলদ-লাঙল এ-গ্রামের যৌথ সম্পত্তি। ওরা একসঙ্গে জমিটা চাষ করে দেখবে এ বছর।

যৌথ-চাষের পরিকল্পনা দেবু পণ্ডিতের। তারই সবচেয়ে খুশি হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু আজকের মিটিঙে মনটা তার ভেঙে গেছে। গাঁয়ে বোধকরি একমাত্র সেই একা মানুষ যে দুর্মনস্যতায় ভুগছে। একমাত্র তার ঘরই আজ শূন্য—সেখানে কেউ সাঁঝের পিদিম জ্বালায় না।

উমা আজ সাতদিন হল কাঁকের যক্ষা-হাসপাতালে চলে গেছে।

কিন্তু না। এ বিষণ্ণতা তার ব্যক্তিগত শূন্যতায় নয়। তার চেয়ে অনেক অনেক বড় আঘাত সে পেয়েছে আজ ষোলো-আনার ডাকে। এবং আঘাতটা এসেছে এমন একজনের কাছ থেকে যাঁর সম্বন্ধে ওর ধারণা ছিল অন্যরকম। আজ ওর বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে জওহরলাল নেহেরুর লেখা 'গ্লিম্পসেস-অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'র সেই অনবদ্য পংক্তিটি : ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সব মানুষই বদলে যায়।

কিন্তু তাই বলে—তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থ!

সেই জ্ঞানবৃদ্ধ! যাঁর পায়ের তলায় বসে সাকেশোর জীবনের পাঠ নিয়েছে।

হ্যাঁ, তিনিই।

মন্দিরের পুরোহিত নির্বাচনের সময়েই খটকা লেখেছিল দেবু পণ্ডিতের। রসিকলাল শিরোমণির পরিবর্তে তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থের নির্বাচনে সে খুশি হতে পারেনি। কূপমন্ডূক প্রাচীনপন্থী শিরোমণিকে সে কোনদিনই অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করত না; কিন্তু সেই হা-হা-করা আগুনের আলোয় ঐ গোঁড়া ব্রাহ্মণের চরিত্রের যেদিকটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাও ভুলতে পারেনি। ওর মনে হয়েছিল দেবীপূজার অধিকার অর্জন

করেছিলেন শিরোমণি তাঁর বিকলাঙ্গ দেহটার বিনিময়ে। হয়তো দেবু পণ্ডিত প্রতিবাদও করত; কিন্তু পঙ্গুত্বের অজুহাত দেখিয়ে রসিকলাল নিজেই যখন অব্যাহতি চাইলেন তখন আর সে কথা বাড়ায়নি।

কিন্তু আজ? আজ যে ঘটনা সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইল : যৌথচাষের প্রসঙ্গ শেষ হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-সাহেব বললেন; আর একটা কথা। আপনাদের প্রাইমারি স্কুলের বাড়িটা তো শেষ হয়েছে। ব্ল্যাকবোর্ডও পৌঁছে গেছে। স্কুলটা কবে খুলছেন?

সকলের মুখপাত্র হিসাবে তারাপ্রসন্ন বললেন, সাতাশে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন।

—তাহলে একজন স্কুল-টিচার এবার নির্বাচন করতে হয়। আপনারাই বলুন—

মন্দিরের পুরোহিত নির্বাচনের সময় রসিকলাল শিরোমণির যে অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই তখন পড়েছে দিবাকর। কোন লজ্জায় নিজে থেকে কথাটা বলে? তাকে রক্ষা করল রত্নাকর ঘোষ। উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললে, আপনি যখন অনুমতি করলেন ছার, তখন কই—এ কাজের উপযুক্ত একজন মনিষ্যিই আছেন গাঁয়ে। আমাদের দেবু পণ্ডিত। কমলপুরে তিনি পণ্ডিতি করতেন।

সভায় একটা সম্মতিসূচক কলগুঞ্জন পরিস্ফুট হয়ে ওঠার আগেই তারাপ্রসন্ন বলে ওঠেন, না! দিবাকর গোস্বামীকে এ কাজে নির্বাচন করায় এখন অসুবিধা আছে।

—কেন? অসুবিধাটা কিসের?—জানতে চায় ঘোষের পো।

তার দিকে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃক্‌পাত করে তারাপ্রসন্ন বলেন, আমার কথাটা মেনে নাও রত্নাকর। দেবুকে তোমার চেয়ে আমি কম চিনি না। নিতান্ত অসম্ভব না হলে দেবুর তরফে আমিই প্রস্তাব রাখতাম।

দেবু পণ্ডিত বিস্ময়ে মূক হয়ে যায়।

তারাঠাকুরের মুখের উপর কথা বলবে এমন মানুষ কমলপুরেও ছিল না, এখানেও নেই। অগত্যা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-সাহেব বলেন, দেবুবাবু যদি না হতে পারেন, তাহলে?

অম্লানবদনে তারাপ্রসন্ন বললেন, যতদিন না বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন ও দায়িত্বটা আমিই পালন করব।

—ন্যায়তীর্থমশায় স্বয়ং এ দায়িত্ব নিলে তো কোন কথাই নেই—অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-সাহেব ও প্রসঙ্গে যবনিকা টানেন।

মিটিঙের শেষে সাহেবরা যখন চলে গেলেন তখন তারাপ্রসন্ন বললেন, দেবু, সন্ধ্যার সময় আমার বাড়িতে একবার এস তো! কয়েকটা জরুরি পরামর্শ আছে।

দিবাকর তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। বলে, কী কথা?

একটু অবাক হয়েছিলেন তারাপ্রসন্ন। বুঝিবা কিছুটা আহতও। কয়েকটি খণ্ড মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, গাঁয়ের ভালোমন্দের কথাই। আরও দু-চারজনকে আসতে বলেছি—এবং তোমার কথাও। কেন তোমাকে—

—থাক ঠাকুরমশায়! আমার কথা থাক। আর গাঁয়ের ভালোমন্দ যখন আপনিই দেখছেন, তখন আবার আমাকে কেন?

তারাপ্রসন্ন একেবারে অবাক হয়ে যান। কোন জবাব দেবার আগেই হনহনিয়ে চলে গিয়েছিল দিবাকর। শূন্য কুটিরে চুপচাপ পড়েছিল একা।

অভিমান করে দেবু পণ্ডিত যদি সরে না থাকত তাহলে দেখতে পেত সেই সন্ধ্যাতেই গ্রামের বেশ কয়েকজন এসে সমবেত হয়েছেন তারাপ্রসন্নের কুটীরে। কমলপুরেও এমন চণ্ডীমণ্ডপের বৈঠক হত—সেখানে মধ্যমণির মত থাকতেন রায়মশায়, আর তাঁকে ঘিরে সরোজ সাঁই, ননীমাধব, হৃদয় ঘোষ, রসিকলাল চাটুজ্জের দল। পারালকোটের এই বিজন-বনের একান্তে যে মজলিস বসল সেখানে শুধু ভদ্রলোকরাই সমাগত হননি—এসেছে নবীন যুগী, নবাপাল, দ্বিজপদ কর্মকার, রত্নাকর আর নীলাম্বর, আছে যগন্দ, রাখহরি, মালাকার প্রভৃতিরাও।

ছোট্ট ঘর। শালের খুঁটি, ঝাঁটি-মাটির দেওয়াল, মাথায় করোগেটেড টিন। ঘরের এখানে-ওখানে জ্বলছে কালিওঠা গোটাকতক লণ্ঠন। ফতুয়া-গায়ে একপ্রান্তে বসে আছেন তারাপ্রসন্ন—যিনি কমলপুরের মজলিসে কোনদিনই উপস্থিত হতেন না।

সবাই কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেটা কী, তা বোঝা গেল যখন মনুয়া এসে দ্বারপ্রান্ত থেকে ঘোষণা করল, দেবু পণ্ডিত আসবেনি। বুললে, ঠাকুরমশায়কে বলিস আমার শরীলগতিকটো ভালো লয়।

—ও! তাহলে দেবু আসতে পারল না। তা না হক। তোমরা পঞ্চজনা যখন শামিল হয়েছে, তখন আমার বক্তব্যটা পেশ করি। নবীন, প্রশ্নটা আমি তোমাকেই করব—তোমার মেয়ের কোন সন্ধান পেয়েছ?

নবীন যুগীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠে। মাথাটা একবার না-এর ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে দু-হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দেয়।

রত্নাকর বলে ওঠে, আপনে কিছু পাইছেন দ্যাবতা?

—হ্যাঁ, পেয়েছি। রাধা বেঁচে গেছে। সতীশ কর্মকার তাকে কাঁকের নিয়ে গিয়েছিল। সাহেব-ডাক্তারে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

নবীন সোজা হয়ে বসে। মুখ তুলে তাকায়। বলে : কই আছে সে?

—যেখানেই থাক, সে নিরাপদে আছে। এখন তোমরা পঞ্চজনা বিচার করে বল, রাধা যদি গাঁয়ে ফিরে আসে আমরা কী করব?

কেউ কোন কথা বলার আগেই ছিলেখোলা ধনুকের মত লাফিয়ে ওঠে নবীন, মুখদর্শন করবনি! আমার ঘরে ও কুলটা মেয়ের আর ঠাঁই হবেনি, এ আমি নিয্যস্ কয়ে দিলাম ঠাকুর।

তারাপ্রসন্ন বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হলেন না। নবীনকে উপেক্ষা করে বললেন, তোমরা পঞ্চজনা কী বল?

কেউ কোন জবাব দেয় না। যুগীই আবার কিছু বলতে যায়। তাকে থামিয়ে দিয়ে ন্যায়তীর্থ বলেন, তুমি নয়, তুমি তোমার কথা বলেছ। আমি পঞ্চজনার মত জানতে চাইছি।

দ্বিজপদ বলে ওঠে, আপনিই বিধান দ্যান দ্যাবতা?

—আমার মতে রাধা কিছু পাপ করেনি। তাকে সমাজচ্যুত করবার প্রশ্ন ওঠে না। আমরা তাকে গ্রহণ করব।

নবীন হাত-পা ছুড়ে বলে ওঠে, কিছুতেই নয়। আমার ছামুতে অর আর ঠাঁই হবেনি; এ আমি নিয্যস কয়ে দিলাম ঠাকুর।

নির্বিকারভাবে তারাপ্রসন্ন বলেন, বেশ কথা। কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই থাকবে। তাই এবার দ্বিজপদকে আমি প্রশ্ন করব—কী কর্মকার? তোমার ঘরে কি রাধার ঠাঁই হবে? তুমি কি তাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নেবে?

দ্বিজপদকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে নবীন পুনরায় চিৎকার করে ওঠে, আপনে বামুন হয়ি যুগীর মেয়ের সাথে কম্মোকারের বিয়ে দেবেন! অসম্ভব! আমি রাজি নই!

এবার স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করেন তারাপ্রসন্ন, তুমি অহেতুক চিৎকার কর না, নবীন। তোমার রাজি-অরাজিতে কিছুই যায় আসে না। রাধা স্বয়ম্বরা হয়েছে। সে প্রাপ্তবয়স্কা। এ বিবাহ সিদ্ধ। দ্বিজপদ সম্মত হলে আমি নিজে ঐ কন্যা সম্প্রদান করব।

দ্বিজপদ হাত দুটি জোড় করে বললে, আপনেই সমাজ। আপনে যখন অনুমতি দ্যালেন, তখন অরেই আমি ব্যাটার বউ করবনে।

নবীনের বিক্রম তখনও শেষ হয়নি! বলে, না! ঠাকুরমশায় পণ্ডিত হতি পারেন, কিন্তু একা তিনি 'সমাজ' নন! যুগীর মেয়ের সঙ্গে কম্মোকারের বিয়ে হয় না, হবে না! গাঁয়ে আরও দশ ঘর মানুষ আছে। একা তারা-পণ্ডিতই সমাজ নয়, আমি মানি না।

যগন্দ কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে তারা-ঠাকুর বলে ওঠেন, এতক্ষণে তুমি একটা ন্যায্য কথা বলেছ নবীন! 'সমাজ' মানে পঞ্চজনার মত! গাঁয়ে দশ নয়, পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস। তা এক কাজ কর, কাল সকালে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুধিয়ে এস। দেখ, ক-ঘর মানুষ তোমাকে পরামর্শ দেয় ঐ দশরথ বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে! তারই বা প্রয়োজন কী? এখানে, এই মজলিসেই তো দশবারো ঘর লোক আছে—এদেরই প্রশ্ন করে দেখ, কতজন তোমাকে সমর্থন করে।

নবীন মুখ তুলে তাকায়।

রতন ঘোষ বলে, নবীন, পাগলামি করিস না। দ্যাশই যখন গিছে, তখন জাত ধুয়ি কি জল খাবা?

নীলাম্বর বললে, দিনকাল সব বদলে গেছে দ্যাখছেন না যুগী খুড়ো? এই যে আমি, কালাপানি ফেরত আসামী, সাত জাতের ছোঁয়া জল খায়ে দণ্ডকারণ্যে আলাম, কই প্রাচিত্তিরের কথা তো কেউ বুললে না?

নবীন দাঁতে দাঁত চিপে বললে আজ শিরোমণি ঠাকুর নাই, তাই এই অনাচারের কথা বলতে সাহস পাতিছ তোমরা।

তারাপ্রসন্ন হাসলেন। বললেন, ওটাও তোমার ভুল ধারণা, যুগী। আজ সকালেই শিরোমণির পত্র পেয়েছি। কাছেই আছে, রসো, পড়ে শোনাই।

ফতুয়ার পকেট থেকে চশমা বার করে নাকে চড়ালেন। পকেট থেকে রসিকলালের পত্রখানি বার করে পড়তে থাকেন, "দাদা, আমি যদি আজ গ্রামে থাকিতাম, আর আমার যদি সে অধিকার থাকিত তাহা হইলে আমিই উদ্যোগী হইয়া নবীনের কন্যাটির সহিত সতীশ কর্মকারের বিবাহ দিতাম।"

রতন উৎসাহভরে বলে, ঠাকুরমশায়ের চিঠি? কই আছেন তিনি? গাঁয়ে ফিরবেন না?

—না! তিনি ঐ কাঁকেরেই আছেন। গ্রামে আর ফিরবেন না।

—কেন? ফিরবেন না কেন?

তারাপ্রসন্ন সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেন, তাহলে নবীন! এ বিবাহে তোমার মত নেই?

নবীন মুখটা তুলল। মজলিসের উপর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে বললে, ঠিক আছে! পঞ্চজনার আদেশ মানি নিলম। মেয়ে ফিরে আসুক—

বাধা দিয়ে তারাপ্রসন্ন বলেন, মেয়ে তোমার ফিরে এসেছে নবীন। একটু আগে তোমার স্ত্রী এসে আমার বাড়ি থেকে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে গেছেন। তারা তোমার বাড়িতেই আছে। যাও, বাড়ি যাও। আর শোন, রাগারাগি কর না। মেয়ে তোমার বিষ খেয়েছিল—দেখ, যেন আবার থানা-পুলিসে জড়িয়ে পড় না!

ওরা উঠে দাঁড়ায়। তারাপ্রসন্ন নবীনকেই বলতে থাকেন, বিয়ের যোগাড় যন্ত্র দেখ, তেসরা জ্যৈষ্ঠ একটা ভালো দিন আছে।

একে একে সকলেই পথে নামে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ নবীন যুগী গড় হয়ে পেন্নাম করলে ঠাকুরমশায়কে।

—এটা আবার কী হল যুগী?

—আঁগ্যে রাগের মাথায় বেভ্যম যদি কিছু কয়ি থাকি....

—ও, আচ্ছা আচ্ছা!

সবাই বিদায় হলে পুত্রবধূ এসে দাঁড়ায়। বলে, আপনার ঠাঁই করে দিই বাবা?

—না মা, একবার তোমার কাকিমাকে ডাক।

ডাকতে হল না। চৌকাঠের ওপারেই অপেক্ষা করছিলেন রসিকলাল শিরোমণির স্ত্রী। এগিয়ে এলেন তিনি, মাথার ঘোমটা তুলে দিয়ে।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি বাঁধাছাঁদা করে তৈরি হয়ে নাও মা। কাল সকালেই ছগনলালের ট্রাক কাঁকেরে যাবে। তোমাকে যেতে হবে।

ব্রাহ্মণী সংকোচ করলেন না। বললেন, আপনি কি আমাকে সেই পরামর্শই দিচ্ছেন?

—নিশ্চয়ই! স্বামীর ধর্মই তোমার ধর্ম মা! তুমি যে তার সহধর্মিণী!

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন রসিকলালের গৃহিণী। তারপর বললেন, ছগনলালের সঙ্গে আমি একা যাব?

না! দেবু পণ্ডিতও যাবে। তাকে অবশ্য এখনও বলাই হয়নি। লণ্ঠনটা দাও তো মা। ছেলেটা অভিমান করে দূরে সরে রইল। একবার দেখা করে আসি।

—এত রাত্রে?

—রাত এমন কিছু বেশি হয়নি। নটাও বাজেনি বোধ হয়।

দিবাকর স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এতরাত্রে উনি নিজে আসবেন।

—আপনি! এতরাত্রে?

—জরুরি কথা আছে দেবু। শরীর তোমার যতই খারাপ হোক আজ রাতেই কথাটা বলা দরকার। তুমি গুছিয়ে নাও। কাল সকালেই তোমাকে কাঁকের যেতে হবে।

—কাঁকের! কেন উমা কি—?

—না, না! উমা ভাল আছে। চল ভিতরে গিয়ে বসি।

দিবাকরের বিছানায় এসে বসলেন। ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে দিলেন একখানি চিঠি। বললেন, ইংরেজি চিঠি। এর পাঠোদ্ধার করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন লেডি ওয়েলফেয়ার অফিসার। পড়ে দেখ।

—কার চিঠি?

—কাঁকের হাসপাতালের সাহেব ডাক্তার পাঠিয়েছেন আমাদের লেডি ওয়েলফেয়ার অফিসারকে। টাইপ করা ইংরেজি চিঠি। লিখেছেন কাঁকের মিশনারি হাসপাতালের ফাদার মার্লো।

প্রিয় ম্যাডাম,

"আপনি যে রোগিণীকে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন, শ্রীমতী উমা দেবী, তিনি তাঁর স্বামীকে একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানি বঙ্গভাষায় লেখা, আমি তার পাঠোদ্ধার করতে পারিনি। ডেভিডকে দিয়ে পড়াতে পারতাম কিন্তু সেটা উচিত হত না। একটি মহিলার স্বামীকে লেখা-চিঠি অপর পুরুষে পড়ে ওটা আমার মনোমত হয়নি। তাই এটি আপনার কাছে পাঠালাম। যাঁর চিঠি অনুগ্রহ করে তাঁকে পৌঁছে দেবেন।

প্রসঙ্গত জানাই রোগিণীর কেমন যেন ধারণা হয়েছে, তিনি চিকিৎসার অতীত। আমি তা আদৌ মনে করি না। একটু দেরি হয়ে গেছে, এই যা। তা হোক, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও যথেষ্ট উন্নত। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমরা উমা দেবীকে একটি কটেজে স্থানান্তরিত করেছি। তাঁর স্বামী যদি সেখানে এসে থাকেন তাহলে রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা সহজতর হয়। সেটা ব্যবস্থা করা কি সম্ভব? ইতি—

তারাপ্রসন্ন একটি মুখবন্ধ খাম বাড়িয়ে ধরেন দেবুর দিকে। খামটা খুলে ফেলতেই বার হয়ে পড়ল হলদে কাগজে পেন্সিলে লেখা চিঠি।

"মাস্টারমশায়,

একটা কথা না জানিয়ে গেলে মরেও আমি শান্তি পাব না। আশাকরি বুঝতে পেরেছেন, কোন কথা। কেন বিয়ে করতে রাজি হইনি আপনাকে। না মাস্টারমশায়, সংস্কার অতটা দৃঢ় ছিল না আমার; দেহেও কোন অপূর্ণতা ছিল না। কিন্তু কেমন করে রাজি হব আমি? আমার ঠোঁটে তৃষ্ণার পাশে পাশে বাসা বেঁধেছে মৃত্যুবীজ। কেমন করে আপনাকে দেব এই বিষাক্ত দেহটার ওপর অবাধ অধিকার? আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন—আপনার দেহে যে আমার এই রোগ সংক্রামিত হয়নি এটুকুই আমার সান্ত্বনা। এ চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছাবে তখন আমি এ দুনিয়ায় থাকব না। আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি। আশীর্বাদ করুন আবার যেন আপনার দেখা পাই।

আনন্দময়ী মায়ের দোহাই মাস্টারমশায়, সে জন্মে আপনি যেন আমার মাস্টারমশায়ের পরিচয় নিয়ে আসবেন না।

ইতি—প্রণতা উমা।"

চিঠিখানা শেষ করে দিবাকর দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকল। ওর পিঠে একটি হাত রাখলেন তারাপ্রসন্ন। বললেন, কী লিখেছেন বৌমা?

নির্বিকারভাবে দিবাকর চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে।

—আমি পড়ব?

—পড়ুন।

পত্রটি নড়ে বজ্রাহত হয়ে গেলেন তারাপ্রসন্ন।

দীর্ঘ সময় দুজনেই নির্বাক। নীরবতা ভেঙে তারাপ্রসন্ন বলেন তার মানে উমা তোমার বিবাহিত পত্নী নয়?

মাথাটা নাড়ল দিবাকর। জবাব দিল না। ওর হাত দুটি তুলে নিয়ে তারাপ্রসন্ন বলেন, ভেঙে পড়লে তো চলবে না দেবু! কাল সকালে ছগনলালের ট্রাক কাঁকের যাবে। তোমাকে যেতে হবে। সাহেব-ডাক্তার তো ভরসা দিচ্ছেন। ভয় কী? বৌমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। কাল সকালেই রসিকভায়ার গিন্নিকে নিয়ে রওনা দাও তুমি।

দেবু পণ্ডিত জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

তারাপ্রসন্ন বললেন, আশা হচ্ছে আমরা পুনর্বাসন পেলাম। এমনকি শিরোমণি ভায়াও পুনর্বাসন পেয়েছে। শুধু তুমিই কি একা বাকি থাকবে দেবু? এই কখনও করুণাময়ের বিচার হতে পারে? সেইজন্যই তোমাকে স্কুলের মাস্টারিটা নিতে দিলাম না।

দেবু পণ্ডিত নত হয়ে প্রণাম করল তারাপ্রসন্নকে।

পাঁজি দেখে তারাঠাকুর দিনটা নির্দেশ করে দিলেন। প্রথম কর্ষণের শুভদিনটা। কালো করে আকাশ ছেয়ে মেঘ জমেছে। কাল রাত্রে বর্ষণ হয়েছে প্রচুর। ভিজে মাটির একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে একজোটে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাঠে। পঞ্চাশ ঘর চাষীর একলপ্তে হাজার বিঘে ভুঁই। জোড়া জোড়া লাঙল ঘুরছে দিগন্তের এ-প্রান্তে। রত্নাকর ঘোষ অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকে নতুন যুগের নতুন চাষীর কাণ্ডকারখানা। ওর স্যাঙাৎ যগন্দ ঘোষ যেন তিন-কুড়ি বয়সে নতুন করে যৌবন ফিরে পেয়েছে। যেন আর সামলাতে পারছে না নিজেকে। ভুলে-যাওয়া কী-একটা গান সুর-সুর করছে বুড়োর ঠিকরে ওঠা গলকণ্ঠে। দিগন্ত-অনুসারী ভিজা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বুঝি বুড়োর ভীমরতি ধরে—হেঁড়ে গলায় হঠাৎ শুরু করে বাজখাঁই সুরে গান—"কালো বরণ ম্যাঘরে-এ-এ-এ, পানি নিয়া আয়"...তারপর বোকার মতো ইতিউতি চায়। পরের লাইনটা বেমালুম ভুলে গেছে। যাবে না? আজ বারো বছর যে গাওয়া হয়নি! ও পাশ থেকে ভিজতে ভিজতে দ্বিতীয় চরণটা যোগান দেয় নবা পাল—"মোর পরাণ জুড়ায়ে দে-এ-এ!"

পাঁচ চাষীর মনের মণিকোঠা থেকে ওরা তিল তিল করে উদ্ধার করে আনে

কমলপুরের মাঠে হারিয়ে যাওয়া গোটা গানটাকে। আর শুধু কি ঐ একখানা গান? সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে ওদের মস্তিষ্কের রন্ধ্রকোষ থেকে একে এক বেরিয়ে এল আরও কত গানের রাজকন্যে। "ব্যাঙ লো রাণী দে লো পানি"—"পরাণ বন্ধু রে-এ-এ-এ—

খিল খিল করে হেসে ওঠে নবাপালের নাতি—রসময়ের ব্যাটা। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে মনুয়া-ট্যানার দল। ওসব গান ওরা বাপের জন্মে শোনেনি।

একহাঁটু কাদার মধ্যে লাঙল ঘোরে এড়ো-আলের কান ঘেঁষে—এ-মাঠে, ও-মাঠে, যতদূর নজর চলে—হু-উই পাহাড়ের কোল পর্যন্ত। ঐ যগন্দ, রাখহরি, ছিদেম—তারপরের মাঠটায় নবীন যুগীর জামাই-বেটা রসময় আর আনন্দ—হুই দেখা যায় বিশে, পাঁচু ছিনাথ, সুধাময়, অর্জুন আর মাধোকে! তারপরের ঐ দিগন্ত সই-সই মাঠটায়—হু-ই ছোট্ট মানুষগুলো। ওরা কারা? গোবিন্দ আর পেল্লাদ বায়েন মনে লাগে! না-না—ভুল হয়েছে ঘোষের পোর। বুড়ো মানুষ—মনের ভুলে কী বলতে কী বলেছে। টেঁপীর সোয়ামী গোবিন্দ নাই—পদ্মর বাপ পেল্লাদ নাই! না থাক, সে সব দুঃখের কথা আজকের এই শুভদিনে ভাববে না রতন। বুড়োরাজা তেনার পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন ওদিগের। ওদের কথা আজকের দিনটিতে ভুলে থাকতে হবে, শুধু আজকের নয়, আগামী দিনেও। ভুলে যাচ্ছেও। না থাক পেল্লাদ, না থাক গোবিন্দ—এরা আছে। মনুয়া-আনন্দ-রসময়-ট্যানার দল। উট্‌কো জোয়ানের দল। না থাক অভিজ্ঞতা—সাতপুরুষে চাষীর ব্যাটা, শিখে নিতে কদিন? পারবে, নিশ্চিত পারবে ওরা এই জমিতে সোনা ফলাতে। গাঁ-সুদ্ধ লোক আশা রাখে—এবছর ভাল ফসল হবেই। দুই নয়, পাঁচ নয়—পাকা বারো বছর পরে, একযুগ অতিক্রম করে আজ চাষে নেমেছে মানুষগুলো। অন্তত এবার কি বিমুখ হতি পারেন দ্যাবতা? অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে ফেলতি পারেন মাঠ? অতিবৃষ্টিতে ভাস্যে দিতি পারেন জমি? এতটা কঞ্জুষ হলি তাঁরে করুণাময় কেন কবে সবাই, কও?

আহা দেবু পণ্ডিত আজকের দিনটিতে গাঁয়ে থাকতি পারলনি! নিজের চখ্যে দেখি যাতে পারলনি। তা হক,—হে শিবঅ, হে শম্ভু! তুমি দেখ—উমা মারে নিয়া দেবু পণ্ডিত যান ফিরি আসে—সেই যেদিন অ্যাদের সুনালী ফসল মরাইয়ে উঠবে! সেই যখন ঢেঁকি ঘরে ঝিউরি-বউরির দল আলতা-রাঙা চরণে বোল তুলবে : ঢকাঢাঁই-ঢকাঢাঁই-ঢকাঢাঁই, আর তখন রতন-যগন্দ-রাখহরি, হরতুকীগাছের ছামুতে বসি ঐ ঢকাঢাঁইয়ের উতোর গাইবে থেলো হুঁকোয় গুড়ুক-গুড়ুক-গুড়ুক!

কিন্তুক্! হায় বাপ! বীজধানডা যে আজও আসে নাই! সময়ে তা আসবি তো?

আসবি! নিয্যস্ আসবি! হে শিবঅ—হে বুড়োরাজা, দেখো তোমার বদনাম না হয় যান্!
